কোজাগর

বুদ্ধদেব গুহ



কোজাগর

কোজাগর

বুদ্ধদেব গুহ

সমকাল প্রকাশনী
১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৬১

প্রকাশক :

প্রসূন কুমার বসু

সমকাল প্রকাশনী

১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট :

অলোকশংকর মৈত্র

মানসী প্রেস

৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৬



তখন গোধূলির আলোয় জঙ্গল-পাহাড়ের অসমান দিগন্তের ওপরের সমস্ত আকাশ এক বিধুর লালিমায় ভরে উঠেছে। চলে-যাওয়া বাসটার পিছনে পিছনে কিছুক্ষণ লাল ধুলোর মেঘ বাসটাকে তাড়া করে গিয়ে, এলোমেলো উড়ে: আলতো হয়ে পথের পাশের গাছ-গাছালিতে, পাথরে, নিঃশব্দে থিতু হলো।

বাস থেকে নেমে একটু হাঁটতেই মানিয়ার সঙ্গে দেখা। ও শাল জঙ্গলের ভিতরের সুঁড়িপথ বেয়ে এসে, একবোঝা কাঠ কাঁধে নিয়ে বড় রাস্তায় উঠল। মানিয়া মানে, মানি ওরাও°।

বলল, কোথায় গেছিলে বাবু?

ডালটনগঞ্জ।

তোমার জন্যে একটা মুরগী এনেছিলাম সকালে। কিন্তু তিতলি বলল, বাবু মোরগা রাখতে বলে যায় নি। আমি রাখতে পাবব না।

ভালোই হয়েছে। ঔরঙ্গাবাদ থেকে আমার যে মেহমানদের আসার কথা ছিল, তাঁরা আসবেন না। ওটা তুই কালকের চিপাদোহরের হাটে বিক্রি করে দিস্। ভালো দাম পাবি। আমাকে তো সস্তাতেই দিতিস!

তোমার কথা আলাদা। ভালোবেসে বলল, মানি।

তারপরই বলল, পা চালাও জোর। অন্ধকার হয়ে’ এলো।

পালামৌর এই জঙ্গল-পাহাড়ের আড়াআড়ি-আসা শীতের সন্ধ্যেকে একটা অশ্রাব্য দেহাতী গাল দিয়ে ও আবার ওর পথে এগোল।

আমিও আমার ডেরার পথ ধরলাম।

সূর্যটা ডুবতে-না-ডুবতেই এখানে শক্ত হাতে শীতটা দু-কান মোচড়াতে থাকে। নাসারন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কের কোষে কোষে শীতের ফুঁ ছড়িয়ে যায়। এই শেষ আশ্বিনেই!

পথের দু-পাশে লিটপিটিয়ার জঙ্গল। ঢোঁওটা, ঢোটর। মাঝে মাঝে রাহেলাওলার গোল গোল নরম লালচে বেদনার মতো ফুল। তারপরই জঙ্গল গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। কতরকম গাছ-গাছালি! বনজ সন্ধ্যার গায়ের নিজস্ব গন্ধ উঠেছে চারদিক থেকে। রহস্যময় এক অচিন গন্ধ। দূ—রে...পাহাড়ের নিচে নিচে, যেখানে জঙ্গল খুবই গভীর, সেখান থেকে টিটির্-টি, টিটির্-টি—টিটি টিটি করে একজোড়া টিটি পাখি ডেকে ফিরছে। তাদের গলার আগু-পিছু ক্ষীণ স্বর ভেসে আসছে ভালুমার বস্তির ক্ষেত-খামার, আর জঙ্গলভরা টানা-টাঁড়ের ওপর দিয়ে। পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারাটা জ্বল জ্বল করছে।

সিম আর লাউয়ের লতা-ছাওয়া বাঁশের বেড়ার দরজা খুলে আমি ভিতরে ঢুকলাম। লালু ভুক্ ভুক্ করে দু-বার ডাকল লেজ নাড়িয়ে। ও এর মধ্যেই খড়ের গাদার ভিতরে সেঁধিয়েছিল। আমার ডেরার বেড়ার পাশেই আগুন জ্বেলেছে রাস্তা মেরামতকরা কুলিরা, ওদের ঝুপড়ির লাগোয়া। লালু আমাকে অভ্যর্থনা করেই খড়ের গাদা সেই আগুনের কাছে গিয়ে বসল। দীর্ঘ হিমেল রাতের জন্যে নিজেকে তৈরি করছিল ও।

তিতলি দরজা খুলেই অভিভাবকসুলভ গলায় বলল, এতক্ষণে এলে?

বাস তো এক্ষুনি এলো! শব্দ পাস নি? জানিস না ট্রাক নেই আজকে?

যাওয়ার সময় খুব যে বলে গেলে দুপুরে আসবে। তোমার জন্যে আমারও খাওয়া হলো না!

দুপুরেই ফিরব বলে গেছিলাম মনে পড়তেই আমার খুব লজ্জা হলো। বললাম, আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। ক্ষমা করে দে।

তিতলি ভীষণ লজ্জিত হয়েই, উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, ছিঃ, ছিঃ, এ কী! তোমার সঙ্গে কথাই বলব না তুমি এরকম করে কথা বললে!

অন্যায়? তোমার? অবাক গলায় বলল তিতলি।

যেন আমি কখনও কোনো অন্যায় করতেই পারি না।

হাতের জিনিসপত্র রেখে, মুখ-হাত ধুয়ে, জামা-কাপড় বদলাতে গেলাম। ঐ ঘরের পাশে রান্নাঘরে তিতলি আটা মাখছিল, তার শব্দ পাচ্ছিলাম। এ-ঘর থেকেই জিজ্ঞেস করলাম, কী রেঁধেছিস রে আজ?

লাউকির তরকারি আর চানার ডাল।

খুব খিদে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি রুটি সেঁকে ফ্যাল্। বেশী করে। দুপুরে তুই খাস নি? কোনো মানে হয়! সত্যিই খাস নি?

সাচ্ না ক্যা ঝুট? উষ্মার সঙ্গে বলল ও।

ওর হাতের বালার সঙ্গে পিতলের থালার ঘষা লাগতে নিক্কণ উঠল।

তারপর নীচু গলায় বলল, আমি তো ভাতই খাব। দুপুরের ভাত কি নষ্ট হবে?

হাত-মুখ ধুতে-না-ধুতে মিনিট দশেকের মধ্যে জায়গা করে দিয়ে খাবার নিয়ে এলো ও। গরম গরম হাতে-সেঁকা আটার রুটি, লাউয়ের তরকারি, ছোলার ডাল। কাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচা লংকা। মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছি, এমন সময় চুপি চুপি, যেন কোন গোপন কথা বলছে, এমনই গলায় ও বলল, গাড়ুর রেঞ্জার সাব্ তোমার জন্যে নিম্বু, আমলকী আর মরিচার আচার পাঠিয়েছেন। দিই একটু?

তাড়া দিয়ে বললাম, দে দে। দিস নি কেন এতক্ষণ? লেবুর আচার তো তুই-ই দুদিনে শেষ করে দিবি চুরি করে খেয়ে। আমার জন্যে তো কিছুই থাকবে না।

ও গাল ফুলিয়ে বলল, হ্যাঁ। আমি তো হলাম গিয়ে চোর-ডাকাইত্। তোমার সর্বনাশ! তাহলে আমাকে জেনে-শুনে রাখাই বা কেন?

এখানের সব লোকই তো চোর। ভালো লোক পাই না বলেই রাখি। বাধ্য হয়ে।

হ্যারিকেনের আলোয় আলোকিত ওর ব্যথিত মুখের ওপর এক ঝট্কায় ত্রস্ত বাঁ-হাতে আঁচলটা টেনে দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, তুমি দেখো তোমার চাকরি সত্যিই ছেড়ে দেবো কাল থেকে। আমরা চোর ত চোর! না খেয়ে থাকব, তাও ভি আচ্ছা।

আর একটু ডাল দে। তোকে আমি ছাড়লে তো! তোর ইচ্ছেয় কি চাকরি হয়েছিল যে তোর ইচ্ছেয় যাবে?

ও এবার কপট রাগের সঙ্গে পিতলের হাতা করে গরম ডাল এনে বাটিতে ঢেলে দিয়ে

বলল, অনেক পাপ করলে তোমার মতো মনিব পায় লোকে।

এমন সময় বাইরে টেট্‌রার গলা শোনা গেল।

টেট্‌রা গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, এসে গেছিরে তিত্‌লি।

তিত্‌লি বলল, কুলিদের ঝুপড়িতে একটু আগুন পোয়াও বাবা। বাবুর খাওয়া হয়নি এখনও।

টেট্‌রাকে ভিতরে এসে বসতে বললাম। ঘরের মধ্যে মাটির মাল্‌সাতে কাঠকয়লার আগুন রাখাই ছিল। সন্ধ্যে থেকে না-রাখলে ঘর গরম হতে বড় সময় নেয়। টেট্‌রা পাশের ঘরে বসেই আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। নানা কথা ডালটনগঞ্জে আটার কেজি কত? কাড়ুয়া তেল আর মিট্টি তেলের আমদানি কী রকম! শুখা মহুয়ার দাম কি আরো বেড়েছে এ বছর?

মেঝেতে শালকাঠের পিঁড়িতে আসন করে বসে আমি খাচ্ছিলাম। তিত্‌লি হ্যারিকেনটা একটা কাঠের টুকরোর ওপর রেখে আমার সামনে বসে ছিল।

ঐ ঠোঙায় কী এনেছো আমার জন্যে?

তুই-ই বল।

ওর মুখ খুশিতে ঝল্‌মল্‌ করে উঠল।

আমি জানি। বলব? বাজি!

খুলে দ্যাখ্‌।

ও আস্তে আস্তে উঠে আমার ঘর থেকে প্যাকেটটা এনে খুলে ফেলল। খুশিতে ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল, ওমাঃ, এত্ত! এত্ত কেন আনলে?

সকলে মিলে ফোটাবি। মজা করবি। তোর জন্যে একটা শাড়িও এনেছি। দেওয়ালির দিনে পরবি। নিয়ে যা। বাজিগুলোও নিয়ে যা।

না, না, এখন কিছুই নেবো না। দেওয়ালির দিন সকালে দিও, তোমাকে প্রণাম করব যখন। দেওয়ালির আর কতদিন বাকি?

ছ'দিন। রাতে অন্ধকার কেমন চাপ বেঁধে থাকে দেখিসনি? চাঁদ ওঠে সেই শেষ রাতে, তাও একটুখানি।

ও কিছু না বলে, ঠোঙাটা ঘরে রেখে আসতে গেল।

আমার খাওয়া হয়ে গেলে, তিত্‌লি থালায় ওর খাবার গুছিয়ে নিয়ে বাঁ-হাতে তুলে ধরে বাঁ-কাঁধের ওপর নিলো, আর ডান হাতে কেরোসিনের কুপিটা। তারপর এক ঝাঁকিতে বাচ্চা শিমুলের মতো সটান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষারত টেট্‌রাকে ডাক দিয়ে বলল, চল্‌ বাবা!

এসব জায়গায় সন্ধ্যের পর কেউ ঘর থেকে বেরোয় না বড় একটা। যদি-বা কখনও বেরোতেই হয়, খালি হাতে এবং আলো ছাড়া কখনোই না। টেট্‌রার কাঁধে টাঙ্গি তিত্‌লির হাতে আলো।

খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম, টেট্‌রা আলো হাতে পথ-দেখানো মেয়ের পিছন পিছন বড় বড় পা ফেলে মোড়ের ঝাঁকড়া মহুয়া গাছটার কাছে পৌঁছে পাকদণ্ডীর পথ ধরল বস্তির দিকে।

আমি জানি, তিত্‌লি যেটুকু খাবার নিয়ে যায়, মানে যেটুকু ওকে দিই; ওর মতন, তা তিত্‌লি তার মা-বাবার সঙ্গে ভাগ করেই খায়। হয়তো ওর নিজের পেটও ভরে না। ওরা সারা বছর এ-বেলা ও-বেলা যা খায়, তা না-খাওয়ারই মতো। অথচ আমার এমন সামর্থ্য নেই যে, ওর পরিবারের সমস্ত লোককে আমি খাওয়াই। সে সামর্থ্য থাকলে আমার মতো

খুশি কেউই হতো না। দু-বেলা খাওয়ার পরই রোজ আমার ওদের কথা মনে হয়। এবং মনে হওয়ায় বেশ অনেকক্ষণ মনটা খারাপ থাকে। নিজে পেট ভরে দু-বেলা ভালো-মন্দ খেতে পাই বলে একটা অপরাধবোধও জাগে মনে।

দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। অন্ধকারে, শীতার্ত তারা-ভরা রাত ; বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। খাপ্‌রার চাল, মাটির দেওয়ালের ঘরে দড়ির চৌপাইতে বসে আমি একটা পান মুখে দিলাম। চৌপাই-এর নিচে মাল্‌সায় কাঠ-কয়লার আগুনের উষ্ণতা ধীরে ধীরে শরীরকে গরম করে তুলছিল। শীতের রাতে সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গেই এধারের ঘরের বাইরের জীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। সবাই খেয়ে-দেয়ে দরজা লাগিয়ে শুয়ে পড়ে। শুধু ক্ষেতে ক্ষেতে রাখওয়ার ছেলেদের ক্যানেস্তারা পিটিয়ে শুয়োর হরিণ তাড়ানোর আওয়াজ পাওয়া যায় এদিক ওদিক থেকে। কুল্‌থি আর অড়হড় ক্ষেতে শম্বরের দল আসে। যেদিন হাতি আসে, সেদিন আছাড়ী পট্‌কা, মাদল, ক্যানেস্তারার সম্মিলিত শব্দে মাঝ রাতে আচমকা ঘুম ভেঙে যায়। সকলেই যে যার মাটির ঘরে উৎকর্ণ, উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। একসময় বাইরের রাখওয়ারদের চিৎকার চেঁচামেচি স্তিমিত হয়ে থেমে যায়। তখন পাশ ফিরে সকলে আবার ঘুমোয়।

ঘুমোতে পয়সা লাগে না। একমাত্র ঘুমোতেই! তাই, ওরা খুব ঘুমোয়।



দেওয়ালির পরই ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেল একচোট। গাছ-গাছালি পড়ে গেল ঝড়ে। নালার পাশের নিচু জমিতে ধানগুলো তৈরি হয়ে গেছিল প্রায়, প্রায় সবই ঝরে গেল। পাখিও মরেছিল অনেক।

একটা নীলকণ্ঠ পাখিও।

মঞ্জরী বলেছিল, এ বড় অলক্ষুণে ব্যাপার। মানিয়া শোনে নি সে-কথা। ঠিক শোনে নি বললে ভুল হয়। শুনেছিল, কিন্তু বিশ্বাস করতে সাহস হয় নি ওর। সমস্ত লক্ষণ শুভ থাকাতেই এই ক'টা পেট চালানো বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই যথেষ্ট কষ্টের। তাই অশুভ লক্ষণ আরও কী বয়ে আনবে, ভাবতেই ভয় করে মানির। আগে আগে রাতে একটা কুপি জ্বালিয়ে রাখতো ঘরের কোণায়। যখন ছেলেমেয়ে হয় নি। কেরোসিনের দাম সস্তা ছিল তখন। এখন সারারাত কুপি জ্বালিয়ে রাখার কথা ভাবতেও পারে না। রাত-ভর জ্বললে পঞ্চাশ পয়সার কেরোসিন পুড়বে। জ্বালাবার সামর্থ্য যেমন নেই, আবার না-জ্বালিয়ে রাখলে অস্বস্তিও কম নয়। শীতকালটায় তাও সাপের ভয় নেই। কিন্তু বর্ষার দিনে বড় ভয় করে। খাপ্‌রার চালে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য। জল চুঁয়োয় জোরে বৃষ্টি হলে। সাপ এসে ইঁদুর ধাওয়া করে চালময়। কয়েক বছর আগে একটা কালো গহুমন্ সাপ ঝুপ্ করে পড়েছিল বুল্‌কির মাথার কাছে। কোনোক্রমে সেটাকে মারে মানি। নিজেও মরতে পারতো। তার ফণাধরা চেহারাটা মাঝে মাঝে এখনও মনে পড়ে। ওদের ঘরের পাশেই যে ঝাঁকড়া আম আর তেঁতুল গাছ-দুটো আছে, তাদের পাতা থেকে টুপ্‌টাপ করে শিশির ঝরে খাপ্‌রার ওপরে, ঘরের আশে-পাশে, ওদের আস্তানার চৌহদ্দির বাইরের ঘন জঙ্গলে, ফিস্ ফিস্ করে। বলদ দুটো যেখানে থাকে, সেই চালার মাথায়; জঙ্গল থেকে কিছু ডাল-পাতা কেটে এনে দিয়েছিল। এবারে যা ঠান্ডা! গরুটা বিইয়েছে। বাছুরটা আর গরুকে যত্নে রাখে মানিয়া।

পরেশনাথটার বড় নাক ডাকে। এতটুকু ছেলের এরকম নাকডাকা ভালো নয়। প্রথম রাতেই ঘুমোতে না পারলে আজকাল ঘুমই হয় না মানিয়ার। রাজ্যের চিন্তা এসে মাথায় ঘুরপাক খায়। মাথার মধ্যে অসহায়তার মোম গলে পুট্-পাট্ শব্দ করে। কিছু করার নেই। তবুও কেন যে ভাবনাগুলো মাথায় ভিড় করে আসে, জানে না মানিয়া। ওর জীবনটাও ঐ বলদ দুটোরই মতো হয়ে গেছে। স্থবির, পরনির্ভর। মঞ্জরী কাৎ হয়ে শুয়ে আছে ন-বছরের মেয়ে বুল্‌কিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে, বিচালির ওপর ছেঁড়া কম্বলটা গায়ে দিয়ে। একদিন মানিও অম্‌নি করে মঞ্জরীকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতো। বুকের

মধ্যে যুবতী মুঞ্জুরীর নরম শরীরের সমস্ত উষ্ণতা কেন্দ্রীভূত হতো। দুজনে দুজনকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে, বাইরের শীত, ওদের অন্তরের সমস্ত শীতকে একে অন্যের শরীরের ওমে সহনীয় করে তুলতো তখন। সে সবও অনেক দিনের কথা। এখন পরেশনাথ ওর সঙ্গে শোয়। বয়স প্রাত সাত হয়ে গেল দেখতে। বড় বাপ-ন্যাওটা ছেলে। মানিয়া ঘুমন্ত পরেশনাথের কপালে একবার হাত বোলায় অন্ধকারে। মালসার মধ্যে কাঠ-কয়লার আগুনটাকে পরেশনাথের গায়ের আরো কাছে এনে দেয়। তারপরে কী মনে করে আবার সরিয়ে রাখে। শোওয়া বড় খারাপ পরেশনাথের। ঘুমের মধ্যে আগুনে হাত-পা না-পোড়ায়! একবার পুড়িয়েছিল ওদের বড় মেয়ে জীরুয়া। জীরুয়ার কথা মন থেকে মুছে ফেলতে চায় মানিয়া। বড় কষ্ট পেয়ে মরেছিল মেয়েটা। সে-সব অনেক কথা। মনে আনতে চায় না। মাথার মধ্যে বড় ব্যথা করে ওর।

হঠাৎই ওর কান খাড়া হয়ে ওঠে। বাইরের ঘাস-পাতায় শিশির পড়ার শব্দ ছাপিয়ে অন্য একটা শব্দ শুনতে পায় ও। শিশির পড়ার শব্দের মতোই নরম। কিন্তু প্রাকৃতিক শব্দ নয় কোনো। নাঃ! আবার এসেছে। দাঁতে দাঁত ঘষে একটা আওয়াজ করল মানিয়া। উঠে বসে, নিভিয়ে-রাখা লণ্ঠনটাকে জ্বালাল। তিন চারটে কাঠি খরচ হয়ে গেল। আজকালকার দেশলাই! কতো কাঠি-ই যে জ্বলে না' তার ওপর হিমে বারুদটা নেতিয়ে গেছে একেবারে। লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে, পরেশনাথকে ডাকবে ভাবল। কিন্তু বড় মায়া হলো। এই শীতের রাতে শত্রুকেও বাইরে যেতে বলতে মন সরে না। চোর-ডাকাতরাও ঘর ছেড়ে এক পা নড়ে না এমন রাতে। কিন্তু উপায় নেই। খিলটা খুলল দরজার। একটা পাল্লা খুলতেই সারা গা হিম হয়ে গেল। টাঙ্গিটা কাঁধে ফেলে, লাঠিটা ডান হাতে নিলো। আর বাঁ-হাতে লণ্ঠনটা। তারপর দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে বেরোতে যাবে, এমন সময় মুঞ্জুরী ঘুমভাঙা গলায় বলল, কওন্ চি?

মানি স্বগতোক্তির মতো বলল, খরগোশ।

মুঞ্জুরী একটা পুরুষ-সুলভ অশ্লীল গাল দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একবার। তারপর পাশ ফিরে শুলো গুটি-শুটি হয়ে।

এই পাহাড়-জঙ্গলের শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, এই খিদে, বছরের পর বছর এই অভাব মুঞ্জুরীকে হিজড়ের মতো রুক্ষ করে দিয়েছে। সবই মানিয়ার দোষে। তার মরদের দোষ। যে মরদ আওরাতকে সুখে রাখতে পারে না, সে আবার মরদ কিসের?

লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে যখন চীনেবাদামের ক্ষেতে পৌঁছল মানি, তখনও খরগোশগুলোর ভ্রূক্ষেপ নেই। পাটকিলে-রঙ ধেড়ে দুশমনগুলো প্রায় আধখানা ক্ষেত সাবড়ে দিয়েছে। দেখেই অন্ধ ক্রোধে দৌড়ে গেল মানি। ধপাধপ্ লাঠি পিটল। যেন লাঠি দিয়েই ও মারতে পারবে ওদের। এবং ওর অন্য সমস্ত শত্রুদেরও।

দৌড়োতে গিয়ে, একটা গর্তে পা পড়ে, আছাড় খেলো। বুকে চোট লাগল খুব। কিন্তু বুঝতে পেলো না তেমন। সারা শরীর ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গেছে। লণ্ঠনটা ছিটকে পড়ে গেল ওর হাত থেকে। কাঁচটা কোনোক্রমে বাঁচল। কিন্তু আলো নিভে গেল। উল্টে গিয়ে তেল গড়াতে লাগল। হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে হাতড়ে-হাতড়ে লণ্ঠনটাকে সোজা করল মানিয়া। কেরোসিন তেল গড়ানোর চেয়ে ওর বুকের রক্ত গড়ানোও যে ভালো। লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে যখন উঠে দাঁড়াল তখন খরগোশ সব পালিয়ে গেছে। ঢুকে গেছে লিটপিটিয়ার ঝোপ পেরিয়ে ওপাশের ঢালের গভীর জঙ্গলে। একচিলতে চাঁদ, মারুমারের ঢালের দিকের আকাশে ঝুলে ছিল। চাঁদটাও শিশির লেপে কুঁকড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছিল। পশ্চিমের চড়াই থেকে হঠাৎ হাতি ডেকে উঠল। বন-পাহাড় সেই তীক্ষ্ম ও সংক্ষিপ্ত আওয়াজে

চমকে উঠল। শিশির-ভেজা বনপাহাড়ে শব্দটা অনেক দূর অবধি গড়িয়ে গেল। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকতে থাকল। একটা একলা টি-টি পাখি হুলুক্ পাহাড়ের দিক থেকে ডাকতে ডাকতে এদিকে উড়ে আসতে লাগল। জঙ্গলে কোনো চলমান কিছু দেখে থাকবে পাখিটা। শিশির-ভেজা আধ-ফোটা চাঁপাফুলের মতো আবছা-হলুদ ভিজে আলোয় পথ দেখে আবার ঘরে ফিরে এলো মানিয়া। তারপর আগুনের মালসাটার ওপরে পায়খানায় বসার মতো করে বসল। পিছনটা ভালো করে সেঁকে নিলো। ওর নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। হিমে নাকের ডগাটা যেন খসে গেছে। হাত দুটো প্রাণপণ ঘষতে থাকল। সেঁকা পাঁপড়ের সঙ্গে অন্য সেঁকা পাঁপড় ঘষলে যেমন আওয়াজ হয়, মানিয়ার হাত ঘষার তেমনি আওয়াজ হলো।

পরেশনাথের বোধহয় ঘুম ভেঙে গেল। অস্ফুটে বলে উঠল, বাবা!

কিছু না রে, কিছু না। ঘুমো তুই! বলেই, মানিয়া ঘুমন্ত পরেশনাথের পিছনে আদরের চাপড় দিলো। এই 'বাবা' ডাকটা মানিয়ার বুকের মধ্যে আজকাল কী-সব পাথর-বাঁধা জিনিস তোলপাড় করে দেয়। শক্ত, বড় কঠিন অনেক কিছু বোধ যেন বুকের মধ্যে গলে যেতে থাকে। প্রথম যৌবনে ও কখনো ছেলেমেয়ের প্রতি এমন অন্ধ টান অনুভব করে নি। আগুন সেঁকতে-সেঁকতে মানিয়া বুঝতে পারছিল, ও বুড়ো হয়ে আসছে। ওর দিন ফুরিয়ে আসছে। লণ্ঠনে তেল শেষ। এইবার দপ্ করে জ্বলে উঠেই, কোনো একদিন হঠাৎ নিভে যাবে মানি ওরাওঁ।

কিছুক্ষণ আগুন সেঁকে পরেশনাথের গায়ের সঙ্গে ঘেঁষে কাঁথাটা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল মানিয়া।

নাবালক ছেলের ধুলো মাখা গায়ের গন্ধে নিজের নাক ভরে নিয়ে মানিয়া ভাবতে লাগল, যদি বেঁচে থাকে, তবে আর কয়েক বছর বাদেই ও নিশ্চিত বিশ্রাম পাবে। মাদল বাজাবে, বড় জোর বজ্‌রা ক্ষেতে রাতের বেলায় মাচায় বসে শুয়োর হরিণ তাড়াবে, নয়তো দিনের বেলা সুগা তাড়াবে, মকাইয়ের ক্ষেতে সাবাই ঘাসের মাদুর বানাবে আর সারাদিন রোদে বসে থাকবে। বস্তির বুড়োরা যেমন থাকে! তখন খুব করে রোদ পোয়াবে মানি। ওর একমাত্র ছেলে, বেটা, ওর বংশধর, ওর মরা-মুখে আগুন দেওয়ার জন্য দেখতে দেখতে জোয়ান যুবকে রূপান্তরিত হবে। সেদিন ওর জোয়ান লেড়কার ভরসা করতে পারবে মানিয়া। মানিয়া আজকাল প্রায়ই অনুভব করে পরেশনাথই ওর বীজ, বার্ধক্যের অভি-ভাবক রক্ষাকর্তা, ওর ভরন্ত ভবিষ্যৎ।

এত সব ভাবতে ভাবতে ঐ শীতের রাতেও মানিয়ার গা গরম হয়ে উঠল। ভালো লাগল খুব, ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তারপরই, খারাপ লাগল হঠাৎ। চীনাবাদামগুলো সব গেল। যতটুকু বাকি আছে, তাও যাবে কয়েক রাতের মধ্যে। অথচ করার নেই কিছুমাত্র। নিজের ঔরসজাত পরেশনাথের গায়ের গন্ধে বুঁদ হয়ে ঐ প্রচণ্ড শীতার্ত অস্পষ্ট ভিজে রাতে, এক দারুণ সূর্যভরা উজ্জ্বল, উষ্ণ, স্পষ্ট ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে একসময় মানিয়া ওরাওঁ যখন ঘুমিয়ে পড়ল, তখন নালার মধ্যের মৈথুনরত শেয়ালরা হুক্কা-হুয়া রবে মধ্যরাত ঘোষণা করল।



ভোর হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ঘুম ভাঙার পর লেপের নিচে শুয়ে সামান্য সময় একটু আমেজ করি রোজ। তারপর কুয়োর ধুঁয়ো-ওঠা জলে চান করি। ততক্ষণে তিতলি চলে আসে। ওকে বলেছিলাম, আমার কাজ করতে হলে নোংরা হয়ে থাকলে চলবে না। শাড়ি অবশ্য আমিই কিনে দিয়েছি। সাবান-তেলেরও পয়সা দিতাম ওকে আলাদা করে। প্রথম আমার কাজে বহাল হওয়ার পর দেখতে দেখতে মাসখানেকের মধ্যেই ওর চেহারা বদলে গেল। রুক্ষ মুখে লাবণ্যর চিকণতা লাগল। চুলে সুগন্ধি তেলের গন্ধ। গোলা-সাবানে, ঝর্নার পাথরে সান-বাঁধানো কুয়োতলায় কাচা, পরিষ্কার শাড়ি-জামা পরতো ও। ভোরের রোদ্দুরের গন্ধ গায়ে মাথায় মেখে সুস্নাতা তিতলি যখন বাঁশের বেড়ার দরজা ঠেলে আমার এই পর্ণ-কুটিরের আঙিনায় হাসিমুখে ঢুকতো তখন আমার মন খুশিতে ভরে উঠতো। ও হাসতো, গোলাপের পাপড়ির ওপরে রাত-ভর জমা-হওয়া টলটলে শিশিরের মতো পবিত্রতায়। মুখে বলতো, পর্নাম বাবু।

আমি বলতাম, পর্নাম।

ওদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা কিন্তু কেউই ভোরে চান করে না। ও আমার দেখাদেখি ভোরে চান করার অভ্যেস করে ফেলেছিল।

উঠোনের একপাশে একটা ঝুমকো জবার গাছ ছিল। তাতে দুর্গা-টুনটুনি আর মৌটুসী পাখিদের মেলা বসতো। সেই জবা গাছ থেকে কয়েকটা জবা, পাশের গ্যাঁদার ঝাড় থেকে গ্যাঁদা ছিঁড়ে এনে বসবার ঘরের ফুলদানিতে সাজাতো। ওকে বলি নি কখনও। নিজেই করতো। ওর মধ্যে এক আশ্চর্য সহজাত বুদ্ধি, সৌন্দর্য-জ্ঞান ও সুরুচি ছিল, যা ও, ওর পরিবেশ থেকে পায় নি। ওর সঙ্গে যে আমার শ্রেণীগত এক প্রচণ্ড বিভেদ আছে ও তা জানতো। আমি শিক্ষিত, "ভদ্রলোক", শহুরে, বামুনের ছেলে। আর ও অশিক্ষিতা, গ্রাম্য, এক "ছোটলোক" কাহারের মেয়ে। ও পরের কাছে কাজ করে খায়-পরে। আর আমি ওকে রুজি দিই। এটা ছিল আর্থিক-শ্রেণীগত বিভেদ। ও যেন সব-সময়ই আমার খুব কাছে আসার চেষ্টা করতো। সংকীর্ণ লোকেরা যাকে বলে "জাতে-ওঠা"-র চেষ্টা! কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে নয়। এমনিই। ঐ সদ্য-যুবতী মেয়েটির কাছে আমিই ছিলাম বাইরের পৃথিবীর একমাত্র জানালা। জানালা খোলা রেখে ও আলো বাতাস পেতে চাইতো। আমাদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, আমাদের শহুরে বাঙালি-রান্না আমার কাছ থেকে শুনে-শুনে রপ্ত করার খুবই চেষ্টা করতো ও। মিষ্টি হেসে বলতো, আমি পারছি? তোমার মনের মতো হতে পারছি?

আমি হাসতাম বন্য যুবতীর কথা শুনে।

বলতাম, এখনও পারিস নি। চেষ্টা করতে করতে কখনও হয়তো হয়ে উঠবি। তবে, আশা কম। সকলের দ্বারা কী সব হয়?

ও বলতো, দেখো। একদিন নিশ্চয়ই পারব।

চান সেরে, ঘরে আমি জামা-কাপড় পরছিলাম। একটু পরেই ট্রাক আসবে। হুলুক্ পাহাড়ের ওপরে আমাদের কাজ হচ্ছে। এতক্ষণে মেট, মুনশী, কুলিরা সব কাজে লেগে গেছে। তাড়াতাড়ি নাস্তা করেই ট্রাকে উঠে চলে যাবো। ফিরব, সেই সূর্য ডোবার আগে! ততক্ষণ তিতলি আমার একার সংসারের মালকিন্ হয়ে থাকবে। ঘরের দেওয়ালে গেরুয়া মাটি আর রঙ মিলিয়ে ছবি আঁকবে। গোবর দিয়ে উঠোন নিকিয়ে রাখবে। আমার গামছা-পাজামা-পাঞ্জাবি ধুয়ে দেবে। অন্যান্য কাপড়-জামা লেপ-বালিশ প্রয়োজন মতো রোদে দেবে। চৌপাইতে খাট্‌মল বাড়লে, চৌপাই বাইরে বের করে তাতে ফুটন্ত জল ঢেলে ছারপোকা মারবে। আমার জন্যে অনেক যত্নে রান্না করবে। সারাদিন এ-ঘর ও-ঘর, উঠোন কুয়োতলা এই-ই করে ও। ওর হাতের গুণে এই লক্ষ্মীছাড়া একা মানুষের সংসারও শ্রীময়ী হয়ে উঠেছে। আমার মতোই ওরও খুব ফুলের শখ। ম্যানেজারবাবুকে বলে কলকাতার সাটন্‌স্ থেকে কিছু সীজন, ফ্লাওয়ারের বীজ আনিয়েছিলাম। পুর্টোলেকা, ডালিয়া, এ্যাস্টার এই সব। যত্ন করে লাগিয়েছে ও। উঠোনের দু-পাশে দুটো বোগোন-ভোলিয়া। রাধাচূড়া দুটো। ওগুলো সব ফরেস্ট বাংলোর মালির কাছ থেকে যোগাড় করা। ও-ই করেছে। মাঝে মাঝে আমি জঙ্গলে কোনো নতুন ফুল বা গাছ দেখতে পেলে চারা বা বীজ সংগ্রহ করে নিয়ে আসতাম। খুব আগ্রহ সহকারে ও সেগুলো বাঁচাবার এবং বড় করার চেষ্টা করতো। কিন্তু আশ্চর্য পাখি সম্বন্ধে ওর কোনো উৎসাহ ছিল না। ওদের কারোই নেই। জঙ্গলের মধ্যে যারা বাস করে, তারা তাদের পরিবেশ ও জগৎ সম্বন্ধে এতো কম উৎসুক যে নিজের চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করাও মুশকিল। কোনো অপ্রধান গাছ দেখিয়ে নাম জিজ্ঞেস করলে এরা সকলেই বলে, কওন জান্‌তা? নতুন পাখি দেখালে বলে, কওন চিড়িয়া, কওন জানে? আসলে ওরা নিজেরাই জানে না যে ওরা নন্দনকাননের বাসিন্দা। অথচ নন্দনকাননের বাসিন্দাদেরই চোখ আর কান দিয়ে পাঠান নি বিধাতা। কিংবা হয়তো শরীরের যে একটা ন্যক্কারজনক অংশ যার নাম জঠর, সেই জঠরের দাবাগ্নিতেই ওদের আর-সব শুভবোধ ও ঔৎসুক্য বুঝি চাপা পড়ে গেছে চিরতরে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি ঐ একই চিন্তা। অন্ন চিন্তা। দোষ দেখি না কোনো ওদের।

জামা-কাপড় পরতে পরতে একটা পাখির ডাক শুনলাম। পাখিটা থেমে থেমে ডাকছিল প্রথমে। তারপরই ঘন ঘন ডাকতে লাগল দুটি পাখি। গলার আওয়াজে মনে হয় কোথাও কোনো চীনেমাটির জিনিস ভেঙে-চুরে যাচ্ছে বুঝি। ধাতব শব্দের কাছাকাছি একটা শব্দ। পাখি দুটো ডাকছে রাস্তার পাশের কোনো গাছ থেকে। এমন ডাক এর আগে কখনও শুনি নি।

তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পরে বাইরে এসেই দেখি, মানি প্রায় দৌড়তে দৌড়তে আসছে, হাতে দুধের লোটা নিয়ে। ক্ষমা-চাওয়া হাসি হেসে বলল, বড়ী দের্ হো গেল মালিক।

বললাম তিতলি আছে! দুধ দিয়ে এসো ভিতরে।

আস্তে আস্তে গাছটার দিকে এগোলাম। একটা কাঠ টগরের মতো দেখতে বুনো ফুলের গাছ। এই গাছগুলো ভালুমার অঞ্চলেই বেশি দেখি। পাহাড়ের ওপরের দিকেও

নেই। আরো নীচে নেমে গেলেও নয়। পাখিটা নজরে এলো। অনেকটা ফিঙের মতো দেখতে। গলার কেশর ফুলিয়ে সঙ্গিনীর সঙ্গে প্রেম করছে। লেজটা একটা ত্রিকোণের মতো দেখাচ্ছে পিছন থেকে। পাখি দুটোকে নজর করার পর আস্তে আস্তে সাবধানে পিছিয়ে এসে হাঁক দিলাম, তিত্‌লি, তিত্‌লি......।

রান্নাঘর থেকে জবাব এলো, নাস্তা তৈয়ার হ্যায়।

নাস্তা নয়, বইটা আন্।

তিত্‌লি রান্নাঘরের বারান্দায় এসে শুধোল, কওন্‌সা কিতাব? চিড়িয়াওয়ালা?

হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি আন্।

তিত্‌লি দৌড়ে সালিম আলির বইটা এনে দিলো। দিয়ে, আমার পাশেই দাঁড়িয়ে রইল।

বইটার পাতা খুলে পর পর তাড়াতাড়ি উল্টোতে উল্টোতে এক জায়গায় এসে থেমে গেলাম। তারপর পাতাটা খোলা অবস্থাতেই আস্তে আস্তে আবার পাখি দুটোর দিকে এগিয়ে গেলাম। ওরা প্রেমের খেলায় এমনই মেতে ছিল যে চারপাশের কোনো কিছুর প্রতিই ওদের হুঁশ ছিল না। আমি মিলিয়ে দেখলাম, হুবহু ছবির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। গলার স্বরের বর্ণনার সঙ্গেও মিলে যাচ্ছে। পাখি দুটোর নাম র‍্যাকেট্‌ট্রেইল্‌ড ড্রঙ্গো। পাখি দুটোকে চিনতে পেরে ভারি ভালো লাগল।

কতক্ষণ ওখানেই উবু হয়ে বসে ছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ পিছ থেকে কে যেন আমার কাঁধে হাত দিলো। ফিস্ ফিস্ করে ভয়ে ভয়ে বলল, বাবু।

তাকিয়ে দেখি, তিত্‌লি। তারপর তিত্‌লির আঙুল যেদিকে তোলা ছিল, সেদিকে তাকিয়েই দেখি আমার সামনেই একটা থর্‌হি বাঁশের ঝাড়ের মধ্যে বাঁশে জড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড শঙ্খচূড় সাপ রোদ পোয়াচ্ছে!

তিত্‌লি কাঁধে খিমচে আমাকে সজোরে পিছনে আকর্ষণ করল।

আমরা দুজনেই সরে এলাম। ডেরার দিকে ফিরতে লাগলাম।

তিত্‌লি বলল, তুমি এই করেই একদিন মরবে। নাস্তা ঠাণ্ডা হয়ে নেতিয়ে গেল, উনি পাখি দেখে বেড়াচ্ছেন! তোমার মা, মরে বেঁচে গেছেন তোমার হাত থেকে!

উঠোনে ঢুকলাম। ওর কথার কোনো জবাব দিলাম না।

ও এরকম করে প্রায়ই বলে। আমার শুনতে যে খারাপ লাগে, তা বলব না। এই সম্পূর্ণ অনাত্মীয়া মেয়েটির চোখে-মুখে আমার জন্যে দরদ, শংকা, সহানুভূতি সব এমন করে হঠাৎ হঠাৎ আমার অন্ধকার অনাদরের জীবনে তারার মতো ফুটে ওঠে। বুকের মধ্যেটা যেন কীরকম করে ওঠে।

কত কীই যে ও বয়ে বেড়ায় ওর বুকে আমার জন্যে, ভেবে অবাক হই। ভালো-লাগায়, এবং লজ্জাতেও মরে যাই। ভালোলাগাটা, ভালোলাগার কারণেই। লজ্জাটা, আমার জন্যে ও যা করে, যা ভাবে, আমি ওর জন্যে তার কণামাত্রই করি না; বা ভাবি না বলে।

ও যখন নাস্তা দিচ্ছিল, আমি বললাম, ঐ যে ট্রাকের শব্দ আসছে পাহাড়ের আড়াল থেকে। ঈস্‌স্ ট্রাক এসে গেল। পাখি দেখতে গিয়ে, দেরি হয়ে গেল আজ।

ট্রাক দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলে রামের বনবাসের মেয়াদ বাড়বে না। তুমি ডাট্‌কে নাস্তা কর্‌কে, তব্ যাওগে। সারাদিনের জন্যে খেয়ে একেবারে বেরোনো! এমন করলে শরীর থাকবে?

ধমক দিয়ে বললাম, তুই চুপ কর তো। বড় বেশি কথা বলিস।

ও আর কথা বলল না। দু-হাত হাঁটুর ওপর ছড়িয়ে দিয়ে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে বসে, চোখ নীচু করে আমার পাতে ও খাবার ঠিক ঠিকই দিচ্ছিল, কিন্তু তাকাচ্ছিল না আমার মুখে।

ট্রাকটা একটা প্রাগৈতিহাসিক দাঁতাল শুয়োরের মতো আওয়াজ করছিল ডেরার সামনে। ডিজেলের ট্রাক। কোম্পানীর। ড্রাইভার রহমত্ এঞ্জিন বন্ধ করার প্রয়োজন মনে করে না। তেল পুড়লে তো মালিকের পুড়বে! ওর কি?

খাওয়া শেষ হলে তিত্‌লি উঠে বলল, দুধ আনছি।

দুধ খাবো না।

কেন? ও আমার চোখের দিকে তাকালো। নীরবে কৈফিয়ৎ চাইল।

বিরক্ত গলায় বললাম, সময় নেই।

আমার ভাবটা এমনই, যেন দুধ খেয়ে আমি ওকেই ধন্য করব।

ও কথা না-বলে, দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে টাটকা জ্বাল দেওয়া দুধ নিয়ে এলো কাঁচের গ্লাসে করে। এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল।

আমি রুক্ষ চোখে একবার ওর দিকে তাকালাম।

ও আবার চোখ নামিয়ে নিলো। কিন্তু দুধের গ্লাসটা বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে।

কথা না-বলে, বারান্দার লোটাতে তোলা জলে মুখ ধুয়ে, তোয়ালেতে হাতমুখ মুছে, ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম।

শঙ্খচূড় সাপটা ট্রাকের শব্দ পেয়ে নিশ্চয়ই এতক্ষণে জঙ্গলের গভীরে চলে গেছে।

প্রেমিক কালো পাখিটাও আর নেই। নেই তার সঙ্গিনীও।

ট্রাকের সামনের উঁচু সীট থেকে আমার ডেরার ভিতরটা দেখা যায়। রহমত্ যখন ট্রাকটা স্টার্ট করে হুলুক্ পাহাড়ের দিকে চলল, তখন ড্রাইভারের পাশের সীটে বসে দেখলাম, বারান্দার বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে ঐভাবেই দু-হাতে দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে তিত্‌লি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। মুখ নামানো। চোখ আনত। ও যেন কতদূরে চলে গেছে। ওখানে থেকেও ওখানে নেই।

হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে বড় কষ্ট হলো ওকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। ওর সঙ্গে বড়ই খারাপ ব্যবহার করি আমি। বিনা কারণে। সংসারে যাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা যায়, তেমন আপনজন কি খুব বেশি থাকে? কারোই? আসলে, ওকে কষ্ট দিয়ে আমি খুব আনন্দিত হই। ও যেন আমার পোষা হরিণ। বা আমার ছাগল-ছানা। কী কাকাতুয়া!



আমাদের বাঁশের কুপে এসে হুলুক্ পাহাড়ের গায়ে যখন ট্রাক থেকে নামলাম, তখন গা-মাথা ধুলোয় ভর্তি হয়ে গেছে। কুলির দল পৌঁছে গেছে আগেই। মেট ও মুনশীরা কাজের তদারকি করছে। বারশো দশ নম্বর ট্রাকে বাঁশ লোডিং হচ্ছে।

প্রতি বছর কালীপুজোর পর থেকেই কাজ শুরু হয়। জংগলের পথ-ঘাট খোলে! লাতেহার, চাঁদোয়া, চিপাদোহর, রাংকা, মারুমার, ভালুমার, প্রায় দু-হাজার বর্গমাইল জুড়ে কাজ হয় কোম্পানীর। ডালটনগঞ্জ থেকে এক এক জায়গার দূরত্বও কম নয়। [illegible] একশো বত্রিশ কিলোমিটার। চাতরা, টোরী এবং বাঘড়া মোড় হয়ে একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার। মহুয়াডাঁর, চিপাদোহর হয়ে একশো কিলোমিটার। বানারী একশো দশ কিলোমিটার। অন্যদিকে ভান্ডারীয়া ও রাংকার জঙ্গল দেড়শো কিলোমিটার। বেশিরভাগই জঙ্গলের মধ্যে কাঁচা রাস্তা। তাই এত বড় এলাকা সামলে কাজ করা বড় সোজা নয়। আমাদের কোম্পানীর মালিকের বয়স পঞ্চাশ হবে। তা হলেও এত বড় ব্যবসা চালানো সোজা কথা নয়। আমাদের মতো যারাই আছে, তাদেরও মালিক নিজের লোকের মতোই দেখেন। তা-না হলে এই পাহাড়-জঙ্গলে বছরের পর বছর আমাদের পক্ষে পড়ে থাকা সম্ভব হয়তো হতো না। অবশ্য আমার কথা আলাদা। আদিমতম এই আশ্চর্য মেয়ের প্রেমে পড়ে গেছি যে আমি! আমাকে তাড়িয়ে দিলেও যাবো না এখান থেকে। এই মায়াবিনীর জালে যে একবার ধরা দিয়েছে, তার পালাবার সব পথই বন্ধ। এ জীবনের মতো জংগলের সংগে বন্দী হয়ে জংলী হয়ে গেছি। জংলী হয়েই থাকতে হবে।

প্রতি বছর খুবই ধুমধাম করে কালীপুজো হয় ডালটনগঞ্জে। কোম্পানীর হেড অফিসে। তারপরই সকলে যে যার চলে যায় নিজের কাজের জায়গায়। আমার এবার কালীপুজোয় যাওয়াই হলো না। ঔরংগাবাদ থেকে সমীর তার বৌ-বাচ্চা নিয়ে জঙ্গল দেখতে আসবে লিখেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এলোই না। কোন খবর দিলো না।

বড় মামা উঠে-পড়ে লেগেছেন আমার বিয়ে দেওয়ার জন্যে। বাবা ছোটবেলাতেই মারা গেছেন। গত বছর মা মারা যাবার পর থেকে গুরুজন বলতে এই মামারাই। আমারই কোনো সহকর্মী উড়ো চিঠি লিখেছিল তাঁকে, কলকাতায়। বাঙালির যা ধর্ম লিখেছিল : আমি এক কাহার ছুঁড়ির সংগে দিব্যি ঘর-গেরস্থালি গুছিয়ে বসেছি। এ-জন্মে সভ্যতার আলো নাকি আর দেখবারই সম্ভাবনা নেই! জানি না, তিতলি ও টেটরা একথা শুনলে আমাকে কী ভাববে। বড় মামার উৎসাহে ছোট মামা ও মামীমা পাত্রীর দাদা বৌদি ও পাত্রীকে নিয়ে এখানে আসবেন লিখেছিলেন কালীপুজোর সময়ে। সরেজমিনে তদন্ত করে

যেতে। পাত্রীও পাত্রকে দেখতে পাবে চাক্ষুষ। জঙ্গলের এই দু-পেয়ে জানোয়ারকে! দেখতে পাবে তার ঘর-গেরস্থালি! বিয়ে হলে, যেখানে তাকে থাকতে হবে বাকী জীবন, সেই জংলী জায়গা। দেখা ত উচিত নিজের চোখে।

মাঝে মাঝে ভাবি, বিয়ে ব্যাপারটা সত্যি-সত্যিই ঘটে গেলে বোধহয় মন্দ মতো না। একজন কনসিডারেট, বুদ্ধিমতী সঙ্গিনী। শিক্ষিতা, ঋতু গুহর মতো না হলেও মোটামুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে; এমন চলনসই একজন সুশ্রী, নরম স্বভাবের মিষ্টি মেয়ে। খিচুড়ি এবং ডাল-রুটি রাঁধতে পারলেই চলে যাবে।

মাঝে-মাঝেই অনেক কিছু কল্পনা করছি আজকাল। যাকে বলে, ইমাজিনিং থিংগস্। আমার না-হওয়া অ-দেখা বৌ-এর সঙ্গে অনেক গল্পটল্পও করছি। এমনকি মাঝে-মাঝে ছোটখাটো আদর-টাদরও করে দিচ্ছি। মনে মনে দুজনে মিলে আবৃত্তি করছি, গান গাইছি। অদেখা, অনুপস্থিতকে পাশে নিয়ে, ঘুরে ঘুরে আমার এই আদিগন্ত নির্মল, আশ্চর্য সাম্রাজ্য দেখাচ্ছি। আর সে ভালোলাগায় শিহরিত হয়ে উঠেছে। কতরকমই না অভিব্যক্তি তার। সে আমাকে বলছে, আমি সারাজীবন তোমার এই সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হয়ে তোমারই পাশে পাশে থাকতে চাই।

আমার এই এলাকা চিহ্নহীন সাম্রাজ্য ছোটই-বা কী? আই এ্যাম দ্যা লর্ড অফ অল আই সার্ভে। আদিগন্ত। চতুর্দিকে।

মেয়েটিকে আমি দেখি নি। ছোটমামীমা লিখেছিলেন, চেহারার ও গুণের বর্ণনা দিয়ে। ছোটমামীর বর্ণনার সঙ্গে আমার কল্পনা মিশিয়ে আমার ভাবী বৌকে গড়ে নিয়েছি আমি। চোখে না দেখে, বলতে গেলে, অন্যের বাঁশি শুনেই তাকে ভালোবেসে ফেলেছি। নিজেকে দেখাবার জন্য তার আমার কাছে কষ্ট করে আসার দরকার ছিল না আদৌ একদল লোকের সঙ্গে। বরং বিয়ের পর একা আমারই সঙ্গে এলে, এই হুলুক্ পাহাড়ের ভালুক-রঙা পিঠের ওপর মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে-থাকা সকালের সূর্য, ফানুসের মতো ভাসতে-থাকা পূর্ণিমার চাঁদ, এই জঙ্গল, নদী, গাছ-গাছালি, পাখির জগতে তাকে চমৎকৃত, বিস্মিত, বিহ্বল করে দিতাম। এবং তার সেই সমস্ত প্রথম বিহ্বলতার সুযোগ, একলা স্বার্থপর এক্সপ্লোরারের মতো পুরোপুরি একাই এক্সপ্লয়েট করতাম।

আসলে, কাহার-ছুঁড়ির ব্যাপারটা যে কি, তা সকলে নিজ চোখে দেখে যান, সেটাই চাই বলে ওঁদের আসতে মানা করি নি। আমার মামারাও কেউ কখনও আসেন নি একদিকে। ছোট মামা এলে খুশিই হবো! উনিও খুশি হবেন। কবি-প্রকৃতির মানুষ! ছোটমামাকে দেখে মনে হয়, মানসিকতায়, সার্থকদের চেয়ে ব্যর্থ কবিরাই বোধহয় অনেক বেশী কবি থাকেন।

ওঁদের তদন্তে বেচারী তিতলির চরিত্রে কী কলঙ্ক রোপিত হবে জানি না। তবে নিজের চরিত্র নিয়ে আমার নিজের কখনোই মাথা ব্যথা ছিল না। অ্যাকাউন্ট্যান্টরা বলেন যে, চরিত্র নাকি এমনই এক ইনট্যানজিবল্ অ্যাসেট যে থাকলেও প্রমাণ করা যায় না যে আছে, এবং না থাকলেও নেই বলে। মোস্ট ইনট্যানজিবল্ অফ অল ইনট্যানজিবল্ অ্যাসেটস্। তাই-ই, তা থাকাথাকি নিয়ে মাথা না-ঘামানোই ভালো।

জঙ্গলের গভীর থেকে নীলরঙা লুঙির ওপর লাল সোয়েটার গায়ে মুনশী ইয়াসিন এগিয়ে এসে রেক্ এসেছে কিনা তার খবর করল।

ট্রাকে বাঁশ বোঝাই হয়ে এখান থেকে চলে যায় চিপাদোহরের ডিপোতে। সেখানে ইয়ার্ডে ওয়াগন লোডিং হবে। ওয়াগন শর্টেজের জন্যে কাজের খুবই ব্যাঘাত হয়।

আজকাল রেক্ পাওয়া মহা ঝামেলা। পেলেও, তা অনিয়মিত। সবচেয়ে টেন্শান হয় গরমের শেষে বা বর্ষার আগে। বৃষ্টি নেমে গেলে বাঁশ পচে যায়। কোনো কোনো বছর বৃষ্টির আগে আগে জঙ্গল থেকে বাঁশ ঢোলাই করে ডিপোতে সময় মতো পৌঁছে দিলেও, তা রেকের অভাবে বৃষ্টি নামার আগে পাঠানো সম্ভব হয় না। জঙ্গল-পাহাড়ের গরীব-গুরবোরা জুন মাসের প্রথমে যখন দু-হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, বৃষ্টি নামাও হে ভগবান, বৃষ্টি নামাও, দুটো গোন্দ্নি বা সাঁওয়া ধান বুনি, আর কতদিন কান্দা গেঠি খুঁড়ে খেয়ে কাটাবো? বৃষ্টি নামাও! ঠিক তখনই ডালটনগঞ্জের বিড়িপাতা আর বাঁশের গুজরাটি ব্যবসায়ীরা বৃষ্টি না-নামার জন্যে পুজো দেয়। প্রার্থনা করে। ভগবান ঘুষে তৃপ্ত হন কী না জানি না, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, তিনিও পয়সাওয়ালা ব্যবসাদারদের কথাই শোনেন। আর গরীব ভোগ্তা, মুণ্ডা, কাহার, ওরাওঁ, খাঁরওয়ার, লোহার, ভুঁইয়াররা সবাই হাহাকার করে।

যাঁরা বেত্লার ডানলোপিলো লাগানো, গীজার-বসানো বৈদ্যুতিক আলো ঝল্মল্ বাংলোয় সবান্ধবে ও সপরিবারে থেকে, অভয়ারণ্যের ছাগলের মতো চরে-বেড়ানো পালে পালে হরিণ, বাইসন এবং অন্যান্য জীবজন্তু দেখেন, তাঁদের অনেকেই প্রাণিতত্ত্বরই মতো বাঁশতত্ত্বরও কোনো খোঁজ রাখেন না। অবশ্য না-রাখাই স্বাভাবিক। আর যে বাঁশ কথাটা মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়, সেই বাঁশ নিয়েই আমার কাজ। অনেক রকম বাঁশই হয় পালামৌর জঙ্গলে-পাহাড়ে। খর্হি, সর্হি, বড়্হি আর টেরা। ব্যাসের তফাত অনুযায়ী নামের তফাত। খর্হি বাঁশ হয় সরু। আঙুলের মতো। এইগুলোই ঘর-বাড়ি বানাতে লাগে। খর্হির চাহিদাও তাই বেশি। গয়া-রাজগীরের মগধী পানের বরজওয়ালারা পানের বরজ বানাবার জন্যে এই বাঁশ কেনেন। খর্হি আর সর্হির বান্ডিল হয় পঁচিশটায়। বড়্হির বান্ডিল বারো এবং তেরোটা বাঁশে। টেরার বান্ডিলের আবার মজা আছে। দুটো বান্ডিল হয় আট বাঁশের। একটা ন-বাঁশের। ছ-বাসা বাঁশের বান্ডিল হয় ছ-বাঁশের। পাঁচ-বাসা হয় পাঁচ বাঁশের। টিরার তিন বান্ডিল মিলিয়ে ষোলো, আর নয় নিয়ে পঁচিশ হয়।

প্রত্যেকটি বাঁশ কাটা হয় বারো ফিট করে, বান্ডিল বাঁধবার সময়। বাকী টুকরো-গুলোকে টোনিয়া বলে। এই টোনিয়া বা টুকরো বাঁশই চালান যায় কাগজের কলে মণ্ড তৈরির জন্য। কাগজ কল ভালো পয়সা দেয়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টও রয়্যালটি পান, আমাদের কোম্পানী পায় হ্যান্ডলিং-এর পয়সা। পয়সা আগামও দেয় কোনো কোনো পেপার মিল। টোনিয়ার চেয়ে বেশি লাভ হয় খর্হি, সর্হি-বড়্হি ইত্যাদিতে। এই সব বাঁশের গোড়া ইংরেজিতে যাকে 'ব্যাম্বু শুটস্' বলে, তা দিয়ে দেহাতী মানুষেরা তরকারি ও আচার করে খায়।

কবিল হচ্ছে বাঁশের এক বছরের গোড়া। ছাল তুললে সাদা পাউডারের মতো বেরোয় তখন। দোর্সা, দু বছরের গোড়া। এ-দিয়ে নতুন বাঁশগাছ হয়। অথচ তিন বছরের গোড়া তোর্সা লাগালেও কিন্তু গাছ হয় না।

সমস্ত উদ্ভিদ জগতে ফুলই পরিপূর্ণতার প্রতীক। সার্থকতারও। তাই সাহিত্যে, উপমাতে আমরা মঞ্জরীত পুষ্পিত এইসব কথা দেখি। বাঁশ কিন্তু এর ব্যতিক্রমের অন্যতম। বাঁশগাছে ফুল এলে তার সঙ্গে যমদূতের পদধ্বনিও শোনা যায়। ফুল ফুটিয়েই বাঁশ তার অস্তিত্ব অনস্তিত্বে পর্যবসিত করে।

কুলি মেট, মুনশী সবাই ওরা কাজ করে। বহুদিনের সব শিক্ষিত, বিশ্বস্ত কর্ম-চারী। রহমত্ এবং অন্যান্য ড্রাইভাররা গাছের ছায়ায় বসে বিড়ি খায়। গল্প করে।

কামিনদের সঙ্গে রসিকতা করে। এ-গাছ থেকে ও-গাছে মৌটুসী, বুলবুলি, টিয়া, মুনিয়া, ক্রো-ফেজেন্ট উড়ে উড়ে বেড়ায়। সরু হি বাঁশের চিকণ ডাল আর ফিনফিনে পাতা তাদের উড়ে যাওয়ার ছন্দে ছন্দোবন্ধ হয়ে দোল খায়। হাওয়া দিলে বাঁশে বাঁশে ঘষা লেগে কট্‌কট্‌ করে আওয়াজ ওঠে। হলুদ রোদে ফিকে হলুদ প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়। প্রজাপতিকে এখানের মানুষ তিতলি বলে। কখনও দূরের বনে হনুমানের দল হুপ্‌ হুপ্‌ হুপ্‌ হুপ্‌ করে ডেকে ওঠে। ঝুপ্‌-ঝাপ্‌ করে এ-গাছ থেকে ও-গাছের মগ-ডালে ঝাঁপিয়ে যায়। ক্বচিৎ বাঘের ডাকও ভেসে আসে। সেই ডাকে পাহাড় গম্‌ গম্‌ করে ওঠে।

সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরেই ওরা কাজ শুরু করে। শীতের দুপুরে একটুক্ষণ রোদে এবং গ্রীষ্মকালে ছায়ায় বসে, সঙ্গে করে নিয়ে-আসা কিছু খাবার খেয়ে নেয়। খিচুড়ি বা অন্য কিছু। ঝর্নার জল খায় আঁজলা ভরে। আবার কাজ শুরু করে। কাজ ঠিক তেমন সময়ই শেষ হয়, যাতে সূর্য ডোবার আগে আগে কূপ-কাটা কুলিরা নিজ নিজ গ্রামে জঙ্গলের পথ বেয়ে পৌঁছতে পারে। যাদের গ্রাম. ট্রাকের ফেরার পথে, তারা বাঁশ-গাদাই-করা ট্রাকের মাথায় চড়ে গান গাইতে গাইতে চলে যায়। তারপর যার যার গ্রামের কাছে রাস্তায় নেমে পড়ে।

এখানে যখন আমি প্রথম আসি, অনেক বছর আগে, তখন পুরো এলাকার চেহারাটাই একেবারে অন্যরকম ছিল। অনেকই সুন্দর ছিল। এখন তো গাড়ুবাজার অবধি রাস্তা পাকা হয়ে গেছে। মস্ত ব্রীজ হয়ে গেছে কোয়েলের ওপরে। যে বেতলাতে এখন পাকা বাংলো. রাঁচী-কলকাতার নম্বরে-ভরা মোটর গাড়ি আর বৈদ্যুতিক আলোর জেল্লা; সেই বেতলার পথে দিনের বেলাতেও হাতি. বাইসন. বাঘের জন্যে পথ-চলা মুশকিল ছিল। দু-পাশে জঙ্গল ঝুঁকে থাকতো. কাঁচা পথের লাল মাটির কী বিচিত্র গন্ধ বেরুত, বিভিন্ন ঋতুতে। পীচের রাস্তার গায়ের অমন গন্ধ নেই। প্রতি ঋতুতে তারা নতুন গন্ধবতী হয় না। পীচ রাস্তাবা ব্যক্তিত্বহীন।

একবার নিউমোনিয়া হয়েছিল। গাড়ু থেকে চৌপাইতে করে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কোয়েল পার করে গাড়ুর উল্টোদিকে। সেখান থেকে ছোট্ট বেডফোর্ড পেট্রোল-ট্রাকে করে ডালটনগঞ্জের সদর হাসপাতালে। আর এখন তো মহুয়াডাঁর অবধি বাসই যাচ্ছে রোজ ডালটনগঞ্জ থেকে। আসছেও সব জায়গা ছুঁয়ে। যদিও দিনে একটি করে। এখন ডিজেল মার্সিডিসের গাঁক্‌গাঁক আওয়াজে নিস্তব্ধ জঙ্গল চম্‌কে যায়। তখনকার ছোট ছোট পেট্রোলের গাড়িগুলোর আওয়াজও যেন মিষ্টি ছিল। মিষ্টি লাগতো পেট্রোলের গন্ধ। ডিজেলের ধোঁয়ায় এখন নাক জ্বালা করে।

সেই সব আশ্চর্য নিবিড় রহস্যময়তা, ভয় ও আনন্দ মিশ্রিত অসহায়তার সুখ-ভরা দিনগুলি মরে গেছে। তাই যখন এই আজকের ভালুমারে এসেও কোনো শিক্ষিত শহুরে লোক নাক কোঁচকান, বলেন, থাকেন কী করে মশাই এমন গড্‌ ফরসেকন জায়গায়? তখন তাঁকে অনেক কথাই বলতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু সব কথা সকলের জন্য নয়।

আমাদের এই জঙ্গল-পাহাড়কে চাঁদিন রাতে অনেকেই ভারি সুন্দর দেখেন। আমিও দেখি। কিন্তু জঙ্গল-পাহাড়ের অন্ধকার রাতের বুকের কোরকে যে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুপুরুষ তাঁর সমস্ত আপাত দুর্জ্ঞেয়তা নিয়ে প্রতিভাত হন. তাঁর সৌন্দর্যও বড় কম নয় পৌরুষের সংজ্ঞা বলেই মনে হয় এই নীরেট জমাট-বাঁধা অন্ধকারকে। সেই কালো সুপুরুষের পরিপ্রেক্ষিতেই চন্দ্রালোকিত রাতের নারীসুলভ মোহিনী সৌন্দর্য পরিস্ফুত

পায়।

অন্ধকার রাতে, শীত খুব বেশি না-থাকলে জঙ্গলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় কোনো উঁচু পাথরে বসে অথবা আমার মাটির বারান্দায় নারকোল দড়ির ইজিচেয়ারে বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। কত গ্রহ-নক্ষত্র, কাছে দূরে। একে অন্যকে ঘিরে ঘিরে ঘুরে চলেছে অনন্তকাল ধরে। ভালুমারের সকলের 'পাগলা সাহেব', যাঁর আসল নাম রথী সেন; সেই রথীদা বলেন, আকাশের দিকে তাকাবি, ভগবানকে প্রত্যক্ষ করবি।

ভগবান বলতে কী বোঝায়, এখনও নিজে তা বুঝি নি নিজের মতো করে। কখনও বুঝব কিনা, তাও জানি না। কিন্তু এত বছর জঙ্গলে-পাহাড়ে, প্রকৃতির মধ্যে থেকে কোনো প্রচণ্ড শক্তিমান অদৃশ্য অপ্রত্যক্ষ কিন্তু অনুভূতিসাপেক্ষ কেউ যে আছেন, যিনি এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডকে করতলগত করে কোটি কোটি বছর ধরে এই গ্রহ-নক্ষত্র নিচয়ের পরিবারকে শাসন করছেন, পালন করছেন; তাঁর প্রভাব এখানে নিশ্চিত অনুভব করি অমোঘ ভাবে। লক্ষ লক্ষ গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে অতি নগণ্য এই আমাদের ছোট্ট পৃথিবী। সেই পৃথিবীর কীটাণুকীট, এই মনুষ্যাকৃতির একটি প্রাণী আমি। আমার একটা নামও আছে। সায়ন। সায়ন মুখার্জী। আমার ভূমিকার নিদারুণ নগণ্যতা নিজের কাছেই নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তোলে মাঝে মাঝে। আমার স্বার্থপরতা, আমার অহমিকা, আমার ঈর্ষা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা এসব নিয়ে কখনও উত্তেজিত হলেই আমি ভালুমারের আকাশে তাকাই। রাতের দিগন্তরেখার ওপরে হুলুক্ পাহাড়ের পিঠটা একটা অতিশয় প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের পিঠ বলে মনে হয়। দিগন্তের কোনো দিকে হঠাৎ-ই কোনো তারা খসে যায়। শিহরিত হই। হাহাকার করি। পরমুহূর্তেই মনে মনে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠি। ঐ দূরের একটি অনামা অচেনা প্রজ্বলিত নক্ষত্র হয়তো পৃথিবী থেকে কোটি গুণ বড়। তার জ্বলে উঠেই ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তার লীলাখেলার মেয়াদ শেষ হওয়ার তাৎক্ষণিক মুহূর্তেই, আমি আমার সামান্যতা সম্বন্ধে নতুন করে সচেতন হই। বড়ই কৃতজ্ঞ বোধ করি। বড় খুশি হয়ে উঠি। আনন্দে, এক নিঃস্বার্থ পবিত্র আনন্দে; আমার দু-চোখের কোণ ভিজে ওঠে। অমরা সকলেই সামান্য। কিন্তু এই পরিবেশে না-থাকলে, চোখ ও কানের আশীর্বাদে সম্পৃক্ত না হতে পারলে, কেমন করে জানতাম আমার ক্ষুদ্রতার মাপটা ঠিক কতখানি ক্ষুদ্র'

আকাশ ভরা কত তারা, কত অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ। কী সুন্দর সব তাদের নাম। কী উজ্জ্বল চোখে, কোট্‌রা হরিণের ভয়-পাওয়া ডাকে গম্‌গম্‌-করা অন্ধকার রাতে তারারা আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন জিজ্ঞেস করে, কেমন আছো? যেন বলে, তুমি যে তোমার ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন, সে কারণে আমরা তোমাকে ভালোবাসি। তাই-ই তো মাঝে মাঝে নিজের ডাইরিতে লিখি: "যে পাখির ভালোবাসা পেয়েছে, ফুলের ভালোবাসা, চাঁদের ভালোবাসা; তার অভাববোধ কি থাকতে পারে কোনো?"

চিত্রা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, বিশাখা, অনুরাধা, কৃত্তিকা, রোহিণী শ্রবণা, শতভিষা, ক'টা নামই-বা আমি জানি? কতো ছায়াপথ? অয়নপথের কতো বিচিত্র সব লীলাখেলা চলেছে সৃষ্টির আদি থেকে? এই মহাবিশ্ব এবং এই মহাকালের প্রতি এক সুগভীর শ্রদ্ধা কি জন্মাত আমার এই তিরিশ বছরের হাস্যকর রকমের ছোট্ট জীবনে? এখানে না থাকলে? আমি যদি ভাগ্যবান না হব তো ভাগ্যবান কে?

রথীদা, কেন কী কারণে সব ছেড়ে-ছুড়ে এই জঙ্গলে টালির বাংলো-বাড়ি বানিয়ে একা এসে বসলেন, তা কেউই জানে না। এখানে কারোই সে-সব কথা জিজ্ঞেস করারও

সাহস নেই তাঁকে। প্রতি মাসে ডালটনগঞ্জে যান একবার। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলেন, সারা মাসের খরচ। সেদিনেই ফিরে আসেন। তিনি বলতে গেলে ভালুমারের বাসিন্দাদের লোকাল গার্জেন। অসুখে হোমিওপ্যাথিক্ ওষুধ দেন। বিপদে পাশে দাঁড়ান। বিবাদে মধ্যস্থতা করেন। সমস্ত গরীব গুরুবোর রক্ষাকর্তা তিনি।

কোন্ জাত? জিজ্ঞেস করলে বলেন, বজ্জাত।

বাড়ি কোথায়? বললে বলেন, পৃথিবী।

আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই? শুধোলে বলেন, আত্মীয় কথাটার ডেরিভেশান্ জানিস? যে আত্মার কাছে থাকে; সেই-ই তো আত্মীয়। তোরাই আমার আত্মীয়।

অদ্ভুত মানুষ। তাঁর কথা বলে শেষ করা যায় না। সাদা দাড়ি। ঘাড় অবধি নামানো সাদা চুল। খুব লম্বা। দোহারা।

কোন্ ধর্মাবলম্বী জিজ্ঞেস করলে, রথীদা হাসেন। বলেন, আমার ধর্ম, স্বধর্ম।

'পুজা-পার্বণ' বলে বহু পুরনো একটা মলাট-ছেঁড়া চটি বই উনি আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। রাতে পড়লাম সেদিন; "যদি খ্রীস্টপূর্ব চার হাজার পাঁচশো অব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ হয়, তাহা হইলে অন্তত ইহার দুই সহস্র বৎসর পূর্বে চৈত্রী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ হইত। অতএব আশ্বিন পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ন হইত।

"ইহা হইলে পাইতেছি, অশ্বিনীর চতুর্দশ নক্ষত্র পশ্চিমে চিত্রা নক্ষত্রে রবি আসিলে দক্ষিণায়ণ হইত। এখন আর্দ্রা প্রবেশে দক্ষিণায়ণ হইতেছে। আর্দ্রা ছয়, চিত্রা চোদ্দ নক্ষত্র—আট নক্ষত্রের ব্যবধান। অতএব এখন হইতে অন্তত আট সহস্র বৎসর পূর্বের কথা। পুরাণ ইহার প্রমাণ, আশ্বিনী পূর্ণিমায় কোজাগরী ও আশ্বিনী অমাবস্যায় দীপালি পাইতেছি। ঋগ্‌বেদে এই কালের প্রমাণ অবশ্য আছে। কিন্তু সেখানে অশ্বিনী ও চিত্রার নামগন্ধও নাই। নক্ষত্রগুলি আছে, অন্য নামে আছে। যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি দেখিতে পান, যাঁহার বর্ণজ্ঞান হইয়াছে তিনি পড়িতে পারেন। যে অন্ধ, সে কী দেখিবে! যে বধির, সে কী শুনিবে! ভারতের অতীত প্রত্যক্ষ হইয়া কথা কহিতেছেন...।"

আমি নিজে সর্বাংশে অশিক্ষিত। কোনো বিষয়েই বলবার মতো জ্ঞান আমার কিছুমাত্র নেই। কিন্তু এই সব দেখে-শুনে এবং পড়ে জানার ইচ্ছা, দেখার ইচ্ছা, বড় প্রবল হয়ে ওঠে বারে-বারে। জীবনের তিরিশটা বছর বৃথাই নষ্ট করলাম বলেই মনে হয়, জানার মতো কিছুমাত্র না-জেনেই। এই দুঃখটাও যে হয়, এটাই একমাত্র সান্ত্বনা। জঙ্গলে, পাহাড়ে, প্রকৃতির বুকে শিশুর মতো লালিত-পালিত না হলে এই দুঃখবোধটুকু থেকেও হয়তো-বা বঞ্চিত হতাম। বঞ্চিত হয়ে, কূপমণ্ডুক আত্মসর্বস্ব, উচ্চমন্য, কেবলমাত্র স্বর্ণমুদ্রা অর্জনের শিক্ষাতেই শিক্ষিত হয়ে ডিজেলের ধুঁয়ো-ভরা কোনো বড় শহরে সারাজীবন খাই-খাই করে কাটিয়ে, ইঁদুরের মতো স্বার্থপরতায়, নিজেদের একে অন্যকে কাটাকুটি করে এই মানবজীবন শেষ করতাম। অসীম ব্রহ্মাণ্ড থেকে গ্রহ-নক্ষত্রের আকস্মিক স্খলনে, তাদের নিরুচ্চার নিঃশব্দ মৃত্যু এ-জন্মে তাহলে আর দেখা হতো না।

আমার এই ভালুমারে অতীত কথা বলে। সত্যিই কথা বলে। ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কেবলই মনে হয়, এই অতীতের যথার্থ অনুভবেই আমাদের প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ নিহিত আছে। ছিল চিরদিন। এবং থাকবে।



সমস্ত আকাশ আলোয় ভরে দিয়েছে রোদ। ঘন নীল উজ্জ্বল আকাশ। পাহাড়ী বাজ উড়ছে ঘুরে ঘুরে। কয়েক দানা শুকনো মকাই চিবিয়ে, একটা মকাই কোঁচড়ে নিয়ে পরেশনাথ কিস্কু পাহাড়ে যাচ্ছিল গোরুগুলোকে চরিয়ে আনতে। ফিরবে সেই সন্ধ্যা-বেলা। মাহাতোর গোরু চরানোর ভার তার উপর। সাদা-লালে মিলিয়ে গোটা পনেরো গোরু। দিনে পঁচিশ নয়া করে পায় পরেশনাথ মাহাতোর কাছ থেকে।

ওদের বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে পাহাড়ে পাকদন্ডীর পথ ধরবে ও, এমন সময় বুলকি পিছু ডাকল, এই ভাইয়া!

কা রে দিদি? পরেশনাথ দাঁড়িয়ে পড়ে শুধোলো।

বুলকি বলল, পাহাড়ে যাচ্ছিস? আমার জন্যে এক কোঁচড় কাঁকোড় ফল নিয়ে আসিস। মালা গাঁথব।

পরেশনাথ বিজ্ঞের মতো বলল, এতগুলো গোরু নজরে রাখা কী কম কথা? আমার সময় কই? .....আচ্ছা দেখবো, যদি হাতের কাছে পাই ত আনবো।

বুলকি বলল, বেশি বেশি, না?

পরেশনাথ গম্ভীর গলায় বলল, তুই বড় অবুঝ দিদি। তোর যা চাই, তা এক্ষুণি চাই! বলছি তো দেবো এনে। তবে আজই দেবো কি-না বলতে পারছি না।

বুলকি জেদ ধরল, না, আজই চাই। কাল হাট না? হাটে যাবো কাঁকোড়ের মালা পরে।

পরেশনাথ জবাব না দিয়ে, একটা গোরুর পিঠে লাঠির বাড়ি মারল। তারপর একবারও ফিরে না-তাকিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যের পাকদন্ডীতে মিলিয়ে গেল।

এই পাহাড়-জঙ্গলের নেশায় বুঁদ হয়ে যায় পরেশনাথ। পেটের খিদে, পরনের কাপড়ের অভাব, সব কিছু ভুলে যায় ও।

একটু এগিয়ে যেতেই পাকদন্ডীর বাঁকে শুকনো পাতা মাড়াবার মচ্‌মচ্ আওয়াজ হলো। বাঁক ঘুরতেই দেখলো টেট্‌রা-চাচা। একটা ফালি-হওয়া জামা গায়ে দিয়ে কিস্কু পাহাড় থেকে পাকদন্ডী বেয়ে নেমে আসছে।

পাহাড়ের ওপরে মুলেন সাহেবের বাংলো ছিল একসময়। শিকারে আসতো নাকি সাহেব। পরেশনাথ কখনও দেখে নি, তার বাবার মুখে শুনেছে। জন্ম থেকেই পরেশনাথ

দেখে আসছে ঘন জঙ্গলের মধ্যে এই ভেঙে-পড়া বাংলো: জঙ্গলের সঙ্গে আর আলাদা করা যায় না আজকাল। শুধু কিছু-কিছু শৌখিন গাছ মনে করিয়ে দেয় যে, একসময় এখানে মানুষের বাস ছিল। মাঝে-মাঝেই শোন্‌চিতোয়া এসে আস্তানা নেয় এখানে। বিশেষ করে ঝড়-বৃষ্টির দিনে। একবার পরেশনাথ মুখোমুখি পড়ে গেছিল শাওন মাসের এক সকালে, একটার সামনে। চোখ দুটো কটা-হলুদ। তাকালে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। শোন্‌চিতোয়াটা কিছু বলে নি, পথ ছেড়ে নেমে গেছিল পাথরের আড়ালে পরেশনাথ ভয়ে আর এগোয় নি। এক-এক পা করে অনেকদূর পৌছিয়ে এসে দৌড় লাগিয়েছিল বাড়ির দিকে।

টেট্‌রা-চাচা ফলের ব্যবসা করে। টেট্‌রা-চাচার মেয়ে তিতলি ঠিকাদার কোম্পানীর বাবুর বাড়িতে কাজ করে। বাঁশবাবু যাঁর নাম। পরেশনাথের বাবা মানিয়া তাঁকে ভালো চেনে। দুধ দেয় তাঁর বাড়ি। মাথায় একটা ঝুড়ি নিয়ে গেছিল টেট্‌রা-চাচা মুলেন সাহেবের বাংলোর হাতায় এখনও যে পেয়ারা গাছ আছে, তা থেকে পেয়ারা পাড়তে। আমের দিনে আমও পাড়ে। ভাল্লুকদের সঙ্গে তখন টেট্‌রা-চাচার রেষারেষি। গরমের সময় এই সব আমগাছের দখল নেয় ভাল্লুকেরা। মুলেন সাহেব মরার সময় সমস্ত আমবাগান যেন ওদেরই ইজারা দিয়ে গেছিল। গভীর জঙ্গলের মধ্যে বলে দিনের বেলাতেও ভাল্লুকেরা এখানে আমগাছে আম পেড়ে খায়। একবার একটা ভাল্লুক টেট্‌রা-চাচাকে তাড়া করে পিছন থেকে এক খাব্‌লা মাংস তুলে নিয়েছিল। একদিন ধুতি তুলে পিছনের গর্ত হয়ে-যাওয়া জায়গাটা দেখিয়েছিল টেট্‌রা, পরেশনাথকে।

কোথায় চললে চাচা? পরেশনাথ হাসিমুখে বলল।

টেট্‌রা হাসল। বলল, বাসারীয়া।

তারপর বলল, যাওয়া-আসাই সার। বস্তিতে পয়সা দিয়ে আমরুত্‌ খাবে এমন লোক কই? যেতে পারতাম যদি চিপাদোহর, তাহলে হয়তো স্টেশনে কী হাটে বিক্রি করতাম কিছু। যাওয়া-আসা অনেক খরচের। কিছুই নাফা থাকে না। সময়ও লাগে বিস্তর। দিনকাল বড় খারাপ রে পরেশনাথ!

পরেশনাথ বলল, হুঁ। ও জানে। ওর বাবা-মা সব সময়েই, উঠতে-বসতে খালি এই কথাই বলে: দিনকাল বড় খারাপ। দিন আর কাটতেই চায় না।

টেট্‌রা মাথার ঝুড়িটা পথের পাশের পাথরে নামিয়ে রেখে একটা বিড়ি ধরালো। পরেশনাথকে শুধলো, তোর বাবা কেমন আছে? অনেকদিন দেখা হয় নি। আগের সপ্তাহে যখন হাটে গেছিলাম, তখন হাট ভেঙে গেছে। গোদা শেঠ পয়সা দিতে এতই দেরি করল যে, হাটে গিয়ে কিছু কিনতেই পারলাম না। অথচ সেই সকাল থেকে বসেছিলাম ওর গদীর বারান্দায়। বেচা-কেনা করল, হিসেব মেলাল, তারপর বাড়িতে খেতে গেল। খেয়ে-দেয়ে এসে ঢেকুর তুলতে তুলতে যখন পয়সা দিলো, তখন বেলা শেষ।

টেট্‌রার এই কথায় কোনো অভিযোগ, অনুযোগ বা রাগ ছিল না। ঘটনা বলার মতো, যা ঘটেছিল, তাই-ই বলেছিল পরেশনাথকে। আস্তে আস্তে, থেমে থেমে, বিড়িতে সুখটান দিতে দিতে।

টেট্‌রা পরেশনাথের বাবা মানিয়া, তাদের গ্রাম ও আশ-পাশের গ্রামের যত লোককে জানে-শোনে মানিয়ারা, তাদের কারো মধ্যেই কোনো উত্তেজনা নেই। অনাবৃষ্টি, অতি-বৃষ্টি, ঝড়, দুর্যোগের মতোই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে এখানকার সকলেই যার যার নিজের জীবনে এই রকমই হয়, বা হবে মনে মেনে নিয়েছে। পরেশনাথের বাবা যেমন নিয়েছে, পরেশনাথ, হয়তো পরেশনাথের ছেলেও এই নির্লিপ্ত সর্বংসহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে

বড় হবে। শিশু থেকে যুবক, যুবক থেকে বৃদ্ধ, তারপর একদিন নিদিয়া নদীর পাড়ের শ্মশানে চৌপাইতে করে চলে যাবে। জঙ্গলের পথে-পথে, পথের ধুলোয়, কাঠপুত্‌লী গাছের পাতায়, কাঁকোড়ের ঝোপে-ঝোপে 'রাম নাম সত্‌ হ্যায়,' 'রাম নাম সত্‌ হ্যায়' কথাগুলো কিছুক্ষণ ঠিক্‌রে ফিরবে। তারপরই, আবার মন্থর, চাঞ্চল্যরহিত ঝিঁঝির ডাক, কথাগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে।

টেট্‌রা বিড়িটা শেষ করে উঠল।

ঝুড়ি থেকে দুটো পেয়ারা তুলে বলল, নেঃ, তুই একটা খাস, বুল্‌কিকে একটা দিস। তারপর, চলে যাওয়ার আগে বলল, গাই-বয়েলগুলোকে ঢালের দিকে যেতে দিস না আজ। হাতি আছে। আমি আমরুত্‌ পাড়ার সময় ডাল ভাঙার শব্দ শুনেছি। পুরো দল আছে। কান খাড়া করে রাখিস আজ।

যখন পরেশনাথ একা বসে থাকে অলস দুপুরে, গাই-বয়েলগুলো যখন গলায় কাঠের ঘন্টা দুলিয়ে চারিদিকে পটাস্‌ পটাস্‌ করে ঘাস পাতা ছিঁড়ে খায়, নরম রোদটা পিঠের ওপরে পড়ে, বুঁই-বুঁ-বুঁইই-ই-ই করে রোদের মধ্যে কাঁচপোকা ওড়ে, জঙ্গল থেকে নানারকম ফুলের গন্ধ, পাখির ডাক ভেসে আসে, কাঠের ঘন্টাগুলো ঘুমপাড়ানি সুর তোলে, তখন পরেশনাথের ঘুম পেয়ে যায়। ঘুমের মধ্যে ও শোনে, তারা যেন কানের কাছে বলে, 'রাম নাম সত্‌ হ্যায়'।

কথাটার মানে কি? মানে ও জানে। কিন্তু কথাটা বলা হয় কেন? রাম কি আছে?

পরেশনাথের বাবা কথায় কথায় বলে, হায় রাম! বা হায় ভগ্‌য়ান।

ভগবান কি আছে? থাকলে, পরেশনাথের বাবা-মার এত কথার একটাও ভগবান শোনে না কেন? কেন খরগোশ এসে চীনেবাদাম খায়? দিনে হরেকরকম পাখি এসে কেন ফসল খেয়ে যায়? আর রাতে শুয়োর, হরিণ, শজারু? কেন এত কষ্টে পাথর-কেটে-করা বস্তির আশেপাশের ধানের ক্ষেতেও হাতির দল নেমে এক রাতে সমস্ত ফসল সাবাড় করে? কেন্‌ গোদা শেঠ টেট্‌রা-চাচার সঙ্গে, তার বাবার সঙ্গে, এত এত লোকের সঙ্গে, এমন ব্যবহার করে? কেন এত ইচ্ছে থাকতেও ও একটাকা দিয়ে বুল্‌কি দিদিকে একটা পুঁতির মালা কিনে দিতে পারে না? কেন? কেন?

পরেশনাথ ওর দিদিকে ভালোবাসে। দিদির মুখটা কী সুন্দর! মায়ের চেয়েও সুন্দর। কী সুন্দর করে কথা বলে দিদি। একবার পরেশনাথ বাসারীয়ার হাটে মোটরে করে কোথা থেকে যেন বেড়াতে-আসা দিদিরই সমবয়সী একটি মেয়েকে দেখেছিল। বাবুদের মেয়ে। তার কী সুন্দর জামাকাপড়, কী দারুণ লাল জুতো মাথার চুল, হাসি, সব। আহা! পরেশনাথ ভাবে, ওর দিদির যদি অত সব থাকতো, তবে বুল্‌কি দিদিকে না-জানি কী সুন্দরই দেখাতো!

ঠিক আছে, আজ কাঁকোড়ের ফল নিয়েই যাবে দিদির জন্যে। নেবেই খুঁজে পেতে, এক কোঁচড়।



মানি ওরাওঁ-র বউ, পরেশনাথের মা মুঞ্জরী, তার মেয়ে বুলকিকে পাঠিয়েছিল গোদা শেঠের দোকানে। একটু নুন, আর সরগুজার তেল আনতে। বহুদিন হয়ে গেছে সর্ষের তেলের স্বাদই ভুলে গেছে ওরা। স্বাদ ভুলে গেছে জিভ; ভুলে গেছে শরীর। তেল মাখলে যে কেমন দেখায় তাকে, মুঞ্জরী আজ তা মনেও করতে পারে না। রুক্ষ দিন, রুক্ষ চুল, রুক্ষ শরীর, রুক্ষ মেজাজ। প্রকৃতিতে রুক্ষতা।

সর্ষের তেল দিয়ে আলু ভেজে খেতে কেমন লাগে? ভাবতেও জিভে জল আসে মুঞ্জরীর। ওর নিজের জন্যে আজকাল আর কোনো কষ্ট নেই। কাঁচ-কাঁচ ছেলেমেয়ে দুটোর মুখের দিকে তাকানো যায় না। মাথায় তেল নেই, পরার জামা-কাপড় নেই, পেটের খাবার নেই। অথচ, তবু বেঁচে থাকতে হয়। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য সূর্য ওঠা থেকে সূর্যাস্ত অবধি কী-ই না করতে হয়!

একমাত্র চৌপাইটা ঘরেব বাইরে এনে, গায়ে দেওয়ার কাঁথা-কম্বলগুলো সব রোদে দিচ্ছিল মুঞ্জরী। যা-হোক করে দুটো মকাই ফুটোতে হবে। দুপুরেব জন্যে। কিছু জংলী মূল আছে ঘরের কোণায়। পরেশনাথ আর বুলকিই নিয়ে এসেছিল খুঁড়ে খুঁড়ে জঙ্গল থেকে। তাই একটু ভেজে দেবে সরগুজার তেলে। ওদের খাওয়া-দাওয়ার সাধ চলে গেছে। কিন্তু পরেশনাথ আর বুলকি? ওরা যে বড়ই ছোট!

হঠাৎই ওর বুকের মধ্যেটা ধক্ করে উঠল। হাতের কাঁথা মাটিতে ফেলেই দৌড়ে গেল মুঞ্জরী মকাই ক্ষেতের দিকে। দিগন্তের ওপারে সবুজ গাছ-গাছালির মাথার ওপরে এক চিলতে সবুজ মেঘ কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছে।

সুগা! সুগা! হারামজাদা! মনে মনে মুঞ্জরী বলল।

কিন্তু একা কী করবে বুঝতে পারল না ও। এই মকাইটুকুই সামনের বছরের ভরসা। যে মকাই খেয়ে আছে এ-বছরে, তা গত বছরের শুকনো মকাই। এতবড় টিয়ার ঝাঁক কী করে ও সামলাবে একা? মুঞ্জরী কাকতাড়ুয়াটা এদিক-ওদিক ঘোরাতে লাগল। আর শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে সেই আগন্তুক অসংখ্য শত্রুর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল।

এখন বুলকিটা থাকলে ভালো হতো। কোথায় যে আড্ডা মারতে বসল ছুঁড়ি! মুঞ্জরী চেঁচিয়ে ডাকল, এ বুলকিয়া বুলকিয়া রে......। কিন্তু চোখ সরালো না ওদিক থেকে। সবুজ মেঘটা কাঁপতে কাঁপতে আসছে। এখন আর মেঘ নেই, কতকগুলো ছোট ছোট সবুজ কম্পমান বিন্দু ক্রমশ ছোট থেকে বড় হচ্ছে আর তীরবেগে এগিয়ে আসছে।

বড় বয়ের গাছটার আড়ালে খুব ধীরে-সুস্থে আসতে দেখল ও বুল্‌কিয়াকে। যেন ঘুমের মধ্যে হেঁটে আসছে ছুঁড়ি।

চিৎকার করে উঠল মুঞ্জরী, এতক্ষণ কী করছিলি?

ততক্ষণে বুল্‌কিরও চোখ গেছে আকাশে।

এবারে টিয়াগুলোর ডাক শোনা যাচ্ছে—ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ। ডাক নয়, যেন কর্কশ চাবুক!

বুল্‌কি জোড়ে দৌড়ে আসছিল। গায়ে কোনোক্রমে জড়িয়ে-রাখা দেহাতী ময়লা মোটা শাড়িটার আঁচলটা পিছনে লুটোতে লাগল। একহাতে নুন আর অন্যহাতে তেলের শিশি ধরে দৌড়ে আসছিল বুল্‌কি মায়ের দিকে।

মুঞ্জরী চেঁচিয়ে উঠল, আস্তে আয় মুখপুড়ি! তেল যদি পড়ে, তাহলে তোর চুলের ঝুঁটি ছিড়বো আমি।

বুল্‌কির চোখ দুটো স্থির। দুই আদেশ একই সঙ্গে মেনে নিয়ে যথাসম্ভব সাবধানে মায়ের পাশে এসে দাঁড়ালো। তেলের শিশি আর নুনটা তাড়াতাড়ি পাথরের ফাঁকে রেখেই।

ততক্ষণে টিয়াগুলোও এসে গেল।

মা ও মেয়ে একই সঙ্গে দু-হাত নেড়ে যতো জোরে পারে চিৎকার করতে লাগল। কাকতাড়ুয়ার কালো হাঁড়ির মাথায় সাদা চুনে আঁকা মুখ-চোখ-কান বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল। ন্যাকড়া আর খড়ের তৈরি হাত দুটো বাঁই-বাঁই করে চক্রাকারে আন্দোলিত হতে লাগল। কিন্তু সর্বনেশে সুগার ঝাঁক কিছুতেই ভয় পেলো না। পাখিগুলো প্রায় পেকে-আসা মকাইগুলোর ওপরে এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মকাই গাছগুলো টিয়াদের শরীরের ভারে বেঁকে গেল। হেলতে-দুলতে লাগল। গাছে দু-পা বসিয়ে লাল-লাল বীভৎস ঠোঁট বেঁকিয়ে টিয়াগুলো মকাই খেতে লাগল।

মুঞ্জরী আর্তনাদ করে উঠল। পাগলের মতো দু-হাত তুলে এদিকে-ওদিকে দৌড়োতে লাগল। ওর শাড়ির আঁচল খসে গেলো। দুটি রুক্ষ, খড়ি-ওঠা স্তন ঝুলে পড়ল। দুলতে লাগল। চুল উড়তে লাগল রুক্ষ হাওয়ায়। আর ওর বিস্ফারিত চোখের সামনে টিয়াগুলো মকাই খেতে লাগল। এত বড় টিয়ার দল আগে দেখে নি কখনও মুঞ্জরী। পঙ্গপালের মতো। মুঞ্জরী বুঝতে পারল, এইভাবে চললে আর পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে সব মকাই শেষ করে দেবে সুগাগুলো। মা ও মেয়ে দু-জনেই রণচন্ডী মূর্তিতে আপ্রাণ আস্ফালন করছিল। কিন্তু নিষ্ফল। আকুল হয়ে বধির ভগবানকে ডাকতে লাগল মুঞ্জরী।

ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ দু-ম্‌ম্‌ করে একটা আওয়াজ হলো। তার পরেই পর পর কয়েকটা বোমা ফাটার মতো আওয়াজ।

মুঞ্জরী ও বুল্‌কি চমকে উঠল। চমকে উঠল টিয়াগুলোও। ওরা পড়ি-কি-মরি করে মকাই ক্ষেত ছেড়ে পাখার ভর্‌র্‌—র্‌—র্‌, ভর্‌র্‌—র্‌—র্‌, শব্দ করে, ট্যাঁ...ট্যাঁ...করে ডাকতে ডাকতে এক এক করে উঠতে লাগল। হঠাৎ ভার মুক্ত হওয়ায় মকাইয়ের মাথাগুলো জোরে আন্দোলিত হতে লাগল। দেখতে দেখতে পলাতক টিয়াগুলো সবুজ কম্পমান অসংখ্য বিন্দুতে আবার রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে একাত্ম হয়ে গেল দ্রুত অপসৃয়মাণ এক সবুজ মেঘে।

মুঞ্জরী ও বুল্‌কি দু-জনেই এদিক-ওদিক চাইল, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলো না। ওদের দুজনেরই ভারি অবাক লাগছিল। কী করে এরকম হলো? কে এই সময় এমন করে তাদের বাঁচালো! কেউ কোথাও নেই। মাথার ওপরে ঝক্‌ঝক্‌ করছে রোদ্দুর।

দোলাদুলি-করা মকাই গাছগুলো, নীল আকাশে সবুজ দিগন্ত মেশা। কে এই দেবদূত?

এমন সময় ক্রিং-ক্রিং করে একটা সাইকেলের ঘন্টা বাজল। আর ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই হোঃ হোঃ করে যেন হেসে উঠল। উদ্দাম, আগল-খোলা হাসি।

অ্যাই!

বুলকিই প্রথম দেখেছিল।

মুঞ্জরী তাড়াতাড়ি শাড়ি ঠিক করে নিলো।

একটা ঘন নীল-রঙা ফুল প্যান্টের ওপর ঘন লাল-রঙা ফুল হাতা শার্ট পরে এক পা মাটিতে নামিয়ে অন্য পা প্যাডেলে রেখে নান্কুয়া হাসছিল তখনও হোঃ হোঃ করে।

মুঞ্জরী আদর ও প্রশংসা মেশানো গলায় বলল, নান্কুয়া। অ্যাই নান্কুয়া। ভগবানই তোকে পাঠিয়েছিল রে নান্কুয়া। বলতে বলতে দৌড়ে গিয়ে নান্কুয়ার মাথাটাকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে চুলগুলো এলোমেলো করে দিলো।

নান্কুয়া বলল, আরে, আমার চুল, চুল ছাড়ো মাসী।

বলেই, নিজের মাথাটাকে মুঞ্জরীর হাত থেকে মুক্ত করেই বুক-পকেট থেকে একটা হলুদ-রঙা প্লাস্টিকের চিরুনি বের করে সাট্ সাট্ করে চুলটা আঁচড়ে নিলো। তারপর দাঁড়-করানো সাইকেল থেকে নেমে পড়ে বলল, ভগবান পাঠালো মানে? আমিই তো ভগবান।

তারপর বলল, চলো মাসী।

নান্কুয়া মুঞ্জরীর আপন বোনপো নয়। বোনপোর বন্ধু। ওরা দুজনেই কয়লা-খাদে কাজ করতো। মুঞ্জরীর বোন-ভগ্নিপতি, ছেলে বদলি হওয়াতে চলে গেছে কার্কা কোলিয়ারীতে। সে, শুনেছে নাকি বহুদূরে। তিন টাকা নাকি ভাড়া লাগে বাসে, ফুলদাওয়াই স্টেশন থেকে। মহুয়ামিলন স্টেশন থেকে দু টাকা ট্রেনে। কার্কা ঠিক কোনদিকে, মুঞ্জরী জানে না। তার বোনপো আশোয়া চলে গেছে বটে, কিন্তু এই ভালুমারের এক অপাংক্তেয় ছেলে নান্কুয়া ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে। ভালুমার গ্রামে নান্কুয়াকে সকলেই জানে। ভালোবাসে।

নান্কুয়ার ঠেলে-আনা সাইকেলের চাকায় কির্কির্ আওয়াজ হচ্ছিল। ওরা তিন-জনে মুঞ্জরীর ঘরের দিকে হেঁটে চলল।

একটা দাঁড়কাক ডাকছে আমগাছের মগডাল থেকে কা-খুনা করে। এখন সূর্য ঠিক মাথার ওপরে। এর পরেই সূর্য পশ্চিমে হেলতে শুরু করবে। তখন সব কাজই তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে করতে হবে ওদের। রাতকে ওদের বড় ভয়। অনেক কারণে।

নান্কুয়া বলল, মেসো কোথায়?

মুঞ্জরী বিরক্ত গলায় বলল, তোর মেসোই জানে। বলদ দুটো ভাড়া দিয়েছিল মাহাতোর জমি চাষের জন্যে। তার ক'টা টাকা পাওনা আছে। তিন মাস হলো সে টাকা আদায় কবতে পারছে না। গেছে, সেই টাকার তাগাদায়। ফেরার সময়ে কাঠ কেটে আনবে। শীতটা এবারে এত তাড়াতাড়ি পড়েছে! সন্ধ্যের পর আগুন না জ্বালালে…।

নান্কুয়া সাইকেলটা একটা পেয়ারা গাছে ভর দিয়ে রেখে চৌপাইতে এসে বসল। আসার সময় সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝোলানো একটা থলি নিয়ে এলো। বুলকিকে বলল, এটা নিয়ে যা বুলকি।

এতে কী আছে রে? মুঞ্জরী শুধোলো।

তাচ্ছিল্যের সুরে নান্কুয়া বলল, এই একটু খাবার-দাবার।

কেন এসব করিস তুই! রোজ রোজ এরকম করা ভালো না। তুই ঘর করবি, সংসার করবি, এমন করে পরের জন্যে টাকা নষ্ট করতে নেই।

ছাড়ো! বলল নানকুয়া।

মুঞ্জরী বলল, বোস্, আমি এক্ষুনি আসছি।

বুলকিকে নানকুয়া বলল, বাছুরটা কবে হলো?

সাদা বাছুরটার দিকে তাকিয়ে বুলকি বলল, প্রায় মাসখানেক। একটাই তো গাই আমাদের। বাঁশবাবু আর পাগলা সাহেবের কাছে দুধ বিক্রি করছে বাবা।

নানকুয়া বলল, ভালো। তাও যতদিন গোরুটার বাঁটে দুধ থাকে, কিছু রোজগার হবে।

ঘরে গিয়ে থলিটাকে উপুড় করল মুঞ্জরী। চোখ দুটো আনন্দে, লোভে, চকচক্ করে উঠল। বুলকি ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল ঘরে। খুশিতে বুলকি দাঁত বের করে হাসল। অনেকখানি চাল, চানার ডাল, আলু-পেঁয়াজ এবং চোখকে বিশ্বাস হলো না—শুয়োরের মাংস! কত দিন যে মাংস খায় নি ওরা। কত দিন, তা মনেও পড়ে না।

মুঞ্জরী মুখ থেকে লোভ ও খুশির ভাব মুছে ফেলে, মুখে স্বাভাবিক ভাব ফুটিয়ে বাইরে এসে বলল, আজ তো হাটিয়া ছিল না। আনলি কোথা থেকে?

ছিল ত! টিমার-এ। কাজে গেছিলাম। তাই, তোমাদের জন্যে...

ওহো! মুঞ্জরী বলল। খেয়ে যাবি তো?

নাঃ, নাঃ, আমি ফিরে যাবো। ট্রেন ধরব মহুয়ামিলন স্টেশন থেকে। গ্রামে ত সব হপ্তাতেই আসি। কিন্তু তোমার কাছে বহুদিন আসা হয় না। এলাম তাই। তোমার বাড়িটা বড় দূরে।

গ্রামের মধ্যে থাকব এমন সামর্থ্য কোথায়? সারা জীবন তো পরের জমিতে আবাদ ফলিযেই কাটল।

নানকুয়া কথা ঘুরিয়ে বলল, মেসো আসবে কখন? কথা ঘোরাল, কারণ নানকুয়ার এই হতাশা ভালো লাগে না। এখানকার সব ক'টা মানুষই এরকম!

তোমার মেসোই জানে। তারপর বলল, টুসিয়ার সঙ্গে দেখা হয়?

কই আর হয়! বহুদিন দেখা হয় না। আছে কেমন ওরা সব?

মিথ্যে কথা বলল নানকুয়া।

ভালোই আছে।

নানকুয়া বলল, কেনই বা খারাপ থাকবে? যার এমন কেউ-কেটা ভাই!

মুঞ্জরী হাসল। বলল, তার ভাইয়ের কথা বুঝি না। কিন্তু তোর মনের কথা বুঝি। শুধোলো, ডাকতে পাঠাবো নাকি ওকে?...যা ত বুলকি, টুসিয়া দিদিকে ডেকে নিয়ে আয়। বলবি, নানকু ভাইয়া এসেছে।

বুলকি উঠে চলে গেল।

বেশ কিছুদূর গেছে বুলকি, এমন সময় মুঞ্জরী ধমক দিল ওকে, অ্যাই ছুঁড়ি, আবার! তোর ঠ্যাং ভেঙে দেবো আমি।

হঠাৎ ধমকে, বুলকি চমকে উঠল।

বুলকি ও পরেশনাথকে বার বার মানা করা সত্ত্বেও ওরা কখনোই কথা শুনবে না। সরগুজার ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ওদের শর্ট-কাট না করলেই নয়। কতোগুলো গাছকে যে শুইয়ে ফেলেছে তা বলার নয়। দুই ভাইবোনে রীতিমতো আলাদা একটা পায়ে-চলা

পথ বানিয়ে ফেলেছে ক্ষেতের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে। পরিষ্কার দেখা যায় সেই পথের চিহ্ন। সবুজ সতেজ গাছে হলুদ ফুল। তার মধ্যে দিয়ে পায়ে-চলা মাটির পথ। ফসল থাকুক কী না-থাকুক ওরা গ্রাহ্য করবে না কখনও। সব সময়ই নিজেদের পায়ে-বানানো ঐ পথেই যাবে বজ্জাত দুটো।

বুলকি ধমক খেয়ে সোজা রাস্তা ধরল। কিন্তু মুঞ্জরী জানে যে, দুই ছেলেমেয়ের কেউই ওর কি মানিয়ার কথা শোনো না। এতো কষ্ট, এতো খিদে, তবুও কী যে ঘোরের মধ্যে থাকে দু ভাইবোনে সব সময়, কী নিয়ে যে এত হাসাহাসি করে, এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে, তা ওরাই জানে। দেখলে গা জ্বালা করে মুঞ্জরীর।

বুলকি চলে গেলে মুঞ্জরী বলল, তুই সময় মতো না এসে পড়লে আজ বড় সর্বনাশ হয়ে যেতো। কিন্তু কী দিয়ে আওয়াজ করলি রে?

নানকু পকেট থেকে লাল-নীল পাতলা কাগজে মোড়া একমুঠো আছাড়িপটকা বের করল।

বলল, এই নাও। রেখে দাও।

মুঞ্জরীকে চিন্তিত দেখালো। বলল, ফরেস্ট গার্ড ধরবে না?

ধরলেই-বা কি? মানুষ কি মরে যাবে নাকি? বাঘের বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে হোক. কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই থেকে রইস্ আদমীরা এসে জানোয়ার দেখে যাচ্ছে যাক। তা বলে কি তোমরা জানোয়ারের চেয়েও অধম? মানুষ মেরে জানোয়ার বাড়াতে হবে, এ-কথা কোন আইনে বলে?

কিন্তু...। মুঞ্জরী বলল, তোর মেসো একবার হাতি তাড়াবার জন্য চিপাদোহর থেকে নিয়ে আসা পটকা ফুটিয়েছিল বলে তার পরের দিন ফরেস্ট গার্ড ওকে ধরে নিয়ে গেল। খুব মারপিট করেছিল ওকে। বলেছিল, কোনো জানোয়ারকে যেন একটুও বিরক্ত করা না হয়। করলে দাঁত খুলে নেবে।

মেসো কিছু বলল না? কাঠের কুপ্ কাটা ত এ তল্লাটে প্রায় বন্ধই! যা কাটা হচ্ছে, তা বহু দূরে। কুপ্ কেটে যে ক'মাস কিছু রোজগার হতো, তা ত গ্রামের লোকের এখন নেই। যার যতটুকু জমি আছে, তাতে বছরের দু-মাসের ফসলও হয় না। তা লোকেরা খাবে কি?...তোমরা এত লোক যে প্রায় না-খেয়ে আছো, সব ফসল নষ্ট করছে জানোয়ারে, তোমরা কেন দরবার করো না ওপরে?

মুঞ্জরী বলল, ওপরওয়ালা যে কে তাই-ই তো জানা নেই। তাছাড়া, কে করবে? আমরা কি লেখাপড়া জানি? তা সত্ত্বেও কাকে ধরে যেন আর্জি পাঠিয়েছিল সকলে মিলি। তোর মেসোও টিপ সই দিয়েছিল। সেই দরখাস্তে নাকি ওরা বলেছিল যে, বাঘোযা পোজকুট্ আর দেখনেওয়ালাদের থেকে যে পয়সা পাচ্ছ, তার কিছু জঙ্গলের মধ্যের গরীব লোকদের দেওয়া হোক, যাতে তারা না-খেয়ে মারা না যায়। কিন্তু কই? কিছু তো হলো না।

নানকু একটা সিগারেট বের করল প্যাকেট থেকে। টিনের লাল-নীল রঙা পেট্রল-লাইটার বের করে ফিচিক্ আওয়াজ করে সিগারেটটা ধরাল। তারপর অনেকখানি ধুঁয়ো ছেড়ে বলল, দেখি, আমি কী করতে পারি!

মুঞ্জরী নানকুর দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, নানকুর মতো বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সাহসী ছেলে এ-অঞ্চলের দশটা গাঁয়ে নেই। নেশা করে না নানকু। শুধু সিগারেট খায়। তাই ত এত পয়সা জমাতে পারে। মাইনে ত কয়লাখাদের সকলেই ভালো পায়, কয়লাখাদগুলো সরকার নিয়ে নেওয়ার পর। কিন্তু রোজের দিনেই তার অনেকখানিই

উড়ে যায় ভাঁটিখানায়। তার ওপর যেদিন হাট, ওদের মধ্যে অনেকেই ভালো-মন্দ কেনে। সেরা জিনিসটা। মোর্গা কেনে। ধার শোধ করে। হপ্তার মাঝামাঝি এসে আবার ধার হয়ে যায়। তবুও বাবুদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যে নান্‌কুয়ারা অনেক কিছু কিনতে পারে আজকাল, একথা ভেবেও ভালো লাগে মুঞ্জ্‌রীর। যুগ-যুগান্তর ধরে যে বাবুরাই ওদের চোখের সামনে সব কিছু কিনে নিয়ে গেছে।

এখন ওদের দিন।

সরকার এখন ওদের নিয়ে নাকি অনেক ভাবছেন। অনেক আইন-কানুন হচ্ছে নাকি! নান্‌কু বলে, ওরাই ত দেশের নিরানব্বই ভাগ। শহুরে বাবুরা ত এক ভাগও নয়। এই সাঁওতাল, ওরাও, চামার, মুচি, কাহাররা। এই দোসাদ, ভোগতা, মুণ্ডারা। আরো কতো আছে ওদের মতো। ওরা ভালো না-থাকলে, বড়লোক না-হলে দেশ এগোবে কী করে? অনেক নাকি ভালো দিন পড়ে আছে ওদের সামনে। নান্‌কু একদিন বলেছিল যে, মুঞ্জ্‌রীর পরেশনাথও স্কুলে লেখাপড়া শিখে কলেজ থেকে পাশ করেই কী একটা ইম্‌তেহানে বসলেই নাকি পুলিশ সাহেব, ডি-এফ-ও সাহেব এমনকি ম্যাজিস্টের সাহেবও হয়ে যেতে পারে।

পরেশনাথটাকে স্কুলে পাঠানো গেল না।

মুঞ্জ্‌রীর চোখের দৃষ্টি বিকেলের রোদের মতো বিধুর হয়ে উঠল। একটা ফিচ-ফিচিয়া পাখি ফিচফিচ্‌ করে ডাকছিল ওদের ঘরের পেছন থেকে।

আহা! ওদের দুজনের জীবন তো প্রায় শেষ হয়েই এসেছে। ভালো থাকুক নান্‌কুয়ারা। ভালো থাকুক পরেশনাথ। বড় হোক। বড় কষ্ট ওদের, এতো কষ্ট মা-বাবা হয়ে চোখে দেখা যায় না। ভালো বিয়ে হোক বুল্‌কির। সাবান মাখুক, তেল, মাখুক, রোজ ভাত-রুটি খেতে পাক। সুন্দর ছেলে-মেয়ে হোক। এমন ধুলোর মধ্যে, লজ্জার মধ্যে, খিদের মধ্যে, এমন অবহেলায় হেলাফেলায় যেন পরেশনাথ আর বুল্‌কির ছেলেমেয়েরা বড় না হয়। এই জীবন ত জানোয়ারদের চেয়েও অধম।

পরেশনাথ আর বুল্‌কির ভবিষ্যৎ-এর কথা ভাবতে ভাবতে নান্‌কুয়ার সামনে মাটিতে ছেঁড়া চাটাই পেতে বসে বাজ্‌রার দানা থেকে ধুলো বাছ্‌ছিল মুঞ্জ্‌রী কুলোর মধ্যে করে। রোদে পিঠ দিয়ে, আধশোয়া হয়ে।

এমন সময় হঠাৎ মানিয়াকে আসতে দেখা গেল। মানিয়া বেড়ার পাশ দিয়ে হেঁটে আসছে, কিন্তু পা-দুটো যেন ঠিক মতন পড়ছে না। ও যেন ভেসে আসছে।

সোজা হয়ে বসল মুঞ্জ্‌রী। চোখের দৃষ্টি রুক্ষ হয়ে উঠল ওর। মানিয়ার সঙ্গে কাঠ নেই। খালি হাত। টাঙ্গিয়া পিঠে টাঙানো।

নান্‌কু বলল, পিয়া হুয়া হ্যায় মালুম হোতা!

তারপর স্বগতোক্তির মতো বলল, বুঝলে মাসী, নেশাই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। আমাদের কাউকেই কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবে না এই ভাঁটিখানাগুলো। পারলে, আমি কয়লাখাদের বুলডোজার দিয়ে সব ভাঁটিখানা ভেঙে গুঁড়ো করে মাটিতে মিশিয়ে দিতাম। যারা খেতে পায় না, বউকে খাওয়াতে পারে না, ছেলেমেয়েকে খিদের সময় একমুঠো বাজ্‌রা দিতে পারে না, তাদের নেশা করার কী যুক্তি আছে? বড় খারাপ, বড় খারাপ এসব।

মুঞ্জ্‌রী ছেলেমানুষ নান্‌কুর সামনে মানিয়ার এরকম বেলেল্লাপনা সহ্য করতে পারলো না। ঐ আসছে তার স্বামী, মাতাল, অপদার্থ, নচ্ছার। মানিয়ার দিকে তাকিয়ে ঘেন্নায় মুঞ্জ্‌রীর গা রি-রি করতে লাগল। মানিয়া আমগাছটার কাছে এসে পৌঁছেছে, এমন

সময় মঞ্জরী হাতের কুলোটা মাটিতে ফেলে দিয়ে ঝড়ের মতো দৌড়ে গেল মানিয়ার দিকে। কুলো থেকে বাজরাগুলো সব গড়িয়ে পড়ে ধুলোয় মিশে গেল।

দূর থেকে মানি তার পরিচিত শাড়ি পড়া বউয়ের চেহারাটা দেখতে পেয়েছিল একটা অস্পষ্ট ছবির মতো। ওদের ঘর, আমগাছটা, তেঁতুল গাছটাও। কে যেন বসে আছে চৌপাইতে।

কে?

মানিয়া একটা ঘোরের মধ্যে হেঁটে আসছিল। মাথায় বড় ভার।

এতদিন পরে অনেকবার ঘুরিয়ে মাহাতো তাকে আজ টাকা দিয়েছিল। পনেরো টাকা। যদিও, পাওনা হয়েছিল পঁয়তাল্লিশ। এতগুলো টাকা হাতে পেয়ে বড় আনন্দ হয়েছিল ওর। বড় কষ্টে থাকে মানি। জন্ম থেকেই বড় কষ্ট করেছে। সে-কষ্ট লাঘব করার কোনো ক্ষমতা ওর দুর্বল হাতে নেই। ও জানে, যে-ক'দিন বাঁচবে এমনি করেই মরে মরে বাঁচতে হবে। এই মরে থাকার মধ্যে এক ঘন্টা, দু-ঘন্টা, তিন ঘন্টার একমাত্র খুশি এই মদ; পচাশী।

মাহাতোর বাড়ি থেকে সোজা ভাঁটিখানায় গেছিল ও। শুঁড়ি বলেছিল, কি ব্যাপার রে মানিয়া? আজ তো হাটবার নয়?

মানিয়া বহুবছর বাদে একটু বড়লোকের মতো হেসেছিল।

আয়না নেই ওর। ওর বড় ইচ্ছে করে বড়লোকের মতো হেসে একদিন আয়নায় দেখে ওকে কেমন দেখায়। হেসেই ও পাঁচ টাকার নোটটা বাড়িয়ে দিয়েছিল শুঁড়ির দিকে। তারপর বাকি টাকা পয়সা ফেরত নিয়ে বোতল দুটো নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা নির্জন জায়গায় এসে বসেছিল, শুকিয়ে-যাওয়া পাহাড়ী নদীর বালিতে। পাথরে পিঠ দিয়ে বসে রোদের মধ্যে আরাম করে আস্তে-আস্তে ছোট-ছোট চুমুকে অনেকক্ষণ ধরে শেষ করেছিল বোতল দুটো। পাখি ডাকছিল জঙ্গলের গভীর থেকে। বুলবুলি, টিয়া, ফিচ্‌ফিচিয়া, পাহাড়ী ময়না। ফিসফিস্ করছিল অস্পষ্ট হাওয়াটা পাতায় পাতায়। করাউনির হলুদ ফুলগুলো হাওয়ায় দোলাদুলি করছিল। লজ্জাবতী লতার মতো লতানো সবুজ লতার গায়ে-গায়ে লাহেলাওলার লাল ফুলগুলো নড়ছিল আস্তে আস্তে। মানিযার নেশাও হচ্ছিল আস্তে আস্তে। ওর মধ্যে কবিত্ব জাগছিল। লাহেলাওলার লাল গুটি ধরা ফুলের দিকে চেয়ে হঠাৎ মানিয়ার মনে হলো, ওদের বিয়ের সময় মুঞ্জরীর বুকের বোঁটার রং এমনি লাল ছিল। এখন কেমন বয়ের ফলের মতো কালো, দড়কচ্চা মেরে গেছে। সব ওরই দোষ। ও মরদ নয়। আওরাতকে যত্নে রাখতে পারে নি মানিয়া! একজোড়া রাজঘুঘু, বড় পান্ডুক এসে বসল সামনের পন্ননের ডালে। ঘুঘুর বুক কী রকম নরম, পেলব। মুঠি করে ধরতে কী আরাম। সারা গা গরম হয়ে ওঠে। কী যেন একটা মনে করতে চাইলো, ঘুঘুর বুকের সমতুল্য। মনে পড়ল না ঘুম ঘুম পেতে লাগল ওর। ঐ রোদে বসে নেশা যেমনই চড়তে লাগল, তেমনই মানিয়ার মনে হতে লাগল, এই জঙ্গলেরই উল্টো-পিঠের পাহাড়ে এখন তার সাত বছরের ছোট ছেলে একটা শুকনো মকাই খুটে খাচ্ছে গাই-বয়েলের মধ্যে বসে। সারাদিন, সকাল থেকে সূর্যাস্ত অবধি ও পাহাড়েই থাকবে, পঁচিশ নয়া পয়সার জন্যে! আর মানিয়া? সেই ছোট্ট পরেশনাথের বাপ? যে কিনা পাঁচ টাকার মদ কিনে একা একা গিলেছে চোরের মতো! ওদের কারোই জামা নেই গায়ে দেওয়ার। বুল্‌কিটা বড় হচ্ছে। মুঞ্জরী লজ্জায় বাইরে বেরোতে পারে না। আর সে? পাঁচ টাকার পচাশী মদ গিলল!

না, না! বড় খারাপ রে মানিয়া, তুই বড় খারাপ। নিজেকে বলেছিল ও।

ফেরার সময় নিজের হুঁশে পথ চলে নি। সন্ধ্যেবেলায় গোরু যেমন পথ চিনে গ্রামে ফেরে, গুলিখাওয়া জানোয়ার যেমন অর্ধচেতন অবস্থায় নিজের গুহায় ফেরে; ও তেমন করে নিজের বাড়ির দিকে ফিরে আসছিল।

মুঞ্জরী বাঁ-হাতে মানিয়ার চুলগুলো মুঠিতে ধরে ডান হাতে ধপাধপ্ করে মুখে, পিঠে, বুকে বেদম মার মারতে লাগল।

নান্‌কুয়া ভাবছিল, একটু মার খাক। মার খাওয়া দরকার। তারপর ছাড়াবে মানিয়াকে। কিন্তু ইতিমধ্যে বুল্‌কি কোথা থেকে দৌড়ে এলো। ওর আঁচল উড়ছিল হাওয়ায়। মা, মা, মা! কী করছ—বলতে বলতে বুল্‌কি ওর বাবাকে আড়াল করে দাঁড়াল। জোরে বলল, মা, তুমি কী করছ?

মুঞ্জরীকে রাক্ষুসীর মতো দেখাচ্ছিল। শনের মতো রুক্ষ চুল উড়ছিল বাতাসে। ও বলল, ছুঁড়ি! তোকে জবাবদিহি করতে হবে? ঠাস্ করে এক চড় বসালো মুঞ্জরী বুল্‌কিকে! পাঁচটা আঙুলের দাগ বসে গেল মেয়েটার নরম গালে। এক ধাক্কা মেরে বুল্‌কিকে মাটিতে ফেলে, মানিয়ার পকেট থেকে টাকা-পয়সা সব কেড়ে নিয়ে নিজের আঁচলে আগে বাঁধল, তারপর এক ঠেলা দিলো মানিয়াকে। মুঞ্জরী এতক্ষণ তার চুল ধরে ছিল বলে পড়ে নি। এবার ঠেলা খেয়েই মানিয়া দু-পা ছড়িয়ে অসহায় ও হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গিতে মাটিতে পড়ে গেল। পড়ে গিয়েই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

নান্‌কুয়া গিয়ে ওকে হাত ধরে তুলল। তুলে এনে চৌপাইতে বসালো।

তারপর নরম গলায় বলল, কেন এরকম করিস মেসো। কেন খাস?

মানিয়ার দু-চোখে জল গড়িয়ে পড়ছিল গাল বেয়ে।

মানিয়া জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, দ্যাখ্ নান্‌কুয়া, সে-সব অনেক কথা। তুই ছেলে-মানুষ; তুই বুঝবি না। তারপর নান্‌কুর মুখের সামনে ডান হাতের তর্জনী নাড়াতে নাড়াতে, বারবার একই কথা বলে চলল, বড় দুঃখে খাই রে নান্‌কু, বড় দুঃখে খাই; আমার অনেক দুঃখ। বড় দুঃখে খাই। একটা হেঁচকি তুলল মানিয়া। আবারও হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

নান্‌কুয়া রাগের সঙ্গে বলল, তোমার দুঃখ জীবনেও ঘুচবে না। আমার কি? যত খুশি খাও। শরম বলে কিছু কি নেই তোমার?

মুঞ্জরী ঘরের অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নান্‌কুর কথা শুনে দেওয়ালে মাথা হেলালো মুঞ্জরী। নিচের দাঁত দিয়ে ওপরের ঠোঁটটাকে জোরে কামড়ে ধরল ও। ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল নিঃশব্দে। নোনা জলে ওর মুখ বুক ভিজে যেতে লাগল। পাছে মুখ ফুটে কোনো শব্দ বেরোয়, তাই ও ঠোঁট কামড়ে রইল। নান্‌কু ছেলেমানুষ। ভাবল মুঞ্জরী। নিরুচ্চারে বলল, তুই অনেক বুঝিস্, কিন্তু সব বুঝিস্ না। তুই এখন বড়লোক। অন্যরকম। তুই আমাদের কথা, এই হতভাগ্য স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কথা কতটুকু বুঝিস্ রে ছোঁড়া?

যে-হাতে মানিয়াকে মেরেছিল, সেই ডান হাতটা হঠাৎ জোরে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল মুঞ্জরী।



হলুক্ পাহাড়টা রীতিমতো উঁচু। সমুদ্র সমতা থেকে কতো উঁচু হবে জানি না, কিন্তু এই পাহাড়ী জনপদ থেকেও হাজার দুয়েক ফিট উঁচু। শীতের জ্যোৎস্না-রাতে চাঁদ ঝুলে থাকে এর মাথার ওপরে ফানুসের মতো। পায়ের কাছে কুয়াশার আঁচল জমে মাঝ রাতে, নীল হয়ে। আর সেই কুয়াশার ওপরে শিশির-ভেজা চাঁদের আলো পড়ে সমস্ত বিশ্ব চরাচর কেমন এক অপার্থিব মোহময় সৌন্দর্যে ভরে ওঠে। তখন মনে হয় পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোনো গ্রহেই বুঝি এসে পড়েছি।

এমন রাতে একা একা ঘুরে বেড়াই বনের পথে। শীতের রাতে অদৃশ্য সাপ ও বিছের ভয় নেই বললেই চলে। আর যারা আছে, তাদের পায়ের শব্দ শুনতে না পেলেও অন্য জানোয়ার ও নিশাচর পাখিদের স্বরে, শুকনো পাতার মচ্মচানিতে, কী ডাল ভাঙার আওয়াজে তাদের আনাগোনার খোঁজ পেয়ে যাই আগে ভাগেই। এতো বছর জঙ্গলে থেকে চোখ ও কানের সদ্ব্যবহার করতে শিখেছি।

প্রথম প্রথম খুব শীত লাগে। কিন্তু একটু হাঁটার পরই গা গরম হয়ে যায়। বেরোবার সময় বেশি করে কালাপাত্তি জর্দা দিয়ে দু-খিলি পান মুখে পুরে নিই। গা-গরম করার ওষুধ।

চলতে চলতে থামি। কোথাও বসি। উঁচু এবং ঋজু বড় শিমুলের সমকোণে ছড়ানো ডালের ওপর লেজ ঝুলিয়ে ময়ূর-ময়ূরী বসে থাকে। তাদের পাখা শিশিরে ভিজে যায়। তার ওপর চাঁদের আলো পড়ে বড় ভূতুড়ে দেখায় তখন। কখনও হাত-তালি দিয়ে উড়িয়ে দিই তাদের মজা দেখার জন্যে। ন্যাত্পেতে ভারী শরীরে লম্বা লেজে ও বড় বড় ডানায় সপ্ সপ্ শব্দ করে জ্যোৎস্না-স্নাত শিশির-ভেজা গা-ছমছম্ উপত্যকার ওপরে উড়ে গিয়ে ওরা অন্য গাছে বসে। ময়ূর নেহাত দায়ে না-ঠেকলে এক-সঙ্গে বেশি ওড়ে না। অতবড় শরীর আর লেজ নিয়ে একবারে বেশিদূর উড়তে বোধ-হয় কষ্ট হয় ওদের।

বছর কয়েক আগে কাড়ুয়া একবার ময়ূরের মাংস খাইয়েছিল। খেতে চমৎকার। মানে এতোই ভালো যে, বলার নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো হোয়াইট মীট। কিন্তু কী করে মানুষে ময়ূর মারে তা ভাবতেও আমার কষ্ট হয়। কী করে মারতে পারে?

টাইগার প্রোজেক্ট্ হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত শিকারীর ওপরই কড়া নজর বন

বিভাগের। ওয়্যালেবস্-এর টাওয়ার বসেছে বেত্লাতে। আর্ম-গার্ড রাইফেল নিয়ে থাকে সেখানে। কোথাও চোরা-শিকারের খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে জীপ নিয়ে চলে যায় তারা। কাড়ুয়া চোরা-শিকারী। কাড়ুয়ার একটা মুঙ্গেরী দো-নলা গাদা বন্দুক আছে। সেটা এখন আর বাড়িতে রাখে না ও। পাহাড়ের মধ্যের এক গুহায় লুকিয়ে রাখে। সন্ধ্যে হয়ে গেলে ছায়ামূর্তির মতো বেরিয়ে পড়ে বন্দুকটাকে ওখান থেকে নিয়ে। শুরু হয় তার রাতের টহল।

গরমের দিনে শিমুল ফুল খেতে আসে কোটরা হরিণ। তখন পাথরের আড়ালে ও'ত পেতে কাড়ুয়া। শিমুল ফুল আমিও খেয়ে দেখেছি। ফুলের গোড়াটা কষা কষা লাগে। গরমের দিনে জঙ্গলের গভীরে কোনো জলের জায়গায় এসেও বসে থাকে কাড়ুয়া। শুয়োর আর হরিণের ওপরই লোভ বেশি ওর। বাঘকে ও কখনও ভয় পায় নি। কিন্তু জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে নিজের দায়িত্বে বেশি বাঘ আগেও মারে নি। এখন সব চোরা-শিকারীরই বাঘের ভয়ের চেয়েও, বন বিভাগের ভয়টাই বেশি। বাঘ মারার কথা ভাবে না এখন কেউই।

গরমের সময় জঙ্গল ফাঁকা হয়ে যায়। তাই কাড়ুয়াকে তখন যেতে হয় পাঁচ-দশ মাইল দূরের গভীরতর ছায়াচ্ছন্ন জঙ্গলে। যেখান থেকে বন্দুকের শব্দ কারোই শোনার কথা নয়। কাড়ুয়া জানে, ধরা পড়লে শুধু বেদম মার খাবে যে তাই-ই নয়, তার জেলও হবে। এই জঙ্গল-পাহাড়, জঙ্গল-পাহাড়ের তাবৎ জানোয়ার এবং চিড়িয়ার রাহান্ সাহান্ এ-অঞ্চলে ওর মতো ভালো কেউই জানে না। টাইগার প্রোজেকট্ এবং স্যাংচুয়ারী হওয়ার আগে বনবিভাগের বড়কর্তাদের এবং শিকার-কোম্পানীদের শিকার খেলিয়ে তার আমদানি ভালোই হতো। ও কিন্তু এইসব জানোয়ার এবং পাখিদের অন্য অনেকের চেয়েই বেশি ভালোবাসে। কারণ ও তাদের জানে। মায়া ওরও কম নেই কারো প্রতি। কিন্তু পেট বড় বেইমানী করে। ও নিরুপায় হয়েই তাই এতো ঝুঁকি নিয়ে এখনও লুকিয়ে শিকার করে। চাষবাসের, কী কাঠ কাটার কাজ সে কখনও শেখে নি। গোলামী করে নি কারুর। ও স্বাধীন।

যখন বন্দুকটা ওর ঘরে থাকতো, এক বর্ষার দিনে, ওর সঙ্গে কথা বলেছিল বন্দুকটা। ঝারিতালাওয়ের পাশের কচুক্ষেতে তার এক শিকারী বন্ধুকে বড়্কা দাঁতাল শুয়োরে ফেড়েছিল। তার নাম ছিল রাম্ধানীয়া। সে-রাতে বৃষ্টি পড়ছিল টিপ্টিপ্ করে সন্ধ্যে থেকে। কাড়ুয়া তার মাটির ঘরে চাটাই পেতে ঘুমিয়ে ছিল। এমন সময় ওর মনে হলো হঠাৎ ফিস্ফিস্ করে রহস্যময় স্বরে কে যেন ওকে ডাকল। ধড়্ফড়্ করে ঘুম ভেঙে উঠেই কাড়ুয়া দেখল, কাছে-পিঠে কেউই নেই। বন্দুকটা যেন ওকে ফিস্ফিস্ করে বলল, শটি খেতোয়ামে বড়্কা শুয়ার আওল্থু।

রাম্ধানীয়ার কথা মনে পড়ে গেল। পেটটা চিরে দিয়েছিল শুয়োরটা। চোখ দুটো ঠিক্রে বেরিয়ে এসেছিল তার। নিদিয়া নদীর পাশের শ্মশানে বসে কাড়ুয়া তার জিগ্রী দোস্তের খুনের বদলা নেবে বলে শপথ করেছিল মড়া ছুঁয়ে।

সেই টিপ্টিপে বৃষ্টিতে গাদা-বন্দুকে তিন-অংগলী বারুদ গেদে সামনে একটা মবচে-ধরা লোহার গুলি ঠেসে বনদেওতার নাম করে বেরিয়ে পড়েছিল কাড়ুয়া। ঝারিতালাও-এর কাছে আসতেই শুয়োরের কচু গাছ উপড়ানো শব্দ পেয়েছিল ও। তারপর প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে কাদার মধ্যে এগিয়ে গিয়ে হুম্মচ্কে দেগে দিয়েছিল তার বন্দুকোয়া। হড়্হড়িয়ে পা পিছলে গুচ্ছের কাদা ও শটি গাছ ছিটিয়ে-মিটিয়ে উল্টে পড়েছিল বড়্কা এক্রা দাঁতাল শুয়োরটা।

বন্ধুর মৃত্যুর বদলা নিয়েছিল কাড়ুয়া।

মাঝে মাঝে এমন রাতে একা টহলে বেরিয়ে পালসা-খেলা কাড়ুয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো আমার। অন্ধকারে ছায়ার মতো, সাবধানী নিশাচর শিকারী জানোয়ারের মতো নিঃশব্দে মাংসল পায়ে ও চলাফেরা করতো। কখনও মুখোমুখি হলে আমাকে হঠাৎ-দেখা ভূতের মতো হাত তুলে বলতো, পররনাম বাবু।

বলতাম, পররনাম।

তারপরই বলতাম, পেলে কিছু?

নেহী! কুছু না মিললই।

বুঝতাম, দূরের জঙ্গলের মধ্যে কোনো জানোয়ার মেরে গাছের ডাল চাপা দিয়ে রেখে এসেছে সে। দিনের বেলায় বিশ্বস্ত একজন অনুচরকে নিয়ে সেখানে ফিরে যাবে কাল।

কাড়ুয়া আমাকে বিশ্বাস করে না। ওদের বিশ্বাস ছোটবেলা থেকে এতলোক ভেঙেছে নির্দয়ভাবে যে, কাউকেই আর বিশ্বাস করে না ওরা।

হুলুক্ পাহাড়ের দারুণ ঘন জঙ্গলের মধ্যে গভীর ছায়াচ্ছন্ন স্যাঁতসেঁতে জায়গা আছে একটা। বড় গাছ-গাছালির পাতার চন্দ্রাতপের ফাঁক-ফোক দিয়ে রোদ এসে পড়ে তাদের ওপরে। জাফ্‌রির মতো প্যাটার্ন হয় ঘন সবুজ জঙ্গলে হলদে-সাদা রোদের সেই আলো-অন্ধকারের কাটাকুটির আড়ালে বাঘ তার সাদা-কালো ডোরা শরীর নিয়ে বাঘিনীর সঙ্গে মিলিত হয় নানা ফুলের সুগন্ধে সুরভিত নিভৃতে। বাঘিনী বাচ্চা দেয় মাঝে মাঝে ঐখানে। তারপর পাশের বিরাট গুহায় বাচ্চা নিয়ে আশ্রয় নেয়। গড়ে তিন-বছরে একবার করে ব্যাঘ্র-শিশুমঙ্গলের জায়গা হয়ে ওঠে গুহাটা। ঐ জায়গাটা বাঘের বড় প্রিয় জায়গা বলে লোকজন ঐ দিকটা এড়িয়ে চলে। পথও বড় দুর্গম এবং দূরের। একদিন রথীদা আর আমি খুব সকালে সঙ্গে হ্যাভারস্যাকে খাবার ও জল নিয়ে ঐ গুহা দেখতে গেছিলাম। ট্রাকে করে যতোটা যাওয়া যায় গিয়ে, বাকিটা হেঁটে গেছিলাম। কে জানে, কতোদিন আগে খারওয়ার বা চেরোরা এই গুহাতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল? কতো হাজার বছর ধরে কতো আদিম উপজাতির আনাগোনা ছিল এইখানে তার খবর কে রাখে? গুহার মধ্যে যেসব কারুকার্য আছে উপজাতিদের আঁকা, তা দেখলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। কী দিয়ে তারা কালো পাথরের ওপর এঁকেছিল; বেশিই জন্তু-জানোয়ারের ও শিকারীর ছবি, তা নিরূপণ করবার মতো জ্ঞান আমার ছিল না। কতো হাজার বছর আগে যে ঐসব ছবি আঁকা হয়েছিল, তাও অনুমান করা অসম্ভব ছিল আমার মতো জ্ঞান আমার ছিল না। কতো হাজার বছর আগে যে ঐসব ছবি আঁকা হয়েছিল, তাও অনুমান করা অসম্ভব ছিল আমার মতো সাধারণ লোকের পক্ষে।

স্থানীয় একটা জনশ্রুতি আছে, মুলেন সাহেবের শ্বশুর জনস্টন্ সাহেব ঘোড়ায় চড়ে কাঁধে ভারী রাইফেল ঝুলিয়ে ঐদিকে যেতেন। সঙ্গে অনেক গাছ-গাছালি নিয়ে। আজকে আমরা যে গাছ-গাছালি দেখি এই ভয়াবহ জঙ্গলের গভীরে তা এক বিদেশী সাদা চামড়ার মানুষের অবদান। ওরা আমাদের রক্ত চুষতে এসেও এই দেশকে যেভাবে ভালোবেসেছিল, যেভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এ-দেশীয় বন-পাহাড় নখদর্পণে রেখেছিল, যে পরিশ্রম ও অসুবিধে স্বীকার করে বিভিন্ন জেলার গেজেটীয়ায় আশ্চর্যভাবে লিখে গেছিল সেই নিষ্ঠা আমরা স্বাধীনতার এতো বছর পরেও দেখাতে পারলাম কই!

এসব দেখে মনে হয়, যে ভালোবাসে, ভালোবাসতে জানে, যার জ্ঞানের স্পৃহা আছে, আবিষ্কারের তাগাদা আছে, সে মালিকানার কথা হয়তো সবসময় ভাবে না। আপন পর

জ্ঞানও করে না। ভালোবাসার আনন্দেই তেমন মানুষ ভালোবাসে।

এই জায়গাটাতে কতোরকম যে গাছ-গাছালি, মনে হয় কোনো হর্টিকালচারাল গার্ডেনে ঢুকে পড়েছি বুঝি। এক এক দিকে, পাথরে, জমিতে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে এক এক রকম প্ল্যান্টে ভরে আছে। তাকালে, চোখ ফেরানো যায় না। 'ডিফিওন্-বিচিয়া', 'জেব্রা প্ল্যান্ট', 'বেবী'জ টিয়ারস্' আরো কত কী প্ল্যান্ট। জেব্রা প্ল্যান্টরা ব্রাজিলের নেটিভ্।

লজ্জাবতীরও কতোরকম বাহার। 'বেবী'জ টিয়ারস্' বা 'মাইন্ড ইওর ওওন বিজনেস' প্ল্যান্টের পাতাগুলো সবুজের ওপর সাদা ডোরা। জেব্রার গায়ের ডোরার মতো। বড় উজ্জ্বল হলুদ ফুল ফুটে ছিল তাতে। এখানে ফার্নও-বা কতোরকম। 'হেয়ারস্ ফুট ফার্ন' 'মেইডেনহেয়ার', আমার ভারি ভালো লাগে। হালকা ছোট ছোট গোল পাতাগুলো এই ফার্নের। ব্রোমেলিয়াড্‌সও ছিল এক রকম। ক্রীপ্‌টান্‌থাস্ জোনাটাস্। সবুজের ওপরে হালকা হলুদ আর সাদার ডোরা। বড় বড় পাতা।

আর অর্কিডের তো শেষ নেই। এতো কম উচ্চতায় এতোরকম অর্কিড দেখে রথীদা তো অবাক! সুন্দর অর্কিডগুলোর কটমটে সব নাম বলেছিলেন : 'ক্রীস্টোফার লীন', 'মিল্‌টোনিয়া ভেক্সিলারিয়া'—অবাক বিস্ময়ে পর পর নাম বলে যাচ্ছিলেন রথীদা।

অর্কিড আমি চিনি না। অন্য প্ল্যান্ট-ট্যান্টও অতো চিনি না। চিনতে চেয়েছি চিরদিন। কিন্তু সুযোগ-সুবিধা হয় নি তেমন। রথীদার কাছ থেকে জেনে নিই। চিনে নিই। পালামৌর বন পাহাড়ে অর্কিড বিশেষ দেখি নি, এক নেতারহাট অঞ্চল ছাড়া। এই জায়গাটা একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

আমরা যখন গুহার কাছে পৌঁছেছিলাম, তখন দুপুর হয়ে গেছে। কতো রকমের যে প্রজাপতি ফুলে পাতায় উড়ে বসছে। মনে হচ্ছিল, কোনো স্বর্গরাজ্যে যেন এসে পড়েছি।

নিস্তব্ধ, গহন অরণ্যের বুকের কোরকে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা দু-জন মুগ্ধ বিস্ময়ে।

গুহায় ঢোকার আগে গুহার সামনের নরম মাটি ভালো করে পরীক্ষা করে নিলাম। রথীদা গাছ, ফুল, তারা চেনেন। জানোয়ার বা পাখি সম্বন্ধেও ওঁর ঔৎসুক্য কম দেখলাম না। বাঘের পায়ের দাগ আছে। কিন্তু পুরনো।

রথীদাকে বললাম, চলুন এগোই। ঝর্নার জল-চোয়ানো নরম মাটিতে পায়ের দাগ না-ফেলে এই গুহাতে ঢোকা বা বেরুনো কোনো জানোয়ারের পক্ষেই সম্ভব নয়। সেইটাই বাঁচোয়া।

গুহাটার মুখটা প্রকান্ড বড়। ভিতরে গিয়ে আস্তে আস্তে সরু হয়ে এসেছে। সাবধানে টর্চ জেবলে এগোচ্ছিলাম আমরা। কথা বললে গম্‌গম্ করে উঠছিল। নিজেদের গলার স্বরে নিজেরাই চমকে যাচ্ছিলাম। দুর্গন্ধি চামচিকে টর্চের আলোয় ও আমাদের শব্দে বিরক্ত হয়ে এদিকে-ওদিকে উড়ে বেড়াচ্ছিল। বাঘের গায়ের গন্ধ এবং হিসির গন্ধেও গুহাটা ভরে ছিল।

কিছুটা এগিয়েই আলো দেখতে পেলাম। কাছে যেতেই দেখি, গুহাটা আরও চওড়া ও উঁচু হয়ে গেছে। এবং আলো আসছে ওপরের স্কাইলাইটের মতো পাথরের ফাঁক-ফোক দিয়ে। সেই ফাঁক-ফোকরগুলো এমন, আলোই আসতে পারে শুধু। বৃষ্টির জল নয়।

আরও এগিয়েই দেওয়ালের সেই আশ্চর্য ছবিগুলো চোখে পড়লো। একজন আদিবাসী শিকারীকে একটি বুনো মোষ তাড়া করেছে। বিরাট-বিরাট বন্য বরাহ—মুখ ব্যাদান করে দাঁত বাগিয়ে ছুটে যাচ্ছে। তীর-ধনুক নিয়ে বাঘ শিকার করছে আদিবাসী শিকারীরা। শিকার-করা বাঘ পড়ে আছে তাদের পায়ের কাছে।

মোহাবিষ্টর মতো অনেকক্ষণ আমরা গুহার মধ্যেই রইলাম।

বাইরে বেরিয়ে, ঐ ছায়াচ্ছন্ন জায়গা ছেড়ে এসে অপেক্ষাকৃত আলোকিত জায়গায় আসন্ গাছের নিচে, পরিষ্কার একটা বড় কালো পাথরের ওপর খাবারদাবার সামনে নিয়ে সতরঞ্জি বিছিয়ে বসা গেল।

রথীদা বলছিলেন, বুঝলি সায়ন, বড় অদ্ভুত ব্যাপার। এই গুহার ছবিগুলোর কথা এ-অঞ্চলের কেউই জানে না। বহু বছর হয়ে গেল কেউ আসেও না এদিকে। জানি না, আগে লোকে এর খোঁজ জানতো কি-না। স্থানীয় লোকে জানতো নিশ্চয়ই!

তারপর আত্মমগ্ন হয়ে বললেন, আমরা কী ভাগ্যবান। ইতিহাসের সঙ্গে দেখা হলো আমাদের। ইতিহাসও নয়। বলা উচিত, প্রাক্‌ইতিহাসের সঙ্গে।

খেতে খেতে রথীদা নানা কথা বলছিলেন। বলছিলেন আজকে সভ্য মানুষ শিকারকে একটা অমানবিক ব্যাপার বলে মনে করে। শিকার ব্যাপারটাই এখন ন্যক্কার-জনক। হয়তো যথার্থভাবেই। কিন্তু আর্টের ইতিহাসের স্ফুরণ বা আর্টের প্রথম বিকাশ কিন্তু এই প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগের শিকারীদের হাতেই। এমন সব গুহায় গুহায় পৃথিবীর কোণায় কোণায় সেইসব শিকারীরা যা এঁকে রেখেছিল, যা খোদাই করে গেছিল; তাই-ই পৃথিবীর আর্টের উৎস। আমাদের পূর্বসূরী, সব শিল্পীর পূর্বসূরীরাই শিকারী ছিলেন। ভাবা যায় না! তাই না.

প্যালেওলিথিক বা প্রাথমিক প্রস্তর যুগ বলতে যা বুঝি আমরা, তাতেও কিন্তু শিকারীরাই ছিল মুখ্য। সেটা ছিল শিকারীদেরই যুগ। কারণ মানুষের আদিমতম পূর্বপুরুষরা শিকার করেই বেঁচে থাকতো। তার অনেক পরে চাষ-বাস করা শিখেছিল মানুষ। তারও অনেক পর আগুন আবিষ্কার করেছিল। ক্রুড আর্টিফ্যাকটস্ থেকে আমাদের পূর্বপুরুষরা আস্তে আস্তে অসীম সৌন্দর্যসম্পন্ন শিল্পে পৌঁছান।

একটা রুটি আর আলুর দম মুখে পুরে রথীদা বললেন, স্পেনে কতো সব বিখ্যাত গুহা আছে। তার মধ্যে আলটা-মিরা একটা। এই হুলুক্ পাহাড়ের গুহাটা দেখে যে কতো কথাই মনে হচ্ছে! আমরা যে হোমো-ফ্যাবার থেকে হোমো-স্যাপিয়েনে উন্নীত হলাম, ভাবতে শিখলাম, ভাবনাকে ভাষান্তরিত করতে, আর্টের মাধ্যমে রূপান্তরিত করতে শিখলাম—এই প্রক্রিয়ার গোড়ায় শিকারীরাই। যদিও একথা বলছি বলে, তুই আমার ওপর হয়তো চটে যাবি। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই চটেছিস ইতিমধ্যেই।

আমি বললাম, চটবো কেন? সত্যেরে লও সহজে.. ।

এটা আমার আর রথীদার মধ্যে একটা স্ট্যান্ডিং জোক্। রথীদা রবীন্দ্রনাথের কণিকার সব কবিতা চমৎকার আবৃত্তি করেন। শুধু আবৃত্তিই যে করেন, তাই-ই নয়। বলেন, "দিস্ ইজ্ মাই ম্যানুয়াল অফ রাইট সিভিলিজেশান।"

"ভালোমন্দ যাহাই ঘটুক সত্যের লও সহজে"—এ-পংক্তিটি রথীদার মুখে সব সময়ই ঘোরে। সুযোগ পেলাম, আমিও রথীদাকে বলে দিলাম।

রথীদা হেসে উঠলেন। বললেন, স্পেনের আলটা-মিরার গুহায় যেসব ছবি আছে জানোয়ারের শিকারের, সে-সব ছবি আমি একটু আগে যা বললাম, তাই-ই প্রমাণ করে। এসব আমার কথা নয়। গুণী-জ্ঞানীদেরই কথা। আমার মতো করে তোকে বলছি। আমাদের দেশেও এরকম অনেক সব গুহা-চিত্র আছে, যেমন মধ্যপ্রদেশের ভীমবৈঠ্কায়।

রথীদাকে বলেছিলাম, পরে একদিন আপনার কাছে ভাল করে এসব শুনব। এখন খাওয়া সারা যাক। ট্রাক থেকে নেমেও আমাদের দুঘণ্টা লেগেছিল গুহায় পৌঁছতে পায়ে হেঁটে। তারপর ট্রাকেও লাগবে আধঘণ্টা ভালুমারে ফিরতে।

ঠিক বলেছিস। বলেই, খাওয়াতে মন দিয়েছিলেন রথীদা।

আসলে, আমি এসব দেখেশুনে এতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে, তোকে বোধহয় খুব জ্ঞান দিয়ে দিলাম একচোট। বোরড্ হয়ে গেলি?

কি যে বলেন? কতো কী শিখলাম! কতো নতুন গাছ চিনলাম, পাতা চিনলাম কতো অর্কিড। আপনার সঙ্গে না-এসে একা এলে এসব দেখতাম ঠিকই। কিন্তু কী দেখলাম তার তাৎপর্যই বুঝতাম না।

হুলুক্ পাহাড়ের গুহামুখে বসে সেদিন আর্টের জন্ম আর তার বিকাশ নিয়ে আর কিছু শোনার সুযোগ হয় নি রথীদার কাছ থেকে। তবে বেশ কয়েক মাস পরে, এক কৃষ্ণপক্ষের গরমের রাতে রথীদার বাংলোর সামনে হাতায় বসে যখন আমরা গল্প করছিলাম আর দুজনে মিলে একসঙ্গে তারা দেখছিলাম, চিনছিলাম; তখন ঐ পাহাড়ের দিকে চোখ পড়ায় উনি নিজের থেকেই আবার ঐ প্রসঙ্গ তুলেছিলেন।

সেদিন বলেছিলেন যে, প্রস্তর যুগের যে দ্বিতীয় অধ্যায়, সেটাকে শিকারী যুগই বলা চলে। সেই অধ্যায়ের সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে আর্টের আবিষ্কার। আবিষ্কারও না বলে, উদ্ভাবন বলাটাই ঠিক। এই আশ্চর্য উদ্ভাবন প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বিবর্তনধারায় এক ল্যান্ডমার্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুস্তেরীয় যুগের (Mousterian) গুহাগুলোতে কিন্তু কোনো শিল্পকর্মের নিদর্শন পাওয়া যায় নি। প্রথম এর সূচনা দেখা গেছিল অরিগ্নিসিয়ান—পেরিগর্ডিয়ান সময় থেকে।

রথীদাকে থামিয়ে দিয়ে বলছিলাম, কী সব যে বলছেন, জার্মান ল্যাটিন এই অশিক্ষিত লোককে। আমি মানেই বুঝতে পারছি না। সোজা করে, আমার মতো সাধারণ বুদ্ধির মানুষের বোঝার মতো করে বলুন।

রথীদা হেসে ফেলে বলেছিলেন, সরী। না বুঝলেও চলে যাবে। সকলকে সব যে বুঝতে হবেই এমন কোনো কথা নেই। মোটা কথাটা বুঝলেই হলো। বুঝলি, অরিগ্নিসিয়ান—পেরিগর্ডিয়ান যুগ থেকেই হঠাৎ যেন শিকারী যুগের লোকেরা রাতারাতি কোন দৈবশক্তিতে ভর করে আর্টিস্ট হয়ে গেল। তার অব্যবহিত আগের যুগেও কিন্তু আর্টের এমন উৎকর্ষতার অংকুর যে কিছুমাত্রও ছিল, তেমন কোনো প্রমাণ নেই। এইটেই বিস্ময়ের।

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ সিগার খেয়ে, যেন নিজের মনেই বলছেন, এমনভাবে বলেছিলেন, প্রস্তরযুগের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম থেকে শেষ পর্যায়ের পুরো সময়েই ভাস্কর্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত। তখন ভাস্কর্য বলতে প্রধানত নারীমূর্তি। পৃথুলা নিতম্বিনীই ছিল সব ভাস্কর্যের নারী

আমাদের দেশের ভাস্কর্যের নারীরাও ত পৃথুলা; নিতম্বে ত বটেই।

ঠিক। রথীদা বললেন।

তারপর আলোচনার গম্ভীর বিষয়কে হালকা করতে বললেন কিনা জানি না, বললেন, জানিস ত, দক্ষিণ আমেরিকার বুশ-কান্ট্রির মেয়েদের ওটা একটা বিশেষত্ব। নিতম্বে অস্বাভাবিক মেদ জমে ওদের। যাকে বলে স্টিপ্টোপীগিয়া।

আপনি যে নিতম্বের ওপর এমন অথারিটি তা ত আগে জানতাম না।

রথীদা হাসলেন। বললেন, শুধু নিতম্ব কেন হে ছোকরা? অনেক কিছুর ওপরেই।

রথীদা আবার শুরু করলেন। কিছু কিছু জায়গার গুহাতে যেসব ভাস্কর্য ছিল, তার বেশির ভাগই অন্তঃসত্ত্বা নারীদের। অথবা ভেবে দ্যাখ, ঘোড়াদের মিলনের। হোয়াট আ কনট্রাসট্। তবে ঐরকম সব বিষয়ের প্রবণতা দেখে পন্ডিতেরা অনুমান করেন যে, নারীর সন্তান-ধারণের ক্ষমতাকে, মানে উর্বরতাকে, তখন বিশেষ তাৎপর্য দেওয়া হতো। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার কন্দর গুহার অন্ধকারতম কোণগুলিতে পন্ডিতেরা

নানারকম জানোয়ার, ম্যামথস্, জংলী ঘোড়া, বল্‌গা হরিণ, বুনো শুয়োর, জংলী ষাঁড় আর মেয়েদের ছবির ভাস্কর্য দেখতে পেয়েছেন। স্পেনের আল্‌টা-মিরা গুহার কথাও ত তোকে আগেই বলেছি।

স্বগতোক্তির মতো বললাম, জংলী জানোয়ারের ছবিই আর্টের গোড়ার আর্ট? আশ্চর্য! কিন্তু জানোয়ারের ছবি কেন আঁকতো প্রথম হোমো-স্যাপিয়েনরা? এর কি কোনো তাৎপর্য ছিল? ছবিতেও কল্পনারই প্রাধান্য থাকা উচিত ছিল। জানোয়ার শিকার ত করতোই তারা। সেই বাস্তব জানোয়ারের ছবি নিয়ে অত বাড়াবাড়ি কি?

মুশকিলে ফেললি আমাকে। অত কী জানি? তবে মনে হয়, মস্তিষ্কের প্রথম বিকাশের সময় হোমো-স্যাপিয়েনদের কল্পনার ক্ষমতা তখনও ফোটে নি তেমন। তাছাড়া পণ্ডিতেরা এও বলেন, যে জন্তু-জানোয়ার আঁকার আসল তাৎপর্য ছিল যাদু। বশীকরণ। ধর্, বুকে তীর বেঁধা একটা বিরাট দাঁতাল শুয়োর এঁকে দিল। অন্ধকার গুহার গায়ে এই ছবি আঁকা মানে জীবন্ত বন্য-বরাহকে যাদু করা। হয়ত ঐ ছবি দেখতে দেখতে আগেকার দিনের সামান্য হাতিয়ার-সম্বল মানুষগুলোর আত্মবিশ্বাসও বাড়তো। ওরা হয়ত ভাবতো, সাংঘাতিক বলশালী ও হিংস্র জন্তুদের সামান্য হাতিয়ার নিয়েও বাস্তবে মারা খুব সহজ হবে, ঐ ছবির ঘোরে!

বাঃ!

যেসব জানোয়ার ওরা খেতো, পাথরের ওপর সেগুলোর ছবি এঁকে, বা তাদেরই হাড়ে তাদের চেহারা খোদাই করে ওরা প্রার্থনা করতো যেন সেই জন্তু-জানোয়ারদের ধরা বা মারা তাদের পক্ষে সহজতর হয়। তখন জীবন বড় সংগ্রামের ছিলো ত!

আমি বললাম আজকের জীবন এখনও সংগ্রামের নয়।

তা নয়, তবে বুঝে দ্যাখ্, ঘোড়া পর্যন্ত বশ মানে নি তখনো। মানুষের প্রধান খাদ্যই ছিল তখন ঐসব জন্তু-জানোয়ার। একমাত্র জীবিকাই ছিল শিকার।

তাহলে কাড়ুয়া বেচারীর আর দোষ কী।

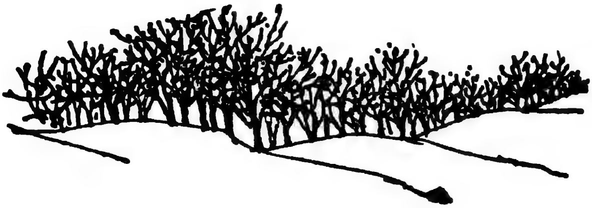
রথীদা হাসলেন। বললেন, কোনোই দোষ নেই। আসলে কাড়ুয়া যখন অনন্ত-ঘুম ঘুমোচ্ছিল তখন হোমো-স্যাপিয়েনরা এক দারুণ ফাস্ট ট্রেনে চড়ে আজকে আমি-তুই যেখানে পৌঁছেছি সেখানে পৌঁছে গেছে। কাড়ুয়া হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে দেখে সেই প্রস্তর যুগেই প্রায় রয়ে গেছে ও। কোন্ স্টেশনে, কোন্ ট্রেনে তার ওঠার কথা ছিল, ও জানে নি। উন্নতির মধ্যে, পাথরের টুকরো বা তীর-ধনুকের বদলে ওর হাতে মুঙ্গেরী গাদা-বন্দুক। আমরা যে স্টেশনে, যে-ট্রেনে পৌঁছেছি কাড়ুয়ার সেখানে আর পৌঁছুনো হয় নি। হলো না।

আমি বললাম, আমরাও কি ঠিক ট্রেনে চেপেছিলাম রথীদা? আমি? আপনি? সংখ্যায় আমরা যারা গরিষ্ঠ, তারা যে-ট্রেনে চড়ে দ্রুতগতিতে কোটি কোটি বছর পেরিয়ে এসে আধুনিক নগরাভিত্তিক সভ্যতানামক গোলমেলে স্টেশনে পৌঁছেছি এবং পৌঁছতে পেরে গর্বে বেঁকে রয়েছি বর্তমান মুহূর্তে, সেই গন্তব্যটাই কি হোমো-স্যাপিয়েন্‌দের সঠিক গন্তব্য ছিল? আমরা সকলেই কি নিশ্চিত সে বিষয়ে?

রথীদা নড়ে চড়ে বসলেন।

সিগার থেকে প্রচুর ধুঁয়ো ছাড়লেন।

অনেকক্ষণ তারা-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে গভীর গলায় বললেন, বড় দামী কথা বলেছিস রে একটা। কথাটা ভাববার মতো। হয়ত অনেকেই পৃথিবীর নানা কোণে বসে এই মুহূর্তে এই কথাটাই ভাবছে। কে জানে? হয়ত কাড়ুয়াই আমাদের সকলের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান্। আমরাই সকলে হয়ত ভুল ট্রেন চড়েছিলাম।



নান্‌কুয়া ওর সমবয়সী সব ছেলের থেকে একেবারেই আলাদা। যখন অন্যান্যরা কয়লা-খাদে কাজ করে প্রচুর পয়সা হাতে পেয়ে জামা কাপড়, ট্রানজিস্টর, ঘড়ি, সানগ্লাস ইত্যাদি কিনে এবং মদ খেয়ে ওদের যুগ-যুগান্ত ধরে সঞ্চিত অতৃপ্ত সাধ-আহ্লাদের দিকে দ্রুতবেগে ধেয়ে যায় তখন ও একা বসে অনেক কিছু ভাবে। নিজের গ্রামে, অন্যদের গ্রামে, ঘুরে বেড়ায়। কী করে ওদের ভালো করা যায়, ওদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর, ওদের সমস্ত শ্রেণীর ; সেইসব নিয়ে মাথা ঘামায়।

নান্‌কুয়ার বাবা টিগা অল্প বয়সে বসন্তের প্রকোপে অন্ধ হয়ে প্রায় পনেরো বছর পৃথিবীর আলো থেকে বঞ্চিত থেকে বিনা চিকিৎসায়, বিনা শুশ্রূষায় মারা যায়। অন্ধ স্বামী ও শিশুপুত্রকে ওর ধনহীন, জমিহীন, সহায়-সম্বলহীন মা কোনোক্রমে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। স্বামী, সুস্থ ও সক্ষম থাকাকালীনও বেঁচে থাকা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্যই ছিল।

নান্‌কুয়া মায়ের রঙ পায় নি, কিন্তু মুখশ্রী পেয়েছে। কাটা-কাটা, রাগী। মা ছিল এ তল্লাটের নামকরা সুন্দরী। সোনালী মিষ্টি গুড়ে যেমন মাছি পড়ে, তেমন করে কামার্ত পুরুষ পড়ত মায়ের ওপরে। ভন্‌ ভন্‌ করত তারা। জঙ্গলের সুঁড়িপথে, ঝর্নার পাথরে, ফরেস্ট বাংলোর ঘরে মাকে নিয়ে ওরা চিরে চিরে মা-র সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ করত। আধুলটা, টাকাটা গুঁজে দিত হাতে। মা ফেরার সময় শেঠের দোকান থেকে শুখা-মহুয়া বা বাজরার ছাতু কিনে আনত।

নান্‌কুয়ার একটি ভাই অথবা বোন হওয়ার সম্ভবনা দেখা দেয় একসময়। তখন বুঝত না ও, এখন বোঝে যে, সেই অনাগত সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার নিজের অন্ধ বাবার পিতৃত্বে হত না। জারজ সন্তানের জন্ম দিতো তার মা, রসিয়া।

কিন্তু গোদা শেঠের দাদা, জোদা শেঠ তখন বেঁচে। মায়ের ঐরকম শারীরিক অবস্থাতেই সে মত্ত অবস্থায় তার লোকজনকে দিয়ে মাকে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়ে এক কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে ঝুমুরিবাসার নির্জন বাংলোয় রসিয়ার ওপর অত্যাচার করে। একা নয়, ইয়ার-দোস্তে মিলে। ওরা আদরই করতে চেয়েছিল। কিন্তু আদরের রকম ও আদরের বাড়াবাড়ি হলেই অত্যাচার ঘটে। এক্ষেত্রেও তাই-ই ঘটেছিল।

মা যখন বাড়িতে ফিরে আসে, তখনও আকাশে কোজাগরী পূর্ণিমার চাঁদ ছিল। তিনদিন অবিরল রক্তস্রাবের পর বিনা-চিকিৎসায় নান্‌কুয়ার মাথায় হাত রেখে তার মা রসিয়া মারা যায়। নান্‌কুয়ার জীবনের মহাকাশ থেকেও তার সবচেয়ে পরিচিত তারা খসে যায় নিঃশব্দে। সেই হারিয়ে-যাওয়া প্রজ্বলিত তারা এক বিশেষ ভূমিকা রেখে যায় নান্‌কুয়ার জন্যে, নান্‌কুয়ার জীবনে। সেদিন থেকে কোজাগরী পূর্ণিমার ওপরই একটা আক্রোশ জন্মে গেছে নান্‌কুয়ার।

নান্‌কুয়া জানে এই দারিদ্র্য ও অসহায়তার ইতিহাস ওর একার নয়। ওদের সকলের।

নান্কুয়া যতটুকু পড়াশুনা করেছে, তা পাগলা সাহেবেরই দয়ায়। স্কুলে পড়েছিল, ক্লাশ সেভেন অবধি। কিন্তু স্কুল যা শেখায় নি তাকে, খুব কম স্কুল-ই যা শেখায় তা শিখেছে সে পাগলা সাহেবের কাছে। মানুষ হওয়ার শিক্ষা পেয়েছে নান্কুয়া। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করার শিক্ষা।

যে সময়ে এবং যে-দেশে অধিকাংশ শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক এবং রাজনীতিকরা কেউ-ই নিজেদের কোনো দায়িত্বই পালন করেন না যে শুধু তাই-ই নয়, সে দায়িত্বকে আপন আপন স্বার্থ-কোলাহলের আবর্তের মধ্যে থেকে স্বচ্ছন্দে এবং উচ্চ-কণ্ঠে অস্বীকার পর্যন্ত করেন, পরম নির্লজ্জতায়, সেই সময়ে এবং সেই দেশে জন্মেও নিজের অতিশয় সামান্য ক্ষমতার সমস্ত পরিপূর্ণতায় নিজের দায়িত্বটুকুকে ওর অজানিতেই স্বীকার করে ও। ওর শিরা-উপশিরার রক্তের এলোমেলো দৌড় ওকে সব-সময় বলে যে, এই দেশে একটা বড় রকমের ওলোট-পালোট ঘটবার সময় এসেছে। হয়ত ঘটাবারও।

এক ছুটির দিনে হুলুক্ পাহাড়ে কিছুটা উঠে যখন ও একা বসে রোদ পোয়াচ্ছে, তখন হঠাৎ যেন তার ঘাড়ে ও পিঠে রোদের নরম আঙুলের পরশের সঙ্গে ওদের লক্ষ লক্ষ স্বজাতির, ওর পিতা-প্রপিতামহের, ওর দুঃখিনী বহুচারিণী মায়ের আশীর্বাদের পরশ লাগে ওর পিঠে। পাহাড়ের ওপর থেকে আদিগন্ত জঙ্গল, গ্রাম, ক্ষেত-খামার, নদী চোখে পড়ে। গোরু ছাগল চরিয়ে বেড়ায় গাঁয়ের ছোট ছেলে-মেয়েরা। মাটির ঘরের সামনে ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে বসে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে, অশক্ত, শীতবস্ত্রহীন বৃদ্ধ, রামধানীয়া চাচা সূর্য থেকে প্রতিকণা অণুপরমাণু উষ্ণতা, তা শক্ত হয়ে-যাওয়া খট্খটে হাড়ে শুষে নিতে চায় রাতের হিমের সঙ্গে লড়বার জন্যে। মকাই, অড়হর আর বাজরার ক্ষেতে রাখওয়ার ছেলেরা মন-উদাস-করা বাঁশি বাজায় মাচায় বসে। ঝর্না থেকে কলসী করে জল আনে লাল, হলুদ, নীল শাড়ি-পরা গাঁয়ের মেয়েরা। পাহাড়ের নিচে ঘন জঙ্গল থেকে ময়ূর ডেকে ওঠে কেঁয়া কেঁয়া কেঁয়া রবে। নান্কুয়ার পাশের কেলাউন্দার ঝোপ থেকে ভরর্ ভরর্ করে বনমুরগীর ঝাঁক উড়ে যায়, হঠাৎ। তাদের সোনালী, হলুদ-কালচে ডানায় শীতের রোদ রামধনু হয়ে চম্কিয়ে যায়। নিচের পাহাড়ী নদীর শুকনো সাদা পেলব বালির বুক ধরে ভাব-গম্ভীর হেঁটে যায় একলা পাঁশুটে-রঙা শিঙাল গম্বর। দূরে গ্রামের কুয়োয় কেউ জল তোলে—ক্ষেতে জল দেয়। অবিরাম লাটাখাম্বার ওঠা-নামার ঘুমপাড়ানী ছন্দোবদ্ধ ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর শব্দ আসে কানে। খড় বোঝাই বয়েল গাড়ি গড়িয়ে যায় পথ বেয়ে, ধুলো উড়িয়ে, ক্যাঁচ-কোঁচ্ শব্দ করে। পথের ধুলোর গন্ধ, বয়েলের গায়ের মিষ্টি গন্ধ খড়ের মিষ্টি গন্ধে মিলেমিশে সমস্ত বেলা-শেষের দিনকে গন্ধবিধুর করে তোলে। এইসব টুকরো-টুকরো ছবি দেখতে দেখতে শব্দকণা শুনতে শুনতে নান্কুয়ার চোখ ও কানের মধ্যে দিয়ে একটা ঘুমভাঙা দারুণ দেশের স্বয়ম্ভু ছবি সমস্ত শব্দ, গন্ধ অনুভূতিতে মঞ্জরীত হয়ে ওর মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে যায়। ওর নাকের পাটা ফুলে ওঠে, নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়। এই হতভাগা লোক-গুলোর জন্যে কিছু একটা করার জন্যে ওর সমস্ত মন, ওর হাত দুটো, ওর বোধ আকুলি-বিকুলি করে। কিন্তু কী করবে, কেমন করে করবে, তা ও বুঝতে পারে না।

নান্কুয়া তার গ্রামের, তার দেশের আদিগন্ত, সূর্যস্নেহে সুধন্য বড় সুন্দর সেই রূপের দিকে অবাক স্তুতির চোখে চেয়ে ভালোবাসায় বুঁদ হয়ে থাকে।

নান্কুয়া যেখানে বসেছিল, তার কিছু দূরেই একটি ঝর্না ছিল। এটি মীরচাইয়া প্রপাত থেকে নেমে এসেছে। ঝির্ ঝির্ করে জল চলছে পাথরের আড়ালে। কতরকম ফার্ণ, শ্যাওলা, লতাপাতা জন্মেছে ঝর্নার পাশে পাশে, পাথরের আনাচে কানাচে। তিনটি

শিরীষ গাছ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে ঝর্নার প্রবেশদ্বারে। জায়গাটার নাম নেই আলাদা। লোকে বলে মীরচাইয়াকা বোঁট। মুখে মুখে মীরচাবোঁটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ সেখান থেকে ঠং করে একটা আওয়াজ হল। কার পায়ের মল বাজল যেন পাথরে।

নান্‌কুয়ার অন্যমনস্কতা কেটে গেল। হঠাৎ একটা দু-লাইনের গান মনে এলো ওর :

'বিছিয়া ঠোক্‌লে টোঙ্গড়ী কা
শুন্‌কে জিয়া লাগ্‌ গিয়া।

পাহাড়ের ওপরে কোথায় যেন মলের শব্দ শুনলাম। শুনেই মন ছুটে গেল সেখানে।

নান্‌কুয়া উঠে পড়ে দেখতে গেল কে এসেছে ওখানে। তার গাঁয়ের সব মেয়েকেই সে চেনে। গ্রাম ছেড়ে এত দূরে ঘন জঙ্গলের মধ্যের মীরচা-বোঁটিতে কেউই জল নিতে আসে না। কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া আসে না এখানে কেউই। কি কারণে? কে এলো?

আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে লাগল নান্‌কুয়া। ছোটবেলা থেকে নিঃশব্দ পায়ে চলা-ফেরা করা অভ্যেস হয়ে গেছে ওদের। কিন্তু শীতকালে শুকনো পাতা মচ্‌মচ্‌ করে পায়ে পায়ে। পায়ের তলার চামড়া, জুতোর চামড়ার মতোই শক্ত হয়ে থাকে বন-জঙ্গলের মেয়ে-পুরুষের। খালি পায়ে পাথুরে জমিতে, পাহাড়ে পথ চলে চলে গোড়ালি অবধি সাদা হয়ে যায়। কী পুরুষ, কী মেয়ের। কিন্তু নানকুর পায়ে হাট থেকে কেনা প্লাস্টিকের জুতো। তবু সাবধানে যথাসম্ভব কম শব্দ করে আড়ালে আড়ালে এগোতে থাকল ও। যেই-ই এসে থাকুক, তাকে চম্‌কে দেবে ও। মজা হবে।

যখন একটা খয়ের গাছের গোড়ায় পৌঁছে ও ঝর্নার দিকে তাকালো, তখন উত্তেজনায় মনে হল ওর হৃৎপিন্ডটা ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে।

বিস্ফারিত চোখে দেখল নান্‌কুয়া, টুসিয়া একটা পাথরে বসে জলে পা ডুবিয়ে গায়ে সাবান মাখছে। শিরীষ গাছের পাতা পিছলে রোদ এসে পড়ছে তার কুঁচফল-লাল বুকে। পাশ ফিরে বসে আছে টুসিয়া। খোলা চুল নেমে এসেছে কোমর অবধি। চুলে আধো-ঢাকা তার নিতম্বকে একটা অতিকায় বাদামী লাল গোঁড় লেবুর মতো মনে হচ্ছে। একটা পা পাথরের ওপরে রেখে অন্য পা ডুবিয়ে দিয়েছে বহমান জলে।

নান্‌কুয়া স্থাণুর মতো তাকিয়ে রইল সেখানে। না পারল পালাতে, না পারল এগোতে।

একটা ফিচ্‌ফিচিয়া পাখি খয়ের গাছে বসেছিল। পাখিটা হঠাৎ নানকুয়াকে দেখতে পেয়ে ফিচ্‌ফিচ্‌ করে উত্তেজিত গলায় ডেকে খয়েরের সরু ডাল দুলিয়ে টুসিয়ার দিকেই উড়ে গেল।

টুসিয়াকে জামা-কাপড় পরা অবস্থায় ছোটবেলা থেকেই দেখেছে নান্‌কুয়া। অনাবৃত, অন্যমনস্ক, তার ভালবাসার জনকে এই ঝর্নাতলায় নরম রোদের মধ্যে দেখে টুসিয়ার নগ্ন নিভৃত বড়-হয়ে-ওঠা সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল নান্‌কুয়া।

বিধাতা মেয়েদের এক আশ্চর্য ষষ্ঠবোধ দিয়ে পাঠান পৃথিবীতে। তাদের চোখ যা দেখতে পায় না, তাদের বোধ তা দেখতে পায়। ভাল শিকারীদের ষষ্ঠেন্দ্রিয়র মতো।

হঠাৎ টুসিয়া মুখ ঘুরিয়ে খয়ের গাছের দিকে তাকাল। ফিচ্‌ফিচিয়া পাখিটার হঠাৎ ভয়-পাওয়া ডাক তার সহজাত বুদ্ধিকে বলেছিল পাখিটা কোনো জানোয়ার বা মানুষ দেখে ভয় পেয়েছে।

নান্‌কুয়াকে দেখেই লজ্জায়, প্রায় কেঁদে ফেলল টুসিয়া। অজান্তে মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, অসভ্য! কী অসভ্য!

নান্‌কুয়া কী করবে ভেবে না পেয়ে দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। টুসিয়াও তখন দু-হাতে বুক ঢেকে নান্‌কুয়ার দিকে পিছন ফিরে একলাফে পাথরের আড়ালে চলে গেছিল।

মুখ-ঢাকা অবস্থাতেই নান্‌কুয়া বলল, আমি মলের শব্দ শুনে দেখতে এসেছিলাম, এসে দেখি ..।

টুসিয়া রেগে বলল, তুমি যাবে কি-না বলো এখান থেকে, নইলে পঞ্চায়েতে বলব।

নান্‌কুয়া বলল। বললে তো ভালোই হয়। আমার সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে শাস্তি হিসেবে। আমি তো তোকে বিয়ে করতেই চাই।

করাচ্ছি বিয়ে? রাগের গলায় বলল টুসিয়া।

আবারও বলল, অসভ্য কোথাকার!

নান্‌কুয়া যাবার সময় বলে গেল, টুঙরিতে বসে আছি। চান করে আয়। এক সঙ্গে নিচে নামব দুজনে।

টুসিয়া রেগে বলল, তুমি ভাগো। আমার তোমার সঙ্গে যেতে বয়েই গেছে।

টুঙরির ওপরে কিছুক্ষণ বসে রইল নান্‌কুয়া। নান্‌কুয়া জানত যে টুসিয়াকে এই পথেই নামতে হবে নিচে। এবং এও জানত যে, টুসিয়া খুশি হয়েছে ওকে দেখে। যদিও ঐ অবস্থায় দেখা দিতে চায় নি সে। মেয়েরা যে প্রিয়জনের অনেক অনুরোধে, অনেকে সোহাগে, নিজেকে চার দেওয়ালের নিশ্চিন্ততায় অনাবৃত করে, তাই বিনা আয়াসে কেউ তাদের উন্মুক্ত আকাশের নিচে অনাবৃত বে-আব্রু দেখতে পাক, তা তারা কখনও চায় না। স্বামীর ব্যবহারে ব্যবহারে পুরনো-হয়ে-যাওয়া স্ত্রী পর্যন্ত চায় না। আর টুসিয়া তো অনাঘ্রাতা।

এটা মেয়েদের সংস্কার। জন্মগত, যুগ-যুগ ধরে সঞ্চিত সংস্কার। এমন বিনা নোটিশে নিরাবয়ব হয়ে ধরা দিতে ওদের বড় অভিমানে লাগে। বোধহয় মনে করে, সস্তা হয়ে গেল।

এতসব নান্‌কুয়া জানতো না। ও শুধু ভালোলাগায় বুঁদ হয়ে বসে ছিল। তখনও ওর দু-কানের লতি গরম হয়ে ছিল। ওর শরীরের মধ্যে যে এমন সব রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটতে পারে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সব এমন হঠাৎ জীবন্ত ও মহাপরাক্রান্ত হয়ে উঠতে পারে, ওর পাথরের মতো শক্ত চ্যাটালো বুকও যে এমন ধুক্‌ধুক্ করতে পারে এক তীব্র বেদনামিশ্রিত কিন্তু গর্হিত আনন্দের বাঙ্‌ময়বোধে, তা জঙ্গলের পথে বহুবার বাঘের মুখোমুখি হয়েও সে কখনও জানে নি। এ ভয় সে-ভয় নয়। এ একটা অন্যরকম, নতুন রকম, গা শিরশিরানো ভয়।

কুড়ি বছরের নান্‌কুয়া এই প্রথম প্রকৃতির কোলের মধ্যে অন্য পরমা প্রকৃতির, নারী প্রকৃতির, অনাবৃত রূপ দেখে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠল। আজ দুপুরে ওর জীবনে একটা বিশেষ ধাপ অজানিতেই অতিক্রম করল ও। গোঁফ-দাড়ি গজালেই পুরুষ, পুরুষ হয় না। আজ এই মুহূর্তে বড় তীব্র, এক মিশ্র বোধের মধ্যে সে কথা জানল।

শীতের বেলা ঝুপ্ করে পড়ে যায়। সূর্যটা হুলুক্ পাহাড়ের আড়ালে গেলেই সমস্ত টাঁড়ে, ক্ষেতে, জঙ্গলে ছায়ার আঁচল লুটোয়। ঝাঁটি জঙ্গল থেকে তিতির আর বটের ডাকতে থাকে। চিহাঁ চিহাঁ চিহাঁ করে। টিয়ার ঝাঁক দ্রুত পাখায় ছোট ছোট সবুজ তীরের মতো উড়ে যায় রাতের আশ্রয়ে। গ্রাম থেকে গোরু-বাছুর চরাতে যাওয়া

বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের উচ্চৈঃস্বরে ডাকে মায়েরা। গোরুর গলার গম্ভীর হাম্বা—আ-আ রব সন্ধ্যাকে স্বাগত জানায়। গোরু-ছাগলের পায়ে পায়ে ধুলো ওড়ে। মাটির ঘরগুলোর সমষ্টি থেকে উনুন ধরানোর ধুঁয়ো ওঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে। সন্ধ্যার আগে আগে কুয়াশা, ধুলো, ধুঁয়ো ও নানা মিশ্র গন্ধ মিলে মিশে আসন্ন রাতের কালো বালাপোশে কোনো অনামা আতরের খুশবু মাখায়।

অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল নানকুয়া। হুলুক্ পাহাড়ের পিঠের ছায়া পড়েছে নিচের ঘন জঙ্গলের গায়ে।

এমন সময় পিছ থেকে রিনরিনে গলায় টুসিয়া বলল, কত দিন, এই সব গুণ হয়েছে তোমার! ছিঃ ছিঃ। এই নাকি পাগলা সাহেবের শিক্ষা!

নানকুয়ার রক্ত মাথায় চড়ে গেল। খুব একটা খারাপ গাল দিয়ে বলল, মুখ সামলে কথা বল্।

কী বললে? টুসিয়া আহত গলায় বলল।

এইই দোষ নানকুয়ার। বড় মাথা গরম ওর। একটুতেই বড় রেগে যায়। এ জন্যেই ওর কিছু হবে না। ও জানে।

পরক্ষণেই ও হাত জোড় করে বলল, গাল দিলাম বলে রাগ করিস না। তুই তো জানিস, তোকে আমি কত ভালোবাসি! তোকে এ কথা বলতে চাই নি। তুই পাগলা সাহেবকে এর মধ্যে আনলি কেন?

টুসিয়া বলল, আমার কিছু বলার নেই।

সেদিন মুঞ্জরী মাসীর বাড়িতে গেছিলাম। মাসী বুলকিকে পাঠিয়েও ছিল তোকে ডেকে আনতে। তুই বাড়ি ছিলি না?

তুমি কি নিজে আসতে পারতে না? বুলকি কি তোমার দূত? আমি বাড়ি ছিলাম। ইচ্ছে করে আসি নি।

ইচ্ছে করে? কেন? নানকুয়া আবার ফুঁসে উঠল।

টুসিয়া বলল; এমনিই। আমার খুশি।

বলেই বলল, পথ ছাড়ো। কাল রাতে বাঘ খুব ডাকাডাকি করেছে পাহাড়ে। অন্ধকার হয়ে যাবে। আমার তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছতে হবে।

নানকুয়া ওর পাশে পাশে পাকদণ্ডী দিয়ে পাহাড়ে নামতে লাগল।

ছায়াচ্ছন্ন সোঁদা-গন্ধ পথের পাশে লজ্জাবতীর মতো একরকম ঝোপে লাল লাল ফুল ফুটেছে। নানকুয়া জানে না গাছটার নাম। কবে কোন সাহেব বীজ বা চারা এনে লাগিয়েছিল শিকার করতে এসে, কে জানে? গাছটা লজ্জাবতীর মতো। একরকমের লজ্জাবতীই। গায়ে হাত ছোঁয়ালেই পাতা বুঁজে যায়, লাজুকে মেয়ের চোখের মতো। সুন্দর লাল ময়ূর-শিখার মতো ফুল ফোটে গাছটায়। নানকুয়া দুটো ফুল ছিঁড়ে টুসিয়ার কাছে এগিয়ে গেল। বলল, তোকে চান করে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। ফুল দুটো খোঁপায় গুঁজে নে।

থাক্। বলল টুসিয়া।

কিন্তু ফুল দুটো হাতে নিলো।

নানকুয়া বলল, আমাকে দে, আমিই গুঁজে দিচ্ছি।

বলে, নিজেই টুসিয়াকে দাঁড় করিয়ে গুঁজে দিলো ফুল দুটি। গুঁজে দিয়েই জোর করে টুসিয়াকে বুকের মধ্যে নিয়ে চুমু খেল।

ঐ দোষ ওর। বড় দোষ! কোনো কিছুই ভদ্রভাবে ধীরে সুস্থে করতে পারে না। জংলী ত!

এর আগেও দুবার চুমু খেয়েছিল নান্কুয়া টুসিয়াকে। একদিন জেঠ শিকারের দিনে। অন্য দিন দশেরাতে। আজ টুসিয়াকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে একেবারে অন্যরকম অনুভূতি হল নান্কুয়ার। এতদিন ওর পাথরের মতো শক্ত বুকের মধ্যে টুসিয়ার অদেখা বুকের ছোঁয়াই পেয়েছিল সে শুধু। আজ টুসিয়ার শাড়ি-জামার আড়ালে তা যেন দেখতে পেলো। ওর চোখে ভেসে উঠল জল-ভেজা রোদ-পিছলানো অনাবৃত টুসিয়ার নিভৃত শরীরটা।

টুসিয়া ভালোলাগায় শব্দ করে উঠল যদিও, তবুও দু-হাত দিয়ে ওকে ঠেলে দিলো। বলল, চল্, হঠ্।

তারপর নিচে নামাতে নামতে টুসিয়া বলল, দাদা আসছে কালকে।

টুসিয়া দাদা হীরু, শহরে কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছে। তারপর তফসিলী উপজাতিদের জন্যে সংরক্ষিত আসনে সরকারী অফিসার হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ অফিসার। পাটনাতে পোস্টেড এখন। দাদার জন্যে টুসিয়া এবং তার মা-বাবার অত্যন্ত গর্ব। হীরু পুরো গ্রামেরই গর্ব। ক'টা গ্রামের ও'রাও কাহার, দোসাদ, ভোগ্‌তা, মুন্ডাদের ছেলে এত ভারি অফ্‌সর হয়?

দাদা যদি টুসিয়াদের সকলকে নিয়ে পাটনায় চলে যেতো, তাহলে খুব ভালো হতো। তার দাদা অনেক বড় হয়েছে, কিন্তু ওরা যেমন তেমনই রয়ে গেছে—তাই এই টানাপোড়েনে পড়ে ওদের অবস্থাটা অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। অনেকদিন হল ভাইয়ার চিঠির রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছিল টুসিয়ার ভাইয়া বদলে গেছে অনেক। আগের মতো আর নেই। আজকাল টাকা-ফাকাও বিশেষ পাঠায় না। মাঝে মাঝে একশো টাকা করে পাঠায়, তাও কয়েক মাস বাদে বাদে। অবশ্য ওদের কাছে তাই-ই অনেক টাকা। তবু পরিবারের একমাত্র ছেলে ও কৃতী ছেলে হিসেবে ভাইয়ার ওর জন্যে এবং বাবা-মায়ের জন্যে অনেক কিছুই করার ছিল।

টুসিয়ার দাদা হীরু যে এইবার তার এক বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে, সে খবরের বিশেষ তাৎপর্য ছিল টুসিয়ার মা-বাবার কাছে। টুসিয়ার কাছে তো নিশ্চয়ই। বাবাকে দাদা কী লিখেছিল জানে না টুসিয়া। কিন্তু মনে মনে স্বপ্ন দেখা শুরু করে দিয়েছিল। তার দাদার বন্ধু কেমন দেখতে হবে কে জানে? দেখতে যাই-ই হোক, পুরুষ মানুষের আবার রূপ! বিয়ের পর কোন ভারী শহরে থাকবে, কী ভাবে সেখানের আদব-কায়দা, রীতি-নীতিতে রপ্ত করবে নিজেকে, তা নিয়ে চিন্তাও করেছিল। তার ভাবী স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে যাতে সে ক্যাবলা গ্রাম্য মেয়ে বলে ইম্‌তেহানে অকৃতকার্য না হয়, তার জন্যে একা একা জঙ্গলে টাঁড়ে এ ক'দিন অনেক মহড়াও দিয়েছে সে।

মা এই ক'দিন টুসিয়ার চুল বড় যত্নে বেঁধে দিচ্ছে। কোনো কাজই প্রায় করতে দিচ্ছে না। সব কাজই নিজে হাতে করছে। মুখে গোঁড়লেবু কেটে ঘষে লাগাচ্ছে। করৌঞ্জের তেল মাখাচ্ছে মুখে, শোবার সময়। এত যত্ন তার শরীর যে কখনও পেতে পারে, তা টুসিয়া স্বপ্নেও ভাবে নি। তার শরীরকে সুন্দর করা হচ্ছে ভবিষ্যতে একজনের ভোগের জন্যে। সে টুসিয়ার জীবনের পরম পুরুষ। তার পতি। দেওতা!

শিগ্‌গীরিই দাদা আসবে, আর ঠিক আজই এমন ভাবে, এমন পরিবেশে নান্কুয়ার সঙ্গে তার দেখা হল বলে মনে মনে বড় বিরক্ত হয়েছিল টুসিয়া। ভীষণ আতঙ্কিতও ও। এতদিন ও ব্যাপারটাকে সকলের কাছেই গোপন করতে চেয়েছিল। নান্কুয়াকে গোপন করে যদি তার বিয়ে পাকা হয়ে যেত তাহলে নান্কুয়া হয়ত তাকে খুনই করে ফেলত। কে জানে? যা বদ্‌রাগী মানুষ! যা হয়েছে, ভালোই হয়েছে। দেওতা যা করেন

মঙ্গলের জন্যে। নান্‌কুয়াকে যা বলার বলে তার অপরাধী মনের ভার লাঘব করতে পারলে সে হালকাই বোধ করবে এখন।

নান্‌কুয়া চুপ করে ছিল। চুপচাপ হাঁটছিল।

হঠাৎ টুসিয়া নান্‌কুয়ার হাতটা আদরে জড়িয়ে ধরল। বলল, অ্যাই তুমি কোনো বাগড়া দেবে না তো? আমার যদি ভালো বিয়ে হয়, সুখে থাকি আমি, তুমি...।

নান্‌কুয়াকে যেন সাপে কামড়েছে এমন ভাবে ও ছিটকে সরে গেল টুসিয়ার কাছ থেকে।

তাবপব ঘৃণায় ভুরু কুঁচকে বলল, আমাকে তুই কী মনে করিস? আমি কি তোর মতো কামিনা? আমার নাম নান্‌কু। নান্‌কু ওঁরাও!

তারপর পথের পাশের একটা আমলকী গাছের ডাল থেকে আচমকা এক মুঠো পাতা ছিঁড়ে ফেলে নিজের মুঠির মধ্যে পিষতে-পিষতে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তুই আমার যোগ্য নোস, আমার যোগ্য নোস্; একেবারেই নোস্।

বাকি পথ কেউই কোনো কথা বলল না। জঙ্গলের শেষে বড় মহুয়া গাছটার কাছে এসে পথটা যেখানে দু-দিকে ভাগ হয়ে গেছে, সেখানে পৌঁছে দুজনে দু-দিকে চলে গেল। নিঃশব্দে।

নান্‌কু নিঃশব্দে বলল, তুই সত্যিই আমার যোগ্য নোস্ টুসি। তুই আমাকে চিনতে পারিস নি। হয়ত কখনই চিনতে পারবি না! ভালোই হয়েছে। যা হচ্ছে তা ভালোই।



চিপাদোহরে কাজ ছিল। আমাদের কোম্পানীর মালিক রোশনলালবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে সেখানে। মুনাব্বর কাল বলে গেছে।

ডালমিয়া নগর, পাটনা, রাঁচী বা কোলকাতায় না গেলে উনি রোজই বিকেলবেলায় ডালটনগঞ্জ থেকে চিপাদোহরে আসেন। প্রথমেই ডিপোতে ঘুরে আসেন একবার আলো থাকতে থাকতে। কত বাঁশ কোন্ জঙ্গল থেকে লাদাই হয়ে এসে সেখানে ঢোলাই হল, রেক্ কেমন পাওয়া যাচ্ছে? কত ওয়াগন মাল কোথায় গেল? সব খোঁজখবর নিয়ে তারপর ডেরায় ফেরেন।

এখন শীত, তাই সূর্য ডোবার আগে থেকেই ডেরার সামনে আগুন জ্বালানো হয়। ভয়সা ঘিয়ে ভাজা দুটি পানতুয়া এবং অনেকখানি চিনি দিয়ে এক কাপ দুধ খান উনি। চিপাদোহরের রোজকার বাঁধা বৈকালিক রুটিন রোশনবাবুর, এখানের সকলেই জানে।

যখন আসেন, তখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কিছু লোক, রোহাটাস্ ইন্ডাস্ট্রিস, ইনডিয়ান পেপার পাল্প্-এর কোনো লোক এবং স্থানীয় এবং ডালটনগঞ্জী বাঁশ-কাঠের ঠিকাদারদের কেউ কেউ আসেন। আগুন মধ্যে রেখে গোল হয়ে বসেন সকলে বেতের চেয়ারে। শীত বেশী থাকলে অফিস ঘরের খাপ্রার চালের নিচে মাথা বাঁচিয়ে আগুনের দিকে পা করে বসেন। টুক্টাক গল্প হয়, কাজ শেষ হলে।

জংলী জায়গা, ছোটখাট খবর; কূপমণ্ডূকতার জগৎ এখানে।

শীতের দিনে মালিক রাত আটটা নাগাদ আর গরমের দিনে ন'টা নাগাদ উঠে চলে যান গাড়ি চালিয়ে। চল্লিশ কিলোমিটার পথ।

যতক্ষণ উনি চিপাদোহরে থাকেন, মেট মুনাব্বর, জঙ্গী জওয়ানের মতো চেহারা, ছ'ফিট লম্বা, সুগঠিত কুচ্কুচে কালো পেটা শরীরের নীরব কর্মী, খাকি পোশাকে সটান দাঁড়িয়ে থাকেন গভর্নরের এ-ডি-সির মতো তার মালিকের ইজি চেয়ারের পাশে।

পাঁড়েজী ধব্ধবে, ফিন্ফিনে, ফর্সা; খাঁটি ব্রাহ্মণ। বাড়ি আর্রা জেলায়। বেজাতের হাতে জল খান না। উনিও পায়ে নাগরা এঁটে, ধুতির ওপর গলাবন্ধ গরম দেহাতী পশমের কোট পরে প্রাণের দায়ে সিঁড়িতে উবু হয়ে বসে আগুন পোহান।

নানা জায়গা থেকে বেপারীরা আসে বাঁশ ও কাঠ কিনতে। সকলেরই খাওয়া-দাওয়া কোম্পানীর ডেরায়, নিখরচায়। দূর দূর থেকে জঙ্গলের মধ্যে আসেন সকলে, যাঁরা দিনে দিনে ফিরতে না পারেন, তাঁদের রাতের শোওয়ারও ব্যবস্থা করতে হয়।

আমার মালিক লোক খারাপ নন। আমার বোন রানুর বিয়ের রাতে, আসবার সময় মা'কে তিনি বলেছিলেন, আপনি খুশি তো? কোনো কিছুতে খুঁত থাকলে আমাকে জানাবেন। ফুলশয্যার তত্ত্বের টাকাও আমি সায়নবাবুকে দিয়ে গেলাম। কোনো ভাবনা নেই।

মা হাত তুলে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, সুখী হও বাবা।

কতরকম মানুষ দেখলাম এই দুনিয়ায়। আলাদা আলাদা তাদের চাওয়া, তাদের পাওয়া। একের কাছে যা সুখ, অন্যের কাছে তাই-ই অসুখ। যার সব আছে বলে অন্যদের ধারণা, তার মতো হাহাকারে-ভরা মানুষ হয়ত দ্বিতীয় নেই। সুখ বা দুঃখকে আমরা নিজের নিজের পরিবেশ, মানসিকতা এবং অভিজ্ঞতা দিয়েই নিরূপণ করি, তাই নিজের সুখটাই অন্যের সুখ বলে মনে করি। ব্যক্তি বিশেষে, অবস্থা বিশেষে, পরিবেশ বিশেষে সুখের সংজ্ঞা যে কত পরিবর্তনশীল তা হৃদয় দিয়ে বোঝার ক্ষমতা আমাদের অনেকেরই নেই।

আজই দুপুরে এসেছিলাম ভালুমার থেকে ট্রাকে। আজ রাতটা চিপাদোহরেই কাটিয়ে ভোরে আবার মুনাব্বর-এর সঙ্গে ট্রাক নিয়ে গিদাই ড্রাইভারের সঙ্গে ভালুমার ফিরে যাব। এই চিপাদোহরেরই মেস্-এর রাঁধুনি বামুন লালটু পান্ডে। এমন একজন সৎ, পবিত্র চরিত্রের, কবি-স্বভাবের শান্ত চেহারার নির্মল মানুষ খুব কমই দেখেছি। লালটুর উজ্জ্বল অপাপবিদ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে আমার চিরদিনই নিজেকে বড় ছোট লাগে। মানুষটার ছোটখাট চেহারাও এই বন-পাহাড়েরই মতো খোলামেলা। মনে কোথাও এতটুকু কলুষ নেই।

লালটুর বাড়ি গাড়োয়াতে, খিলাওন্ গ্রামে। জাতে ও পূজারী বামুন। পূজাপাঠ করার কথা, আর করছে রাঁধুনী বামুনের কাজ। কিন্তু যে যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে ও রান্না করে, এবং এক-একবেলা পঞ্চাশ-ষাটজন লোককে আদর করে খাওয়ায়; তাতে তার পূজা-পাঠের চেয়ে কিছু কম পুণ্য হয় বলে আমার মনে হয় না।

দোষের মধ্যে লালটুর একমাত্র দোষ একটু ভাঙ খাওয়া। ওকে ভালোবাসি বলে একটু বললাম কিন্তু ভাঙ ও বেশ বেশিই খেতো। মৌরী, গোলমরিচ, গোলাপ ফুল, শশার বীচি, পোস্ত এসব দিয়ে ভাঙ বেটে এবং সন্ধ্যে লাগতে না লাগতেই তা খেয়ে মত্ত হয়ে থাকে ও। এবং ভাঙ খেলেই লালটুর মন বিরহী হয়ে ওঠে। মনে মনে সে তার প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীকে কবিতা লেখে এবং তার স্ত্রীর জবাবও নিজেই রচনা করে।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে কুলি-মজুরদের সঙ্গে দিন কাটায় বলেই কাউকে অশিক্ষিত বলা যায় না। তাছাড়া স্কুল-কলেজে আমরা যা শিখেছি, সেইটেই শিক্ষা আর যারা স্কুলে-কলেজে পড়ার সুযোগ পায় না তাদের সবকিছুই অশিক্ষা একথা মনে করাটা বোধহয় ঠিক নয়। ঠিক নয় এই কারণে যে লালটু পান্ডের মতো অনেক মানুষকেই আমি নিজের চোখে দেখেছি। তাদের গ্রাম্য, নির্মল, নির্লিপ্ত পরিবেশ তাদের দারুণ কলুষহীন শিক্ষায় সুস্নাত করেছে। রামায়ণ মহাভারত থেকে তারা যে শিক্ষাকে নিজ নিজ জীবনে গ্রহণ করেছে, তাদের সঙ্গে আমার মতো দু-পাতা ইংরিজী-পড়া কেরানির ফালতু শিক্ষার কোনো তুলনাই হয় না। এ হচ্ছে একজন ভারতীয়র জন্মগত, সুসংস্কার-গত শিক্ষা। তেমন লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেলে লালটু যে যশস্বী কবি হতো এমন মনে করার যথেষ্টই কারণ ছিল।

রাতে খেতে বসে চিপাদোহরের লালটুকে নিয়ে অনেকেই রসিকতা করতেন। পরেশবাবু অনেকদিনের লোক। খেতে খেতে বললেন, আরে লালটু, শুনলাম তুই নাকি আজকাল হিদু-ড্রাইভারের বৌ-এর সঙ্গে লটর্-পটর্ করছিস। তোর বৌ-এর প্রতি প্রেম কি উবে গেল?

গজেনবাবু বললেন, লেহ্ লট্কা!

কিন্তু আমরা সকলেই জানতাম যে এসব মিথ্যে কথা। লালটু এবং লালটুর স্ত্রীর মতো দম্পতিই আদর্শ দম্পতি। এমন বিশ্বস্ততা এবং প্রেমই ভারতের আদর্শ। যা আমরা ভাবতেও পারি না। ক'জন শহুরে শিক্ষায় শিক্ষিত লোক শপথ করে বলতে পারেন যে, বিবাহিত জীবনে নিজের স্ত্রী এবং স্বামী ছাড়া অন্য কারো প্রতিই জীবনের দীর্ঘ পথে তাঁরা কখনও আকর্ষিত হন নি? অথচ লালটুর মতো অরণ্যবাসের জীবনে, যেখানে পা-পিছলানো যায় এক টাকার বিনিময়ে জঙ্গলে, ঝোপে বা খড়ের গাদায়, অক্লেশে এবং বিনা সমালোচনায়, সেখানেও সে পুরোপুরি বিশ্বস্ত। তার বিবাহিতা স্ত্রীই তার স্বপ্ন, তার আদর্শ। লালটু পান্ডের বুকে বসন্তের চাঁদনি রাতে তারই বিরহ-ভাবনা, প্রচন্ড শীতের রাতে তারই কবোষ্ণতার উষ্ণতার স্বপ্ন। লালটু, লালটুই!

পরেশবাবু যখন ঐ কথা বললেন, তখন লালটু খেসারির ডালের হাঁড়িতে হাতায় করে মনোযোগ সহকারে গাওয়া-ঘি ঢালছিল। ঘুরে দাঁড়িয়েই হঠাৎ সে বলে উঠল—

"রোওশনী সুরজ্ সে হোতা হ্যায়
সিতারো সে নেহী,
মুহব্বত্ এক সে হোতা হ্যায়,
হাজারোসে নেহী।"

আমার গলায় রুটি আটকে গেল। এই শীতের রাতের লণ্ঠন-জ্বলা রান্না ঘরে কাঠের পিঁড়িতে বসে খেতে খেতে হঠাৎ এক আশ্চর্য জগৎ আমার চোখের সামনে খুলে গেল।

"আলো কেবল সূর্যই দিতে পারে।
তারারাও আলো দেয়; কিন্তু সে আলো কি আলো?
প্রেম হয় জীবনে একজনেরই সঙ্গে,
হাজার লোকের সঙ্গে কি প্রেম হয়?"

পরেশবাবু কথা ঘুরিয়ে বললেন, কি লালটু? তোর বউএর চিঠি এলো না আর? কী লিখল সে চিঠিতে?

লালটুর স্ত্রী লেখাপড়া জানতো না। লালটুও জানে সামান্যই। কিন্তু লালটুর কল্পনাতে তার দূরের গ্রাম খিলাওন্ থেকে তার স্ত্রী নিত্য নতুন কবিতায় চিঠি পাঠাতো এবং লালটু তার জবাবও দিত কবিতায়। প্রতি সপ্তাহেই এমনি করে নতুন কবিতা শোনা যেত লালটুর কাছ থেকে।

পরেশবাবু বললেন, কি হল লালটু? এ সপ্তাহে খত্ আসে নি বুঝি?

এসেছে এসেছে। বলল, লালটু।

তারপর বলল, বউ লিখেছে :

"জল্‌কি শোভা কমল হ্যায়
ঔর থল্‌কি শোভা ফুল্
ঔর মেরী শোভা আপ হ্যায় পতিদেব
হামে না যাইয়ে ভুল।"

অর্থাৎ, "জলেব শোভা হচ্ছে গিয়ে পদ্ম আর স্থলের শোভা ফুল, আর আমার শোভা আপনি, আমার পতিদেব; আমাকে ভুলে যাবেন না।"

পরেশবাবু বললেন, জবাবে কি লিখলি তুই?

কী লিখেছি শুনুন—

"দিল্ তো করতা আউর মিলু
পরবীন্ উড়া না যায়,

কেয়া কহু ভগওয়ান্‌সে কি
পঙ্খ্‌ দিয়া না জমায়।"

মানে, "প্রাণতো সবসময়েই করে যে তোমার সঙ্গে দেখা হোক, কিন্তু কী করব বল? আমি তো কবুতর নই যে, তোমার কাছে উড়ে যাব? ভগবান যে আমায় পাখাই দেন নি।"

আমাদের কোম্পানীতে যাঁরাই জঙ্গলের কাজে আছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় সবাই-ই অল্পবয়সী এবং ব্যাচেলর। এর মধ্যে গজেনবাবুই একমাত্র কনফার্মড্‌ ব্যাচেলর। বয়স হয় নি কিছুই, কিন্তু এরই মধ্যে কেমন বুড়োটে মেরে গেছেন। রসিক লোক। কিছু বটতলার বই, আর কামিনদের সঙ্গেই তাঁর সময় কাটে ভাল। মুখ দিয়ে সব সময় মদের গন্ধ বেরোয়। একেবারে ওরিজিনাল মানুষ। বিধাতা গজেনবাবুর প্রোটোটাইপ পৃথিবীর এদিকটিতে আর একটিও সৃষ্টি করেন নি।

চিপাদোহরের রেলস্টেশানের ছোকরা এ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশান মাস্টার গণেশবাবু রোজ রাতে আসেন আড্ডা মারতে, এই ঠান্ডাতেও। মাথায় বাঁদুরে টুপি চাপিয়ে, হাতে টর্চ নিয়ে, লুঙ্গির ওপরে শেয়ালরঙা র‍্যাপার জড়িয়ে। ঘরের মধ্যে মাল্‌সার আগুন ঘিরে বসে ও'রা তাস-টাস খেলেন।

আমি কিছু পড়ার চেষ্টা করি।

রথীদা পাবলো নেরুদার 'মেমোয়ার্স্‌' বইটা দিয়েছিলেন। মাঝামাঝি এসেছি। নেরুদার গদ্যটাও কবিতারই মতো। এর আগে রাসেলের 'অটোবায়োগ্রাফী' পড়িয়েছিলেন। তার আগে বার্নার্ড জিমিকের 'সেরেঙ্গেটি শ্যাল নেভার ডাই' তারও আগে থর হায়ারডালের 'প্যাপিরাস্‌, কন্‌টিকি'। অদ্ভুত সব বিষয়ের ওপর বই। বিষয়ের কোনো সাযুজ্য অথবা মাথামুন্ডু নেই।

অল্প ক'দিন আগে একটা বই পড়তে দিয়েছিলেন, গাছ গাছালির যৌন জীবন, সংবেদনশীলতা এবং মানসিকতার ওপরে। বইটা এখনও পড়া হয় নি, পড়েই আছে। পড়তে হবে সময় করে। মাঝে মাঝে ভাবি রথীদা এখানে না থাকলেও আমাকেও বোধহয় তাস পিটে, মাঝে মধ্যে মহুয়া বা রাম গিলে এবং সিনেমার ম্যাগাজিনে চোখ বুলিয়ে একবারেই অন্যদের মতো হয়ে যেতে হত। আমার "আমিত্ব" বলে কিছুই থাকতো না।

গজেনবাবু তাস ফেরাতে ফেরাতে বললেন বাদলের বোনের বিয়ের কথা হচ্ছে কিন্তু গণেশ। এইবেলা মা বাবাকে লিখে একটা ফয়সালা করে ফ্যাল। নইলে আঙুল চুষতে হবে পরে।

বাদল আমাদের টোবীর কাজ দেখাশোনা করে যদিও তার ওপরে আছেন কণ্ঠেবাবু। নাম রেখেছেন গজেনবাবু ক্যাট-জ্যাম্পিং বাইস। অর্থাৎ উনি যে পরিমাণ ভাত থালায় নিয়ে খেতে বসেন তা কোনো হুলো বেড়ালের পক্ষেও লাফিয়ে ডিঙোনো সম্ভব নয়। বাদলের ছোট বোন চুমকি একবার চিপাদোহরে এসেছিল বাদলের সঙ্গে। কলেজে পড়ে। হাজারীবাগে না কোথায় যেন। চেহারাতে জয়া-ভাদুড়ী জয়া-ভাদুড়ী ছাপ ছিল সামান্যই। মিষ্টি গলায় আরতি মুখার্জীকে নকল করে আধুনিক গান গাইত। ভীষণ কাঁচা তেঁতুল খেতে ভালোবাসত। শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আর নুন মিশিয়ে।

চুমকির প্রেমে পড়ার পর চুমকির জন্যে তেঁতুল পাড়তে গিয়ে গণেশ তেঁতুলগাছে উঠে পা পিছলে ডালসুদ্ধ নিচে পড়েছিল। অতএব পা-ভেঙে তিনমাস ডালটনগঞ্জের হাসপাতালে। প্রাণ যে যায়নি, এই যথেষ্ট। কিন্তু বাদলের বোন চুমকি অন্যান্য অনেক চুমকির মতোই আরো তেঁতুল খেয়ে ও আধুনিক গান গেয়ে ছুটি ফুরোলে আবার

স্বস্থানে ফিরে গেছিল। গণেশকে হাসপাতালে একদিন দেখতে পর্যন্ত যায় নি।

গণেশ মাস্টার ছেলেটি একটু বেশিমাত্রায় রোম্যান্টিক। চাঁদ উঠলেই দেবব্রত বিশ্বাসের ঢঙে 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে' গান গাইতে শুরু করে। শীতেই হোক, কী বর্ষাতেই হোক। তার মনে চুমকি সম্বন্ধে একটা স্বপ্নিল কিছু গড়ে উঠেছিল। বাদলেরও আপত্তি থাকার কথা ছিল না, যদিও চুমকিকে কেউ বাজিয়ে দেখে নি, এই প্রস্তাবে সে চমকায় কি না।

কিন্তু বাধা ছিল অন্যখানে।

লক্ষ লক্ষ নিরুপায় মধ্যবিত্ত বাঙালি চাকুরিজীবীর যেখানে বাধা। গণেশের বাবা সবে রিটায়ার করেছেন। দুটি ছোট বোন আছে, একজন অনেকদিনই বিবাহযোগ্যা। অন্যজনও বড় হয়ে উঠেছে। বোনেদের বিয়ে না হলে গণেশের বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

আমাদের সকলেরই জানাশোনা এমন অনেক ছেলেও আছে যারা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন, নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে নি মা-বাবা, বা ভাই-বোনেদের মুখ চেয়ে। নিজের নিজের খুশিমত বিয়ে করেছে, ছোট্ট সুখী স্বার্থপরতার দেওয়াল তুলে সংসার গড়েছে যারা। আশ্চর্য! তারা কিন্তু আজও ব্যতিক্রম। বেশিরভাগই গণেশদেরই মতো।

গণেশের বয়স হয়ত চল্লিশ পেরিয়ে যাবে দু-বোনের বিয়ে দিতে দিতে। তবুও হয়ত তাদের বিয়ে হবে না, কারণ তাদের মুখশ্রী নাকি গণেশরই মতো। যদিও গায়ের রঙ ফর্সা। কিন্তু তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার জেনেও গণেশ অপেক্ষা করছে। এবং অপেক্ষা করবে।

ওদের এইটুকুই আনন্দ। সারাদিন কাজের পর, এই তাসখেলা, এই গালগল্প, এই ছোট জায়গার নানান কুৎসা ও রসের ভিয়েনে কোনক্রমে হাঁপিয়ে-ওঠা অবকাশকে ভরিয়ে তোলা। সকালে দুটো আর বিকালে দুটো প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসে যায় আপ-ডাউনে, আর কিছু মালগাড়ি। মাইনে ছাড়াও যে সামান্য উপরি রোজগার আছে তা দিয়েও বাড়িতে টাকা পাঠিয়ে লাউকির তরকারি আর অড়হড়ের ডাল ছাড়া কিছু খাওয়া জোটে না গণেশের। ওর ছুটির দিনে আমাদের চিপাদোহরের ডেরাতেই খায় গণেশ।

রোশনলালবাবু আমাদের সকলের কাছে বাদলের সমস্যার কথা শুনে একদিন বলেছিলেন, বুঝলে বাদল দিয়ে দাও বোনের বিয়ে, গণেশের সঙ্গে। খরচের কথা ভেব না। কিন্তু সমস্যাটা বাদলের বোনের বিয়েজনিত ছিল না। ছিল, গণেশের দুই বোনের বিয়ে নিয়ে। সে কথা জেনে রোশনলালবাবু এও বলেছিলেন, লাগাও হে মাস্টার, এক বোনের বিয়ের খরচ আমিই দেব। যদি তাতে তোমার বিয়ে নির্বিঘ্ন হয়। সেইমত বাড়িতে চিঠিও লিখেছিল গণেশ বেচারা। কিন্তু বড় বোনের বিয়ে দেওয়া গেলেও ছোট বোনের বয়স তখন পনেরো। মা, দুই বোনের বিয়ে দেওয়ার আগে ছেলের বিয়ের কথা মোটেই ভাবছেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন।

আজকের দিনের অর্থনৈতিক কাঠামো মধ্যবিত্তদের মানসিকতার খোল-নলচে পালটে দিয়েছে। স্বামীর অবসর গ্রহণের পর পরিবারের রোজগারের একমাত্র উৎস, এ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার ছেলের বিয়ে দিয়ে অজানা চরিত্রর পুত্রবধূর দয়া-নির্ভর হয়ে সেই উৎস হারাবার মতো সাহস গণেশের মায়ের ছিল না। আর্থিক অবস্থা অতি স্নেহময়ী বাঙালি মায়েদেরও বড় নিষ্ঠুর করে তুলেছে। পরেশবাবুর কাছে শুনেছি যে গণেশের মা নাকি এ-ও লিখেছিলেন যে, বড় মেয়ের বিয়ের পর ছোট মেয়ের এবং গণেশের বিয়ে একই সঙ্গে দেবেন যাতে ছেলের বিয়ের পণের টাকা দিয়েই ছোট মেয়ের বিয়েটাও হয়ে যায়।

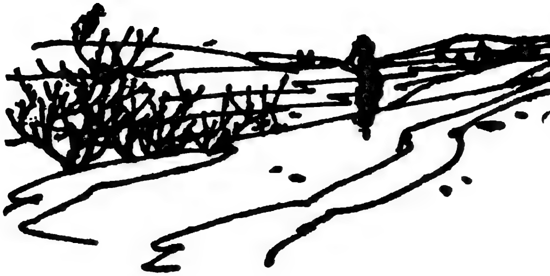
লালচে বাঁদুরে-টুপি পরে বেঁটে-খাটো, ফর্সা, ছিপ্‌ছিপে গণেশ জোড়াসনে বসে

তাস খেলছিল। ছোট্ট নাকটা বেরিয়ে ছিল টুপি থেকে আর মুখের একটা অংশ। লণ্ঠনের আলোটা স্থির হয়ে ছিল গণেশ-মাস্টারের মুখে। ঘরের কোণে বসে, ওর দিকে চেয়ে, আমার হঠাৎই মনে হল যে, যারা যুদ্ধ করে, পাহাড় চড়ে, সমুদ্র ডিঙোয়, তারাই কি শুধু বীর? আর যারা তিল তিল করে নিজেদের যৌবন, নিজেদের সব সাধ-আহ্লাদ, নিজেদের খাওয়ার সুখ, পরার সুখ, শরীরের সব সুখকে এমন নির্বিকার নির্লিপ্তচিত্তে প্রতিদিন নিঃশব্দে গলা টিপে মারে, নিজের জন্মদাতা বা দাত্রী এবং ভাইবোনদের কারণে তারা কি বীর নয়? প্রতি মুহূর্তে নিজের সঙ্গে যুদ্ধে যে যোদ্ধা নিজেকে বার বার পরাজিত করে, সেও কি মহান যোদ্ধা নয়?

বাইরে পেঁচা ডাকছিল দুরগুম্ দুরগুম্ করে। কুকুরগুলো ভুক্ ভুক্ করে উঠলো। শেয়াল বা চিতা-টিতা দেখেছে হয়তো। দূরের রেল লাইনে ডিজেলের ভারী মালগাড়ি একটানা ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে রাতের শীতের হিমেল শিশির-ভেজা নিস্তব্ধতাকে মথিত করে চলে গেল বাড়কাকানার দিকে।

ওরা দান দিচ্ছিল, কথা বলছিল, তাস ফেটাচ্ছিল। আমি বইটা মুড়ে রেখে বালিশে মাথা দিয়ে আধো শুয়ে কম্বল গায়ে টেনে বসে ভাবছিলাম কী আশ্চর্য সুন্দর, প্রাগৈতিহাসিক অথচ কী দারুণ আধুনিক আমাদের দেশ।

এই ভারতবর্ষ!



সকালে চান করে আটার ফুলকো আর আলুর চোকা খেয়ে মুনাব্বরের সঙ্গে ট্রাকে বসলাম। মুনাব্বর ভিতরে, আমি বাঁয়ে। রোদ আসছিল বাঁদিক দিয়ে। কিছুক্ষণ পর পথটা ডাইনে বাঁক নিতেই শীত শীত করতে লাগল। সকালের শীতের বনের গা থেকে ভারি একটা সোঁদা সোঁদা মিষ্টি গন্ধ ওঠে। কী সব ঠুকরে খেতে খেতে বনমুরাগ, ময়ূর, তিতির পথের মাঝ থেকে দুধারে সরে যায়, ট্রাকের শব্দ শুনে।

ডানদিকের সেগুন প্ল্যানটেশানে একদল বাইসন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লাগানো কুলথী ক্ষেতে কুলথী খাচ্ছিল রোদ পোয়াতে পোয়াতে। রাতের শিশির ওদের মোটা অথচ রেশমী চামড়াতে তখনও মাখা ছিল। রোদ পড়ে, ওদের কালচে বাদামী শরীর চকচক করছিল। কপালের সাদা জায়গাগুলো আর পায়ের সাদা লোমের মোজাও।

পথে সাতনদীয়া পড়ে। একই নদী পথটাকে কেটে গেছে সাতবার ঘুরে ফিরে সাত সাতটা কজওয়ে নদীর ওপর মাইলখানেকের মধ্যে। জল চলেছে তির্‌তির্‌ করে শ্যাওলা-ধরা নুড়ি পাথরের গা বেয়ে। বর্ষায়, বিশেষ করে বৃষ্টির পর, এই সাতনদীয়াতে এসে অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আমাদের, আধঘণ্টা, কখনও বা একঘণ্টাও ; বা তার চেয়েও বেশি। তখন পথ ভাসিয়ে কজওয়ের ওপর দিয়ে বেগে লালরঙা ঘোলা। বানের জল কাঠকুটো ডালপালা আর নুড়ি ভাসিয়ে গড়িয়ে গর্জন করে বয়ে যায় যতক্ষণ না জলের তোড় কমে, ততক্ষণ পার হবার উপায় থাকে না। একবার এক কলকাতার রাফিং-করা বাঙালীবাবু বাহাদুরী দেখানোর জন্যে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও অবিবাহিতা শালীসমেত অ্যাম্বাসাডার গাড়ি করে বর্ষায় এই নদী পেরোতে গিয়ে সপরিবারে ডুবে মারা গেছিলেন। গাড়িসুদ্ধু তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছিল নদী, অনেক দূরে। একমাত্র শালীই বেঁচে যান। জামাইবাবুরা চিরদিনই শালীদের জন্যে নানাভাবে মরে থাকেন। সেটা কিছু নূতন বা আশ্চর্য ঘটনা নয়। কিন্তু সেই দুর্ঘটনার পরই রমেনবাবু সাতনদীয়ার নাম বদলে দিয়ে এই নদীর নাম রেখেছেন জামাই-মারা নদীয়া।

গাড়ুর কাছে কোয়েলের ওপরের ব্রীজ পেরিয়ে গাড়ু বাজার হয়ে ট্রাক চলল ভালুমারের দিকে। মুনাব্বর আমাকে ভালুমারে নামিয়ে দিয়ে হুলুক্‌ পাহাড়ে চলে যাবে। আমি মাস্টার-রোল্‌স তৈরি করে, খাওয়াদাওয়া করে নিয়ে বসে থাকব। মুনাব্বর আবার ট্রাক পাঠাবে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আজ পেমেন্টের দিন। চিপাদোহর থেকে টাকা ও সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছে। নতুন মার্সিডিস্‌ ট্রাক, ভালুমার বস্তির মাইল খানেক আগে হৃদয়-ঘটিত গোলমালে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। জঙ্গলে যে সব মানুষ চাকরি করবার জন্যে যায়, তাদের নিতান্ত দায়ে ঠেকেই সর্বজ্ঞ হতে হয়। তাই মুনাব্বরও একজন মেকানিক্‌। ড্রাইভার ও হেল্পার তো আছেই। কেবল আমার দ্বারাই কিছু

শেখা হল না। যন্ত্রপাতির সঙ্গে আমার একটা জন্মগত বিরোধ আছে। জানি না, ছোটবেলায় বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে এই কারণেই বিস্তর মাঞ্জা দেওয়া সত্ত্বেও আমার সব ঘুড়ি ভো-কাট্টা হয়ে যেত কি-না। কোন ফুটোয় তেল ঢালে, কোন ফুটোয় মবিল, সেটুকুও শিখে ওঠা হল না, তাই গজেনবাবু আমাকে ডাকেন বাঁশবাবু, 'দ্যা পারপেচুয়াল আন্‌পড়্' বলে।

ওরা যখন বলল, কমপক্ষে আধ ঘণ্টাটাক লাগবে ট্রাক ঠিকঠাক করতে, আমি তখন মুনাব্বরকে বলে নেমে গেলাম। ভাবলাম পায়ে হেঁটেই এগিয়ে যাই। যদি ওদের আসতে দেরিও হয়, তাহলে মাস্টার-রোল নিয়ে একেবারে তৈরি হয়ে থাকব। দুপুরে মেট-মুনশিদের সঙ্গেই কিছু খেয়ে নেব না হয় জঙ্গলে। অনেকদিন হয়ে গেছে সকালের দিকে এই পথে হাঁটি নি। আমার যাওয়া-আসা সবই ভালুমারের অন্য দিকটাতে।

শীতের ফসল লেগেছে ঢালে ঢালে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে। ভরন্ত সবুজের পটভূমিতে সরগুজা আব কাড়ুয়ার নরম হলুদ ভারি এক সিগ্ধতায় ভরে দিয়েছে। অড়হরের ক্ষেতে ফুল এসেছে। রাহেলাওলা আর পুটুসের ফুলে পথের দু-পাশ ভরে আছে। ফিচ্-ফিচিয়া পাখি ডাকছে থেকে থেকে। ছোট ছোট টুই পাখিগুলো ফুরৎ ফুরৎ করে উড়ে বেড়াচ্ছে চঞ্চল ভাবনার মতো। কিছুদিন আগে জিনোর লেগেছিল। কিন্তু হলে কী হয়, গাঁয়ের বেশির ভাগ লোকই জিনোর ঘরে তুলতে পারে নি গত বছরে হাতির অত্যাচারে। মকাইকে পালামৌ জেলাতে জিনোর বলে। অথচ পাশের হাজারীবাগ জেলাতে মকাই-ই বলে। পুজোর সময় এই পথেরই দু-পাশে ভরে ছিল হলুদ-সবুজ ফসলে ফসলে। দিন ও রাতে রাখওয়ার ছেলেরা টিয়া ও জানোয়ার তাড়াত তখন। দুপুরে বা রাতে তাদের বাঁশির সুর বা দেহাতী গানের কলি ভেসে আসত দু-পাশ থেকে। গোন্দ্‌নি ও সাঁওয়া ধানও যে যা করেছিল, নষ্ট করে দিয়েছিল হাতিতে। এখন কুল্‌থী, মটর-ছিম্মি, অড়হড় এই সব লেগে আছে।

পথের কালভার্টের নিচে দিয়ে বয়ে-যাওয়া তির্‌তিরে নালাতে ছোট ছোট অর্ধ-উলঙ্গ ছেলেরা চেত্‌নী মাছ ধরছে ছেঁকে ছেঁকে। ছোট ছোট পাহাড়ী পুঁটি রোদ পড়ে ঝিক্-মিকিয়ে উঠছে ছটফট্-করা ছোট মাছগুলোর রুপোলী শরীরে। আর সেই রোদই মিলিয়ে যাচ্ছে ছেলেগুলোর কালো কালো রুখু খড়িওঠা অপুষ্ট গায়ে। রোদই ওদের নিখরচার ভিটামিন।

রাম্‌ধানীয়া বুড়ো, কষ্টে কঁকিয়ে নিচু হয়ে হেঁটে আসছিল। ও হাঁটলে ওর হাড়ে হাড়ে হাওয়া-লাগা কট্‌কটি বাঁশের মতো কট্‌কট্ শব্দ হয়। এই-ই নান্‌কুয়ার রাম্‌ধানীয়া চাচা। সারারাত ধরে এই শীতে ঔরঙ্গা নদীতে চালোয়া মাছ ধরেছে। তাও মাত্র এক কেজির মতো। বুড়োর শরীরে এখনও রাতের শীত জড়িয়ে আছে। এতক্ষণ রোদে হেঁটেও গরম হয় নি ও। আমি একটা সিগারেট দিলাম। বুড়ো কালভার্টে বসল। সিগারেটটা দুহাতের মধ্যে নিয়ে আদর করে ধরল, তারপর মহামূল্য জিনিসের মতো এক-বার টানল, তারপর জোরে জোরে টানতে লাগল।

বলল, নেবে নাকি বাঁশবাবু? মাছ? আমার স্থানীয় নাম বাঁশবাবু। যার যেমন কপাল। চলিতার্থে এ জীবনে কাউকেই বাঁশ দেওয়ার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা না থাকলেও কাগজ কলে আর মালিকের ডিপোতে বাঁশ সাপ্লাইয়ের কাজে বহু বছর লেগে আছি বলে সকলেই আমাকে বাঁশবাবু বলে ডেকে থাকে। বাঁশের মতো আমিও ফুল ধরলেই মরে যাব। বিয়ে-টিয়ে আমার না-করাই ভাল।

কত করে নিচ্ছ?

বুড়ো বলল, দামের কি কোনো ঠিক আছে। সারা রাত এই শীতে নদীর জলে দাঁড়িয়ে, বিবেচনা করে যা হয় দাও। তুমি কি আর ঠকাবে আমাকে? তুমি ত শহুরে বাবু নও।

আমি অনেকই বেশি দিতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু ওদের চেয়ে ভালো জামা-কাপড় পরি, আর দু-পাতা ইংরিজীই পড়েছি। নইলে ওদের তুলনায় খুব যে একটা বড়লোক আমি এমনও নয়।

বললাম, কত পেলে খুশি হও। কোথায় নিয়ে চলেছিলে বেচতে?

বুড়ো বলল, শীত একেবারে হাড়ের ভিতরে ঢুকে গেছে গো! কোথাওই আর বেচতে টেচতে যেতে পারব না। পথেই কেউ নিয়ে নিলে, নেবে। ফরেস্ট বাংলোতে গেছিলাম—সেখানে কোনো মেহমান নেই। চৌকিদার. মাত্র আট আনায় কিনতে চাইল. তার চেয়ে নিজে খাওয়াই ভাল। তাও শরীরে একটু তাগৎ হবে। তা তুমি যদি দু-টাকা দাও, তো দিয়ে দিই সবটা। তোমার কথা আলাদা।

দু টাকাই দেব, কিন্তু সবটা দিও না। তুমি এত কষ্ট করে ধরলে, আদ্দেক তুমি খেও, আদ্দেক আমাকে দাও।

রামধানীয়া হাসল। বলল, আরেকটা সিগারেট খাওয়াও। আমিও হাসলাম। সিগারেট বের করে দিলাম, তারপর বললাম, গান শোনাবে নাকি একটা?

বুড়ো টাকা দুটো পেয়ে গাছ-থেকে-ছিঁড়ে-নেওয়া শালপাতায় অর্ধেক মাছ ঢেলে দিয়ে, সিগারেটে বড় বড় দুটো টান দিযে রোদে পিঠ দিয়ে ঝুমুরের গান ধরল, রামচন্দ্রর বিয়ের গান।

যে ছেলেগুলো মাছ ধরছিল, তারা মাছ-ধরা ছেড়ে দিয়ে বুড়োর কাছে উঠে এল, এসে রাস্তায় বুড়োকে ঘিরে বসল। মোষের গাড়ির পিঠে খড় বোঝাই করে দূর গ্রামের একজন লোক চলেছিল, মোষের পায়ে পায়ে মিষ্টি-গন্ধ-ধুলো উড়িয়ে গাড়ুর দিকে। সেও গাড়ি থামিয়ে দিল পথের মধ্যিখানে। কিছুক্ষণের জন্যে নিজের নিজের দুঃখ-কষ্টর কথা ভুলে গিয়ে বুড়োর গান শুনতে জমে গেল সকলে।

এখানের জীবন এমনই! সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খেটেও কোনো লাভ হয় না। তাই কিছু সময নষ্ট করতে ওদের গায়ে লাগে না। আনন্দ আহ্লাদ করতে ওদের ঐটুকুই। হঠাৎ২—পড়ে-পাওয়া।

বুড়ো গান ধবল, ভাঙা ভাঙা খনখনে গলায়। যৌবনে রামধানীয়ার নাকি নাম—ডাক ছিল গাইয়ে হিসেবে। দশটা গ্রামের মধ্যে এমন গাইয়ে ছিল না নাকি!

“জর্ গেল বাজা তোর জিন্দ্গী,
কী তোর ঘরে রাম হ্যায় ত কুঁয়ার;
উত্তরে খোঁজ্লি. দক্ষিণে খোঁজ্লি,
তব খোঁজ্লি চারো পরগনা;
নাই মিলল কান্যিয়া কুঁয়ার।”

যন্ত্র নেই, কিছু নেই; শুধু শীতের মন্থর হাওয়ায় পাথরে ঝরে-পড়া শুকনো শালপাতার মচ্মচানির শব্দের মধ্যে এই প্রাকৃত গান সমস্ত পরিবেশকে এমন এক অকৃত্রিমতায় ভবে দিল যে, মনে হল এই সব গান বুঝি এমন হঠাৎ বায়নায়, আচমকাই শুনতে হয়।

ছেলেগুলো হল্লা করে উঠল, আর একটা হোক, আরেকটা। বুড়ো আবার ধরল—

“ওরে গঙ্গা পাড়ে যমুনা,
সেই বীচে গোখুলা নগর,

ঔর উহে নগরে হ্যায় হাঁসা-হাঁসানীয়া
ওক্‌রে ঘরে কাঁন্যয়া কুঁয়ার।”

গান শোনার পর চুপ করে থাকলাম কিছুক্ষণ। মোষের গাড়ি আবার চলতে লাগল, ছেলেগুলো মাছ ধরতে নেমে গেল।

বললাম, এবার এগোই। একদিন এসো বাড়িতে। ভালো করে গান শুনব চাচা।

বুড়ো বলল, যাব। তিতলিকে বোলো, আদা আর এলাচ দিয়ে চা খাওয়াবে। ও সেদিন যা চা খাইয়েছিল না, আমার মেজাজই চাঙ্গা হয়ে গেল। সব মারীজই ওই ইলাজে ভাল হয়ে যাবে।

আমার মামাবাড়ি ছিল বিহারের গিরিডিতে। তাই আমার মা, দিদিমার কাছ থেকে দারুন মোহনভোগ, নানারকম নোন্তা খাবার আর ওই রকম চা বানাতে শিখেছিলেন। আমার কাছ থেকে শুনে শুনে তিতলি এখন মা'র মতই এক্সপার্ট হয়ে গেছে। আমার ছোট-বড় পছন্দ-অপছন্দ, ভালোলাগা-না-লাগা নিয়ে মেয়েটার কেন যে এমন ঝোঁক তা বুঝতে পারি না। মা বেঁচে থাকলে খুশি হতেন খুব ওই চা খেয়ে ওর হাতে।

পথের পাশে পাশে কুল গাছ, পলাশের বন, একটা দুটো বড় সটান শিমুল। ডানা-মেলা সাদা চিলের মতো রোদ বসে আছে শিমুলের ডালে ডালে। ডানা ঝাড়ছে উত্তুরে হাওয়ায়। অভ্রর কুচির মত রোদের টুকরো ঠিক্‌রে যাচ্ছে চারদিকে।

সামনে থেকে টিহুল হেঁটে আসছিল। ফরেস্ট-বাংলোর চৌকিদারের কাছে রোজ-এ কাজ করে ও। বাংলোতে অতিথি থাকলে,—জলের ট্যাংকে কুয়ো থেকে বালতি করে জল এনে ভরে দেয়। ফাই-ফরমাশ খাটে। বাসন-পত্র ধোওয়া-ধুয়ি করে। রান্না-বান্নায় সাহায্য করে। বাংলোর চৌকিদারটা মহা ধূর্ত। অতিথি এলেই খোঁড়া শেয়ালের মত পা টেনে টেনে এসে সামনে দাঁড়ায় রাতেরবেলা। একটু কাশে আর ফিস ফিস করে বলে, ঔর কুছ চাহিয়ে হুজৌর।

অনেক সাদা-মাটা হুজৌর বলেন, নেহি ভাই, থ্যাঙ্ক ইয়্যু। যাঁরা বিশেষ রসের রসিক, তাঁরা পাঁঠার মাংস দর করার মতো বন-পাহাড়ের, বুনো-গন্ধময় নারীমাংসর রকম-সকম নিয়ে দামদর করেন। ফরেস্ট বাংলোর পুরানো ঝাঁকড়া মহুয়া গাছগুলো আজ অবধি অনেকেই দেখেছে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায়, এই বন-পাহাড়ের কত গ্রামের কত বিভিন্ন রূপের, বিভিন্ন বয়সী মেয়ে, চুপিসাড়ে এসে হঠাৎ বারান্দায় উঠে পড়েছে রাতের অন্ধকারে বা জ্যোৎস্নাতে। তারপর শেষরাতে চৌকিদারকে রোজগারের সিংহভাগ গুণে দিয়েছে করুণ মুখ করে।

গাছেদের চোখ বড় সজাগ। গাছেরা সব দেখে ; সব মনে রাখে।

টিহুলের গায়ে একটা শতচ্ছিন্ন জামা। যেখানে আমাদের ট্রাক খারাপ হয়েছে, তারই কাছাকাছি ঘন জঙ্গলের মধ্যে ওর ঘর। সামান্য একফালি রুখু জমি আছে সেই ভগ্নপ্রায় ঘরের লাগোয়া; তাতেই যা পারে তা বোনে, আর বাংলোয় অতিথি থাকলে, সেখানে দিন হিসাবে কাজ করে। ভালো-বাবু-টাবু এলে মাঝে মাঝে বর্কশিস টর্কশিসও পায়।

বললাম, কিরে টিহুল, কী বুনেছিলি ক্ষেতে এবারে? চলছে সব কেমন?

টিহুল মাথায় হাত দিয়ে বলল, সে-কথা আর বোলো না বাঁশবাবু। হাতি, শম্বর, শুয়োর, হরিণ আর খরগোসের অত্যাচারে ফসল করাই মুশকিল।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আর চলছে না বাবু। প্রায় থেমে এসেছে। এত দূরের বাংলোতে অতিথি-টতিথি বড় একটা আসেও না। এবার ভাবছি তোমার কাছেই যাব।

টিহুলকে অনেক আগেই বলেছিলাম যে, ইচ্ছে করলে ও আমাদের জঙ্গলেই কুপ্‌

কাটতে পারে। কিন্তু ঘরে টিহ্লের পরমা সুন্দরী যুবতী বউ আছে। টিহ্ল যে চৌকিদারকে একটুও বিশ্বাস করে না। ও ভোর থেকে সন্ধ্যে অবধি দূরের জঙ্গলে বাঁশ কাটলে তার বউকে যে কী ভাবে ফুস্‌লিয়ে কার ভোগে লাগিয়ে দেবে চৌকিদার, তা বলা যায় না। দুপুর বেলা তো, দুপুর বেলাই সই। কত রকম বাবু আসে বাংলোতে! আর চৌকিদারটা তো একটা মহা জাঁবাজ লুম্‌রী।

বেচারা! মাঝে মাঝে বউ সুন্দরী বলে, খুব রাগ হয় ওর নিজের ওপরে। মাঝে মাঝে টিহ্লের মনে হয় যে, গরীবের ঘরে সুন্দরী মেয়েদের জন্মানো বা বিয়ে হওয়া বড় পাপের। এখানের প্রত্যেকেরই সমস্যা আছে অনেক। কিন্তু টিহ্লের এই সমস্যাটা একটা অন্যরকম সমস্যা। অন্য সব সমস্যার ওপরে সব সময়েই মাথা উঁচিয়ে থাকে। এ সমস্যার কথা কাউকে বলা যায় না, এমন কী বউকেও নয়; তাই নিজের বুকেই বয়ে বেড়াতে হয়।

টিহ্ল একদিন আমাকে বলেছিল, টাকা বড় খারাপ জিনিস বাঁশবাবু। অভাবী লোক টাকার জন্যে করতে পারে না, এমন কাজই নেই।

আমি ওকে বলি নি যে, অভাবহীন লোকেরাও আরো টাকার, অনেক টাকার জন্যে করতে পারে না এমন কাজও নেই। টিহ্ল জানে না তা, এই যা।

ও বলল, আমরা সকলে মিলে একদিন আপনার কাছে যাব। আমাদের একটা ভালো দরখাস্ত লিখে দিতে হবে ইংরিজীতে।

কার কাছে?

ফরেস্ট ডিপার্টে। কতবার হিন্দীতে লিখিয়ে তাতে গ্রামের সকলের টিপসই লাগিয়ে পাঠালাম। কেউই ত কোনো কথা শুনল না। ফরেস্ট ডিপার্ট কিছু ভরতুকি দেবে বলেছিল তারও নাম-গন্ধ নেই। এদিকে টাইগার প্রোজেক্‌টের জন্যে বেশির ভাগ জায়গাতেই কূপে সবরকম কাজই বন্ধ। ফসল, সামান্য জমিতে যে যা করে, সবই খেয়ে নেবে বুনো জানোয়ারে, ঘর ফেলে দেবে হাতিতে; আমরা তাহলে বাঁচি কী করে বলতো বাঁশবাবু?

সেদিন ডালটনগঞ্জে কাগজে দেখেছিলাম যে, পালামৌ জেলায় তেরোটা বাঘ বেড়েছে। কিন্তু এই তেরোটা বাঘের কারণে হয়ত তেরোশো লোক মরেছে টিহ্লের মতো। এখানে মানুষ ঝরাপাতার মতো মরে, নিঃশব্দে, অলক্ষ্যে। সেটা কোনোই খবর নয়।

আমি দায়িত্ব এড়িয়ে গেলাম। আমার মালিকের স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাক্‌শান্ আছে যে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমাদের কাজ; তাই তাদের সঙ্গে কোনক্রমেই ঝগড়া-বিবাদ যেন না করি। জলে বাস করে, কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা আমাদের পোষায় না। মালিক বলেন, ব্যবসা করলে এসব নিয়ম মেনে চলতে হয়ই। টাকা রোজগার করতে হলে মাথা ঝুঁকিয়েই করতে হয়। সে ব্যবসা, সামান্য পানের দোকানেরই হোক কী ওকালতিই হোক। ব্যবসা আর পেশা সবই সমান।

আমি টিহ্লকে বললাম, তোরা পাগলা সাহেবের কাছে যাস না কেন? সকলকে নিয়েই যা। উনি যেমন করে লিখতে পারবেন, আমি কি আর তা পারব?

সরল টিহ্ল আমার দায়িত্ব এড়ানোটা ধরতে না পেরে বলল, অনেকদিন আগেই তাঁর কাছে যাওয়া উচিত ছিল। আমরা শুধু পঞ্চায়েতের ভরসায়ই ছিলাম এতদিন। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল।

হঠাৎ টিহ্ল দূরে তাকিয়ে কালভার্টের কাছে ভিড় দেখে আমাকে শুধোল, ওখানে কিসের ভিড়? বললাম, রাম্‌ধানীয়া চাচা বোধহয় আবার গান ধরেছে; ঝুমুরের গান।

টিহ্লের চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল, তাই?

তারপরই বলল, যাই।

বলেই, দৌড় লাগাল।

আমি ওকে থামিয়ে বললাম, শোন, তোর ঘরের কাছে কোম্পানীর ট্রাক খারাপ হয়ে আছে। মুনাব্বরকে বলিস, বেশি দেরি হলে ও যেন হেঁটে আমার ডেরায় চলে আসে। আমার সঙ্গেই খেয়ে নেবে।

আচ্ছা! বলেই ও আবার দৌড় লাগাল।

গান শুনতে দৌড়ে-যাওয়া টিহুলের দিকে তাকিয়ে বোঝার উপায় রইল না আর যে, ওর এত দুঃখ, এত কষ্ট।

অদ্ভুত,এই মানুষগুলো। এত সহজে এরা সুখী হয়, এত সহজে সব গ্লানি ও অপমান ভুলে যায়!

আর একটু এগোলেই ভালুমারের এলাকা। বাঁদিকে ফরেস্ট বাংলো, তার পাশ দিয়ে আরেকটা পথ বেরিয়ে গেছে ঝুমরীবাসার দিকে। ডাইনে একটা বুড়ো বয়ের গাছের নিচে গোদা শেঠের দোকান।

সিগারেট নেওয়ার ছিল, তাড়াতাড়িতে, চিপাদোহরে নিতে ভুলে গেছিলাম। ওখানে তাও দুটো-একটা অন্য ব্রান্ড পাওয়া যায়, এখানে শুধুই বিড়ি আর চারমিনার, নাম্বার টেন, পানামা। ব্যস্‌স্‌। গোদা শেঠের বয়স পঁয়তাল্লিশ হবে। লালচে, ফর্সা গায়ের রঙ। পরনে পায়জামা আর গেঞ্জি। গেঞ্জি বেশীর ভাগ সময়েই নাভির ওপর পাকিয়ে তোলা থাকে গরমের দিনে। গোদা শেঠের শেঠানি, বছর বছর ভাল গাইয়ের মতো বাচ্চা বিয়োয় আর অবসর সময়ে বড়ি দেয়, পাঁপড় বানায় এবং আচার শুকোয়। স্বামী ও গুচ্ছের ছেলেমেয়ের জন্যে রান্না করে। তার নিম্নাঙ্গে সে হস্তিনী। উর্ধাঙ্গে পদ্মিনী। ভগবানের আশ্চর্য সৃষ্টি!

এখন শীতকাল, তাই একটা নোংরা ফুল-হাতা খয়েরি-রঙা সোয়েটার পরে রয়েছে গেঞ্জির ওপর গোদা শেঠ। ওর শীত কম, বোধহয় টাকার গরমেই গরম থাকে সব সময়! চোখ দুটো সবসময়ই লাল জবাফুলের মতো। টাকা বানানো ছাড়াও ওর অন্য অনেক রকম নেশা আছে বলে শুনেছি। তার লাল মোটর সাইকেলটা দোকানের পাশের বয়ের গাছের গায়ে দাঁড় করানো থাকে।

কোথাও নিঃশব্দে যেতে হলে ও সাইকেলেই যায় এখনও। সশব্দে যেতে হলে এই ঝকঝকে মোটর সাইকেলে। তবে মোটর সাইকেলের বিপদ একটা আছে। বেত্‌লার দিকে এই ভট্‌ভট্‌ শব্দ শুনলেই হাতি তাড়া করে মোটর সাইকেলকে। চড়ুক আর না-ই চড়ুক এটা একটা স্ট্যাটাস্‌-সিম্বল। এই বস্তিতে আর কারোরই নেই মোটর সাইকেল। এমন কি মাহাতোরও নেই। ভূমিহার জমিদাররা আজকাল নিঃশব্দে সরে যাচ্ছে, ব্যবসাদারদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে গ্রামেগঞ্জে, শহরে। ব্যবসাদাররাই রাজা-মহারাজা এখন।

অনেক জায়গা-জমি গোদা শেঠের। চড়া সুদে দাদন-টাদনও দেয়। পরে সেইসব জমি, এমনকি ঘটিবাটি পর্যন্ত লিখিয়ে নেয়। মানুষটা যে ভালো নয়, তা তার কাছে এলেই বোঝা যায়। খারাপ মানুষদের চোখ থেকে, শরীর থেকে, পরিবেশ থেকে কোনো অদৃশ্য কিছু বিকিরীত হয়। মানুষটার সঙ্গে দেখা হলে ওর কাছাকাছি এলেই আমার কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে। দোকানের মধ্যে থেকে, কেরোসিন তেল. কাড়ুয়া তেল, শুখা মকাই, চাল, শুখামহুয়া, নানারকমের ডাল, সস্তার সাবান, শুকনো লংকা, পেঁয়াজ, জিরে, হলুদ, গোলমরিচ, আখের গুড় ইত্যাদির এবং মেঝের মাটির একটা মিশ্র গন্ধ ওঠে। সেই মিষ্টি মিষ্টি, ঝাঁঝ-ঝাঁঝ, ঝাল-ঝাল, গন্ধটা দোকানে যে ঢোকে তার গায়েও যেন লেগে যায়।

শেঠ মাঝে মধ্যে ডালটনগঞ্জে গিয়ে হিন্দি সিনেমা দেখে আসে। কথায়বার্তায়

আজকাল হিন্দি ছবির হিরোদের ডায়ালগ্‌এর ঢঙ লেগেছে।

দোকানে ঢুকতেই গোদা শেঠ বলল, কা বাঁশবাবু, আপকি দর্শনই নেহি মিল্‌তি আজকাল।

এমনভাবে বলল, যেন আমি ওর একজন ইয়ার।

এইই কাজে কর্মে থাকি।

গোদা বলল, আমরা কি সব নিষ্কর্মা?

কথা ঘুরিয়ে বললাম, সিগারেট, এক প্যাকেট।

আর কথা না বলে, সিগারেট এগিয়ে দিতে দিতে দোকানের সামনে দাঁড়ানো একজন দেহাতী লোককে বলল, কান খোল্‌ কর শুনলে রে বাবুয়া, ই তেরা চ্যারিটিবল্‌ ডিস্‌পিন্‌সারী নেহি বা। রুপাইয়া সব্‌হি ওসুল করেগা হাম। যেইসা হো তেইসা। তেরা গরু ইয়া জরু ভি উঠানা হোগা ঘরসে, তো উভি উঠাকে লায়গা। ইয়াদ রাখ্‌না। গোদা শেঠ্‌সে মজাক্‌ মত্‌ উড়ানা।

এ লোকটা মানি ও'রাও-এর কীরকম আত্মীয় হয়। নামটা আমার জানা নেই, মহুয়া ডাঁরের রাস্তার কাছাকাছি থাকে।

করুণ গলায় সে বলল, কা করে মালিক্‌। ঈয়ে হাথনী ত জান খা লেল্‌। জিনোর সব্‌হি বরবাদ হো গেল্‌; সাঁওয়া ভি। ঔর কুছ রোজ মদত দে মালিক। তোরা গোড় লাগ্‌লথু।

গোদা শেঠ একটা অশ্রাব্য গালি দিয়ে লোকটাকে ওর সামনে থেকে সরে যেতে বলল, এবং সেই একই নিঃশ্বাসে আমার দিকে তাকিয়ে মেকী বিনয়ের গলায় শুধোল, চাত্‌রা থেকে ভাল মুগের ডাল এসে্‌ছে। লাগবে না কি?

এখন লাগবে না।

শেঠ হঠাৎ বলল, তিত্‌লি ভাল আছে? তারপরই ও যেন টেট্‌রার পরম হিতৈষী এমন স্বরে বলল, সেদিন টেট্‌রা বলছিল, আমার জওয়ান মেয়ে, বাঁশবাবুর বাড়ি কাজ করছে, বয়সও হল অনেক। অনেক আগেই বিয়ে দেওয়ার ছিল। নানাজনে নানা কথা বলতে পারে। বলে না যদিও। বাবু একেবারে একা থাকে ত!

একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি একটা পাত্র দেখেছি, ওর জন্যে!

খুব ভাল! কোথাকার পাত্র? কী করে? আমি বললাম।

ট্রাকের কুলি। গির্‌ধারী।

হেসে বলল, আপনার অসুবিধের কারণ নেই কোনো। আপনার সেবা যেমন করছে ও তেমনই করবে। ওর বাবাকে কেবল কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করা দরকার। বিয়েতে আবার কিছু ধারও দিতে হবে টেট্‌রাকে। হলে হবে। গাঁয়ের কোন্‌ লোকটাই বা না ধারে আমার কাছে?

ছেলেটা কেমন? ভালো ত?

ও বলল, ভালো। কাজ থাকলে দিনে চার টাকা ত পায় আমারই কাছ থেকে। কাজ অবশ্য রোজ থাকে না। ছেলেটা নরম-সরম। বোকা-সোকা।

তারপর বলল, ছোটলোক কুলি-মজুর কী আপনাদের মতো ভালো হবে? ওরা ওদেরই মতো ভালো। তিত্‌লির পক্ষে যথেষ্ট ভালো, টেট্‌রার মেয়ের বিয়ে আবার এর চেয়ে ভালো কী হবে?

ভালো হলেই ভালো।

বলেই, দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এসে ডেরার পথে পা বাড়ালাম।

বাড়ি পেঁৗছে বাঁশের বেড়ার দরজা দিয়ে উঠোনে ঢুকলাম। ঢুকেই চমকে উঠলাম।

আমার পায়ের শব্দ তিত্‌লি টের পায় নি। দেখি, ও বারান্দার কোণায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে, আমার ঘর থেকে দাড়ি কামানোর আয়নাটা এনে খুবই মনোযোগ সহকারে নিজের মুখ দেখছে।

ডাকলাম, তিত্‌লি।

তিত্‌লি চম্‌কে উঠে পিছন ফিরল।

ও খুব সুন্দর করে সেজেছিল। সামান্য আভরণে ও আবরণে। প্রায় শূন্য প্রসাধনে। কিন্তু ওর কাটা-কাটা চোখ মুখকে, ওর বুদ্ধি এবং বন্য সরলতা এক আশ্চর্য অদৃশ্য প্রসাধনে প্রসাধিত করেছিল।

সাত সকালে এত সাজ-গোজ কিসের? তোর বিয়ে কি এক্ষুণিই হচ্ছে? রান্না-বান্না করেছিস?

বিয়ে?

ও অবাক ও আহত গলায় শুধোল আমাকে।

তারপর বিষণ্ণ মুখ নামিয়ে বলল, রান্না হয়ে এসেছে। আধঘণ্টার মধ্যেই খাবার দিতে পারব।

একটু চুপ করে থেকে বলল, এক্ষুণি কি খাবে?

বললাম, মুনাব্বর ভাইয়াও খেতে পারে আমার সঙ্গে। সেই বুঝে রাঁধ।

তিত্‌লি প্রথমে ধীর পায়ে, তারপরই এক দৌড়ে ভিতরে চলে গেল। ওর প্রতি আমার এই অকারণ এবং এই আকস্মিক রুক্ষ ব্যবহারে অত্যন্ত বিস্মিত হলাম নিজে। আয়নাটা তুলে নিয়ে নিজের মুখ দেখতে লাগলাম।

আশ্চর্য!

মাঝে মাঝে আমারই আয়না আমাকে অন্য এমন এমন লোকের মুখের ছবি দেখায়, যাদের সঙ্গে আমার কোনোই মিল নেই, যাদের আমি বুঝতে পারি না; এমন কি চিনি না পর্যন্ত! ভাবছিলাম, আমি কি নিজেকেই জানি? কেউ-ই কি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জানে?

কবে, কখন, যেন আমার অলক্ষ্যে এই আয়নাটার পিছনের লাল-রঙে-মোড়া পারাটুকু নানা জায়গাতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে। ভাবছিলাম, আয়নার পিছনের পারা তো দেখতে পাই সহজেই, কিন্তু আমার মনের ওপিঠে যে পারা লাগানো আছে তা দেখতে পাই না কেন? যদি সে পারা উঠে যায়, ক্ষয়ে যায় কখনও; আয়নার পারার মতোই, তাহলে আমিও কি পারা-খসা আয়নার মতোই স্বচ্ছ হয়ে যাব? আমার মনের মধ্যে অন্য কোনো মন বা মনের ছায়াকে কি ধরে রাখতে পারব না আর? মাঝে মাঝে বড় উদ্বেল হয়ে উঠি, বড় অস্থির; চঞ্চল। তখন মনে হয় যে অদৃশ্য মনের জায়গায় একটা দৃশ্যমান স্পর্শ-গ্রাহ্য আয়না থাকলে, অনেক অনেক বেশি খুশি হতাম।



সেদিন বোধহয় শুক্রবার, হাটবার ছিল। হুলুক্ পাহাড় থেকে ট্রাকে করে ভালুমারে ফিরতেই দেখি, আমার ডেরার বাইরে কোম্পানীর একটি ডিজেলের জীপ দাঁড়িয়ে। সিং ড্রাইভার খৈনী মারছিল দু হাতের তেলোয়, জীপে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ডেরার উঠোনের কাঠের বেড়াতে তিনটি রঙিন শাড়ি মেলা ছিল। প্রায় শুকিয়ে এসেছে শাড়ি-গুলো। এক্ষুণি তুলে না নিলে হিমে ভিজে যাবে।

ঘাবড়ে গিয়ে, সিংকে শুধোলাম, কি ব্যাপার? সিং বলল, আপ্কি মেহমান্ লোগ ডালটনগঞ্জ আয়ে থে।

কাঁহাসে? অবাক হয়ে শুধোলাম আমি।

রাঁচি হোকে আয়েথে, সায়েদ কলকাত্তাসে। হুঁইয়েসে মালিক জীপোয়া দেকর্ উন্‌লোগোঁকো হিঁয়া ভেজিন্। মালিক বলিন্ কী, জীপোয়া যব্‌তক্ মেহমানলোগ রহেঙ্গে; তবতক্ উনলোগোঁকা ঘুমানা-ফিরানাকে লিয়ে আপ্‌হিকা পাস্ রাখ্‌নেকে লিয়ে। চার রোজ বাদ ইসী জীপোয়াসে উনলোগোঁকো রাঁচী ছোড়্কর আয়েঙ্গা।

উঠোনে ঢুকতেই দেখি ছোটমামা ও ছোটমামী মোড়া পেতে বসে চা খাচ্ছেন আর তিত্‌লির সঙ্গে গল্প করছেন। একজন ভদ্রলোক ওদের পাশে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে বসে কাগজ পড়ছেন। ইংরিজী খবরের কাগজ। বোধহয় রাঁচী থেকে নিয়ে এসেছিলেন।

ছোটমামা বললেন, আয়, আয়, দ্যাখ্ কেমন জাঁকিয়ে বসেছি আমরা।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন আমাকে। আমারই সমবয়সী হবেন উনি। তবে অনেক কেতাদুরস্ত। চেহারাও সুন্দর। আন্দাজে বুঝলাম, ইনিই আমার হবু-স্ত্রীর দাদা।

ছোটমামা আলাপ করিয়ে দিলেন, এই যে রণদেব চ্যাটার্জী।

আমি প্রতি নমস্কার করলাম।

আমার ঘর থেকে এক ভদ্রমহিলা বেরোলেন বোধহয় ঘুমোচ্ছিলেন। চোখ ফোলা ফোলা, চুল উস্কো-খুস্কো। সিঁথিতে সিঁদুর ছিল না। আজকাল মেয়েরা বিবাহিতা কিনা সিঁথি দেখে তা বোঝার উপায় নেই। একটা হলুদ-লাল ছাপা শাড়ি পরে ছিলেন।

উনি হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, আমার নাম বাণী।

রণদেব আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন, আমার স্ত্রী।

আবার নমস্কার করলাম আমি। তারপর বোকার মতো বললাম, আগে খবর দিয়ে এলেন না? কত না অসুবিধে হল আপনাদের।

কিসের অসুবিধে? কী দারুণ জায়গায় থাকেন আপনি। আমার তো ইচ্ছে করছে এখানেই থেকে যাই সারাজীবন।

রণদেব বললেন।

কলকাতা থেকে দু-একদিনের জন্যে এসে সকলেই এমন বলেন। সত্যি সত্যিই সারা- জীবন থাকলে হয়তো নির্বাসন বলে মনে হবে।

রণদেববাবু আমার মোটা কাপড়ের পায়জামা, দেঁহাতী সবুজ-রঙা খদ্দরের ইস্ত্রি-বিহীন পাঞ্জাবি এবং ধুলিধুসরিত চটি এবং হয়তো আমার চেহারা দেখেও মনে হল, একটু শক্‌ড্‌ হলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলেও নিলেন।

বাণী ঘরের ভিতরে অদৃশ্য কাউকে উদ্দেশ্য করে ডাকলেন, এই জিন্‌ বাইরে আয়। ভিতর থেকে রিন্‌-রিনে স্বরে একজন নারীকণ্ঠে উত্তর দিলেন, আর একটু ঘুমুতে দে বৌদি! এতখানি পথ জীপে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এসে হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে। এই জঙ্গলে তো আর পালাতে পারব না কোথাওই। আসছি একটু পরে।

কথা শুনে আমি লজ্জিত হলাম। আমার বাসস্থান, পথ এবং হয়তো আমারও কারণে ভীতও হলাম। ভদ্রমহিলা কী খুবই চটে রয়েছেন আমার সঙ্গে বিয়ের কথা হওয়ায়?

মেয়েটির গলার স্বর খুবই ভালো লাগল। গলার স্বর শুনেই আমি মোটামুটি বুঝতে পারি কে কেমন দেখতে, কার কেমন স্বভাব। অন্তত এতোদিন ভাবতাম যে, পারি।

এই ভগ্নকুটিরে কলকাতাব মহিলাদের পদার্পণ এই-ই প্রথম। লজ্জা, আনন্দ এবং ভয় মিলে-মিশে আমি কেমন বোকা বোকা হয়ে গেলাম। আয়নাটা কাছে থাকলে একবার নিজের মুখটা দেখে নিতাম, কেমন দেখাচ্ছে। কিন্তু আয়না যে ঘরে, সেই ঘরেই যে—আমার আয়না হবে; সে শুয়ে আছে। যে—ঘরে একজন অনাত্মীয়া এবং অপরিচিতা মহিলা শায়িতা অবস্থায় আছেন সেই ঘরে এখন ঢোকা যায় না। যদি সে ভবিষ্যতে পরমাত্মীয়া হয়েও ওঠে, তবেও না।

ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে।

তিতলি আমাকে চা এনে দিল। ওর মুখ দেখে মনে হল, ও আজ দুপুরে খাওয়ার সময় পর্যন্ত পায় নি, ওকেও কেমন বোকা বোকা দেখাচ্ছিল। আমি চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে উঠোনের এক কোণায় তিতলিকে ডাকলাম। ফিস্‌ফিস্‌ করে বললাম, কী কী সওদা করতে হবে বল্‌। এক্ষুণি বেরোব আমি। ও বলল, ডালটনগঞ্জ থেকে ও'রা বারোটা মুরগী, ছোটো এক ঝুড়ি ডিম, কিছু আলু পেঁয়াজ, অন্যান্য আনাজ এবং তিন কেজি মতো পাঁঠার মাংস জীপেই নিয়ে এসেছেন। যেমন ঠাণ্ডা আছে এখন, তাতে রান্নাঘরের জাল-লাগানো জানালার সামনে জিনিসপত্র রেখে দিলেই হবে। বেশ ক'দিন স্বচ্ছন্দে রাখা চলবে।

রণদেববাবু বাণীকে বললে, তুমি বলছিলে হাঁটতে যাবে। চল একটু হেঁটে আসি। জিন্‌কেও ডেকে নাও। একি? গৃহস্বামী এলেন, এখনও বিছানা ছেড়েই উঠল না?

বাণী বললেন, তুমি কি এই ভাবেই যাবে?

এখানে আর কে দেখবে? দেখছ না সায়নবাবু কী রকম নন্‌শালান্টলি শ্যাবী পোশাকে রয়েছেন। এই একটা মস্ত আনন্দ এখানে।

আমার দিকে ফিরে বললেন, কী বলুন সায়নবাবু? সমাজ নেই, সংস্কার নেই, এখানে যা ইচ্ছে তাই-ই করা যায়।

মনে হল, কথাটা বলতে বলতে আমার পাশে দাঁড়ানো তিতলির দিকে তাকালেন উনি এক বিশেষ চোখে।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হাসলাম। বললাম, যা বলেছেন।

একটু পরে জিন্ নামক, ফোটোতে দেখা মহিলাটি ঘর থেকে বেরোলেন। দেখলাম উনি তাঁর নিজের ফোটোর চেয়েও সুন্দরী। ঘর থেকে বেরোবার আগে চুল ঠিক করেছেন, হাল্কা পাউডারের প্রলেপ বুলিয়েছেন মুখে, চোখে কাজল দিয়েছেন। ফিকে সবুজ তাঁতের শাড়ি, গাঢ় সবুজ ব্লাউজ, পিঠময় খোলা চুল। বেশ বুদ্ধিমতী, রুচিমতী চেহারা। প্রথম দেখাতেই ভালো লাগল খুউব। ফোটোটাতে প্রাণ ছিল না। জিন্ সশরীরে এসে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন।

মন বলে উঠল, এখনই গায়ে হলুদের সানাই বাজা উচিত।

উনি হাত তুলে নমস্কার করলেন। বললেন, আমার নাম জিন্। ভাল নাম দময়ন্তী। আপনাকে কেমন জ্বালাতে এলাম আমরা। সত্যি সত্যিই যে আসব, তা নিশ্চয়ই ভাবতে পারেন নি।

কী বলব ভেবে পেলাম না। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, আমার সৌভাগ্য!

বাণী কথাটা শুনে ঠাট্টা করে বললেন, শুনলি। তুই তাহলে সৌভাগ্যও বয়ে আনতে পারিস কারো কারো জন্যে। এতোটা জানতাম না।

আরও লজ্জিত হলাম। বাঁশবাবুর সর্বাঙ্গে লজ্জার ফুল ফুটল। এবার মরণ!

জিন্ আমাকে উদ্দেশ্য করেই বললেন, আপনি বরং ফ্রেশ হয়ে নিন, আমরা একটু হেঁটে আসছি। রাস্তা ভুলে যাবো না তো?

জিনের কথার পিঠে বাণী বললেন, এখানে, এতদূরেই যখন পথ চিনে আসতে পারলি তখন এই বাড়ির বাইরে গিয়েই যে রাস্তা ভুলবি এমন সম্ভাবনা আছে বলে তো মনে হয় না।

বলেই, জিনের দিকে চোখ ঠেরে বললেন, চল্ এগোই!

ওঁরা তিনজন এগোলেন।

বণদেব থেমে দাঁড়িয়ে, তিতলিকে বললেন, একঠো লাঠি-টাঠি হ্যায়?

তিতলি না বুঝে, বোকার মতো তাকিয়ে রইল।

আমি ঘর থেকে একটি বাঁশের ছোট-লাঠি নিয়ে এলাম।

লাঠি কি করবেন?

যদি সাপ-টাপ—

শীতকালে সাপের ভয় নেই।

খারাপ লোক-টোক।

জঙ্গলে খারাপ লোকও নেই। তারা সবাই শহরে থাকে।

তা ঠিক, আপনার মালিককে দেখে, আপনাকে দেখে, এবং তিতলিকে দেখেও এ কথাটা এতক্ষণে বোঝা উচিত ছিল। তাহলেও এটা নিয়েই যাই, সাহস দেবে। শহরের লোক তো, জঙ্গলে এলেই ভয়ে হাত-পা কেমন ঠান্ডা মেরে যায়।

ওঁরা চলে যেতেই ছোটমামীমা বললেন, কিরে খোকা? কেমন দেখলি?

বললাম, তোমরা দেখেছো, তার ওপর আমি আর কী দেখবো? ফোটো তো আগেই দেখেছি! আমার এই ভাঙাচোরা ঘর, জংলী চেহারা ও পরিবেশ এসব ওঁরই এবং ওঁদেরই দেখার। এমন শহুরে সফিস্টিকেটেড্ মেয়ের কী আমাকে পছন্দ হবে?

মামীমা রেগে বললেন, তার দাদা-বৌদির ও তার তোকে যদি পছন্দই না হবে, তাহলে কি আর তোর বাড়ি দেখতে আসে? এতদূর কি এগোতে পারে কেউ? তা-ছাড়া...বলেই থেমে গেলেন। আমি বলি কি, এখন তোরা একটু মেলামেশা করে নে। দু-জনেরই বয়স হয়ে গেছে। শেষে বাবা, বলিস না যে, মা-বাপ মরা ছেলেকে মামা-মামী জোর করে খারাপ

মেয়ে গছালো। জিনটাকে তো ছোটবেলা থেকেই দেখছি। একটু পাগলী-পাগলী এই যা দোষ। আমার দূরসম্পর্কের খুড়তুতো দাদার মেয়ে। গোখলেতে পড়ত। দক্ষিণীর ডিপ্লোমা আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে। ওর বাবা-মাকে আমি জানি! জীবুদা নেই এখন। থাকলে মেয়ের বিয়েতে খুবই ঘটা করতেন। জিন্ যখন স্কুলে পড়ে, তখনই মারা যান উনি ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াতে। সঞ্চয় যা ছিল সবই গেছে। তবে রণ বড় ভালো ছেলে। ও-ই সব দায়িত্ব নিয়েছে এবং নেবে যতটুকু পারবে, নিশ্চয়ই করবে বোনের বিয়েতে।

একটু পরে বললেন, ও, শোন্ খোকা, ভুলেই গেছিলাম। আমি কিন্তু বলেছি, তোকে একটা মোটর সাইকেল দিতে হবে। বনে-বাদাড়ে হেঁটে হেঁটে বেড়াস।

আমি স্তম্ভিত হলাম বললাম, সে কী? পণ চেয়েছ তুমি-তোমার খুড়তুতো ভাইপোর কাছ থেকে ভাগ্নের জন্যে! ছিঃ ছিঃ ওসব কিছু লাগবে না। ভারি অন্যায়। ছিঃ! ও'রা কী ভাবলেন আমাকে। ভদ্রলোকে পণ নেয় নাকি?

ছোটমামা প্রচণ্ড কবি প্রকৃতির মানুষ। ছেলেবেলায় গিরিডিতে থাকাকালীন একটা কবিতা লিখেছিলেন :—

ঐ যে ঐ নীল পাহাড়টার গায়
এক সারি বক চলছে ভেসে,
যেন কুন্দফুলের মালা...” ইত্যাদি ইত্যাদি

মায়ের মুখে শুনেছিলাম সেই কবিতার কথা!

ছোটমামা বললেন, বাঃ সামনের ঐ পাহাড়টার নাম কি রে? কী উঁচুরে পাহাড়টা!

ওর নাম হুলুক্! নিয়ে যাব তোমাদের একদিন।

বাঃ বাঃ। কী সুন্দর নাম।

বুঝলাম শহরে-থাকা ছোট মামার এই রকম জায়গায় পৌঁছেই ইঁট-চাপা কবিত্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। পাহাড় দেখেও যে বাঙালির কবিত্ব জাগে না মনে, তাঁর বাঙালিত্ব সম্বন্ধে অবশ্যই সন্দেহের কারণ থাকে।

কাল সকালে আমি হেঁটেই চলে যাব। কতদূরই আর হবে, আধ মাইলটাক? সে আর কি। কী বল্?

ছোটমামা উত্তেজনার সঙ্গে বললেন।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পালামৌ পড়োনি বুঝি? পাহাড়ের দূরত্ব অমনি মনে হয়। ঐ পাহাড় দশ মাইল দূরে। আর একা যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ওখানে নানারকম হিংস্র জানোয়ার আছে। বড় বাঘের জায়গা ওটা।

ইন্টারেস্টিং। তোর মা থাকতে তাকে এখানে একবারও আনলি না। বুবুকে নিয়ে এলে বড় খুশি হতো। জানিস, আমাদের গিরিডির খাণ্ডুলী পাহাড়টা...আর উশ্রী নদী ..।

ছোটমামীমা বললেন, তুমি চুপ করবে, আবার গিরিডিতে পেল। তারপরই আমার দিকে ফিরে বললেন, তোর মামা-মাসীদের এই গিরিডি দুর্বলতা একটা রোগ বিশেষ। পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ভালো; সবই গিরিডির মতন। দেখছিস খোকা?

হাসলাম আমি।

ছোটমামা বললেন, যাক গে। তুমি যখন এসে গেছো, তখন খোকাকে এ-ক'দিন একটু ভালো-মন্দ রেঁধে খাওয়াও। বুবু যেমন রাঁধত তেমন ভুনি খিচুড়ি, কড়াইশুঁটির চপ্। এখানে খাঁটি গাওয়া-ঘি নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। ভালো করে কিস্মিস্ দিয়ে মোহন-

ভোগ। পাটিসাপ্টা, ক্ষীরের পুলি, চুষি, সমস্ত। বেচারি ফাঁকে পড়ে আছে। কিছুই খেতে পায় না।

ছোটমামীমা বললেন, আরম্ভ হল খাওয়ার বিবরণ। তোমাদের মতো পেটুক আর খাদ্যবিলাসী পরিবার আমি আর দেখি নি বাবা!

ছোটমামা হঠাৎ চটে গিয়ে বললেন, দ্যাখো নি ত দ্যাখো। তোমরা বাঙালরা তো কোয়ান্টিটিতে বিশ্বাস কর; কোয়ালিটির তোমরা কী বুঝবে?

দুজনের দিকে দুহাত তুলে বললাম, ব্যস্, ব্যস্ আর নয়।

তুই যা, মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নে খোকা। লজ্জা তো যত তোরই দেখছি বেশি। আমার ভাইঝি তো তুবড়ির মতো কথা বলে হৈ হৈ করে বেড়াতে চলে গেল।

লজ্জা তো আমার হবারই কথা। আমাকেই তো দেখতে এসেছেন ও'রা। আজকাল নিয়ম-কানুন সব পাল্টে গেছে। বুঝেছো ছোটমামী।

বুঝেছি। এবারে যা তুই। জামাকাপড় ছাড়।

ছোটমামা বললেন, তোদের কোম্পানীর মালিক লোকটি বড় ভালো রে। এত বড় কাজ সামলাচ্ছেন। দেখেও আনন্দ হয়। আমার কাছে যেই শুনেছেন যে, তোর বিয়ের ব্যাপারে আমরা এসেছি, অমনি কী উৎসাহ! জানিস, আরও একটা কথা বললেন, আমাকে আলাদা ডেকে। বললেন, আমাকে বরযাত্রীর নেমন্তন্ন করবেন তো? আর বো-ভাত কিন্তু ডালটনগঞ্জেই হবে। যতজন খুশি কনের বাড়ির লোক নেমন্তন্ন করবেন। থাকা, খাওয়া, জঙ্গল দেখানোর সব ভার আমার। মুখার্জীবাবুর বড়ই কষ্ট হয় একা থাকতে এই জঙ্গলে। বউ না থাকলে মানুষ কি একা একা থাকতে পারে? লাগান, লাগান, বিয়েটা লাগান। আমি একপায়ে খাড়া আছি মদত দেবার জন্যে।

ঘরে গিয়ে দেখলাম, বেডকভারের আড়াল থেকে বালিশ দুটো টেনে বার করা। ননদ আর বৌদি বোধহয় পাশাপাশি শুয়ে ছিলেন। বিছানাটাতে শুয়ে থাকার চিহ্ন স্পষ্ট। কুঁকড়ে-মুকড়ে আছে বেডকভারটা। ডানদিকের বালিশে একগুচ্ছ বড় কালো চুল চোখে পড়ল লণ্ঠনের আলোতে। নিশ্চয়ই জিনের চুল। চুলটা নাকের সামনে তুলে ধরলাম। কী সুন্দর গন্ধ। কি তেল? খুব চেনা চেনা গন্ধ—মনে পড়েছে। কেয়ো-কার্পিন। দে'জ মেডিকেলের তৈরি। মা মাখতেন এই তেল। বালিশটা তুলে নাকে গন্ধ নিলাম। সমস্ত বালিশটা গন্ধে ম'ম করছে। বালিশটাকে ধরে মনে হল জিন্ নামক একজন অনাত্মীয়া-অপরিচিতা-কুমারী মেয়ের সঙ্গে আমার সহবাসই বুঝি সম্পূর্ণ হল। গা শিউরে উঠল ভালোলাগায়। এক নিষিদ্ধ না-হওয়া সম্পর্কে। চুলটিকে সযত্নে আমি আমার পার্সের ভিতরের খোপে ভরে রাখলাম। আমার প্রতীক্ষার সহচরী। সময় বাকি নেই বেশি।

আলমারি খুলে বিছানার চাদর ও বালিশ বের করলাম। কম্বল ও কিছু বালিশ ও'রা নিয়ে এসেছেন। সামান্য বিছানাও। তাড়াতাড়ি টর্চ হাতে জীপে করে বেরিয়ে পড়লাম চৌপাই-এর খোঁজে। রথীদার বাড়ি যেতে হবে!

আগামীকাল পূর্ণিমা। সন্ধ্যে হতে না হতেই ফুট্‌ফুট্ করবে জ্যোৎস্না আজকে। মানিয়ার বাড়িও একবার ঘুরে আসতে হবে। কাল থেকে চারদিন অনেক বেশি দুধ দিতে বলতে হবে ওকে। আনাজ-টানাজও যদি কিছু পাওয়া যায়। গাড়ুর রেঞ্জার সাহেবের কাছে পাঠাতে হবে সিংকে, লেবু ও আমলকীর আচারের জন্যে। মানিয়ার ক্ষেতে ভাল কড়াইশুঁটি হয়। বেশী করে পাঠিয়ে দিতে বলব, যাতে ছোটমামার কড়াই-শুঁটি-ছাড়ানো খিচুড়ি আর কড়াইশুঁটির চপ্-এর অভাব না ঘটে।

রথীদার বাড়ির দিকে সিং-এর পাশে জীপের সামনের সিটে বসে যেতে যেতে আমার

মন খুশিতে ভরে উঠল। আমি যে এত কল্পনাপ্রবণ, এমন ছেলেমানুষ তা জিন্ আমার এখানে না এলে বুঝতে পারতাম না। জন্ম-রোম্যাণ্টিক আমি। মামাবাড়ির রক্ত বইছে আমার শরীরে। আমি যে এমন প্রেমিক তা-ও আমি জানতাম না; নইলে একটি চুল আর একটি চুলের গন্ধমাখা বালিশ নিয়ে একটু আগেই যা করলাম, তা কেউ যে এ বয়সে পেঁছেও করতে পারে তা বিশ্বাস পর্যন্ত হত না।

আমি কি পার্ভার্ট্?

নিজেই নিজেকে শুধোলাম।

তারপর নিজেই আবার নির্জন বনপথে নিজেকে আশ্বস্ত করে বললাম, নিজের ভাবী-স্ত্রীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখাটা কি পার্ভার্সান? হতেই পারে না।

রথীদা তো খবর শুনে লাফালাফি শুরু করে দিলেন। তাঁর লোকটিকে জোর করে পাঠালেন। একসময় এক সাহেবের কাছে বাবুর্চি-কাম-বেয়ারার কাজ করত সে। চাকর আর মালীর মাথায় চারটে চারপাইও। বললেন, যে ক'দিন ও'রা আছেন আমিই না হয় তোর ওখানে গিয়ে খাব। শহরের লোক, তার ওপরে তোর পরমাত্মীয়। তোর মামা-মামীও এসেছেন, ও'দের খাতির না করতে পারলে তো আমাদেরই বে-ইজ্জৎ। পুরো ভালুমার বস্তির বে-ইজ্জৎ!

রথীদা কোনো কথাই শুনলেন না। আমার সব প্রতিবাদ উড়িয়ে দিয়ে বললেন, আর একটাও কথা বলবি তো মার খাবি আমার কাছে।

মামীমা আর রথীদার রাঁধুনী রান্নাঘরে। তিতলি যোগান দিচ্ছে। আমি আর ছোটমামা বাইরের বারান্দায় ছাদের নিচে ইজিচেয়ারে ভালো করে র‍্যাপার মুড়ে বসে আছি। ছোটমামাকে আমার বাঁদুরে টুপিটা পরতে দিয়েছি। বয়স হয়েছে প্রায় ষাট। হঠাৎ ঠান্ডা লাগলে মুশকিল হবে এখানে। রথীদার চাকর, মালী এবং তিতলি মিলে হাতে হাতে সব ঘরে ঘরে বিছানা-টিছানা করে দিয়েছে। ঠিক হয়েছে, আমি রথীদার কাছে গিয়ে শোব। আমার এতটুকু বাড়িতে এত লোকের জায়গা হবে না।

টেটরা এসব কিছুই জানত না। ও এসেছিল সন্ধ্যার পর পরই তিতলিকে নিতে। আমি বলে দিয়েছি তিতলি এ-ক'দিন আমার এখানেই থাকবে। ওকে পার্স্ বের করে কুড়িটা টাকাও ধরে দিয়েছি এ-ক'দিন ওদের খাওয়া-দাওয়ার জন্যে। তিতলি তো আর এ-ক'দিন খাওয়া নিয়ে যাবে না বাড়িতে।

আমি যে এমন বড়লোক ছিলাম বা হয়েছি তা আগে আমার নিজেরই জানা ছিল না। শুধু ধনে বড়লোকই নই, মনেও। চমৎকার লাগছে। বাইরে একটা লক্ষ্মীপেঁচা উড়ে উড়ে ডাকছে। চাঁদের আলোয় তার হিমভেজা সাদা ডানা দুটিকে স্বপ্নময় দেখাচ্ছে। ডাকবেই। লক্ষ্মীছাড়ার বাড়িতে লক্ষ্মী এসেছে যে, তা লক্ষ্মীপেঁচাটার অগোচর থাকবার কথা নয়। আফটার অল, ওতো আমাদের ভালুমারেরই একজন। ছোটমামা, রথীদার পাঠানো একটা সিগার ধরিয়েছেন। আমরা তিতলির বানানো গিরিডি-স্পেশাল চা খেয়ে কাপ দুটি নিচে নামিয়ে রেখেছি এমন সময় শীতের স্তব্ধ, হিমঝরা, ঝিঁঝি-ডাকা ভালুমারের রাতকে মথিত করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলি ভেসে এল বাইরে থেকে। ও'রা বাড়ির দিকে আসছেন।

কে যেন গাইছেন,..."হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে। হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে, ঘিরে ঘিরে।" আরও কাছে এসেছেন ও'রা। "দেবতারা আজ আছে চেয়ে, জাগো ধরার ছেলে মেয়ে, আলোয় জাগাও যামিনীরে।

ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো 'দীপালিকায় জ্বালাও আলো, জ্বালাও আলো, আপন আলো, জয় করো এই তামসীরে...।"

আমার কল্পনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। তামসীকে দূর করতেই তো তুমি এসেছো জিন্, এতদূরে; আমি তা জানি। আমি সবই জানি। তোমার কাছে কৃতজ্ঞতার আমার শেষ নেই।

ছোটমামা বললেন, জিন্ গাইছে, গলা চিনতে পারছিস?

মনে মনে বললাম, তোমার খুড়তুতো শালার মেয়ে সে হতে পারে বটে, কিন্তু আমারও কিছু পর নয় জিন্। বুঝলে, ছোট মামা।

মুখে কিছুই বললাম না।

আরো চেয়ার আনালাম বারান্দায়। একটা ফাঁকা চৌপাইও। চৌপাইতে আমিই বসব। যদি ছারপোকা থাকে? তাহলে আমার ভাবী-স্ত্রীর সুন্দর নরম শরীর জ্বলতে থাকবে ছারপোকার কামড়ে। আমি বেঁচে থাকতে এমনটি হতে দিতে পারি না। আমি বন-বাদাড়ের বাঁশবাবু। আমার শিভাল্‌রী আর কী? ঐটুকুই! এইটুকুই করি নিজের কাজে নিজেকে বড় করার জন্যে।

বাণী উঠোনে ঢুকেই বললেন, কই সায়নবাবু, ঠান্ডায় যে জমে গেলাম! এতো ঠান্ডা, আগে বলবেন তো? জিন্ তো নেহাত গা-গরম করবার জন্যেই প্রাণের দায়ে চেঁচিয়ে গান জুড়ে দিল। আপনাদের এই ভালুমারের কুকুরগুলোর বোধহয় রবীন্দ্র-সঙ্গীতে এ্যালার্জি। এমন সমস্বরে চেঁচাতে লাগল না যে, কী বলব!

রণ বললেন, উ-হু-হু আমার নাকটাকে আর আমার নাক বলে মনে হচ্ছে না।

আমরা হেসে উঠলাম। ওরা ঢুকতে না ঢুকতেই তিত্‌লি ওদের হাতে হাতে গরম চায়ের গ্লাস ধরিয়ে দিল। আমার এখানে বেশি কাপ নেই। ওরা দু-হাতের তেলো দিয়ে গরম চায়ের গ্লাস জড়িয়ে ধরে গরম হতে চাইলো।

বললাম, শিগগিরী ভাল করে গরম জামা পরে নিন, ঠান্ডা লাগলে মুশকিল হবে। একশ মাইলের মধ্যে ডাক্তার নেই কিন্তু।

জিন্ বলল, শুধু ডাক্তার কেন? অন্য অনেক কিছুই নেই। সিনেমা নেই, শাড়ির দোকান নেই, ভেলপুরী বা ফুচ্‌কার দোকান নেই, কোয়ালিটির আইসক্রীম নেই। এখানের লোকেরা যা রোজগার করেন, সবই বোধহয় জমাতে পারেন। খরচ বলতে তো কিছুই নেই।

তা ঠিক। তবে এখানের লোকদের যা রোজগার তাতে জমাবার মতো কিছু হাতে থাকে না।

আপনাদেরও না?

রণদেববাবু জিগগেস করলেন।

আমি, আমার ইন্টারভ্যু খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে জেনেও বলে ফেললাম, আমাদেরও না। কী-ই বা রোজগার!

বাণী বললেন, আর এই যে পরিবেশ! এটা বুঝি কিছু নয়। এই পারকুইজিটের দাম বুঝি টাকা দিয়ে দেওয়া যায়?

তারপর, যেন জিন্‌কে শোনাবার জন্যেই বললেন, সাধ্যটা কখনই বড় কথা নয়; সাধটাই বড় কথা। আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, যে মানুষ এমন জায়গায় এতোবছর একটানা থাকতে পারেন, তার মধ্যে শ্রদ্ধা করার মতো অনেক কিছুই দেখি আমি। টাকা দিয়ে কী হয়? কতটুকু হয়? বেশি টাকা দিয়েই বা কী হয়!

তারপর চায়ে একটা হঠাৎ-চুমুক দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে জীবনে কে কী চায়? কেউ আপনার মতো এমন উদার উন্মুক্ত প্রকৃতি চায়, কেউ টাকা চায়, শহরের মধ্যের মাপা জীবন, মাপা হাসি, মেকী সংস্কৃতি চায়।

এটা এ্যাটিচ্যুডের ব্যাপার। আমার কিন্তু আপনার সঙ্গে ভীষণ মিল। এখানে না এলে যে কী হারাতাম, তা আমিই জানি।

এই হঠাৎ বাগ্মিতার কারণ বুঝতে না পেরে চুপ করেই রইলাম।

বাণী চেঁচিয়ে বললেন, জেঠিমা, আমরা চা'টা খেয়েই যাচ্ছি রান্নাঘরে আপনাকে হেল্প করার জন্যে। জিন্ কিন্তু কিছুই বলল না।

মামীমা বাইরে এসে বললেন, তোমাদের কাউকেই দরকার নেই। খোকা বাবুর্চি পর্যন্ত এনে ফেলেছে, লোকজনও। এতক্ষণ নিজে হাতে তোমাদের জন্যে বিছানা-টিছানা করে ফেলেছে। তোমরা হলে গিয়ে মহামান্য অতিথি। আমি রান্নাঘরে গেছিলাম খোকার ফেভারিট্ রান্না করব বলে। রাতে ভুনি-খিচুড়ি আর মুরগি ভাজা এবং আলু ভাজা হচ্ছে। তোমাদের মুখে রুচবে তো?

বাণী বললেন, আমরা তো রোজই পোলাউ-কালিয়া খাচ্ছি। মুখে এতো সাধারণ খাওয়া রোচা শক্ত।

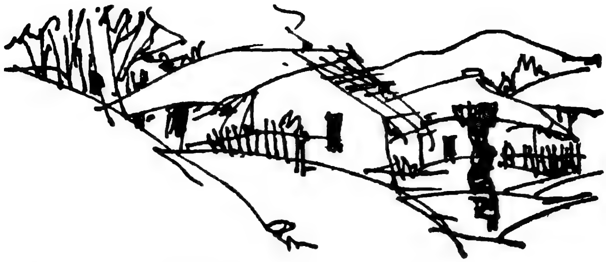
তুই বড় খারাপ বৌদি। আমার দাদা তো তোকে রানীর মতোই রাখে। তাতেও তোর অভিযোগ গেল না। জিন্ বলল।

মনে মনে বললাম, তোমাকেও রানীর মতো করেই রাখব জিন্। বাঁশবনের শেয়াল-রাজা বাঁশবাবু যতখানি পারে। কষ্ট দেব না কোনোই।

এমন সময় রথীদা এলেন। সিংকে পাঠিয়েছিলাম ওঁকে আনতে। রথীদা আসতেই সকলে তাঁর দারুণ ব্যক্তিত্ব ও মিশুকে স্বভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনিই হয়ে গেলেন সেন্টার অফ এ্যাট্রাক্শান। কেউই আমার দিকে আর একবার চেয়ে পর্যন্ত দেখছিলেন না।

রথীদার কাছে যাওয়াটাই ভুল হয়ে গেছে! কখনও নিজের চেয়ে বেশী ভালো লোককে আপারহ্যান্ড দিতে নেই। দিলেই, সমূহ বিপদ।

রথীদা অবশ্য আমার খুব প্রশংসা করছিলেন। কথায় কথায় সায়ন এই, সায়ন সেই। আমার নিজেকে খুব ছোট লাগছিলো। আমি যেন খারাপ ছাত্র। গ্রেস্ দিয়ে আমাকে কোনক্রমে পাশ করাবার চেষ্টা করছেন রথীদা।



রথীদা বলেছিলেন, জীপ যখন আছে, ও'দের মহ্য়াডাঁরে ঘ্রিয়ে আন্। কলকাতার লোকেরা অনেকেই পালামৌ দেখতে এসে বেত্লা দেখেই চলে যান। মহ্য়াডাঁর অবধি গেলে একেবারে ক্রস-কাণ্ট্রি ট্যুওর হয়ে যাবে। পথে হাতি তো নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন ও'রা। অন্যান্য জানোয়ারও দেখতে পারেন। মহ্য়াডাঁরে যাওয়া-আসাটাই একটা এক্সপিরিয়েন্স। সারাজীবন মনে রাখবার মতো।

সেদিন সকাল সকাল নাস্তা করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। স্টিয়ারিংএ সিং। তার পাশে ছোটমামা এবং জিন্। পিছনে আমি, রণবাব্ এবং বাণী। মামীমা আসেননি। বলেছেন, তোর মামা দেখলেই আমার দেখা হবে।

কৌটো করে কুচো নিম্কি, শেওই ভাজা, প্যাঁড়া এবং ফ্লাস্কে করে চা সঙ্গে নিয়েছি আমরা। জীপ ছাড়বার পর থেকেই পথের দ্-পাশে তাকিয়ে ছোটমামা কণ্টিনিউয়াসলি "অপ্র্ব" "অপ্র্ব" বলে চলেছিলেন। জিন্ চ্পচাপ। রণবাব্র কাঁধের ঝোলায় সালিম আলির বই বাইনাকুলার দামী ক্যামেরা। দেওঘরের কাছে রিখিয়াতে ও'র এক বন্ধ্র বাড়ি আছে। কবি বিষ্ণ্ দেরও বাড়ি আছে শ্নেছি ওখানে। প্রায়ই যান নাকি সেখানে বার্ড-ওয়াচিং-এর জন্যে। মাঝে মাঝেই আমাকে প্রশ্ন করছেন, এটা কি গাছ? ওটা কি নদী? এটা কি ফ্ল? ঐ রাস্তাটা কোথায় গেছে?

যথাসাধ্য জবাব দিয়ে যাচ্ছি। বাণী মন্ত্রম্গ্ধের মতো চেয়ে আছেন জীপের পিছনে বসে, ক্রমাগত ফেলে-যাওয়া পথের দিকে। পথের লাল ধ্লোর মেঘের উপর গাছ-গাছালির ফাঁক-ফোক দিয়ে রোদের ফালি এসে পড়ছে টর্চের তীক্ষ্ম আলোর মতো। অবাক চোখে বসে আছেন বাণী।

দেখতে দেখতে আমরা দিঠিয়াতে এসে পেঁছিলাম। নদীর ওপরের কজ্ওয়েটা পেরিয়েই পথটা উঠে গিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়েছে। বাঁদিকে ছোট্ট ফরেস্ট বাংলো। কবরী ফ্লের গাছ রাধাচ্ড়া, হল্দ, করবীতে ভরে গেছে চারপাশ। বাংলোর ড্রাইভে সারি করে লাগানো ইউক্যালিপটাস্। বাংলোটা ও'রা নেমে দেখলেন। সামনে ছোট্ট বারান্দা, বড় বড় হাতাওয়ালা ইজিচেয়ার। সামনে একটা নিচ্ উপত্যকা মতো। আমরা গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াতেই এক-জোড়া চিতল হরিণ দৌড়ে চলে গেল। বাংলোর নিচের ঢালে লাগানো অড়হর খাচ্ছিল ওরা। হ্ল্ক্ পাহাড়টা এখানে আকাশ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। খ্বই কাছে। পাহাড়ের মাথায় গ্হাগ্লো দেখা যাচ্ছে অন্ধকার গহ্বরের মতো। একটা ঝর্ণা প্রায় পাহাড়ের মাথায়। এখন শ্কনো জলের সাদা দাগ দেখা যাচ্ছে কালো কালো বড় পাথরে।

ও'রা সকলেই আনন্দ উত্তেজনায় অস্থির। কেবল জিন্ নীরব। ম্খে কথা নেই। সঙ্গীদের ছেলেমান্ষী ও উৎসাহের আতিশয্যে কিঞ্চিৎ বিরক্তি এবং অবাক হওয়ার দৃষ্টি চোখে।

ভয়ে ভয়ে বললাম, এখানে কি আমরা একটু গান শুনতে পারি?

ন্যাকা-বোকা লোকেরা যেমন করে কথা বলে, তেমনই করে বললাম। জিন্ আসার পর থেকে সত্যিই ন্যাকাবোকা হয়ে গেছি।

বাণী বললেন, এই জিন্ শুনছিস? শোনা-না বাবা একটা গান।

অসম্ভব। আমার গলা ভীষণ খারাপ। গলায় ব্যথা।

একটু আগেই পথের বাঁদিকে মীরচাইয়া ফল্স্ দেখিয়ে এনেছি ওদের। প্রকাণ্ড এলাকা জুড়ে কালো চ্যাটানো পাথর। শীতে শুকনো। পিক্নিক্ করার আইডিয়াল জায়গা। একটি ধারায় জল পড়ছে এখন। বর্ষাকালে ও পুজোর সময় এলে জলে ঢাকা থাকে পুরো জায়গাটা।

বাণী বললেন, আমরা ফেরার সময় এখানে বসে চা খাব কি সায়নবাবু?

যথা আজ্ঞা।

বললাম, মহুয়াড়াঁর অনেক দূরের পথ। এমন ভাবে থেমে থেমে গেলে ফিরতে কিন্তু রাত হয়ে যাবে। তাছাড়া বাড়েষাঁর ঘাটের রাস্তাও খুব খারাপ। খুবই উঁচু ঘাট। রাস্তা ত বরাবরই কাঁচা। হাতির উপদ্রবও আছে, তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরাই ভাল। সিংও তাড়া দিতে লাগল বারবার। হাতিকে বড় ভয় পায় ও। একবার ওর জীপ উল্টে দিয়েছিল! তাই বেশিক্ষণ থাকা হল না ওদের নিরবুদিয়া ফল্স এবং দিঠিয়াতে। বাংলো ছাড়িয়ে এসেই পথটা দুভাগ হয়ে গেছে। বাঁদিকের পথ চলে গেছে রুদ্ হয়ে লাত্। আর ডানদিকে বাড়েষাঁর-এর রাস্তা। বাড়েষাঁর যাবার গেট পেরিয়ে আমরা ঘাট চড়তে শুরু করলাম। ঘাটে ভীষণ শীত, একটুও রোদ নেই। গভীর জঙ্গলে-ঘেরা ছায়াচ্ছন্ন বন-পথ। মারুমারের কাছ থেকে একটা পথ জঙ্গলে জঙ্গলে চলে গেছে নেতারহাট। আরেকটা পথও গাড়ুর আগে থেকে চলে গেছে বানারীতে। সেখান থেকে ডানদিকে গেলে নেতারহাট, আর বাঁয়ে গেলে লোহারডাগা। পথটা বারেবার নানা পাহাড়ী নদীর ওপর দিয়ে চলে গেছে। একটা নদীর পাশে কতগুলো তাগড়া পোষা মোষ চরছিল। ছোটমামা চেঁচিয়ে উঠে সিং-এর স্টিয়ারিং-এ থাপ্পড় মেরে বললেন, বাইসন! বাইসন! স্টপ্!

এ্যাক্সিডেন্ট হতে হতে বেঁচে গেল খুব জোর। সিং বিরক্ত হল।

বাণী বললেন, খুব ফাঁড়া কাটল। জীপটা একটু বাঁদিকে রাখতে বলুন, একটু চা খাওয়ানো যাক সিংকে। খুবই চটেছে।

জীপ থামানো হলো। ছোটমামা ও রণবাবু নেমে নদীর ওপরের ব্রিজে দাঁড়িয়ে ছোট-মামার "বাইসন" দেখতে লাগলেন। গলায় কাঠের ঘণ্টা-বাঁধা বড় বড় মোষ পুট্-পাট্ করে ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছিল! গলার কাঠের ঘণ্টা বাজছিল গম্ভীর বিধুর টুং টাং শব্দ করে, নদীর পাশের জঙ্গলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

হঠাৎ রণবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, এই যে, সায়নবাবু দৌড়ে আসুন। এটা কি পাখি? বলেই, আমার যাওয়ার অপেক্ষা না রেখেই সালিম আলির বই খুলে ফেললেন। একবার বাইনাকুলার দিয়ে দেখেন আর একবার বইয়ের পাতা ওলটান। ঘন ঘন। বার বার।

আমি ওঁদের চায়ের গ্লাস হাতে করে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম।

পেয়েছি, পেয়েছি।

বললাম, পাখিটা কোথায়?

ঐ তো! বলে উনি আঙুল দিয়ে দেখালেন দুটো পাখি। উনি বই-এর পাতা থেকে নামটা পড়েই, আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক্ করলেন। গ্লাস থেকে চা চল্কে পড়ল বাইনাকুলারে।

মিনিভেট্কে, স্কার্লেট বললে ঠিক বোঝানো যায় না। একেবারে অরেঞ্জ ফ্লেম্

কালার। পুরুষ পাখিটার ঐরকম রঙ, কিন্তু স্ত্রীর রঙ হলুদ। ডানাতে চীনাবাদামের খোসার রঙের খয়েরী মোটা বর্ডার দেওয়া।

রণবাবু বললেন, কোথায়ও দেখি নি কখনও, এমনকি রিখিয়াতেও না।

তক্ষুণি পাখিদুটো জংলী আমের ডাল ছেড়ে উড়ে গেল।

ওগুলো কি গাছ? এ্যাকাসিয়ার মতো অনেকটা। জানেন, একরকমের হলুদ এ্যাকাসিয়া হয় আফ্রিকাতে, নাম ইয়ালোফিভার এ্যাকাসিয়া। জলের কাছাকাছি হয়।

জানি না। এখানে তো দেখি নি।

এখানে কোথায় দেখবেন? ও তো আফ্রিকার গাছ। সোয়াহিলীতে বলে, মিগুংগা। রুয়েঞ্জোরী রেঞ্জ, চাঁদের পাহাড়, মানে মাউণ্টেন অফ দ্যা মুন, আর কিলিম্যান্জারোর কাছেও অনেক দেখা যায়। বলেই, ব্রিজ থেকে হাত বাড়িয়েই সেই গাছ থেকে এক-মুঠো পাতা ছিঁড়লেন। চোখের একেবারে কাছে এনে পাতাগুলোকে ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

আমার বুকে লাগল। রণবাবু অনেক জানেন, কিন্তু উনি কি জানেন না যে, গাছে-দেরও প্রাণ আছে, তারাও ভালোবাসতে জানে, চুমু খায়? হঠাৎ আনন্দের আতিশয্যে একমুঠো পাতা ছেঁড়ার কী দরকার ছিল? অনেক বছর জঙ্গলে থাকাকালীন রণবাবুর মতো অনেক উৎসাহী লোক দেখেছি আমি। যাঁরা গাছ-গাছালি, জানোয়ার, পাখি সম্বন্ধে অনেক খোঁজ রাখেন, পড়াশুনা করেন। সত্যিকারের উৎসাহ আছে এঁদের সব বিষয়ে। এরকম লোক আরও বেশি থাকলে ভালো হতো এদেশে। কিন্তু এঁদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞানের জন্যেই জ্ঞান আহরণ করেন, এবং হয়তো অন্যকে জ্ঞানদানের জন্যও কিছুটা।

বনজঙ্গল, বন্যপ্রাণী, পাখি, প্রজাপতি সম্বন্ধে আমার উৎসাহটা এঁদের উৎসাহ থেকে কিছু আলাদা। আমার উৎসাহটা কবির। আমার এই ভালোলাগায় বুঁদ-হওয়া কবির চোখ, অনাবিল মন, কোনো জ্ঞান বা বিদ্যার জটিলতা দিয়ে আবিল করতে চাই না আমি। চাইনি কখনওই। এই ভোরের নরম সুগন্ধি শিশির-ভেজা বনে, পল্লবিত জংলী আম-গাছের ডালে উড়ে এসে বসা এবং সত্যি না-হওয়া স্বপ্নর মতো হঠাৎ উড়ে-যাওয়া এই পথিপার্শ্বের ক্ষণিকের অতিথি পাখিদুটির ছবি ভাস্বর হয়ে থাকবে আমার স্মৃতিতে। তাদের গায়ের রঙ, তাদের গলার স্বর, তাদের ব্যস্তসমস্ত ভাব, তাদের উড়ে যাবার পর ঈষৎ আন্দোলিত ঘন সবুজ আমগাছের পাতাগুলি এসবই চিরস্থায়ী।

সাধারণত আমার পাখির নাম জানতে ইচ্ছে করে না। মানুষেরও বিদ্যাবুদ্ধি, অতীত-ভবিষ্যৎ, শিক্ষা-বিত্ত এসব কিছুই আমার ঔৎসুক্যর বাইরে। অত জানলে, জ্ঞানী হওয়া যায় নিঃসন্দেহে, কিন্তু নরম পাখি, কিংবা লজ্জাবতী লতা কিংবা জিন্-এর মতো অন্ত-মুর্খী স্বল্পবাক্ মানুষকে হয়তো তেমন করে ভালোবাসা যায় না। ভালোবাসার সমস্ত আনন্দ তো ভালোবাসারই মধ্যে। আমার মতো বোকারাই একমাত্র জানে সেই বোকামির সুখ। সেই নিক্কণিত সুমধুর আনন্দের অভিনবত্ব ও চমক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানেরা কোনদিনও জানবেন না। কবির সঙ্গে বিজ্ঞানীর বিবাদ আছে। এবং থাকবেও। সভ্যতা যতদিন আছে এ নিয়ে তর্ক বা ঝগড়ার কোনো অবকাশ নেই।

আমরা চা খাচ্ছিলাম যখন, তখন হঠাৎ কোনো প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের গর্জনের মতো গভীর জঙ্গলাবৃত পাহাড়ের ঘাটের উঁচু রাস্তা থেকে একটা দূরাগত পুরো-লাদাই মার্সিডিস ট্রাকের এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল। তারপর আওয়াজটা বাঁকে বাঁকে ঘুরে ফিরে স্পষ্ট হতে হতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। সিং জীপটাকে একেবারে বাঁয়ে, সাইড করে রাখল ট্রাক যাবার পথ করে দিয়ে। আমরা ব্রিজ ছেড়ে সরে এলাম। একটু পরে ট্রাকটা আমাদের পিছনে ফেলে চলে গেল।

রণবাবু বললেন, এগুলো কি পাতা? পাহাড়-প্রমাণ পাতা নিয়ে কোথায় চললো। ট্রাকটা?

ছোটমামা বললেন, আরে, এগুলো বিড়ি পাতা। কি যেন নাম পাতাগুলোর? আহা! কি যেন, মনে করতে পারছি না। তোমরা সব শহরের লোক। কোনো খবরই রাখো না। আমাদের গিরিডিতে...

বললাম, বিড়িপাতা মানে. বলছ, কেন্দু পাতা ত—

হ্যাঁ, হ্যাঁ কেঁদ, মনে পড়েছে। তারপর বললেন, কেঁদ পাতা চলেছে বিড়িপাতার ব্যাপারীর গুদামে।

ওগুলো কিন্তু বিড়ি-পাতা নয় ছোটমামা। বিড়িপাতা প্রায় গোল দেখতে, এবং অনেক ছোটও হয়। এই বড়-বড় কালচে-সবুজ পাতাগুলোর নাম মহুলান্। এগুলো যাবে দক্ষিণ ভারতে।

দক্ষিণ ভারতে কেন? কী হয় এই পাতা দিয়ে? রণবাবু শুধোলেন।

ঠিক জানি না, তবে শুনেছি আমাদের এদিকে শালপাতা যেমন দোনার কাজে ব্যবহৃত হয়, দক্ষিণ ভারতে মন্দির-টন্দিরে নাকি এই পাতাও দোনার মতো ব্যবহৃত হয়। অন্য জায়গাতেও হতে পারে।

বাণী জিন্-এর কাছে চলে গেছিলেন, দরজার পাশে। ওঁকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। ওঁকে বলতে শুনলাম. কী বলছিস রে তুই? আশ্চর্য! এমন সব জায়গা, তোর ভালো লাগছে না? তাহলে আমার কিছুই বলার নেই।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। আমার এই নির্বিবাদ মালিকানার রাজত্ব যদি জিন্-এর ভালো না লেগে থাকে, তবে এই নির্জন আরণ্য-পর্বতের রবিনসন ক্রুসোকেও নিশ্চয়ই ভালো লাগছে না। এ পর্যন্ত ধারণা ছিল নিজের সম্বন্ধে যে. আমাকেও ভালো লাগে না কারোর. এমনটি হতেই পারে না। বোধহয় বেশীর ভাগ মানুষই এই জন্মগত আত্মবিশ্বাস নিয়ে বড় হয়। তারপর জীবনের পথে এগোতে এগোতে ধীরে ধীরে বোধহয় এই ছেলেমানুষী বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে চিড় খেতে থাকে। শেষে হয়তো একদিন এমনই হয় যে, আমাকে একজন কারোরও যে আদৌ ভালো লাগতে পারে, এমন ভরসা পর্যন্ত হয় না। সে অবস্থাটা বড় করুণ। জানি না. কপালে কী আছে। আসলে জিন্-এর এই মৌনী অবস্থা আমাকে অনেক কিছু ভাবতে বাধ্য করছে। এমন দারুণ আনন্দের মিষ্টি সকালটা হঠাৎই কেমন তেতো লাগতে লাগল। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ আমরা বাড়েষাঁর উপত্যকাতে নেমে এলাম। উঁচু বাড়েষাঁর ঘাট পেরিয়ে। বাড়েষাঁর জায়গাটা ছোট। চারধারে পাহাড়, মধ্যিখানে সমান জমি। কিছু ছাড়া ছাড়া জঙ্গল. কিছু ক্ষেত-খামার। কয়েকটা একলা বুড়ো মহুয়া গাছ ইতস্তত ছড়িয়ে। গাছগুলোর অনেক বয়স। অনেক দেখেছে গাছগুলো।

গাছতলায় জীপ দাঁড় করিয়ে আমরা পরমেশ্বরের দোকানের সামনের কাঠের বেঞ্চে বসে খাঁটি ঘিয়েভাজা পুরী, সিম-এর সব্জী, আলুর চোকা এবং আঁওলার আচার দিয়ে দুপুরের খাওয়া সারলাম। তারপর ওর দোকানে খাঁটি দুধে-ফোটানো চা। চা খেতে খেতে হঠাৎ বাণী আবৃত্তি করে উঠলেন :

"ভালবেসেছিল তারাও, আমার মতো
সীমাহীন মাঠ, আকাশ স্বরাট্,
তারারাশি বাতাহত।
গড্ডলিকার সহবাসে উত্যক্ত,
তারা খুঁজেছিল সাযুজ্য সংরক্ত,
কল্পতরুর নত শাখে সংসক্ত

শত্রু শশীরে ভেবেছিল করগত।
নগরে কেবল সেবিল গরল
তারাও, আমার মতো॥"

বলেই বলল, বলুন তো মশাই কার কবিতা?

ছোটমামা বললেন, রবীন্দ্রনাথ, আর কার?

আমি বললাম, সুধীন্দ্রনাথ-সুধীন্দ্রনাথ গন্ধ পাচ্ছি। ঠিক কিনা জানি না।

রণবাবু চায়ের গ্লাস বেঞ্চে রেখে বাইনাকুলার দিয়ে দূরের ওক্সর জঙ্গল দেখতে দেখতে বললেন, কার সঙ্গে কার নাম।

বাণী চটে উঠে বললেন, যা করছ, তাই-ই করো। সব ব্যাপারেই তোমার কথা বলা চাই। চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট, কাব্যের কী বোঝো তুমি?

বলেই, আমার দিকে ফিরে বললেন, সায়নবাবু, আপনিই ঠিক। কিন্তু কোন্ কবিতার লাইন বলুন তো?

বিব্রত হয়ে বললাম, রণবাবু চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট, আর আমি তো বাঁশবনের লোক। অত কী জানি?

"নান্দীমুখ।" নান্দীমুখের লাইন।

বাণী বললেন।

এখানে আসার পথে আমরা কয়েকটি হরিণ, একটি চিতাবাঘ, কয়েকদল হনুমান এবং একটি হাতি দেখেছিলাম। সকলেই কল্‌কল্ করছিলেন। চারধারে তাকিয়ে আনন্দ আর উত্তেজনার শেষ নেই। উত্তেজনা শুধু নেই সিং ড্রাইভারের। এ পথে তাকে রোশনলালবাবুর নানা রকম অতিথি-টতিথি নিয়ে মাসে কয়েকবারই আসতে হয়। গাড়ির স্বাস্থ্য এবং পথের অবস্থাই তার একমাত্র ভাবনা। মনে মনে সে হিসেব কষে দেখছিল যে, এই সব অতি-উৎসাহী শহুরে বাবুদের নিয়ে অন্ধকার হবার আগে আগেই বাড়ে-ষাঁড়ের ঘাট আবার পেরোতে পারবে কিনা। ঘাটের পথটা বড় সরু। হাতির দল মাঝে মাঝেই পথ আটকায়। অত উঁচু পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে গাড়ি ব্যাক করারও অসুবিধে। সিং ছাড়াও আরও একজন নীরব এবং নির্লিপ্ত। দিঠিয়ার বাংলোতে একবার মাত্র এক মিনিটের জন্যে বাথরুমে যাওয়া ছাড়া জিন্ একবারও গাড়ি থেকে নামেন নি। আমাকে একবার কাছাকাছি পেয়ে বলেছিলেন।...

নাঃ। অনেক কিছুই বলতে পারতেন যদিও কিন্তু বলেন নি কিছুই।

ঝুরু ঝুরু করে শীতের হাওয়া বইছিল পাতায় পাতায়, মাটিতে শুকনো শালপাতা মচ্‌মচানি তুলে গড়িয়ে যাচ্ছিল। শীতার্ত প্রকৃতি একটু উষ্ণতার জন্যে হাহাকার করছিল। হয়তো করছিল আমার মনও। কিন্তু জিন্ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শুধু বলেছিলেন, আমাদের অন্য কোনো পথে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই, না? ঐ সাংঘাতিক রাস্তা দিয়েই ফিরতে হবে?

হ্যাঁ। আমি বলেছিলাম।

কথাটাতে চমকে উঠেছিল জিন্! বলেছিল, ফেরবার কোনো পথই নেই আর? না।

কথাটা বলতে পেরে এবং বলে খুশি হয়েছিলাম।

পরক্ষণেই জিন্ বলেছিলেন, আমরা আপনাকে খুব জ্বালাচ্ছি। অনেকই ট্রাবল্ দিলাম।

চা খেতে খেতে ভাবছিলাম, ভালুমার থেকে মহুয়াডাঁরে আসার সবচেয়ে বড় আনন্দ ঐ পথটি। অমন সুন্দর পথকে যিনি সাংঘাতিক পথ বলতে পারেন, তিনি অসাধারণ

মানুষ। আসলে এ ধরনের মানুষের কাছে বোধহয় পথটার কোনো দামই নেই। যে কোনো পথে গন্তব্যে পেঁৗছতেই এ'রা ভালোবাসেন। গন্তব্যটাই এ'দের কাছে সব; সমস্ত। আমার কাছে যেমন পথটা অনেকখানি। কথাটা ভেবে খুব দুঃখ পেলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাণী আর আমি দুটো পান খেলাম, কালা ও পিলা পাত্তি জর্দা দিয়ে। বাণী পিক্ ফেলে বললেন, আপনার সঙ্গে আমার এত বিষয়ে মিল মশাই যে, কী বলব! কোথায় যে লুকিয়ে ছিলেন এতদিন? রণবাবুর দিকে ফিরে আমাকেই বললেন, কিছুদিন আগে দেখা হলে কত ভালো হতো বলুন তো?

রণবাবু হোল্ডারে সিগারেট লাগাচ্ছিলেন। বললেন, এতো খেদের কি আছে? ছেলে-মেয়ে যখন হয় নি এখনও, লেট আস বী সেপারেটেড্ গ্রেস্ফুলি। তুমি এখানে থাকলে তো ভালই। মাঝে মাঝে বার্ড-ওয়াচিংএর জন্যে আসা যাবে।

লজ্জা পেয়ে বললাম, উনি না থাকলেও আপনি যখন খুশি আসতে পারেন।

এখন বলছেন মশাই। পরে হয়তো চিনতেই পারবেন না।

এসব কী কথা? আমার প্রায়-হয়ে যাওয়া সম্বন্ধীর মুখে এরকম হেঁয়ালি হেঁয়ালি কথা মোটেই ভাল লাগছিল না আমার।

জিন্ বলে উঠল, ছোটজেঠু, তুমি পাশে বসে এমন সিগার খেলে আমার বমি হয়ে যাবে। কী বিচ্ছিরি গন্ধ।

বাণী পিক্ মুখে আমাকে ইসারা করলেন সিংকে গাড়ি থামাতে।

আমি সিংএর কাঁধে হাত রাখলাম, সিং ব্রেক কষল।

জিন্ বললেন, আবার কি হল?

বাণী কথা বলতে পারছিলেন না। আমাকে আর রণবাবুকে টপ্কে গিয়ে পিচিক্ করে পিক্ ফেললেন রাস্তার ধুলোয়।

জিন্ পিছন ফিরে অত্যন্ত বিরক্তির গলায় বললেন, সত্যি বৌদি! একজন মডার্ন মেয়ে হয়ে যে কি করে পান খাও আর পুচ্ পুচ্ করে পিচ্ ফেলো সব সময় ভাবতে পারি না। একেবারে জংলী তুমি।

বাণী ঢোঁক গিলে, আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, পান মুখে, উ, উ, ও, আ, আ...আরেকজনও আছেন।

জিন্ সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলল, ওঃ! আই এ্যাম সরি। আমি কিন্তু আপনাকে বলি নি। কিছু মনে করবেন না, ক্ষমা করবেন।

মেয়েটি বড়ই ভদ্র। শহরের মেয়েরা বোধহয় এরকমই হয় আজকাল। তাদের অকলঙ্ক উজ্জ্বল হৃদয়হীন ভদ্রতাটা বড় চোখে লাগে। ভর-দুপুরের সূর্যের মতো।

ওক্সিতে এসে পৌঁছলাম আমরা। চেকপোস্টে যে গার্ডটি নাকা খুললো তার একটি পা নেই।

রণবাবু শুধোলেন, ওর পায়ে কি হয়েছিল? একটি পা নেই দেখছি।

আসলে, চিপাদোহরে আমাদেরই একটা ট্রাকের তলায় পড়ে গেছিল ও। পা-টাই জখম, হয়েছিল। শেষে ডালটনগঞ্জের হাসপাতালে ওর প্রাণ বাঁচাবার জন্যে পাটা কেটে ফেলতে হয়েছিল। কিন্তু এই পরিবেশে, এমন উত্তর শুনে, রণবাবু হতাশ হবেন নিশ্চিত জেনেই আমি একটি তাৎক্ষণিক গল্প বানালাম। বললাম, একদিন সন্ধ্যের সময় ও যখন এই গেট খুলছিল, একটা বাঘ এসে ওর পা কামড়ে ধরে। তারপর চেকপোস্টের লোকেরা হৈ-হল্লা করলে বাঘ পালিয়ে যায়। কিন্তু ওর পায়ে গ্যাংগ্রিন্ হয়ে পা পচে যায়। পা কেটে ফেলে ওর জীবন বাঁচানো হয়।

বাণী বললেন, কী সাংঘাতিক!

রণবাবু বললেন, কিন্তু জিম করবেট যে বলেছেন, বাঘ তো সচরাচর এমন করে মানুষের পা কামড়ে ধরে না। ধরলে, গলাই কামড়ে ধরে ; নয়ত কাঁধ।

বিপদে পড়লাম। কথাটা সত্যি। ইজিচেয়ারে বসে জঙ্গল সম্বন্ধে যাঁরা বই পড়ে সমস্ত জেনে ফেলেন তাঁদের আমি বাঘের চেয়েও বেশি ভয় পাই।

বললাম, জিম করবেটের এলাকা ছিল কুমায়ুন অঞ্চল। মুখ্যত। এখানের বাঘেরা হয়তো ভালো স্কুলে লেখাপড়া করেনি। তাই অসভ্যর মতো ব্যবহার করে।

রণবাবু কথাটা বিশ্বাস করলেন।

ছোটমামা বললেন, বুঝলি, আমার যখন বারো বছর বয়স তখন গিরিডির কাছের উশ্রী ফল্‌সএ পিকনিক করতে গিয়ে একটা চিতাবাঘ দেখেছিলাম। সেটা কিন্তু আমার পা ধরবার মতলবেই ছিল।

বললাম, হয়তো তোমার কাছে ক্ষমা চাইতেও এসে থাকতে পারে কোনো কারণে।

দ্যাখ্‌ খোকা। সিরিয়াস্‌ ব্যাপার নিয়ে ইয়ার্কি করবি না কখনও।

বাণী বললেন, তারপর আপনি কি করলেন ছোটজেঠু?

যা সকলেই করে। তখন আর করার কি ছিল?

কি? গাছে উঠেছিলেন? বাণী শুধোলেন।

যাঃ।

প্রাণপণে দৌড়েছিলেন নিশ্চয়ই! রণবাবু বললেন।

ছোটমামা সজোরে সিগারটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে বললেন, নাঃ। ও দুটোর কোনটাই করিনি। কারণ, মনে হয়েছিল, যে পা দুটি বাঘে ধরতে এসেছিল তার একটাও বুঝি আমার নেই।

তবে কি করেছিলে? আমি শুধোলাম এবার।

ছোটমামা বললেন, একেবারে ফ্রিজ শট-এর মতো ফ্রিজ করে গেছিলাম। এবং ছোট-বাইরে। প্যান্টেই। ইন্‌স্ট্যান্টেনাস্‌লি। আমি বলেই, সত্যিটা কবুল করলুম। অনেক বড় বড় শিকারীও চেপে যান।

সকলেই হো হো করে হেসে উঠলেন।

বাণী বললেন, কী খারাপ কথা বলতে পারেন না আপনি ছোটজেঠু।

কিন্তু আশ্চর্য। জিন্‌ হাসলেন না।

দূরে মহুয়াডাঁরের মালভূমি দেখা যাচ্ছিল। আমার অনেকবার দেখা। তবুও বড় ভালো লাগে। চারধারে পাহাড়ঘেরা লালচে-কালচে-গেরুয়া-বাদামীতে মেশানো বিস্তীর্ণ সমতল। হু হু করে হাওয়া বইছে মাইলের পর মাইল ফাঁকা জায়গাতে। সেই ছোট্ট শ্বেত শঙ্খিনী নদীটি ঘুরে গেছে বাঁকে বাঁকে। জীপটা যখন এগোতে থাকে সেই উন্মুক্ত, উদোম শূন্যতার দিকে, আর আমাকে নীরবে হাতছানি দেয় দিক্‌চক্রবালে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে-থাকা অর্জুনের গায়ের রঙের মতো নীল রঙের পাহাড়েরা, তখন প্রতিবারেই মনে হয়, শান্তি যদি পৃথিবীতে কোথাওই থাকে, তবে বোধহয় এখানেই, এখানেই : এখানেই।

যখন আমরা মহুয়াডাঁরের মাঝামাঝি এসেছি, দূরে মহুয়াডাঁর জনপদ দেখা যাচ্ছে, তখন জিন্‌ হঠাৎ বললেন, ক'টা বাজে দ্যাখো ত, ছোটজেঠু। আমার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে।

ছোটমামা পাঞ্জাবির হাতা তুলে ঘড়ি দেখে বললেন, আড়াইটা।

জিন্‌ আতঙ্কিত গলায় বললেন, বৌদি এখানে আর দেরি করিস না তোরা বেশি। এখান থেকে ফিরে যাওয়ার আর পথ নেই।

আরে ফিরব তো সবাই-ই। এসেই ফিরে যাবার জন্যে এলিই বা কেন তুই?

জিন্ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নৈর্ব্যক্তিক গলায় বললেন, ইচ্ছে মতো ফেরা যাবে না, তা আগে জানলে ; কখনই আসতাম না।

বলার কিছুই ছিল না। আবারও লজ্জিত হলাম। লজ্জা পেতেই...

উল্টোদিক দিয়ে একটা ট্রাক আসছিল। ট্রাকের ড্রাইভার আমাদের জীপ এবং সিং ড্রাইভারকে দেখে থামাল। আমাদের কোম্পানীরই ট্রাক। কোনো কাজে এসেছিল এখানে।

ট্রাক ড্রাইভার সিংকে শুধোলো, কাদের নিয়ে এসেছ সিং?

বাঁশবাবু আর বাবুর মেহমানদের।

সিং বললো।

বাঁশবাবু আছেন নাকি? উল্লসিত হল সিংএর কথা শুনে ড্রাইভার রামলগন।

ট্রাক থেকে নেমে, সিংকে একটু খৈনি দিল, তারপর জীপের পেছনে এসে আমাকে বলল, পরর্নাম বাবু।

পর্নাম।

আপনার ছাতাটা মেরামত হয়ে গেছে। জুতো জোড়াও। আমি কালই চিপাদোহার থেকে পাঠিয়ে দেব।

তাই দিও।

রামলগন আবার বলল, পরর্নাম।

আমিও যন্ত্রের মতো বললাম, পর্নাম।

আমার উদাসীন ব্যবহারে রামলগন হয়তো একটু অবাকই হলো।

হঠাৎ জিন্ শুধোলেন, বাঁশবাবু? কার নাম?

আমি নিষ্কম্প গলায় বললাম, আমার নাম।

উনি বললেন, ও।

জীপ সুদ্ধু সকলেই স্তব্ধ হয়ে রইলেন। আমি ত বটেই, অনেকক্ষণ কেউই কোনো কথা বললেন না।

ডিজেলের জীপটা চললে যে এত শব্দ হয়, এই-ই প্রথম যেন সকলের সে বিষয়ে হুঁশ হল।



কাল রাতে লালুকে শোন্‌চিতোয়াতে নিয়ে গেল। বারান্দাতে দু-তিনটে পুরনো চটের বস্তার ওপর লালু শুয়ে থাকত। ওর চিৎকারের তারতম্য দেখে বুঝতে পারতাম কী জানোয়ার দেখেছে ও। হাতি দেখলে গলা দিয়ে অদ্ভুত এক আহ্লাদী স্বর বের করত। শুয়োর হরিণ বা শজারু ডেরার কাছাকাছি এলেই ওর লম্ফ-ঝম্ফর রকমই হতো আলাদা। খরগোশ বা শেয়াল দেখলে তেড়ে দৌড়ে যেতো ও বাইরে রাতবিরেতেও। কিন্তু বড় বাঘ আর শোন্‌চিতোয়ার আঁচ পেলেই লালু একেবারে চুপ্‌সে যেতো। চুপ করে ও থাকত ঠিকই কিন্তু ওর অজানিতেই গলা দিয়ে একটা বিশ্রী ঘড়্‌ঘড়ানি আওয়াজ উঠত! মুমূর্ষু রোগীর শ্বাসকষ্টের মতো। ও হয়ত জানত, ওর কপালের লিখন। টানা-টাঁড়ের দিকে বা ভালুমারের চারপাশের নিরবচ্ছিন্ন জঙ্গলের গভীরে ফেউ ফেউ করে যখন শেয়ালগুলো হেঁচ্‌কি তুলে ডাকত গভীর অন্ধকার রাতে, তখন লালু যে বারান্দাতে আছে তা বোঝা পর্যন্ত যেতো না।

কালকে খাওয়া-দাওয়ার পর তিত্‌লি টেট্‌রার সঙ্গে চলে গেল। আমি কিছুক্ষণ ঘরে বসে লণ্ঠনের আলোতে পড়াশুনা করছিলাম। লালু খচ্‌মচ্‌ শব্দ করে গা চুলকোচ্ছিল। বারান্দাতে ওর হেঁটে বেড়ানোর আওয়াজ, ওর পায়ের নখের শব্দ সবই শুনতে পাচ্ছিলাম। তক্ষক ডাকল বার তিনেক বেড়ার ওপার থেকে। লালু কেয়ার করল না। দশটার মধ্যেই আমি শুয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা করুণ কুঁই কুঁই আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে গেল—পরক্ষণেই ঘরের দরজার পাল্লাতে বাইরে থেকে কোনো জানোয়ার যেন নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে বলে মনে হল। ব্যাপারটা কি তা বুঝতেই একটু বেশিই সময় লেগে গেল আমার। লেপটা ছুঁড়ে ফেলে চৌপাই থেকে উঠে পড়লাম। বালিশের নিচ থেকে টর্চটা আর ঘরের কোণায় রাখা বর্শাটাকে তুলে নিয়ে দরজা খুলতে যেতেই মোটা শালকাঠের দরজার ওপরে কী যেন দড়াম্‌ করে আছড়ে পড়ল! যখন দরজা খুললাম, তখন দেখি লালু নেই, কিন্তু লেপার্ডের গায়ের বোঁট্‌কা গন্ধে সারা বারান্দাটা ভরে রয়েছে।

লালু ! লালু! বলে চিৎকার করে বারান্দাতে দাঁড়িয়েই আমি চারধারে টর্চের আলো ফেলতে লাগলাম। কিন্তু ঐ বিকট গন্ধ পাবার পর শুধুই বর্শা হাতে বাইরে বেরুবার মতো সাহস হল না। এক ঝলক আলোতে হঠাৎ দেখলাম, লালুকে মুখে করে একটা বিরাট চিতাবাঘ এক নিঃশব্দ লাফে ডেরার সাত ফিট মতো উঁচু কাঠের বেড়াটা পেরিয়ে বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার গলা-ফাটানো লালু! লালু! ডাক শিশিরে-ভেজা বন-প্রান্তর ঘুরে চারদিক থেকে হাজার হাজার ডাক হয়ে দ্রুত ফিরে এল। কিন্তু লালু এল না।

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আমি বুঝতে পারলাম যে, লালু আর কোনদিনও আসবে না।

অনেক বছর জঙ্গলে থাকাতে, অনেক কিছুকেই মেনে দিতে শিখেছি এখন বিনা প্রতি-

বাদে। আমার বন্দুক নেই, থাকলেও এই স্যাংচুয়ারি এলাকার মধ্যে গুলি ছোঁড়া অসম্ভব ছিল। গুলি করলে, জেলে যেতে হবে। অথচ আশ্রিত এক অবলা জীবকে আমারই ঘরের দরজার সামনে থেকে শোন্‌চিতোয়ায় তুলে নিয়ে যাবে আর আমি কিছুই করতে পারব না!

জঙ্গলের বাঘ বা চিতাকে আমি ভয় পাই না, পাইনি কখনও। যতবারই দেখা হয়েছে তাদের সঙ্গে। কিন্তু যে-চিতা রক্তলোলুপ হয়ে আমার বাড়িতে এসে আমার আশ্রিত কুকুরকে ঘাড় কামড়ে ধরে নিয়ে গেল, তাকে ভয় না করে পারি না। ঠিক ভয়ও হয়ত নয়, হয়ত আক্রোশ। নিষ্ফল কিন্তু অতি তীব্র এক আক্রোশ। সে অনুভূতির শরিক যাঁরা না হয়েছেন, তাঁদের ঠিক বোঝানো সম্ভব নয়। তাৎক্ষণিক হতবুদ্ধি নিশ্চেষ্টতাটা কেটে যাওয়ার পর বুকের মধ্যে এমন কষ্ট হতে লাগল যে, কী বলব! বেচারী, বাঁচার জন্যে আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে আসতে চাইছিল, অথচ আমি তাকে বাঁচাতে পারলাম না। কিংবা কে জানে, হয়ত আমাকেই বাঁচিয়ে দিল ও। একটু আগে দরজা খুললে ব্যাপারটা হয়ত অন্য রকম হতে পারত।

টাইগার-প্রোজেকট্ বা ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড ইত্যাদি সব কিছুর কথা ভুলে গেলাম। শোন্‌চিতোয়াটা যেন আমার আমিত্বকে গালে একটা বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে চলে গেল। লালু কিন্তু আমাকে অন্তত তিনবার সাপের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিল, এবং একবার বাঁচিয়েছিল একটা এক্‌রা হাতির আক্রমণ থেকে। সে সব মুহূর্ত আমার স্মৃতিতে; বাকি জীবন গল্পই হয়ে থাকবে।

ভোর হতেই, কাড়ুয়ায় কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। কাড়ুয়া সবে লোটা হাতে ময়দান থেকে ফিরছিল। আমাকে দেখেই চৌপাই পেতে দিল। ওকে বললাম যা বলার। ও কিছুক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে থেকে নিরুত্তাপের সঙ্গে অত্যন্ত ক্যাজুয়ালি বলল, শোন-চিতোয়া কুকুর বড় ভালোবেসে খায়। আর বাঘে খায় ঘোড়া; ধোপার গাধা।

রাগ হল ওর কথা শুনে। লালু তো একটি কুকুর মাত্র ছিল না আমার কাছে। ও যে লালু!

কাড়ুয়া, মনে হলো, আমার মনোভাব যেন কিছুটা বুঝল। তারপর বলল, আপনি যান। আমি একটু পর আপনার ডেরায় যাচ্ছি। গিয়ে যা করার করব।

তিতলি এসে সব শুনে খুব কান্নাকাটি করছিল। লালু ছিল তিতলির বড়ই আপনজন। ওর সঙ্গেই ছিল তার দিনভর আলাপচারি। একা একা থাকার, দীর্ঘ অবসরের সঙ্গী। যে-কোনো কুকুরের চোখে ভালোবেসে চাইলেই বোঝা যায় কী দারুণ বুদ্ধি ধরে তারা। মনিবের চোখের দৃষ্টি দিয়ে সে মনিবের কথা বোঝে। তার দুঃখে দুঃখী হয়, তার সুখে সুখী। বাড়ি ফিরলে, লেজ নেড়ে অভ্যর্থনা জানায়, বাড়িতে না থাকলে মনমরা হয়ে থাকে। স্বার্থহীন, প্রত্যাশাহীন এই ভালোবাসার কোনো সমতুল্য ভালোবাসা খুব কম মানুষের কাছ থেকেই পায় অন্য মানুষ।

লালু ছিল এক অতি সাধারণ, দেহাতী, পেডিগ্রীহীন কুকুর। ওর মা, চিপাদোহরে গারাজের পিছনে সাজিয়ে-রাখা পোড়া-মবিলের টিনের গাদার পাশে নোংরা কটন্-ওয়েস্ট-এর মধ্যে ওকে আর ওর তিন ভাইকে জন্ম দিয়েছিল। ধর্মপ্রাণ পাণ্ডেজী তাদের দেখা-শোনা করেছিলেন। লালচে-রঙা গাঁট্টা-গোট্টা গাব্‌লু-গুবলু একটা কুকুরের বাচ্চাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে পাণ্ডেজী বলেছিলেন, নিয়ে যান বাঁশবাবু। কুকুর কখনও নমক্‌হারামী করে না। নমক্‌হারামী আর অকৃতজ্ঞতা শুধু মানুষদেরই রক্তে আছে।

যখন ছোট ছিল, প্রথম প্রথম আমার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াত লালু। ফু—উ—উ—উ ফুক্, ফুক্ করে ডাকত। তখনও গলায় ভুক্-ভুক্ ডাক আসে নি। গোঁফদাড়ি ওঠে নি। সাবালক হয় নি লালু। তিতলির আদর-যত্নে দেখতে দেখতে ও বড় হয়ে উঠল। তিতলি ওর সঙ্গে

কত কী যে গল্প করত, তা ওই জানে। আসলে তিতলির সঙ্গেই ছিল ওর বন্ধুত্বের সম্পর্ক, আমার সঙ্গে মনিব-কর্মচারীর। তিতলি যখন একা একা কী ভাবতে ভাবতে নিজের মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলত, তখন লালুও সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে ছড়ানো দুটি পায়ের ওপরে রাখা মুখে পৃথিবীর সব বিষণ্ণতা এনে ফু—স্-স্ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলত, যেন তিতলির ব্যথাতেই ব্যথী হয়ে। এক টিপ নস্যি পরিমাণ ধুলো উড়ে যেত ওর নাকের সামনে থেকে হঠাৎ শ্বাস ফেলায়। অবাক লাগত, ওদের দুজনকে দেখে আমার। তিতলিকে এর রহস্য কি তা জিগগেস্ করলে বলত, সে কথা না-ই বা জানলে। তুমি মালিক, আর আমি নোক্‌রানী। একটা কুকুরও যা বোঝে, তা যদি একজন মানুষ না বোঝে : তাহলে বোঝাবুঝির দরকার নেই।

লালু সাবালক হবার পর, চরিত্রদোষ ঘটেছিল তার। নেড়িকুত্তারও একটা আলাদা পেডিগ্রী আছে। তারও চরিত্র আলাদা, স্বভাব আলাদা। সে পথের কুকুর বলেই যে ফেল্‌না, তা মোটেই নয়। অন্তত আমার ত তাই-ই মনে হয়। রোশনলালবাবুর সঙ্গে কোলকাতার এক প্রচন্ড ধনী পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বেড়াতে এসেছিলেন ভালুমারে একবার। স্বামী-স্ত্রী। সুন্দরী শালী, সাহেব ভায়রা-ভাই আব একটা দারুণ সুন্দর কুকুর সঙ্গে নিয়ে। তার গলাটা হরিণ-হরিণ দেখতে। মানে, গ্যাজেলের মতো। এত সুন্দর গ্রেস্‌ফুল কুকুর আমি কখনো দেখিনি। আমি অবশ্য কীই এবং কতটুকুই বা দেখেছি এ জীবনে। কুকুরটির জাত জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোক বললেন, র‍্যাফায়েলের ছবি কখনও দেখেছেন? প্রিণ্টও দেখেন নি? ওরিজিনালের কথা বলছি না আমি।

আমি খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলেছিলাম, না। এবং ভাবছিলাম, র‍্যাফায়েলের ছবির সঙ্গে এই কুকুরটির কী সম্পর্ক থাকতে পারে?

র‍্যাফায়েলের এক বিখ্যাত ছবিতে এই জাতের কুকুররা রয়েছে। এদের বংশলতিকা আমার আপনার বংশলতিকার চেয়েও অনেক উজ্জ্বল। বুঝেছেন?

ইচ্ছে হয়েছিল বলি যে, আমি না হয় বাঁশবাবু। বাঁশবাবুর আবার বংশলতিকা! কিন্তু আপনার এত বিনয় কেন?

ভদ্রলোক আবার বলেছিলেন, আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে থেকে এই সালুকি কুকুররা মহা সমাদরে পার্‌সিয়া, সীরিয়া এমন কি মিশরেও পালিত হতো।

কী নাম বললেন?

বোকার মতো শুধিয়েছিলাম। কখনও যে-নাম শুনিনি তার আগে।

সালুকি!

তারপর ইংরিজীতে বানান করে বলেছিলেন। সালুকি কুকুররা তখনকার দিনের নবাব-বাদশা রইস্ আদমীদের সঙ্গে গ্যাজেল শিকারে যেত। এত পুরনো ট্র্যাডিশন আর ব্যাক-গ্রাউন্ডের কুকুর আর দুটি নেই।

এসব কুকুরের কত দাম জানি না আমি। দাম হয়ত আমার চেয়েও বেশি হবে। কোথায় পাওয়া যায়, তাও অজানা। ভদ্রলোক বলেছিলেন, ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে একমাত্র তাঁর কাছেই আছে। সেই জন্যে এ কুকুরের মেটিং একটা প্রবলেম!

সে কথা শুনে মনে হয়েছিল মেটিং কারই বা না প্রবলেম্! মানুষই হন্যে হয়ে যায় সঙ্গিনী খুঁজতে আর এতো কুকুর! যতই মহার্ঘ হোক-না সে! তবে, সালুকির চেহারার মধ্যে দারুণ একটা আভিজাত্য ছিল। পা দুটো, লেজ, কানের কাছে কী সুন্দর লোম, ঠিক পাখির পালকের মতো। সরু গলা, হরিণের মতো, আর তেমনই বুদ্ধি-উজ্জ্বল মুখখানি। আহা! ভগবান আমাকে যদি এমন একটি মিষ্টি মুখ দিতেন।

আমি আর তিতলি বারান্দাতে বসে চা খাচ্ছিলাম। আমি ইজিচেয়ারে, তিতলি

বারান্দার কোণায়, কাঠের খুঁটিতে হেলান দিয়ে, রোদে পিঠ রেখে, পা ঝুলিয়ে বসে। দুজনের কেউই কোনো কথা বলছিলাম না। বারান্দার এক কোণে লালুর জন্যে পেতে রাখা চটগুলো পড়ে ছিল। তাতে লালুর অনেক লোম ঝরে পড়ে আছে। বারান্দাতে শোন্-চিতোয়ার গায়ের লোমও পড়ে ছিল ক'টা। আমি আর তিত্লি দুদিকে তাকিয়ে লালুর কথা দুজনে দুজনের মতো ভাবছিলাম। এমন সময় কাড়ুয়া এল। তিত্লি কাড়ুয়াকে চা আর মাঠ্রী খেতে দিল। কাড়ুয়া বলল, কী চাও তুমি বাঁশবাবু?

আমি আর তিত্লি চকিতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

আমি কিছু বলার আগেই জলভরা চোখে তিত্লি বলল, বদলা চাই।

কাড়ুয়া নিজের ডানহাতের তর্জনীটি ঠোঁটে ছোঁয়াল। তারপর বলল, লালুর হাড়গোড় নিয়ে আসছি আমি। উঠোনে কবর দিয়ে তার ওপর একটা ফুলের ঝাঁকড়া গাছ পুঁতে দিও তোমরা। তারপর তিত্লির দিকে চেয়ে বলল, আমি শিকারী। শিকারীকে ঠাণ্ডা মাথায় সুযোগ খুঁজতে হয়। সময় সুবিধা মতো সবই হবে। তোর কথা রাখব, প্রমাণও দিয়ে যাব তোকে। তবে একটা কথা, এই ব্যাপার যদি বাঁশবাবু আর তুই ছাড়া আর কেউ জানে, তাহলে খুউব খারাপ হয়ে যাবে। আবার ও বলল টেনে টেনে, খুউব খারাপ।

কাড়ুয়ার কথা বলার আশ্চর্য ধরন দেখে মনে হল যে, কাড়ুয়া নিজেই একটি শোন্-চিতোয়া। কাড়ুয়া উঠে চলে গেল। বললাম, আমাকেও নিয়ে চল্ কাড়ুয়া। কাড়ুয়া যেতে নিষেধ করল। বলল, কি লাভ?

তারপর একা চলে গেল!

কাড়ুয়া হাড় নিয়ে ফিরে এসেছিল বেলা এগারোটা নাগাদ। বলল, খুব বড় চিতা, প্রায় বড় বাঘের মতো। তুমি আর একটু আগে ঘর থেকে বেরুলে তোমার অবস্থাও লালুর মতো হতে পারত। শিকারের সময় কোন বাধা মানতে রাজী থাকে না ওরা। পুরুষের কাম চাগলে যেমন হয়, বুঝলে না! তাছাড়া, শোন্চিতোয়ারা মাহাতোদের মতোই ধূর্ত। যা তারা চায়, তা যেমন করেই হোক না কেন, নিতে চায়। যিতনা-ভি-কিম্মত্ দে কর্।

আমরা তিনজনে মিলে লালুর হাড়কে কবর দিয়েছিলাম বেড়ার কোণাতে। গাড়ুর রেঞ্জার সাহেবকে বলে একটা ভালো-জাতের ফুলের গাছ আনতে হবে। মৃত লালুর প্রতি যেটুকু সম্মান আমরা দেখাতে পারি, দেখাব। লালু যে কুকুরটির প্রতি বিশেষ আসক্ত ছিল, ভালুমার বস্তির মাঝামাঝি একজন দোসাদের বাড়ির কুকুরী সে। কালো ছিপছিপে চেহারা। ফিগার ভালো কিন্তু ডান গালে একটা পোড়া দাগ। তার কালো রঙে তাতে আরও কালি লেগেছিল। কুকুরীটিকে আমার ভালোই লাগত, কিন্তু তিত্লি কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। ও এলেই পাথর ছুঁড়ে মারত। লালু, বেপাড়ায় গিয়ে মাস্তানী করলে তিত্লি তাকে দাঁড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে শাস্তি দিত। জানি না, এই পর্ণকুটিরের দুটিমাত্র পুরুষ, আমি এবং লালু সম্বন্ধে এ কুটিরের একমাত্র মহিলা তিত্লি এত ঈর্ষাকাতর ছিল কেন? মেয়েদের কথা, মেয়েরাই ভালো বলতে পারবে। আমরা যখন লালুকে কবর দিচ্ছি, একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। গর্ত খোঁড়ার পর, কাড়ুয়া আর আমি কবরে মাটি দিচ্ছি, তিত্লি হাত দিয়ে মাটি সমান করে দিচ্ছে, ঠিক সেই সময় বুলেটের মতো গতিতে কী একটা জানোয়ার দৌড়ে এসে ঢুকলো ডেরার বেড়ার গেটের ভিতর দিয়ে। এসেই আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে হাঁফাল কিছুক্ষণ।

সেই কালো কুকুরীটি!

হাঁফানি কমলে তিন চার সেকেন্ড নীরবে আমাদের মুখের দিকে সে চেয়ে নিল, তারপর মুখটা ওপরে তুলে এমন এক করুণ তীক্ষ্ম অথচ মিশ্র স্বরে কেঁদে উঠল যে, আমার বুকের ভেতরটা ভেঙে যেতে লাগল। আমাদের মতো কথা বলতে না পেরেও যে এমন-

ভাবে দুঃখ প্রকাশ করা যায়, তা ঐ কান্না না শুনলে কখনই বিশ্বাস করতাম না।

কুকুরীটি যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমন হঠাৎই চলে গেল। ওর প্রতি দয়াবশত তিতলি ওকে কী খেতে দেওয়া যায় ভাবছিল, কিন্তু ভাবনা শেষ হবার আগেই তিতলির দিকে একবার অভিমানের চোখে তাকিয়েই সে চলে গেল। আসার সময় প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে এসেছিল আর ফেরার পথে খুবই আস্তে আস্তে হেঁটে ফিরে গেল। যেন তার পায়ে সময় অনন্তকাল বাঁধা।

কাড়ুয়া পুরো ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল, কিন্তু কোন কথা বলেনি। লালুর কবরে মাটি চাপা দেওয়া শেষ হবার পর, কুয়োতলাতে হাত-পা ধুতে ধুতে কাড়ুয়া হঠাৎ স্বগতোক্তি করল, বলল, কুকুরীটি মা হয়েছে।

কি করে জানলে? কাড়ুয়া চাচা?

তিতলি শুধোল কাড়ুয়াকে।

কাড়ুয়া উত্তরে শুধু বলল, আমি জানি।

তিতলি সঙ্গে সঙ্গে বলল, ওর বাচ্চাদের মধ্যে থেকে একটা ছেলে বেছে নেব আমি। লালুর ছেলে থাকবে আমার কাছে। তারপর একটু থেমে বলল, তুমি ঠিক জানো ত কাড়ুয়া চাচা?

কাড়ুয়া তিতলির মুখের দিকে চেয়ে একটু বিরক্তি ভরে মাথা নাড়ল।

বেশি কথার লোক নয় সে। বেশি কথা কখনও বলে না। শোনেও না কারো কাছ থেকে।

কোনোই আভিজাত্য ছিলো না লালুর। "সালুকি" ছিল না। সে ছিল মানুষের জগতে তার মনিব যেমন, তেমনই জীবজগতের অতি সাধারণ এক জীব! তাইই বোধহয় ওর ভাষাহীনতায় এবং আমার বাঙ্ময়তার সন্ধিতে কোথায়, কখন, কী এক নিবিড় সখ্যতা ও গভীর মমত্ববোধ জন্মে গেছিল, তা লক্ষ করিনি যতদিন ও ছিল। যেমন লক্ষ করি না, বা করলেও ভুলে যাই প্রতিদিনের পথের পাশে অনবধানে জন্মানো ব্যাঙের ছাতা অথবা রাহেলাওলা ফুলেদের। লালু আজকে হঠাৎ এইভাবে চলে গেল বলেই বুঝতে পারছি যে, ও আমার আত্মার কত কাছের ছিল। বলতে গেলে, আত্মীয়ই ছিল। যতখানি আত্মীয় ও ছিল, ঠিক ততখানি আত্মীয় বোধ হয় আমার অনেকানেক কাছের মানুষ অথবা রক্তসূত্রের আত্মীয়রাও নন। আমি, এই বাঁশবাবু, যদি কোনোদিন কোন দৈব-দুর্ঘটনায় হঠাৎ যশস্বী হয়ে উঠতাম, বিত্তবান হতাম; লালু তাতে কেবল খুশিই হতো, লেজ নাড়তে লাফিয়ে আমার হাঁটুতে উঠতে চাইতো কিন্তু মানুষদের মতো ঈর্ষা, দ্বেষ ও দাদ-সদৃশ মানসিক অসুস্থতার শিকার সে কখনওই হতো না।



সকালে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, ঝুমরীবাসার কাছের জংলী-সুঁড়িপথে। একটু গিয়েই পরেশনাথের সঙ্গে দেখা।

একটা ঝুড়ি মাথায় করে চলেছিল ও।

বললাম, কোন্‌দিকে রে?

ও বলল, আমলকী কুড়োতে। গোদা শেঠ পাঁচিশ নয়া করে দেবে এক এক ঝুড়িতে!

এক ঝুড়ি ভরতে কতক্ষণ লাগবে?

তা কী বলা যায়? তেমন গাছ পেলে অল্প সময়েই ভরে যাবে। নইলে তিন-চার ঘণ্টাও লেগে যেতে পারে। বললাম, চল্‌, আমি গাছ ঝাঁকাব, নয়ত পাথর মারব মগডালে; আর তুই কুড়োবি।

ও খুব খুশি হলো। আমার পায়ে পায়ে চলতে লাগল। একটু গিয়েই পথের ওপর একটা কাঠের সাঁকো। দুপাশে আসন, পন্নন্‌, গাম্‌হার আর শালগাছ। নিচের পাহাড়ী ঝর্নাটা এখানে একটা দহ'র মতো সৃষ্টি করেছে। সেখানে জল বেশ গভীর। কিন্তু স্বচ্ছ। জলের মধ্যে বালির ওপরে ছোট ছোট মাছ সাঁতার কাটছে। গাছ-গাছালির ফাঁক-ফোকর দিয়ে রোদ এসে পড়েছে জলের ওপর। কতকগুলো কালো কালো পোকা চিড়িক্‌ চিড়িক্‌ করে জলছাড়া দিয়ে নড়ে বেড়াচ্ছে। পোকাগুলোর শরীরের মাঝের অংশটা বোধহয় স্বচ্ছ। কারণ জলের নিচে তাদের মাথা আর লেজের দিকের ছায়াই শুধু পড়ছে। ছায়াগুলো এমনভাবে পড়ছে যে, তিন-তিনটে বিন্দু দিয়ে গড়া অসংখ্য অসংলগ্ন ত্রিকোণাকৃতি এবং বিভিন্নমুখী দ্রুতগতি ছায়ায় ভিড় হয়েছে সেখানে। ঐ ছায়াগুলোকেও মনে হচ্ছে এক-রকমের জীবন্ত পোকা। দাঁড়িয়ে পড়ে, আমরা পোকাগুলোর খেলা দেখতে লাগলাম। আর জলের নিচে তাদের ছায়ার নাচ।

এই বনপথের আনাচে-কানাচে কত কী যে আশ্চর্য আপাততুচ্ছ অথচ অসাধারণ সব দৃশ্য ও অনুভূতি ছড়ানো আছে! এত শব্দ, এত রঙ, এত গন্ধ যে, যার চোখ কান আছে এবং অনুভব করার শক্তি আছে; তার পক্ষে এতে বিভোর না হয়ে থাকা সম্ভব নয়।

পরেশনাথ উত্তেজিত গলায় বলল, "পিল্লু"।

তারপর বলল, ভারী মজার পিল্লুগুলো, না?

অন্যমনস্ক গলায় ওকে বললাম, যা বলেছিস।

পিল্লু হচ্ছে, পিলুয়ার অপভ্রংশ। পিলুয়া মানে পোকা।

একটা কাঠঠোকরা কাঠ ঠুকছে বনের গভীরে। ভারী ছন্দোবদ্ধ, এক স্কেলে বাঁধা সুষম

সে আওয়াজ। আরো গভীর বনের ছায়ায় বসে একটা ক্রো-ফেজেণ্ট ডেকে চলেছে গম্ভীর গলায়।

হঠাৎ উজ্জ্বল লালরঙা বড় একটা প্রজাপতি কোথা থেকে যেন উড়ে এল। একটু আগেও তাকে দেখিনি। "লাল তিত্‌লি লাল তিত্‌লি" বলতে বলতে ছোট্ট পরেশনাথ মুহূর্তের মধ্যে ঝুড়িটা ব্রিজের ওপর ধুপ্ করে ফেলে দিয়েই নদীর দিকে দৌড়ে গেলো। তারপর উন্মাদের মতো দু-হাত তুলে নেমে গেল খাড়া পাড় বেয়ে। প্রজাপতিটা জলের কোণায় জল থেকে হাত দুয়েক উঁচুতে একবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পরক্ষণেই জলের ভিতরের দিকে উড়ে গেল, তারপর আবার ওপরে উঠে এল। এমনি করে দ্রুত উঠতে নামতে লাগল।

পরেশনাথ দৌড়ে দুহাত বাড়িয়ে প্রজাপতিটাকে ধরতে চেষ্টা করতে লাগল, এবং কী ঘটল বোঝবার আগেই সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়ে গেল। জল ছিট্‌কে উঠল মুহূর্তের মধ্যে। রোদ ঝিক্‌মিকিয়ে উঠল ছিট্‌কানো জলবিন্দুতে। সেই বনপথের অনামা পাহাড়ী নদীর ওপরে এক নিমেষের জন্যে একটা আস্ত হীরের খনির সব হীরে দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল।

ব্রিজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে, পরেশনাথ তলিয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ জলের নিচে। পোকাগুলো ভয় পেয়ে বিভিন্ন দিকে সরে যেতে লাগল। মাছের ঝাঁকে, হঠাৎ চিতাবাঘ দেখা চিতল হরিণের ঝাঁকের মতোই চমক্ লাগল।

পরেশনাথ কী সাঁতার জানে না? শহরের ছেলেরা না জানতে পারে, এরাও যে সাঁতার জানে না তা ভাবনারও বাইরে ছিল। ব্যাপারটা বুঝতে যতটুকু দেরি হল, তাতেই সময় যা নষ্ট হল। পরক্ষণেই আলোয়ানটা খুলে ফেলে জলে নেমে গেলাম। আমার কাঁধ অবধি জল। দুহাতে পরেশনাথকে তুলে ফেললাম। তখনও বেশি জল খায়নি ও। কিন্তু দম্ আটকে গেছিল। দম বন্ধ হওয়াতে, মুখ আর ঠোঁট একেবারে নীল হয়ে গেছিলো।

কিছুক্ষণ পর ও চোখ খুলে অস্ফুটে বলল, মাঈরে...মাঈ..! হাম ক্যা বুড় যাতা থা বাবু?

আমি আমার আলোয়ানটা ওর গায়ে জড়ালাম। ঐ শীতের সকালে হঠাৎ জলে পড়ে গিয়ে এবং ভয় পেয়ে কুঁকড়ে গেছিল পরেশনাথ।

প্রকৃতিস্থ হবার পর শুধোলাম, সাঁতার জানিস না তুই?

নাঃ। এখানে জল কোথায় যে, শিখব? বর্ষাকালে নালায় আমি আর বুল্‌কি ঝাঁপা-ঝাঁপি করি বটে, কিন্তু অল্প জলে। মা জানে না। জানলে, মারবে।

প্রজাপতিটা তখনও জলের ওপর উড়ছিল।

এই বর্ষায় তোকে সাঁতারকাটা শিখিয়ে দেব। আর এই শীতে, সাইকেলে চড়াও শেখাব।

সাইকেল?

পরেশনাথের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনন্দে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও অনেকক্ষণ ধরে লাল প্রজাপতিটার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলল, ঐ তিত্‌লিটা কিন্তু খতরনাক্। ও-ই আমাকে জলে ডুবিয়ে মারছিল একটু হলে। ওটা একটা ভূত। আমি সব্বাইকে বলে দেব যেন কেউ লাল তিত্‌লির পিছনে না দৌড়য়।

চুপ করে রইলাম।

ভাবছিলাম, আমার বাড়িতেও তো একটা তিত্‌লি আছে। অবশ্য তার গায়ের রঙ এতোটা লাল নয়।

ছোট্ট পরেশনাথ আজ আর আমলকী কুড়োতে রাজি নয়। ঐ লাল তিত্‌লি যে

অমঙ্গলের দূত, অপ্রাকৃতিক কোনো ব্যাপার; সে সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ। ও, ওর বাবা মানিয়ারই মতো। গভীর সব কুসংস্কার, ভৌতিক এবং আধিভৌতিক সব ভাব ও ভয় ওদের মস্তিষ্কে। আমার সাধ্য কী যে ওকে বোঝাই?

দুজনেই একেবারে ভিজে গেছিলাম। ওর হাতে একটা আধুলি দিয়ে যে যার পথে চললাম। পরেশনাথ চলে গেল সাঁকোর পিছনের অন্য সুঁড়িপথে ওর বাড়ির দিকে। আমি, যে পথে এসেছিলাম সে পথে।

একটু এগিয়ে গিয়েই দেখি, পথের বাঁদিকে হাঁটু সমান ঘাসবনে চার-পাঁচটি শম্বর দাঁড়িয়ে আছে। তখনও মাঠ ভেজা আছে শিশিরে একটু একটু। অনেকগুলো হলুদ প্রজাপতি উড়ছে মাঠটাতে। সবুজ জঙ্গলের পটভূমিতে দারুণ একটি কম্পোজিশন। বড় বড় হনুমানের একটা দল ঝাঁপাঝাঁপি করছে মাঠের পিছনের উঁচু উঁচু গাছগুলোতে। চোখ তুলেই একটা শিঙলে শম্বর অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও, আমাকে দেখতে পেল। দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা একসঙ্গে দৌড়ে পালাল জঙ্গলের গভীরে।

যদি একটা ভালো ক্যামেরা থাকত, তাহলে এত বছর ধরে যে সব ছবি তুলে রাখতে পারতাম, তাতে হয়ত ঘর ভরে যেত। বন আর বন্যপ্রাণীর ছবি বিক্রি করে হয়ত বড়-লোক হয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু ভাল ক্যামেরা ও তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষমতা আমার নেই। রঙিন ফিল্ম কেনারও নেই। দ্বিতীয়ত, আগেই বলেছি যে, সব রকমের যন্ত্রপাতির সঙ্গেই আমার জন্মগত বিরোধ। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে'তে পড়েছিলাম, চোখের থ্রী-পয়েন্ট-ফাইভ লেন্স দিয়ে ছবি তুলে মস্তিষ্কের ডার্করুমে রেখে দেওয়াতে বিশ্বাস করতেন তিনি। যখন খুশি ছবি ছেপে নিতেন যে কোনো সাইজে।

ফোটোগ্রাফী সম্বন্ধে আমার তেমন একটা পক্ষপাতিত্বও নেই। এই শম্বরদের ঘাসের মধ্যে দৌড়ে যাওয়া, এই সকালের গন্ধ, এর রূপ, এর রঙ এবং এর মধ্যে মিশে যাওয়া আমার মনের এইক্ষণের ভাবের সামগ্রিকতার কতটুকুই বা ধরতে পারতো ক্যামেরা! রঙিন ফিল্মই হোক আর মুভী ক্যামেরাই হোক, তারা শুধু এই সকালের এক ভগ্নাংশকেই ধরে রাখতে পারতো। উইথআউট রেফারেন্স্ টু দ্যা কনটেক্সট্। ন্যাচারলিস্ট-এর বিদ্যা ও পরিশীলিত মন আমার নেই। আমি কোনদিন সালিম আলি বা এম কৃষ্ণান বা কৈলাস সাংখালা হতে চাই না। কখনও জিম করবেটের দরদের ভাগীদার হতে পারলে হয়ত হতে চাইতাম। এই কলমটুকু ছাড়া মূলধন আমার আর কিছুই নেই।

বাড়ি ফিরে চান-টান সেরে নিয়ে নাস্তা করলাম। রবিবারে একটু দেরিতে চান করি। সপ্তাহে এই একটা দিনের সারাদিনটাই আমার। আমার একার। নিরবচ্ছিন্ন অবসরের। তিতলিকে বলি একবেলাতেই রান্না সেরে ও-বেলাটা ছুটি নিতে। কিন্তু ও কথাটা পুরো শোনে না। আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে বাড়ি চলে যায় দুপুরে। বিকেলে আবার আসে। চা করে খাওয়ায় দ্বিতীয় কাপ। প্রথম কাপ আমি নিজেই বানিয়ে খাই। তারপর রাতে খাবার গরম করে টাটকা রুটি বানিয়ে আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে ও বাড়ি যায়।

প্রতি রবিবারই সকালটা এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াই বনে জঙ্গলে, যেখানে জীপ বা ট্রাক যাবার পথ নেই। কখনও সঙ্গে কেউ থাকে, কখনও বা একলাই। সারা সপ্তাহে নানা কাজে কর্মে, নানা মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় মনের মধ্যে যেটুকু জট পাকিয়ে ওঠে এবং টেনশান্ গড়ে ওঠে সব আবার খুলে, ঝরে যায় বনে বনে হেঁটে বেড়ালে। নির্জন বনের মধ্যে একা একা হাঁটার মতো গভীর বিশুদ্ধ আনন্দ আর বেশি নেই। তাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আন্‌ওয়াইন্ড্ করা যায়।

বইগুলি রথীদা রাঁচী থেকে যোগাড় করে এনেছিলেন। যাঁর বই তাঁকে ফেরত দিতে হবে তাড়াতাড়ি।

ফাগুয়ার গান—

"তার সুরেলা চুল ছড়ানো ছিল মাটিতে,
আমি ফুল তুলব।
সূর্যাস্তের সময় তার সুরেলা চুল ছড়ানো ছিল মাটিতে
আমি ফুল তুলব।
শোওয়ার সময় তার সুরেলা চুল ছড়ানো ছিল মাটিতে
আমি একটি সুন্দর ফুল তুলেছি।"

আরেকটা গান—

"এই নতুন সরসী খুব গভীর।
আগে আমি পালাই,
তারপর গিয়ে সবাইকে বলব।"

আরও একটা—

"এই মেয়েটা কে রে?
যে বলে, বিয়ে করবে না?
পাকা তেঁতুলের মতো যে নরম,
ভাগ্যিস তুই আমাকে এই মেয়ের কথা বলেছিলি—
ঈস্‌স্‌ কী তেঁতুলের মতো নরম রে!"

"সারহুল্"-এর গানও আছে। সারহুল উৎসব এখানকার ও'রাওঁদের এক উৎসব। শাল গাছকে পুজো করে ওরা তখন। বসন্ত শেষে হয়।

যেমন—

ফড়িংগুলো বৃষ্টির মতো, উড়ছে
আর এই সকাল,
আঃ! আষাঢ় শ্রাবণের এই সকাল
ফড়িংগুলো উড়ছেই, উড়ছেই, উড়ছেই।

আসলে, এখানে ফড়িং বলতে নৃত্যরত ছেলেদের কথাই বলা হচ্ছে গানে।

সেইরকম অনেক আষাঢ়ে গানও আছে।

"পাহাড়ের গায়,
হলুদ শর্ষেক্ষেতে,
হরিণগুলি চরছিল।
একটি তীর ছুঁড়লাম,
দুটি তীর ছুঁড়লাম,
তিনটি তীর ছুঁড়লাম,
হায়!
ওরা কেবল লেজ নাচাল।"

এখানে হরিণ মানে যুবতী মেয়েরা।

ওর্মালির বই পড়তে পড়তে কতদিন আগে চলে যাই। তখন না জানি এই সব বন পাহাড় আরও কত সুন্দর, নির্মল ও নির্জন ছিল! ভাবতেও ভাল লাগে।

ছুটির দিনগুলোতে শোওয়ার ঘরের জানলার সামনে বসে পড়ি, অথবা ডাইরি লিখি।

ছাতারে পাখিগুলো বাইরের পুটুসের ঝোপে নড়ে চড়ে বসতে বসতে অনর্গল কথা বলে। ঝুমকো জবার গাছে বুলবুলিদের মেলা বসে তখন। কত কথা যে বলে ওরা। ওদের শীষে শীষে শীতের মন্থর রোদ-ঝরা আধ-ঘুমন্ত ওম্-ধরা দুপুর সজীব হয়ে ওঠে। এ বন থেকে ও বনে টিয়ার ঝাঁক উড়ে যায় ট্যা ট্যা ট্যা করে হাওয়ায় চাবুক মেরে। দূরের ক্ষেতের ফসলের গন্ধ, রাখওয়ার ছেলেদের বাঁশির সুর, হাওয়ায় গড়িয়ে যাওয়া শুকনো শালপাতার ঝর্ ঝর্ শব্দ সব মিলেমিশে কেমন এক ঘুমপাড়ানী আমেজ আনে।

মাঝে মাঝে মুখ তুলে জানালা দিয়ে দূরে তাকাই। আদিগন্ত সবুজ প্রকৃতি শীতের রোদের সোনালী বালাপোষ মুড়ে ঝিম্ ধরে পড়ে থাকে। হুলুক পাহাড়ের উপত্যকায় তখন শকুন ওড়ে চক্রাকারে।



কাল প্রথম রাতে হাতি বেরিয়েছিল। ভালুমারের ক্ষেতে-ক্ষেতে বড়ই উৎপাত করেছে। একবার ওরা আমার ডেরার লাগোয়া বাঁদিকের বাঁশবনে ঢুকে বোধ হয় একটু মুখ বদলে গেলো।

বস্তির ঘরে ঘরে ধাতব যা কিছু ছিল তা দিয়েই আওয়াজ করেছে সকলে। সব কিছুই ব্যবহৃত হয়েছে। ক্যানেস্তারা থেকে মায় ঘটি-বাটি পর্যন্ত। ফরেস্ট বাংলোর পাশেই ফরেস্ট গার্ডদের কোয়ার্টার্স। তারা বস্তির কয়েকজনকে নিয়ে মশাল জেলে হাতি তাড়াতে বেরিয়েছিলো হৈ-হল্লা করতে করতে। আমি ডান কাত্ বদলে, বাঁ কাতে শুয়েছিলাম।

আজ কুড়ি বছর জঙ্গলে থেকে এইটুকুই জ্ঞান হয়েছে যে, হাতি যদি আমার ঘর ভাঙতে চায় ত ভাঙবে। ওরা আমার চিৎকার চেঁচামেচিতে কর্ণপাতও করবে না। বাঘের দেখা সাপের লেখার মতোই হাতির পরশেও ভাগ্যবিশ্বাসীর মতো নিরুপায়ে বিশ্বাস ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে দলের হাতি সাধারণত বাড়ি ঘরের ওপর হামলা করে না। এক্‌রা গুণ্ডা হাতি করে। ভয়ের কিছু ছিলো না আমার বেড়া-দেওয়া ডেরার মধ্যে শুয়ে। বরং ঝিঁঝিঁদের ঐকতানের একঘেয়েমি কিছুক্ষণের জন্যে এই হাতি-জনিত নানা শব্দে ছিঁদ্রিত হচ্ছিল।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যে বস্তির গরীব লোকদের সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত নন এমন নয়। ও'রা কিছু করবার যে চেষ্টা করেন না, এমনও নয়। গত মাসের গোড়ার দিকে ভালুমার থেকে দিঠিয়া যাবার পথে ডানদিকের জঙ্গলে একটি ঝর্নার কাছে বড় বাঘে একটি মোষ মেরেছিল। যার মোষ, তাকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে টাকা দেওয়া হয়েছিল ক্ষতিপূরণ হিসাবে। আমার সামনেই। আসলে এদেশে যত লোক, যত সমস্যা, তাদের প্রত্যেকের মোকাবিলা করার মতন অর্থ, লোকবল এবং হয়ত বা আন্তরিকতা ও উদ্যোগও সরকার এবং সরকারী আমলাদের নেই। তবে বনবিভাগের আমলাদের মধ্যেও অনেকানেক সৎ, উৎসর্গিত প্রাণ, দুর্দান্ত সাহসী মানুষ আছেন। সকলেই একরকম, একথা বললে, সত্যিই অন্যায় করা হবে। আমাদের ভারতবর্ষর ভিত যে হুড়মুড়িয়ে এখনও ভেঙে পড়েনি তার কারণ এই মুষ্টিমেয় মানুষেরা এখনও আছেন।

মাঝরাত থেকেই আমার একটু জ্বরজ্বর ভাব হয়েছিল। সকালে মনে হল পুরো-পুরিই জ্বর এসেছে। গায়ে, হাতে এবং মাথায় অসহ্য ব্যথা। ভোরে কোনোক্রমে ঘরের দরজা খুলে বাথরুমে গিয়ে ফিরে এসেই ছিট্‌কিনি খুলে কম্বল টেনে আবার শুয়ে পড়ে-ছিলাম। ঘোরের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কখন তিতলি এসেছে, চা করেছে, করে আমার সাড়া না পেয়ে এ ঘরে এসেছে; জানিও না।

ও এসে পুবের জানালা খুলে দিয়েছে। সকালের রোদ এসে আমার হলুদ-লাল খোপ

খোপ কম্বলটার গায়ে পড়াতে ঘরটা একটা হলদে-লালচে আভায় ভরে উঠেছে। তিত্‌লিও একটা হল্‌দ শাড়ি পরেছে। চান সেরে এসেছে ও। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে। চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে আমার চৌপাইয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমার কপালে হাত রাখল। ও অনেক কাজ করে, ওর এই হাত দ্‌টি দিয়ে। তাই-ই ওর হাতের পাতা দ্‌টি র্‌ক্ষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বড় নরম তা।

চোখ খ্‌ললাম, যদিও খ্‌লতে পারছিলাম না। কষ্ট হচ্ছিল।

আমার গায়ে বেশ জ্বর দেখে তিত্‌লির চোখে ম্‌খে চিন্তার ছাপ পড়ল।

এ আবার কি বাধালে?

আমার মাও ঠিক এমনি করেই বলতেন আমার অস্‌খ হলে। বলতেন, খোকা! আবার জ্বর করলি? তোকে নিয়ে আমি আর পারি না। কিন্তু মা যে মাই-ই। এই মেয়েটা সামান্য ক'টি টাকা আর দ্‌ম্‌ঠো খেতে পাওয়ার বিনিময়ে আমার জন্যে এত ভাবে কেন? ওর ম্‌খে আমার জন্যে যে দ্‌শ্চিন্তা এই ম্‌হ্‌র্তে দেখলাম; তা শ্‌ধ্‌মাত্র পয়সার বিনিময়ে আমার পাওয়ার কথা ছিল না।

চা-টা খেয়ে নাও, ম্‌খটা ভালো লাগবে। কী যে করো. কোনো কথাই শোনো না; রাত-বিরেতে এই ঠাণ্ডায় বনে-পাহাড়ে ঘ্‌রে বেড়াবে সবসময়; আমার আর ভালো লাগে না। আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে।

উঠে বসলাম। চৌপাইতে মাথার বালিশটাকে সোজা করে দেওয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে তাতে পিঠ দিয়ে, চায়ের প্লাসটা হাতে নিলাম। তারপর চায়ে চ্‌ম্‌ক দিয়ে বললাম, আমার জন্যে মরবি কোন দ্‌ঃখে! আজ বাদে কাল তোর বিয়ে হবে। এসব কী কথা!

তিত্‌লি আমার ম্‌খের দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। কিন্তু কোনো কথা বলল না। তারপর ঘরের কোণায় একটা চারকোণা প্লাস্টিকের বাক্সের মধ্যে যেখানে ওষ্‌ধ থাকে সেইখানে গিয়ে বলল, কোন্‌টা দেব? হল্‌দটা না সাদাটা।

সাদাটা।

ও ওষ্‌ধের নাম পড়তে পারে না। তাই আমি ক্যাপস্‌ল ও ট্যাবলেটের স্টিপগ্‌লোর রঙ চিনিয়ে রেখেছি ওকে। ওষ্‌ধের বাক্সে একটা ক্যালিফস্‌ সিক্স এক্স-এর বড় শিশি ছিল। তিত্‌লিকে একদিন বলেছিলাম যে. এই শিশিতে বিষ আছে। কখনও আমাকে মারতে হলে এই ওষ্‌ধ জলে গ্‌লে আমাকে খাইয়ে দিবি, সঙ্গে সঙ্গে মরে যাব। ও বিশ্বাস করে বলেছিলো, এই শিশি আমি ফেলে দেব। এটা এনেছো কেন?

ওকে দ্‌ষ্ট্‌মি করে বলেছিলাম. তার জন্যে তোকে কি জবাবদিহি করতে হবে? আমার মরতে ইচ্ছে হলে আমি মরব। তোর তাতে কি?

নাঃ। আমার আর কি? ও ঢোক গিলে বলেছিলো। তুমি মরলে চাকরিটা যাবে। এমন স্‌খের চাকরি। এ চাকরি না থাকলে ত গোদা শেঠের দোকানে গিয়ে চালের কাঁকর বা গমের পোকা বাছতে হতো, নয়ত জঙ্গলে জঙ্গলে দিনভর টো-টো করে ঘ্‌রে আমলকী তেঁতুল এসব পাড়তে হতো। অথবা কান্দা গেঠি খ্‌ড়ে খেয়ে বেঁচে থাকতে হতো। আমাদের ত জমি নেই যে চাষ-বাস করে খাবো। বাবার রোজগারে ত কুলোয় না। আর গোদা শেঠের কাছে কাজ করলে ত শ্‌ধ্‌ কাজ করেই ছ্‌টি মিলত না। আরও কিছ্‌ দিতে হতো তাকে। তুমি আসলে আমাকেই মারতে চাও. সবদিক দিয়ে. তাই তোমার নিজের মরার কথা বলো।

একট্‌ক্ষণ চ্‌প করে থেকে বললো, মাথায় একট্‌ হাত ব্‌লিয়ে দিই। পা টিপে দেব তোমার?

পায়ে হাত দিবি না কক্ষনো। নিজের মা-বাবা ছাড়া আর কারো পায়েই হাত দিবি না।

ও কাছে এসে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, তুমি কি আমার মা-বাবার চেয়ে কম? তুমি ত মালিক। মা-বাবার চেয়েও বড় তুমি।

বোকার মতো কথা বলিস না।

খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে ও মাথার চুলে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। আঁটসাঁট শরীর, ব্লাউজের ভিতর দিয়ে উঁকি-মারা ভরন্ত উষ্ণ-লালচে রাজঘুঘুর মতো ওর বুকের দিকে হঠাৎই চোখ পড়ল আমার। ও লজ্জা পেল। মেয়েরা তাদের সহজাত ষষ্ঠবোধে সব-সময়ই বুঝতে পারে পুরুষের চোখ তাদের কোথায় কখন ছোঁয়। ওর চেয়েও বেশি লজ্জা পেলাম আমি। চোখ সরিয়ে নিলাম। সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার। তক্ষুনি মনে হল, আমার অসুখটা বোধহয় শিগগিরই ভালো হয়ে যাবে। কারণ, তেমন অসুস্থ হলে আমার মনে এই ভাব জাগতো না। বোধহয় কোনো পুরুষেরই জাগতো না। পুরুষের শরীরে কামভাব না থাকাটাই অসুস্থতার লক্ষণ। তার মানে এই-ই যে, আমি রীতিমতো সুস্থই আছি।

কি করব? আমারও যে শরীর বলে একটা ব্যাপার আছে। যৌবন ফুরোতেও যে এখনও অনেক অনেকই দেরি। আমি ত ভগবান নই। একজন অতি সাধারণ রক্ত-মাংসের মানুষ। তিতলির মিষ্টি, শান্ত ব্যক্তিত্ব, আমার প্রতি ওর আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা এবং ওর অতি-কাছে-থাকা উন্মুখ নরম কমনীয় নারীসত্তা মাঝে মাঝে আমাকে এক বন্য-গন্ধী নিষিদ্ধ তীব্র ভালোলাগাময় ভাবনায় ছেয়ে ফেলে। আমার শিক্ষা, আমার আভিজাত্য, আমার সংস্কার; সেই বুনো-আমির লাগাম টেনে ধরে বার বার। নিজের হাতেই নিজেকে চাবুক মারি। কত যে কষ্ট হয়, তা আমিই জানি। সমস্ত মন চাবুকের ঘায়ে যেন ফুলে ফুলে ওঠে।

তিতলিরও কি কোনো কষ্ট হয়? আমি বুঝি আমাকে যে ও এক বিশেষ ভালোবাসা বাসে। তা না-বোঝার মতো বোকা আমি নই। সেটা মনের ভালোবাসা। আর ওর শরীর? মনের ভালোবাসা ছাপিয়েও কি কোনো আলাদা শরীরের ভালোবাসা থাকে? সে তো এক শরীরের অন্য শরীরকে ভালোবাসা। তাকে কি ভালোবাসা বলে? আমি তো ভাবতে পারি না। যাকে মনের ভালোবাসা বাসতে পারি নি তার শরীরের বাগানে ফুল তুলতে যাব কোন লজ্জায়? যদি যাইও, তবে তার শরীরকে পেয়ে কি আমি ধন্য হবো? যে-শারীরিক ভালোবাসা মনের ভালোবাসাকে অনুসরণ করে না, সেই শরীরের আনন্দকে কি এক ধরনের আর্তনাদ বলে না? সেই আর্তির মধ্যে কি কিছু পাওয়া যায়? জানি যে, অনেক পুরুষই আমার সঙ্গে একমত হবেন না। হয়ত অনেক নারীও হবেন না। কিন্তু আমি ত আমিই। আমি ত অন্যদের মতো হতে চাই না। কখনওই হতে চাই না।

মেয়েদের বোধহয় ভগবান পুরুষদের মতো শারীরিক ব্যাপারে এত ভঙ্গুর করে পাঠান নি। হয়তো আমাদের মতো এত কষ্টও দেন নি ওদের। কিংবা কী জানি, ওদেরও হয়তো কষ্ট দিয়েছেন আমাদেরই মতো; কিন্তু ওরা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো বলে হয়তো সে কষ্টকে স্বীকার করে, হজম করে ফেলে। সেই কষ্টের শিকার হতে দেয় না নিজেদের। যে-কারণে তিতলি আমার চেয়ে অনেকই বড়, অনেক মহৎ। মেয়েদের এই সহজাত শিক্ষা আমাকে বিমুগ্ধ করে। শরীরটা ওদের আমাদের চেয়ে অনেকেই গোলমেলে। কত শত কমপ্লিকেটেড্ যন্ত্রপাতি ওদের ভিতরে। জীবন সৃষ্টি করে ওরা। তিল তিল করে নিজের শরীরে মধ্যে রক্তবীজকে সঞ্জীবিত করে নতুন প্রাণ আনে পৃথিবীতে। ওরাও গাছেদেরই মতো। তা-ই তো এতো ভালো লাগে ওদের। ওরা যে ছায়া দেয়। ওদের শরীরে যে ফুল ফোটে! আমাদের শরীর মনের সব কুঁড়িকে যে ওরাই ফোটায় অনবধানে।

আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে তিতলি বলল, তোমার বিয়ে হচ্ছে বলে বুঝি

আমার বিয়ে নিয়ে সব সময়ে ঠাট্টা করো আমাকে?

আমার বিয়ের কথা কে বলল তোকে?

মামীমাই বলেছেন। ঈসস্ আমার মালকিন্ কী সুন্দর!

ওর গলার স্বরে কিন্তু একটুও আনন্দ ঝরলো না।

বিয়ের পরও তুমি আমাকে রাখবে ত? না ছাড়িয়ে দেবে?

তোকে ছাড়া কি আমার চলবে? বউ ছাড়া চললেও চলতে পারে। কিন্তু তোকে ছাড়া চলবে না।

বিয়ের তারিখ ঠিক হল?

কোথায় বিয়ে?

আমি জানি যে, খত্ আসবে তোমার। আমি ত রোজই মাস্টারমশাইকে জিগগেস করি। তোমার কোনো খত্ এলো কি না। খত্ আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন বলত?

তিত্লির গলা শুনে কিন্তু এবারও মনে হল না যে, খত্টা এলে ও খুব খুশি হয়।

এই সব কথা তোকে কে বলেছে?

মামীমা আমাকে সব বলেছে। তুমি একটা মোটর সাইকেল পাবে, তাই না?

তুই চুপ করবি। আমার মাথাব্যথা ত বাড়িয়ে দিলি তুই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিত্লি বলল, তোমার জন্যে গরম পুরী, ঝাল ঝাল আলুর চোকা আর লেবুর আচার নিয়ে আসছি। সঙ্গে গরম চা। খেয়ে নাও। তারপর ভালো করে কাড়ুয়া তেল মেখে রোদে বসে থেকে গরম জলে চান করো দেখবে ভালো হয়ে যাবে আজই। আমি আধঘণ্টার মধ্যে তোমার খাবার আর চা সব বানিয়ে আনছি। খেয়েদেয়ে রোদে বসো, তোমার বুকে পিঠে আমি কাড়ুয়া তেল গরম করে লাগিয়ে দিচ্ছি।

তোর যখন ছেলে হবে তখন তাকে তোর কোলের মধ্যে শুইয়ে ইচ্ছে মতো কাড়ুয়া তেল মালিশ করিস সর্বাঙ্গে। আমাকে ছেড়ে দে।

তুমি বড় অসভ্য! মাখবে না?

অভিমানের গলায় বলল ও।

নাঃ।

না কেন?

ও আবার শুধুলো।

সুড়সুড়ি লাগে।

সুড়সুড়ি বলতে ও বুঝতে পারলো না।

তাড়াতাড়ি বললাম, গুদ্গুদি! গুদ্গুদি লাগে।

ও হাসল। বলল, ধ্যেৎ।

সত্যি রে। জামা খুললেই আমার গুদ্গুদি লাগে। গায়ে হাওয়া লাগলেই। দেখিস না, গরমেও পাঞ্জাবি পরে থাকি আমি।

তিত্লি হেসে গড়িয়ে পড়ল। বলল, এমন অদ্ভুত কথা কখনও শুনি নি।

ছোটমামারা চলে গেছেন আজ দশদিন হল।

কিছুদিন হলো আমি সত্যিই একটু নার্ভাস বোধ করছি। এখনও কোনো চিঠি পেলাম না।

জিন্ মেয়েটিকে আমি প্রায় ভালোই বেসে ফেলেছি। কিন্তু তার ব্যবহার আমাকে খুবই চিন্তান্বিত করছে।

একে কি ভালোবাসা বলা উচিত? নাকি, বলব মোহ? আমার সঙ্গে মেলামেশা বলতে যা বোঝায় তার কিছুই সে করে নি। যদিও তার সুযোগ ছিল। তার দাদা, বৌদি ও

ছোটমামীর অনেক প্ররোচনা সত্ত্বেও সে আমার সঙ্গে একটি মুহূর্তও একা হয় নি। কথায় কথায় ধন্যবাদই দিয়েছে শুধু। যাওয়ার সময়ও ইন্দিরা গান্ধীর মতো কায়দা করে হাত জোড় করে বলেছে, আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব জানি না। অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম। আমাকে ক্ষমা করবেন।

জিন্ পুরোপুরিই কবে যে আমার হবে জানি না। কিন্তু যখন হবে, তখন আমার এই সাম্রাজ্যে তাকে সম্রাজ্ঞীর আসনে বসাবো আমি। তার নৈর্ব্যক্তিক নীরবতার নির্মোক ছিঁড়ে ফেলব, বাঘ যেমন করে অবিসংবাদী মালিকানায় শিকার-করা শম্বরের গায়ের চামড়া ছেঁড়ে। তারপরে আমার খুশি মতো নেড়ে-চেড়ে, উল্টে-পাল্টে, চাঁদে এবং রোদে তাকে আবিষ্কার করব। তিল তিল করে। তার শরীর আর মনের সব ভাঁজ আমার চিরচেনা হবে। দারুণ একটা খেলনা গড়া শুরু করব আমরা দুজনে মিলে। বিয়ের দু-তিন মাস পরেই। তারপর সেই জীবন্ত কাঁদা-হাসা খেলনা গড়া হয়ে গেলে, আজীবন আমার উত্তর-সূরীর মাধ্যমে জিন্-এর বুকের মধ্যে, কোলের মধ্যে; তার শরীর মনের অণু-পরমাণুতে আমি আমৃত্যু এবং মৃত্যুর পরও রোপিত হয়ে থাকব। আমাকে আর কেউই, এমন কি মৃত্যুও তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। আমি বোধ হয় জিন্‌কে ভালোবেসেই ফেলেছি। খুউব খারাপ কাজ করেছি; সন্দেহ নেই। ভালোবাসা মানেই অবধারিত দুঃখ!

চিঠি ত এলো না আজ অবধি। একটাও। আমাকে কি জিনের অপছন্দ হয়েছে? এই বাঁশবনের বাঁশবাবুকে কি সে তার যোগ্য বলে মনে করে নি? তা করলে কিন্তু ও খুব ভুল করবে। আমাকে ও কতটুকু জানার চেষ্টা করেছে? আমাকে কেউ কাছ থেকে গভীর-ভাবে জানলে, কেউই আমায় অপছন্দ করবে এমন ভাবনা ভাবার মতো হীনম্মন্য আমি নই। পছন্দ না হলে বলতে হবে, মেয়েটিকে যত বুদ্ধিমতী বলে মনে করেছিলাম ততটা সে নয়। সেটুকু আত্মবিশ্বাস ছিল এবং আছে। জিন্ আমারই। তাকে আসতেই হবে। এসে আমাকে এবং নিজেকেও ধন্য করতে হবে।

বাইরে যেন কার গলা খাঁকারির আওয়াজ পেলাম।

কওন? আমি শুয়ে শুয়েই শুধোলাম।

তিত্‌লি বোধ হয় রান্নাঘরের বারান্দায় বেরিয়ে এলো। ওর হাতের বালার রিন্‌রিন্ শুনলাম।

খন্‌খনে গলায় কে যেন বলল, বাবু গান শুনবে বলে ডেকেছিল। চা খাওয়াবি ত তিত্‌লি!

তিত্‌লি বলল, বাবুর জ্বর। ঘরে আছে। যাওনা চাচা।

রাম্‌ধানীয়া বুড়ো শব্দ করে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এলো। তারপর ঘরে। ছোটবেলা থেকে পাথুরে মাটিতে চলে চলে তার পায়ের নীচটা খড়্‌খড়ে শিরীষ কাগজের মতো হয়ে গেছে। ও চললে শব্দ হয় খস্ খস-স্ করে। আর হাড়ে হাড়ে কট্‌কটি বাজে।

পররনাম বাবু।

রাম্‌ধানীয়া দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল।

ওকে আসতে বললাম ভিতরে। ভিতরে এসে দু হাতে খৈনী মেরে, ডান দিকের ঠোঁটের নিচে অদ্ভুত কায়দায় নিমেষের মধ্যে খৈনী পুরে দিলো।

তারপর বলল, বুখার? দাঁড়াও, তোমার হাড়ের মধ্যে থেকে অসুখকে এক্ষুনি বের করে দিচ্ছি আমি।

বলেই, আমার দু পায়ের হাড়ে তার হাড়-সার হাত দুটি দিয়ে পাক দিতে লাগল। মনে হল, পা দুটি বুঝি ভেঙেই যাবে।

বুড়ো তবু শোনবার পাত্র নয়।

বলল, তোমার চোখ ছলছল করছে। তোমার যে কি হয়েছে আমার আর তো বোঝার বাকি নেই।

কি হয়েছে, বলো দেখি চাচা?

তোমার হাড়ের মধ্যের নরম সুরুয়াতে শেষ রাতের অন্ধকার ঢুকে গেছে। শীতের অন্ধকার। বহত্ খতরনাগ্। এইটুকু বলেই, একটু থেমে বলল, তুমি কোনো জিন্-এর খপ্পরে পড়ে ছিলে নাকি?

আমার হাসি পেলো।

ভাবলাম, বুড়োকে বলি যে, পড়েছিলাম বটে। কিন্তু সে জিন্ তার জিন্ নয়। অন্য জিন্।

কে জানে? জিন্ পরীরা কেমন দেখতে হয়? পরীরা ত অমঙ্গল করে না, কিন্তু জিন্‌রা করে। ভালোলাগায় গা-ছমছম্ করা শালফুলের সুগন্ধে ম ম করা চাঁদনী রাতে পুরুষমানুষকে ওরা ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে আদর খায়। আদর খাওয়া শেষ হয়ে গেলে নদীতে ডুবিয়ে মারে। পাহাড়ের চূড়ো থেকে নিচের খাদে ফেলে দেয়। আমাদের বন-জঙ্গলের লোকরা বিশ্বাস করে এসব।

যে-কোনো রহস্যজনক মৃত্যুই এবং অসুস্থতাই জিন্ পরীদের অথবা কোনো-না-কোনো ভূতের এ্যাকাউন্ট ভারী করে। ভূতই বা কী এখানে এক রকম? চুরাইল, দারুহা, পিল্‌পিলা চিলুং, টিঙ্গালা রকম-বেরকমের ভূত। ভূতের ছড়াছড়ি। কতরকম আকৃতির কতরকম প্রকৃতির ভূত যে আছে, এসব বনে জঙ্গলে তার হিসেব কে রাখে? ভূতগুলো ভারী সেয়ানাও। নিজেরা পাজী বলেই বোধহয় নিজেদের জাতের ছোঁয়া সযত্নে এড়িয়ে চলে। এবং এ কারণেই বোধ হয় আজ অবধি এক ব্যাটা ভূতের সঙ্গেও দেখা হল না আমার। রাত-বিরেতে জায়গা-বেজায়গায় এত ঘুরে বেড়াই, তবুও।

রামধানীয়া পা টিপতে টিপতে বলল, তোমার জ্বর যদি দুদিনের মধ্যে না ছাড়ে, তবে ওঝা ডাকব গাড়ু থেকে। যে তোমাকে ভর করেছে, সে বাছাধন মজাটা টের পাবে তখন।

ভূতের দাওয়াই এক গোলি খেয়ে নিয়েছি। জ্বর না পালালে তখনই ডেকো তোমার ওঝাকে।

একটা কোসাভিল্ খেয়েছিলাম। বিকেলে আরেকটা খাব। আশা করছি জ্বর ছেড়ে যাবে। না-ছাড়লে, ওঝার অত্যাচার জ্বরের কষ্টের চেয়ে যে অনেক বেশি হবে সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ ছিল না।

রামধানীয়া গলা খাঁকরে গান ধরল :

> "চড়্হলো আষাঢ় মাস, বরষালে বনা, এ রাম,
> পহিলে মুঠ্ বুন্‌লি গোন্দ্‌নি হো এ রাম,
> চিনা মিনা তিন দিনা,
> গোন্দ্‌নি আড়হাই দিনা, এ রাম;
> সাঁওয়া, মাহিনা লাগ্ গেঁয়ো হো, এ রাম......"

টেনে টেনে সুর করে গাইছিল রামধানীয়া।

আমাদের এই বন-পাহাড়ের গানের মধ্যে একটা বিধুর একঘেয়েমি আছে। এই মনো-টোনিই বোধহয় এই গানের মজা। টেনে টেনে শেষ শব্দটাকে অনেক মাত্রা বয়ে নিয়ে যায় এরা। যেন দিগন্তেরই দিকে। এই অরণ্যপ্রকৃতির মধ্যে যেমন এক উদাত্ত অসীমতা আছে, ওদের গানেও তেমনি। বেশির ভাগই তাল ছাড়া গান গায় ওরা। গান যদিও সমে এসে মেলে একসময়, কিন্তু শরতের মেঘের মতো, অতি ধীরে সুস্থে; কোনোরকম তাড়াহুড়ো

করে নয়। তারের কোনোরকম বাজনা ব্যবহার করে না। করা উচিত ছিল। বাজনা বলতে, ওদের শুধুই মাদল। মাদলের বোলও গানের সুরের মতোই একঘেয়ে। কিন্তু এদের এই গানের মধ্যে একটা দোলানি ঘুমপাড়ানি মজা আছে। শহরের টেন্স্ লোকেরা যেমন সেডোটিভস্ বা স্লিপিং ট্যাবলেট খান, দিনশেষে, এখানের মানুষদের তার দরকার হয় না। এদের কাছে সোপোরিফিক্ এফেক্ট্ বয়ে আনে এই গান ও মাদলের একঘেয়ে বোল্।

দূরের চাঁদের পাহাড়ের দিকে চেয়ে, কম্বলের মধ্যে গুঁড়িসুড়ি মেরে শুয়ে, বাইরে শিশির পড়ার টুপ্‌টাপ ভিজে শব্দ আর ঝিঁঝির ডাকের ঝুনঝুনি-ঝংকৃত পটভূমিতে, দূরাগত এই গান এবং মাদলের সুর কখন যে চোখে ঘুমের কাজল পরিয়ে দেয় তো বুঝতে পর্যন্ত পারা যায় না।

এই যে গানটা গাইল রাম্‌ধানীয়া চাচা, এটা ফসল সংক্রান্ত গান। বর্ষার গোড়াতে খেতে খেতে নানা ফসল লাগে, কত যে ফসল তা কী বলব। বেশীর ভাগ শহরের লোকে এসব ফসলের নামও জানে না। চোখেও দেখে নি কখনও।

বোদি ভাদাইবোদি—একরকমের ডাল। এই রুখু অঞ্চলেই হয়। সরু, বীনস্-এর মতো সাদা রঙের। দেখতে, এমনি ডালেরই মতো। এর ছিল্‌কা গরু মোষে খায়। এই ডাল এরা মুগের ডালের মতো ভেঙে নিয়ে জাঁতায় পিষে খায়, ছাতুর মতো করে। ছোট ছোট ঝোপের মতো দেখতে হয় গাছগুলো। এছাড়া অন্যান্য ডালেব মধ্যে উরত্, কুল্‌থী, অড়্‌হর্ ত করেই। আরেক রকমের ডাল লাগায় এরা, বারাই বলে তাকে। কালো রঙের।

গোন্দ্‌নিও এক রকমের ধান। গাছও দেখতে ধানের গাছেরই মতো। গোল গোল, ছোট ছোট ভাতের মতোই সেদ্ধ করে খায়। খুব ভালো পায়েস হয় এই চালে। বেশি জলেরও প্রয়োজন হয় না চাষে। ধান ওঠার পর খড়ও হয়।

গোন্দ্‌নি ছাড়াও চিনা বলে একরকমের ধান হয়। সাঁওয়া ধান আরও ছোট। গাছ-গুলো ছ' থেকে আট ইঞ্চি হয়। এর স্বাদও গোন্দ্‌নির মতোই। এর চাষেও জলের প্রয়োজন খুব কম হয়।

মকাই আর বাজরা ছাড়াও মাড়ুয়া করে এরা। চার-পাঁচ ফিট হয় গাছগুলো। লাল হয়ে ফলে। আটা বানায়, চাকীতে পিষে। গরম জল দিয়ে মাখতে হয় এই আটা রুটি বানাবার আগে। এই আটাও দেখতে লাল হয়। বিয়ে, পুজো, এই সমস্ত অনুষ্ঠানে এরা মাড়ুয়ার রুটি বানায়। মাছ পেলে মাছের সঙ্গে খায়। স্বাদ ভাল লাগে। আমরা যে চাল ও গম খাই তা এদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকেই চোখেও দেখে না। এরা এতই গরীব যে প্রকৃতি জঙ্গলের মধ্যে বন্য প্রাণীদের জন্যে যে খাদ্য সংস্থান করে রেখেছেন, তাই দিয়েই বছরের অনেকখানি চালায়। জঙ্গলে কান্দা-গেঁঠি হয়। কান্দা প্রায় ফুট খানেক লম্বা একরকমের কচু, মিষ্টি আলুর মতো, কিন্তু খেতে বেজায় তেতো। যাদের প্রাণধারণের জন্যে, পেটের আগুন নেভানোর জন্যে, খাদ্যের প্রয়োজন, তাদের স্বাদ বিচার করার বিলাসিতা মানায় না।

গেঁঠি হয় ওলেরই মতো। সারাদিন বনে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে কোথায় কান্দা বা গেঁঠি হয়েছে তা খুঁজে বের করে এরা। তারপর এই পাথুরে শক্ত মাটিতে, চার-পাঁচ ফিট গর্ত করে এই কচু ও ওল বের করে। সারাদিন পর ফিরে এসে এগুলো কেটে কেটে সেদ্ধ করে। তারপর পাহাড়ী ঝর্নার নিচে ঝুড়িতে ভর্তি করে রেখে দেয়। সারা রাত ঝর্নার জল ঝুড়ির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়ায় তেতো স্বাদটা অনেকটা কমে আসে। তার-পর সেদ্ধ করা মহুয়ার সঙ্গে কান্দা-গেঁঠি মিশিয়ে খায়। মহুয়ার মিষ্টি স্বাদ কান্দা-গেঁঠির তেতো স্বাদকে সহনীয় করে তোলে বলেই এরকম ভাবে মিশিয়ে খায়।

শালগাছের শুকনো ফলও জুন মাসে জড়ো করে, পরিষ্কার করে রাখে এরা। ছোলার দানার মতো দানা হয়। এগুলোও এমনিতে খাওয়া মুশকিল। তাই এও সেদ্ধ মহুয়ার সঙ্গে মিশিয়ে খায়। যাদের সামান্য জমিজমাও আছে, তাদেরও সারা বছরের খাদ্য সংস্থান তা থেকে কখনোই হয় না। তাই যখন খাবার থাকে না ঘরে, যখন কাজ থাকে না কোনো-রকম, তখন বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টায় এই সবই খেয়ে থাকে ওরা।

একরকমের গাছ হয় জঙ্গলে ওরা বলে চির্‌চিরি। তার ফলকে বলে তেন্। আমের মতো দেখতে, কিন্তু ছোট ছোট। হলদে হলদে। খেতে বেশ মিষ্টি। গরমের সময় ফলে। তাই-ই খায় ওরা ভাল্লুকের সঙ্গে রীতিমতো প্রতিযোগিতাতে নেমে। পিয়ারও খায়। কালো জামের মতো। পিয়ার সকলেই খায় গরমের সময়। এছাড়া শীতে আছে কুনোদ। এগুলো ঝাড়ে হয়। খেতে মিষ্টি। কেলাউন্দাও শীতে হয়। লেবুগাছের মতো গাছ—ফলগুলো টক্‌টক্ খেতে।

প্রথম শীতে হয় ডিঠোর। ডিঠোর গাছের পাতাগুলো ভারী সুন্দর দেখতে। জুনের শেষে সারা জঙ্গল ডিঠোর গাছের নতুন কচিকলাপাতারঙা পাতায় ছেয়ে যায়। গোল গোল কালো কালো ফল—কাঁটা ভর্তি থাকে ঝাড়ে। মিষ্টি মিষ্টি খেতে।

এছাড়াও হয় জংলী কুল।

আর মহুয়া ত আছেই। মহুয়াই ওই সব মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখে বলতে গেলে। শুখা মহুয়া আর মকাই-ই এদের প্রাণ।

তাই বুড়ো রাম্‌ধানীয়া চাচা এক্ষুণি যে গানটা গাইল, তার বিশেষ তাৎপর্য আছে। গানটার দুঃখময় মানে হল এই-ই যে. ফসল বোনার সময় আষাঢ় মাসে বুনেছিলাম গোন্দ্‌নি চিনা ও সাঁওয়া। কিন্তু খাওযার সময় দেখি, আড়াই দিন গোন্দ্‌নি, তিনদিন চিনা আর সাঁওয়া মাত্র একটা মাসই। বছরের আর বাকি দিন উপোস।

প্রতি লাইনের শেষে একবার করে হো, এ রাম! হো, এ রাম!

রামও নেই ; সেই অযোধ্যাও নেই। কিন্তু এই হতভাগ্য, অর্ধভুক্ত, প্রায়বিবস্ত্র মানুষ-গুলোব জীবনে রাম ঠিকই রয়ে গেছেন। উঠতে বসতে প্রতিদিনে প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হো, এ রাম! এই আশ্চর্য দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ এই সব সরল, প্রতিবাদহীন, প্রতি-কারহীন, নিরুপায় মানুষগুলোর নালিশ জানাবার একমাত্র লোক পৌরাণিক, ধর্মীয়, অনুপস্থিত, অথচ এখনও প্রচন্ডভাবে উপস্থিত রাম!



টুসিয়াব কাল সারারাত ভালো ঘুম হয় নি। ঘুমের মধ্যে বারবার চম্‌কে চম্‌কে উঠেছে। কতবার যে পাশ ফিরেছে, তা ওর মনে নেই। ভোরের পাখি ডাকাডাকি করার সঙ্গে সঙ্গেই বিছানা ছেড়ে উঠে, মা যা কাজের ভার দিয়েছিল, ও সে সব কাজ সারতে লেগেছে।

কাল টুসিয়া আয়নাতে দেখেছিল নিজেকে। এতদিন মা নিয়মিত তার শরীরের যত্ন করেছে। করৌঞ্জের তেল আর সাবানের কল্যাণে আর রোজ চুলেব পরিচর্যায় তার রূপে যেন ছটা লেগেছে।

কালোর মধ্যে টুসিয়ার মতো এমন সুন্দরী প্রাণবন্ত মেয়ে এ-বস্তিতে আর দুটি নেই। সাধে কি আর নান্‌কুয়ার পছন্দ হয়েছিল ওকে। ভেল্জা নাচে সকলেই ওর জুড়ি হতে চায়। নান্‌কু এখানে থাকলে, ও কিন্তু নান্‌কু ছাড়া আর কারো সঙ্গেই নাচে না।

এগারোটার সময়ই বাবা আর তার আট বছরের ছোটভাই লগন বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে রওনা দেবে আজ। বাসটা পৌঁছতে প্রায় সাড়ে বারোটা-একটা হবে। অনেক আগে থেকেই অপেক্ষা করবে ওরা। যদি কোনো কারণে বাস তাড়াতাড়ি এসে যায়।

দাদা হীরু ও তার বন্ধুকে দুটো ঘরের মধ্যে, সবচেয়ে ভাল ঘরটা ছেড়ে দিচ্ছে ওর মা-বাবা। ওরা নিজেরা ঐ ক'টা দিন গরু-ছাগলের মতো গাদাগাদি করে থেকে যাবে এক ঘরে।

এ ক'দিন রোজ চৌপাইয়ে গরম জল ঢেলে ও রোদ দিয়ে খটমল মারা হয়েছে। সারাদিন রোদে দেওয়া কাঁথাকে নিজের নরম বুকের কাছে চেপে ধরে টুসিয়া তার অদেখা, অনাগত স্বামীর বুকের উষ্ণতাটুকু অনুমান করার চেষ্টা করেছে। মা গোন্দ্‌লি ধানের পায়েস রেঁধেছে।

গোদা শেঠের দোকানে রসদ-টসদ আনতে প্রায় পঞ্চাশ টাকা বাকি পড়ে গেছে টুসিয়ার বাবার। তা যাক্‌। ওরা সকলেই জানে শহরের বড় অফ্‌সর তার দাদা, বলতে গেলে টাকার খনিরই মালিক। দাদা এলেই ধারধোর সব শোধ করে দেবে। মাইনে ছাড়াও তার দাদার অনেক উপরি রোজগার। সরকারী অফ্‌সর হওয়ার মতো পয়মন্ত জীবিকা আজকাল খুব কমই আছে। জীবনে অভাব বলতে কিছুই থাকে না। যাই-ই চাওয়া যায়, তাই-ই নাকি পাওয়া যায়, তেমন তেমন জবরদস্ত্‌ চাকরিতে। তার দাদা এবং দাদার বন্ধু জবরদস্ত্‌ ডিপার্টে কাজ করে বলে শুনেছে টুসিয়া, তার বাবার কাছে। পুলিশের কাজ করে দাদা।

টুসিয়ার মা, শুয়োরের মাংসটা উনুনে চাপিয়ে, টুসিয়ার বাবাকে বিষম তাড়া-লাগালো। বলল, এখনও রওয়ানা হলে না? তোমার মতো বে-আক্কেলে মানুষ দেখি নি আর।

তারপর টুসিয়ার বাবা আর ভাই সূর্যের দিকে তাকিয়ে আর কোনো ঝুঁকি নেয় নি। আকাশে একটু মেঘ-মেঘ করেছে। সূর্যের ঘড়ি, ভুলও দেখাতে পারে। তাই-ই তারা সকাল সকালই রওয়ানা হয়ে গেছে।

বাস স্ট্যাণ্ডে পেঁৗছে ওরা জানতে পেলো যে, বাস আসার সময়ের অনেক আগেই পেঁৗছে গেছে ওরা। বাস আসতে আরো এক ঘণ্টা দেরি। তাতে ক্ষতি হয় নি কোনো। পথের পাশের চায়ের দোকানে বসে টুসিয়ার বাবা পথ-চলতি ও থেমে-থাকা সব লোককেই এ খবরটা শুনিয়ে দিয়েছে, তার কেউ-কেটা ছেলে, ভারী সরকারী অফসর আজ গ্রামে আসছে: পঞ্চায়েত থেকে হীরুকে একটা সম্বর্ধনা দেবারও কথা উঠেছিল। কিন্তু হীরুর বাবা জুগনুই বারণ করেছে। তার জানা নেই যে, ছেলে তা পছন্দ করবে কি করবে না। যে ছেলেকে সে জানতো, সে ছেলেতে এবং যে লায়েক ছেলেটি সবান্ধবে আজ আসবে পুরানো গাঁয়ে, তাদের দুজনের মধ্যে অনেক অমিল দেখবে হয়তো জুগনু। তাই জুগনু সাবধান হয়েছে। তার বেটা, হীরুয়া বেটা; বাবাকে সর্বাদক থেকে ছাড়িয়ে গেছে, তাই কি ছোট মাপের বাপকে হীরু আর সম্মান দেবে না?

নানা কথা মনের মধ্যে তোলপাড় করছে এ ক'দিন হলো। একথাও মনে হচ্ছে যে, হীরুর বন্ধুর যদি টুসিয়াকে পছন্দ না হয়? এই ছোট্ট জায়গায়, ছোট্ট গ্রামে বহিরাগত যুবকের সঙ্গে মেলামেশা করার পরও যদি সেই অফসর ছেলেটি টুসিয়াকে বিয়ে না করে, তাহলে কি টুসিয়ার বিয়ে হবে ভবিষ্যতে? ঢি-ঢি পড়ে যাবে না গ্রামে!

নানকুয়াই বা কী বলবে? ও কি কথা বলবে তখন? যদি বলে, তাহলে অপমানই করবে হয়তো! নানকুয়া ছেলেটা ভালো। তবে, বড়ই গোঁয়ার-গোবিন্দ। তাছাড়া, কোথায় হীরুর বন্ধু আর কোথায় ও। কার সঙ্গে কার তুলনা! হনুমানজীর সঙ্গে চুহার। তবে সেই ছেলেটি যদি টুসিয়াকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে কি নানকুয়াও প্রত্যাখ্যান করবে? স্বাভাবিক। তাহলে কি হবে?

বুড়ো আর বেশি ভাবতে পারে না। নিজের ভাবনা ভাবা অনেক সহজ। নিজের রক্তজাত সন্তানদের ভালোমন্দ এবং তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা, বড় অসহায়ের ভাবনা। নিজের হাতে কলকাঠি থাকে না, অথচ অন্যের কলকাঠি নাড়ার কারণে সুখ ও দুঃখের ভাগীদার হতে হয় বয়স্ক বা অবসর-প্রাপ্ত মা-বাবাকে। জুগনুর বর্তমান অবস্থাটা বড়ই করুণ। বড়ই পরনির্ভর হয়ে রয়েছে সে।

জুগনু একটা সিগারেট ধরালো। চিরকাল বিড়ি খেয়ে এসেছে সে। কিন্তু আজকে তার অফসর ছেলের যদি ইজ্জতে লাগে তার বাবা বিড়ি খেলে? অথবা, তার বন্ধু যদি ভাবে কিছু? তাই, সাদা ধবধবে সিগারেটটাকে দু-আঙুলের মধ্যে নিয়ে, কেউকেটা বেটা হীরুর আর তার বন্ধুর পথ চেয়ে বসে আছে, আর ভুস্-স্ ভুস্ করে অনভ্যস্ততায় সিগারেট টানছে।

বাসটা আসার সময় হয়ে এল। বুড়োর সিগারেট-ধরা আঙুল দুটি নিঃশব্দে এবং সকলের অগোচরে কাঁপতে লাগল। বুড়োর পিছনে আরও দু-একজন বুড়ো জমায়েত হয়েছে। ভালুমারের ছেলে হীরুকে অফসর হয়ে ফিরে আসতে দেখবে তারা। একটা ঘটনার মতো ঘটনা ঘটতে চলেছে এই চুপচাপ, হুলুক্ পাহাড়ের পাঁচিলপাহারায় ছোট্ট বস্তির লাল-মাটির বুনো বুনো গন্ধভরা পথে।

বাসটাকে আসতে দেখা গেল। পিছনে লাল ধুলোর মেঘ উড়িয়ে বাসটা এসে স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াল। কোলে একটা ছোট কালো পাঁঠা নিয়ে নামল একজন। মুরগী, লাউ, কুমড়ো, বাজরার বস্তা সব নামল একে একে। মানুষ-জন, মেয়ে বউ নামতে লাগল। যারা এখানে নামবে না, তারা জানালায় হাত রেখে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল। পানের

পিক্ ফেলল পিচ্ পিচ্ করে দুজন। কণ্ডাক্টর বাসের রেলিং দেওয়া ছাদে দাঁড়িয়ে একে একে প্রত্যেকের মালপত্র নামিয়ে দিল।

কিন্তু হীরু বা তার অদেখা বন্ধু কেউই নামল না সেই বাস থেকে।

জুগ্নু বুড়োকে পিছন থেকে অন্য এক বুড়ো শুধোলো, কি হল? বুড়োর অনভ্যস্ত অন্যমনস্ক আঙুলের ফাঁকে সিগারেট পুড়ে এল এবং হঠাৎ তার আঙুলে ছ্যাঁকা লাগত হুঁশ হল বুড়োর।

টুসিয়ার ছোটভাই লগনও উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে ছিল বাসটার দিকে। তার দাদা কত কি উপহার নিয়ে নামবে বাস থেকে! অনেক কল্পনা করেছিল বাচ্চা ছেলেটা।

বাসটা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলো হর্ন বাজিয়ে দিঠিয়ার দিকে।

আবাব ধুলো উড়ল। ফেলে দেওয়া শালপাতা, কাগজ কুচি, এটা-সেটা, ধুলোর মেঘেব মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। জুগ্নু বুড়ো বসে থাকা অবস্থা থেকে বাসটা আসার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। দাঁড়িয়েই রইল স্থাণুর মতো।

ছোট ছেলে লগন হাত ধরে হ্যাঁচ্কা টান দিল।

বাড়ি যাবে না বাবা?

যাব।

বলে, বুড়ো বাড়ির পথে হাঁটতে লাগল।

আকাশে, চারপাশে রোদ ঝক্‌মক্ করছিল তখন। বুড়োর মনে হল তখন রাত হলে, ভালো হতো। কাউকে এই লজ্জার, অসম্মানের মুখ আর দেখাতো হতো না।

নিজেদের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দূর থেকে দেখতে পেল আমগাছ আর নিম-গাছেব ছায়ার ঘর দুটির সামনে টুসিয়ার মা দাঁড়িয়ে আছে পথের দিকে চেয়ে। ওদের একা আসতে দেখে জুগ্নুর বৌ বোধ হয় ঘরের মধ্যে টুসিয়াকে কিছু বলে থাকবে। টুসিযয়া দৌড়ে এল বাইবে। তারপর মা ও মেয়ে নির্বাকে ধীরে ধীরে মাথা নীচু করে হেঁটে আসা ক্লান্ত, ব্যথিত এবং চিন্তান্বিত জুগ্নু ও লগনের দিকে চেয়ে রইল।

টুসিয়ার ছোট ভাই-ই শুধু খেলো। মা, বাবা এবং টুসিয়া কেউই খেলো না। অনেক কিছু রেঁধেছিল মা। খাওয়ার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না ওদের কারোই।

বিকেলে, বেলা পড়ে গেলে টুসিয়া গাছ-তলায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে ছিল। বাবা একটু পর আবার যাবে বাস স্ট্যাণ্ডে। যদি বিকেলের বাসে তারা আসে।

ও হঠাৎ দেখল, টিহুল হেঁটে আসছে ওদের ডেরার দিকে।

টিহুল কাছে এসে বলল, হীরু এসেছে।

টুসিযা চমকে উঠল।

ঘরের ভিতর থেকে টিহুলের গলা শুনে সকলে দৌড়ে বাইরে এল।

জুগ্নু বলল, কোথায়? হীরু কোথায়?

ফরেস্ট বাংলোয়। দুপুরে এসেছে জীপ গাড়িতে করে, সঙ্গে অন্য একজন অফ্‌সর। আমাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে যে, মাত্র দুদিনের জন্যে এসেছে, অফিসেরই কাজে। এখান থেকে মহুয়াডাঁরে যাবে।

এখানে থাকবে না? আসবে না? টুসিয়ার মা অবাক গলায় শুধোলো।

মনে হয় না।

টিহুল মুখ নিচু করে বলল।

তারপর বলল, বাড়িতে থাকা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া ভারী অফ্‌সরের পক্ষে ঐরকম বাড়িতে থাকা কষ্টের। অসম্মানেরও। তোমরা ইচ্ছা করলে দেখা করতে পারো।

ওরা সকলে চুপ করে থাকলো। কেউই কোনো কথা বলল না।

হঠাৎ টিহ্‌ল বলল, হীর্‌ নাম পালটেছে।

নাম পালটেছে?

বাবা, মা এবং মেয়ে একসঙ্গে বলে উঠল, ধরা গলায়।

হ্যাঁ, টিহ্‌ল বলল,। নাম মানে, পদবী। হীর্‌ ও'রাও এখনও হীর্‌ সিং। এত বড় অফ্‌সর বনে গিয়ে নিজেকে ও আর বন পাহাড়ের লোক বলে পরিচয় দিতে চায় না। ওর জীপের ড্রাইভারের কাছেই সব শ্‌নলাম। ড্রাইভার বলছিল যে, পাটনাতে সাহেবের বাড়িতে মাংস ও শাকসব্জী ঠাণ্ডা করার সাদা বাক্স আছে—ফিরিজ্‌ না কি বলে যেন। গান-বাজনা শোনার জন্যেও নানা রকম যন্ত্রপাতি আছে। বড় বিলিতি কুকুর আছে। সাহেব ক্লাবে যায়। একটা খেলা খেলে, যার নাম টিনিস্‌। ভালো অফ্‌সর বলে খ্‌ব স্‌নাম সিং সাহাবের। মায়না ছাড়াও, মাসে দশ-পনেরো হাজার টাকা উপরি আছে। রাজার মতো থাকে সাহেব। আরো অনেক উন্নতি হয়ে যাবে সাহেবের।

তারপর টিহ্‌ল হঠাৎই বলল, শ্‌নলাম, হীর্‌ নাকি সাহেবের মতো কমোড ছাড়া টাট্টি করতে পারে না আজকাল।

কমোড? কমোড কি?

অবাক গলায় ট্‌সিয়ার মা শ্‌ধোলো।

সে সাহেবদের টাট্টির চেয়ার।

চেয়ার কি?

কুর্সী।

ট্‌সিয়ার মা বলল, একবারও ওর ছোট ভাই লগনের কথা, আমার কথাও জিজ্ঞেস করল না হীর্‌? ট্‌সিয়ার কথা?

ভারী অফ্‌সরের সামনে আমি কি যেতে পারি? আর্‌দালী এসে আমাকে খবর দিতে বলল, তাই-ই এসেছি।

আরদালী কি খবর দিতে বলল?

হীর্‌র বাবা শ্‌ধোলো।

টিহ্‌ল ম্‌খ নিচ্‌ করে বলল, আরদালী বলল, জ্‌গ্‌ন্‌ ওরাও'কে খবর দিতে, সিং-সাহাব এবারে দেখা করতে পারছেন না। জর্‌রী কাজে এসেছেন। এখান থেকে চ'লে যাবেন মহ্‌য়াডাঁরে। পরে এলে, দেখা করে নেবেন। যদি সময় হয়।

তারপর টিহ্‌ল বলল, আমি যাই। আমার জল ভরতে হবে বাংলোর ট্যাঙ্কিতে। সাহেবেরা বিকেলে চান করবেন আবার। গরম জলও করতে হবে।

টিহ্‌ল কথা ক'টি বলেই আবার ম্‌খ নামিয়ে নিল।

সরল টিহ্‌ল জানে যে, হীর্‌ যে অপমানটা তার বাবা-মা ভাইবোনকে করল, সেটা তাদের একার অপমান নয়। এটা প্‌রো ভাল্‌মার বস্তিরই অপমান। মনে পড়ল টিহ্‌লের, ছোটবেলায় খেলতে খেলতে ও একবার ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল হীর্‌কে, গোবরের মধ্যে। টিহ্‌লকে হীর্‌ "টিউলা ভাইয়া" বলে ডাকত। খেলার সাথী ছিল।

অপমান টিহ্‌লের নিজেরও কম হয় নি।

হীর্‌ যখন জীপ থেকে নামল, তখন টিহ্‌ল মহ্‌য়া গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিল। হীর্‌র চোখ তাকে অবশ্যই দেখেছিল, ছেঁড়া জামাটা আর দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা খাকি হাফ-প্যাণ্ট পরা অবস্থায়। কিন্তু হীর্‌ তাকে দেখেও চেনে নি।

টিহ্‌ল জানে যে, ট্‌সিয়ারা আর কখনও হীর্‌কে ফিরে পাবে না। ওরা ওর কেউই নয়। সিংসাহাব ভাল্‌মারকে চিরদিনের মতোই ভুলে গেছে। যে ভাল্‌মার বস্তি জ্‌গ্‌ন্‌ ও'রাও-এর ছেলে হীর্‌ ও'রাও-এর জন্য গর্বিত সেই ভাল্‌মারকেই হীর্‌ প্‌রোপ্‌রি

অস্বীকার করেছে। নাম বদল করে অস্বীকার করেছে জুগ্নুর পিতৃত্ব পর্যন্ত।

টুসিয়া হঠাৎ লক্ষ করল যে, তার আট বছরের ছোট ভাইটা ওদের বাড়ির সামনের পাহাড়ী নালার শুকনো বুকে নেমে গিয়ে নুড়ি পাথর কুড়োচ্ছে দ্রুত হাতে, আর আকাশের দিকে প্রচন্ড আক্রোশে সেই পাথরগুলো ছুঁড়ে চলেছে একটা একটা করে। ছোট্ট লগন জানে, ওর লক্ষ্যবস্তু ওর নাগালের বাইরে। তবু ছেলেমানুষী অবুঝ রাগে ও পাথর ছুঁড়েই চলেছে। লগনের রাগটা কিন্তু মিথ্যা! এবং রাগটা সত্যিই।

টুসিয়া শূন্য দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে ছিল আর গুণছিল।

পাথরগুলো অত দূরের ঝাঁটি জঙ্গলে ভরা বড় বড় কালো পাথরের টিলাতে গিয়ে শব্দ করে পড়ছে। শব্দ গুণছে টুসিয়া। চুরমার হওয়া স্বপ্নগুলোর। টুসিয়া গুণছে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়...। টুসিয়া গুণেই চলেছিল। কখন যে ছায়াগুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে এসেছে, কখন পাখিরা সব ঘরে গেছে ডাকতে ডাকতে, কখন সূর্যটা হারিয়ে গেছে পশ্চিমের ঢালে, ঝুমুরীবাসার জঙ্গলের গভীরে কখন যে অন্ধকার নেমে এসেছে টুসিয়া এসবের কিছুই লক্ষ করে নি।

আলো এখন আর কোথাওই নেই। টুসিয়ার চারিদিকেই অন্ধকার। দারুণ অন্ধকার।

হঠাৎ মা ডাকল। যেন বহুদূর থেকে, যেন অন্য কোনো দেশ থেকে।

—টুসিয়া; টুসিয়া।

হুঁ—উ—উ......

টুসিয়া জবাব দিল। যেন, ঘোরের মধ্যে।

মা বলল, কাঠগুলো জড়ো করাই আছে। একটু আগুন জ্বাল্। আজকে বড় শীত।

ও বুঝতে পারছিল তা।

এত শীত আগে কখনও বোধ করে নি টুসিয়া। আজকে ওর নবীন, নবম উষ্ণতার স্বপ্নে স্বপ্নিল উৎসুক শরীরে এবং কবোষ্ণ মনের দাঁড়ে দাঁড়ে শীতের পাখিরা একে একে এসে বসেছে সারে সারে। দূরাগত তাদের ডানায় বয়ে-আনা বিদেশী শীতের ঝাপটায় ক্রমাগত কুঁকড়ে যাচ্ছে টুসিয়া। দিশী নান্কুর পুরোনো প্রেমিকা টুসিয়া।



টুসিয়া অনেক ভেবেছে। কাল সারারাত ভেবেছে আর কেঁদেছে আর কেঁদেছে। কিন্তু ভেবে কোনো কূল-কিনারাই পায় নি।

আজ সকাল দশটা নাগাদ বাবা গেছিল বাংলোতে। দেখা করতে। কিন্তু দাদার সঙ্গে দেখা হয় নি। নানা জায়গার পুলিশের লোকেরা নাকি সেখানে রয়েছেন। বাইরে থেকে আসা পুলিশের পাহারা ছিল বাংলোর বাইরে। তারা পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও হীরুর সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি। বলেছে, বকোয়াস্ মত্ কর্না। পাগল কাঁহাকা। তুম্ হামলোগোঁকা এস-পি সাহাবকা বাপোয়া না ঔর কুছ্। ভাগো হিঁয়াসে। এখন ঢুকতে দেওয়ার অর্ডারই নেই আমাদের। তবু জুগনু, ওদের বলেছিল হীরুকে ডেকে দিতে একবার। তাতে ওরা বলছিল, ওদের ঘাড়ে মাত্র একটা করেই মাথা। ডাকাডাকির মধ্যে ওরা নেই।

বাবা ফিরে আসার পর বিকেলের দিকে টিহুলও আবার এলো। টিহুলের চোখ লাল, দেখেই মনে হল ওরও বুঝি ঘুম হয় নি রাতে। একটা খাম হাতে নিয়ে এসেছিল টিহুল। বাবা মহুয়া গাছটার তলায় দাঁড়িয়েই খামটা খুলেছিল। খামটার মধ্যে টাকা ছিল। দুটো একশ টাকার নতুন নোট। আর কিছুই ছিলো না। না টুসিয়ার জন্যে কোনো চিঠি, না অন্য কিছু। টিহুল বলেছিল, রাতের বেলা আজ হীরু আসতে পারে। তবে কখন আসবে বলতে পারে না। দিনের আলোয় সে আসতে চায়ও না। সে পুরোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না। তবে আবার কখন গ্রামে আসা হয় না হয়, তাই-ই একবার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে যাবার চেষ্টা করবে। ইচ্ছে আছে।

টিহুলের এই কথা শুনে বুড়ো জুগনু স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর ফসস্ করে তার কাছে যা মহামূল্যবান, সেই নোট দুটোকে হঠাৎই ছিঁড়ে ফেলল টুকরো টুকরো করে। তারপর টিহুলকে টুকরোগুলো খামে ভরে ফেরত দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, শোন্ টিহুল, হীরুকে বলে দিস, তার আলোতে অথবা অন্ধকারে কোনো সময়েই আসতে হবে না। হীরু সিং শহরের ভারী অফ্সর হতে পারে, হতে পারে সে পুলিশ সাহেব কিন্তু তার জন্যে কোনো জায়গা নেই আর ভালুমারের জুগনু ওঁরাও-এর বাড়িতে। একটুও জায়গা নেই। যদি হীরু আসে, তবে তাকে ঢুকতে দেবো না আমি।

টিহুল নিস্তেজ ক্লান্ত গলায় বলল, মাথা ঠাণ্ডা করো জুগনু চাচা। যে টাকা ছিঁড়ে ফেললে, এই-ই আমি নিয়ে গিয়ে কী বলব তা জানি না। তাছাড়া, তোমার ছেলে এখন পুলিশের বড় সাহেব। ছেলের সঙ্গেও সাবধানে ব্যবহার কোরো, নইলে তোমরাও বিপদ আছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি হীরুকে আর তার দোস্ত্ অফ্সরকে মারুমার

আর গাড়ুর থানায় দারোগারা ফটাফট্ সেলাম ঠুকছে। কথা শোনো, এরকম কোরো না। কত রকম বিপদ যে ঘটতে পারে তা তোমার ধারণারও বাইরে। বাবা বলেই যে ছেলে খাতির করবে সে যুগ কি আর আছে?

জুগনু বলল, তুই চুপ কর! বিপদ? কিসের বিপদ? আমার ঘরে কি টাঙ্গি নেই? আমার আর কোনো বিপদেরই ভয় নেই। ঐ ছেলে যদি আমার ধারে-কাছে আসে তাহলে টাঙ্গি দিয়ে তার মাথা দু ফাঁক করে দেবো। ইজ্জৎ বড়, না জান বড়? না কি টাকাই বড়? তুই কি বলিস?

আস্তে আস্তে।

টিহুল ফিস্ ফিস্ করে বলল। কে কোথায় শুনে ফেলবে। গাছেরও কান আছে।

তারপর বলল, টাকাটার তো এই দশা করলে। আমার কপালে এখন কী আছে তা কে জানে। তবে আমি এগোচ্ছি।

বলেও, ও একটু দাঁড়াল, টুসিয়ার মায়ের সামনে।

টিহুল জানতো, হীরুর বাবা অমন করলেও, ছেলে সত্যি সত্যিই যদি আসে, মা তাকে আদর করে ঘরে ডাকবেই। তাই টিহুল কিছুক্ষণ টুসিয়ার মায়ের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে শুধালো, কি চাচী? তোমারও কি চাচার মতেই মত?

টুসিয়ার মাও অনেক কেঁদেছে কাল থেকে। চোখের দৃষ্টি ভাসা-ভাসা। অনেক দূরে সেই দৃষ্টি নিবদ্ধ। যেন একদা-উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে আসন্ন রাতের অন্ধকারে মাখা-মাখি হতে দেখছে টুসিয়ার মা। সেই পরস্পরবিরোধী সাদা কালো ছবিতে তার চোখের মণি জ্বলে গেছে। একটুক্ষণ নীরব থেকে টুসিয়ার মা একবার তার স্বামীর দিকে চকিতে চেয়েই কঠিন গলায় টিহুলকে বলল, হ্যাঁ, আমারও তাই মত।

টিহুল স্তম্ভিত হল, কিন্তু কিছু বলল না। এখন সহজে বিস্মিত হয় না টিহুল। কিছুদিন পর বোধ হয় আর কিছুতেই বিস্মিত হবে না। কাল বিকেলে যখন সে টুসিয়াদের বাড়ি এসেছিল তখন তার কুঁড়েতে দুজন কনস্টেবল গিয়েছিল মুরগী খোঁজার অছিলায়। এবং মুরগী তার বাড়িতে ছিলও গোটা চারেক। দুটো মুরগীর দাম দিয়ে তারা টিহুলের বৌকে বলেছিল, সন্ধ্যে লাগতে-না-লাগতে যেন সেই মুরগী দুটো নিয়ে বাংলোতে আসে। সাহেবদের অর্ডার। টিহুলকে যেন না পাঠায়।

যাঁরা এদেশের বনে জঙ্গলে বসবাস না করেছেন তাঁদের পক্ষে পুলিশ ও বনবিভাগের নিম্নতন কর্মচারীদের দৌরাত্ম্য যে অসহায় বুভুক্ষু সাধারণ মানুষদের ওপর কী প্রকার রূঢ়, তা বিশ্বাস করাও মুশকিল। ওঁদের এই ব্যবহারে সাধারণ লোকেরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু পুলিশের এত বড় বড় কর্তাদেরও এহেন আচরণ টিহুলের মতো বহু অত্যাচারিত ও আজীবন বঞ্চিত মানুষেরও অজানা ছিল। বিদেশী, সাদা সাহেবরা চলে গেছে দেশ, ছেড়ে, টিহুল জন্মাবার আগেই। কিন্তু তারা থাকলে আজ যারা দেশের রক্ষক এবং ভক্ষক তাদের দেখে লজ্জায় লাল হয়ে যেত। কুকুর-বেড়ালের দেশেই এমন সম্ভব। কুকুরের বাচ্চাদের মালিক কি আর বাঘ সিংহ হয়?

তার সুন্দরী বাঁজা-বউ কুঁড়েতে ফিরেছিল গভীর রাতে। দুজন কনস্টেবল টর্চ এবং রাইফেল হাতে তাকে সসম্মানে পেঁৗছে দিয়ে গেছিল বাড়িতে। টিহুলকে যা মর্মাহত করেছিল তা পুলিশের বড় সাহেবদের আচরণ নয়, তার নিজের স্ত্রীর আচরণ। সে নেশা-গ্রস্ত হয়ে হাসি হাসি মুখে মাঝরাতে বাড়ি ফিরে একটা দশটাকার নোট টিহুলের সামনে মেলে ধরে বলেছিলো, জীবনে তুই এমন সোহাগ করতেও জানিস নি আর হাতে ধরে এত টাকাও কখনও দিস নি। আমার কিস্মত তুই কখনও বুঝিস নি, বুঝবিও না। তোর হাতে পড়ে আমার জীবনটাই নষ্ট হয়েছে, শুনে রাখ্ টিহুল।

টিহ্ল অবাক চোখে তাকিয়েছিল তার বউ-এর দিকে। আর ভাবছিল, এ গ্রামের আরও দ্-পাঁচজন আত্মসম্মানজ্ঞানহীন প্রুষের মতো সেও কি তার বউ-এর শরীর-ভাঙানো পয়সায়ই বেঁচে থাকবে আজ থেকে? প্রো ব্যাপারটার পেছনে যে চৌকিদারের যোগসাজশ ছিল তা তার ব্ঝতে অস্ববিধে হয় নি। রোগা-পট্‌কা টিহ্ল বেদম মার মেরেছিল তার বউকে। তারপর সাত সকালে গ্রবক্স সিং ঠিকাদারের লাতেহার যাওয়া একটি ট্রাকে উঠিয়ে দিয়ে ড্রাইভারকে বলে দিয়েছিল, তার বউকে লাতেহারের কাছারীর সামনে যেন নামিয়ে দেয়। বউকেও বলে দিয়েছিল বারবার, এখন থেকে সে যেন তার বাবার কাছেই থাকে। আর শরীর ভাঙিয়েই যদি খেতে চায়, ভালো শাড়ি পরতে চায় বা র্পোর মল আর বাজ্বন্দ কিনতে চায়; তাহলে লাতেহারেও তার অভাব হবে না।

প্থিবীতে এই একটি মাত্র পণ্যকেই বাজারীকৃত করতে যে কোনো মার্কেটিং ম্যানেজারের সহায়তা লাগে না—অশিক্ষিত কিন্তু সহজাত শিক্ষায় শিক্ষিত টিহ্লের মতো মান্ষও এই কথাটা ভালো করেই জানত। টিহ্ল জানতে চেয়েছিল, তার বউ কোন্ সাহেবের বিছানায় শ্য়েছিল? হীর্র না হীর্র দোস্ত্-এর। বউ কিন্তু অত মারেও জবাব দেয় নি। তারপর থেকেই টিহ্লের মনে বদ্ধম্ল ধারণা জন্মেছিল যে, নিশ্চয়ই হীর্ই তাহলে তার বৌকে...।

কী করে, কীভাবে ও তার প্রতিশোধ নেবে সকাল থেকে শ্ধ্ এই এক চিন্তা মাথায় ঘ্রছিল ওর। টিহ্ল জানে না, এমন কি ভাবতেও পারে না; চৌকিদারের বির্দ্ধে, প্লিশের বড় সাহেবের বির্দ্ধে কী করে প্রতিশোধ নিতে হয়। ওরা বংশপরম্পরায় অত্যাচার সয়েছে, অন্যায় দেখেছে, কিন্তু কখনো প্রতিবাদ করার বা প্রতিশোধ নেওয়ার সাহস ওদের হয় নি। একদল অত্যাচার করেছে আর অন্যদল ম্খ ব্জে তা সয়েছে। এই-ই নিয়ম বলে জেনে এসেছে চিরকাল ওরা। মালিকদের গায়ের রঙ সাজপোশাক, ভাষা সব বদলেছে ধীরে ধীরে, কালে কালে; কিন্তু ওদের অবস্থার বিশেষ কোনো হেরফের হয় নি। ওরা যেমন ছিল তেমনই আছে। টিহ্লের গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন সংস্কার, ওর বাপ-ঠাকুর্দা, ওকে শিখিয়ে গেছে ওদের কপালের এই লিখন। কপালের মারের বাড়া আর মার নেই।

সন্ধ্যে লাগতে-না-লাগতেই বাড়ি শ্ধ্ শ্য়ে পড়েছিল জ্গ্ন্রা। লগন আর জ্গ্ন্ এক ঘরে শোয়। লাগোয়া ঘরে ট্সিয়া আর ট্সিয়ার মা। ট্সিয়ার মা গতকাল সারাদিন সারারাত এবং আজকের প্রো দিনও কিছ্মাত্র ম্খে দেয় নি। তাই বোধ হয় ক্লান্তিতে ঘ্মিয়ে কাদা হয়ে গেছিল। ট্সিয়ার চোখে আজও ঘ্ম নেই। বাইরে শিশির পড়ার শব্দ শ্নছে আর চমকে চমকে উঠছে। বারবার মনে হচ্ছে, এই ব্ঝি দাদা এল, ডাকলো, 'ট্সি, এই ট্সি' বলে। ঘণ্টাখানেক পর ট্সিয়া মার নাকের সামনে হাত এনে ব্ঝতে চাইল ঘ্ম কতখানি গভীর। মা অঘোরে ঘ্মোচ্ছে। ট্সিয়া তার চাদরখানা তুলে নিয়ে আলতো হাতে দরজার খিল খ্লে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে। ও কী করছে? কোথায় যাচ্ছে? কেনইবা যাচ্ছে?

জানে না ট্সিয়া। ওকে যেন নিশিতে পেয়েছে।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। হল্‌ক্‌ পাহাড়ের নিচটা চাঁদের আলোতে আর কুয়াশাতে নীল স্বপ্নময় দেখাচ্ছে। একটা শম্বর ডেকে উঠল বাঁ-দিকের খাদ থেকে। শম্বরটা বাঘ দেখেছে নাকি? এমন শীতের রাতেই বাঘেরা পথের ধ্লোর ওপর বসে থাকে, গাছ-পাতা থেকে ঝরে-পড়া ব্ষ্টির মতো শিশিরের হাত থেকে বাঁচতে। ট্সিয়ার ভীষণ শীত করছিল বাইরে বেরিয়েই, কিন্তু একট্ চলতেই ওর গা গরম হয়ে এল। যদিও ওর মাথা ভিজে গেল হিমে এবং পথের পাশের গাছ-পাতা থেকে ঝরে-পড়া শিশিরে।

আজ অবধি কোনোদিন এমন রাতে একা টুসিয়া বাড়ির বাইরে আসে নি। পরবের রাতে যখন গাঁ-শুদ্ধু লোক মহুয়া খেয়ে নাচগান করে সারারাত ফুর্তি করে, তখনও না। ওর দাদা হীরু ভীষণ গোঁড়া ছিল। সেই দাদার জন্যেই আজ ওর এমন রাতে বেরোতে হয়েছে। প্রথমে ভীষণই ভয় করেছিল ওর। এখন আর ভয় করছে না। দাদা পুলিশের বড় অফ্‌সর। তাতে আজ আর কিছুমাত্র যায় আসে না। তার নিজের ভালো-মন্দ মান-সম্মান, ভবিষ্যৎ এসব কিছু নিয়েই ভাবে না আর। তার মা-বাবার অপমান, তার ছোট্ট ভাই লগনের ব্যথাতুর মুখ। তাকে হিংস্র করে তুলছে। এই অন্ধকার বনের জ্বলজ্বলে-চোখ হিংস্রতম শ্বাপদের মতো। ও হীরুর মুখোমুখি হতে চায়। এই অপমানের ফয়সালা করে, তবে তার শান্তি। সমস্ত পরিবারকে ওর দাদার দেওয়া সব অসম্মান অপমানকে আজ মুখের ওপর ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। একটা হেস্ত-নেস্ত করবেই আজ টুসি।

দূর থেকে সাদা রঙ করা বন-বাংলোটাকে ফিকে চাঁদের আলোয় ভূতুড়ে দেখাচ্ছিল। মনে হল, ধারে কাছে কেউ কোথাওই নেই। বাবুর্চিখানায় দরজা বন্ধ করে আগুনের পাশে বসে দুজন লোক পুট্‌পাট্ করে কথা বলছে। ফরেস্ট গার্ডদের কোয়ার্টার্সেই বোধহয় কনস্টেবলরা আছে। বাইরে কোন জীপ-টীপও দেখলো না। তবে কি ওরা চলে গেছে? ও জানে না ; জানতে চায়ও না। ও শুধু হীরুকে মুখোমুখি পেতে চায় একবার। নরম পায়ে, শিশির ভেজা বাংলোর হাতায় ঢুকে পড়ল ও। নাঃ। ওকে কেউই দেখে নি। এই শীতে কেউই বাইরে নেই। বাংলোর পাশ দিয়ে ঘুরে পিছনের চওড়া বারান্দায় এল টুসি, দুদিকে দুটি ঘর। মধ্যে বসার ও খাওয়ার ঘর। ছোটোবেলায় এই বাংলোর হাতার পেয়ারা গাছের পেয়ারা চুরি করে খেতে আসত ওরা সদলে। ও আর ওর সমবয়সী ছেলেমেয়েরা। হীরু শুধু ওদের চেয়ে বয়সে বড় ছিল বলেই নয়, এমনিতেও কখনও আসতো না। পড়াশুনো করত গাছতলার পাথরে বসে। হীরু চিরদিনই অন্যরকম ছিল। এই ভালুমার বস্তির কোনো ছেলেমেয়েরই মতো সে ছিল না ছোটবেলায়, ওদের গর্বের হীরু।

বারান্দায় উঠেই টুসিযার বড় ভয় করতে লাগল। মেয়েদের নানারকম ভয় থাকে। কোনো পুরুষ কখনই কোনো মেয়ের ভয়ের স্বরূপ বুঝতে পারবে না। একমাত্র অন্য কোনো মেয়েই টুসিয়ার এই মুহূর্তের ভয়ের কথা বুঝতে পারত। মধ্যের ঘরে, ফায়ার প্লেসে জোর গন্‌গনে কাঠের আগুন জ্বলছিল। বাইরে থেকে কাঠ-পোড়ার ফুট্‌ফাট্ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল টুসিয়া। ঘরের মধ্যে একটা কুর্সী সরানোর আওয়াজ হল। টুসিয়া বুঝতে পারল, হীরু এবং বন্ধু বসবার ঘরেই আছে। দরজাটা ভেজানো ছিল। টুসিয়ার বুকের শব্দ ওর কানে আছাড়ি-পট্‌কার আওয়াজের মতো শোনাচ্ছিল। কী করবে, কী করল ; না বুঝেই টুসিয়া এক ধাক্কায় দরজা খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল। যেন ওর রাশিচক্র-জালেরই ভিতরে!

টুসি ঢুকতেই, ইজিচেয়ারে আধো শুয়ে পায়জামা-পাঞ্জাবি আর শাল গায়ে যে এক-জন মানুষ উল্টো দিকে মুখ করে বসেছিল, সে লাফিয়ে উঠল। টুসিয়া এক মুহূর্তের জন্য তার নিখুঁত ভাবে দাড়ি-কামানো সুন্দর মুখ, একখানা উজ্জ্বল কালো চুল এবং চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল। কী লম্বা সুপুরুষ, সুগঠিত মানুষটি। কী রহিস্।

মানুষটি কথা না বলে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এসে দরজা ভিতর থেকে ছিটকিনি তুলে বন্ধ করে দিল। তারপর বড় সুন্দর করে হাসল টুসিয়ার দিকে চেয়ে। এটাই রহিস্ আদমীদের হাসি। বহত্ পড়ে-লিখে বড় শহরের বড় খান্‌দানের ছেলেরা বোধ হয় এরকম করেই হাসে। টুসিয়া অবাক হয়ে চেয়ে ছিল সব ভুলে, তাঁর দিকে। মানুষ? না যেন দেবতা!

হঠাৎ একটা উগ্র গন্ধ এল টুসিয়ার নাকে। ঘরময় গন্ধ। টুসিয়া হঠাৎই লক্ষ করল, ইজিচেয়ারের পাশে মাটিতে বসানো একটা কালো রঙের বিলিতি মদের বোতল এবং আধ-ভর্তি গ্লাস একটা। টুসিয়া তখনও মানুষটির মুখের দিকে চেয়ে ভাবছিল। মনে মনে কুমারী টুসি বলছিল, আমি জানি, আমি নিশ্চয় জানি, তুমি আর কেউই নও। তুমিই সেই। যার স্বপ্ন দেখেছি আমি গত একমাস চুল বাঁধতে বাঁধতে, চান করতে করতে, গান গাইতে গাইতে, বনপথে একা একা হাঁটতে হাঁটতে, শুখা মহুয়া আর মকাই-এর দানা বাছতে বাছতে। যার স্বপ্ন দেখেছি ঘুমের মধ্যে। তুমিই তাহলে সেই রাজপুত্র। আমার স্বপ্নের ধন! আমার পরম পুরুষ।

লোকটি সত্যিই তার স্বপ্নেদেখা মানুষটিরই মতো। হুবহু এক। একটুও অমিল নেই। টুসিয়া মানুষটির দিকে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইল। তারপর তার হুঁশ হবার আগেই মানুষটি বলল, এতক্ষণে এলে? সেই কখন থেকে তোমার অপেক্ষায় আছি আমি।

একটু চুপ করে থেকে বলল, বিশ্বাস করবে না বললে, ঠিক তোমারই মতো কাউকে স্বপ্ন দেখেছি আমি। তুমি কাল এলে না কেন?

টুসিয়া শুনছিল তার গভীর, সুললিত মার্জিত কণ্ঠস্বর। যেন কোনো দেবদূত কথা বলছিল ওর সঙ্গে।

চৌকিদার কাল অন্য কাকে যে নিয়ে এসেছিল, তার সঙ্গে তোমার কোনো তুলনাই চলে না। সে সুন্দর, কিন্তু শুধু সুন্দরই! তোমার নাম কি গো?

টুসিয়া নিজে বলল কিনা টুসিয়া জানে না, টুসিয়ার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, টুসিয়া। ও প্রতিমুহূর্তেই আশা করছিল যে, পাশের ঘর থেকে এক্ষুনি তার দাদা বেরিয়ে আসবে। এসে তার পরিচয় দিয়ে তার বন্ধুকে বলবে যে, এই-ই আমার আদরের বোন। যার কথা তোমাকে বলছিলাম। কিন্তু হীরু কি তার এই বন্ধুকে আদৌ বলেছিল টুসিয়ার কথা? না সবাই তার বোকা বাবা-মায়ের কল্পনা এবং তাদের মিথ্যা কল্পনায়-ভরা টুসিয়ার দিবাস্বপ্ন?

কিন্তু হীরু এল না। দাদা এল না। মানুষটি তার দিকে এগিয়ে এসে হঠাৎ ডান হাত বাড়িয়ে তার গাল টিপে দিয়ে বলল, টু-সি-য়া। আহাঃ কী রূপ! এই বনজঙ্গলের মধ্যে এমন উজ্জ্বল রঙের যে এমন কোনো ফুল ফোটে তা তোমাকে না দেখলে কখনও জানতাম না।

টুসিয়ার কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। মাথাটা কাজ করছিল না মোটেই।

তুমি একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে। আগুনের কাছে চলে যাও। তারপর এক গ্লাস তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। গরম হয়ে যাবে। শাড়ি জামা সব খুলে ফেলো তাড়াতাড়ি। তোমার সব শীত আমি শুষে নেব। আমার শরীরের সব গরম দিয়ে তোমার ঠান্ডা শরীরকে একেবারে গরম করে দেব। তুমি দেখো, কত ভালো লাগবে তোমার। এক মুহূর্ত থেমে, সুন্দর মানুষটি আরো সুন্দর করে বলল, আমি খুব ভালো আদর করতে পারি। তোমার পাখির মতো শরীর আমার হাতে পড়ে, পোষা ময়নার মতো কথা বলবে, দেখো। দেখো তুমি।

বুঝতে অনেক দেরি করে ফেলেছিল টুসিয়া। তার স্বপ্নের রাজপুরুষকে সামনে দেখে তার যে ঘোর লেগেছিল দু'চোখে, তা কাটাতে বড় বেশি সময় লেগে গেল।

হঠাৎ টুসিয়া বলে উঠল, আমাকে যেতে দাও, এক্ষুনি যেতে দাও, নইলে চেঁচাব আমি। নইলে......

মানুষটি কী একটা বের করল, কিন্তু কোথা থেকে বের করল, তা টুসিয়া বুঝতে

পারল না, কিন্তু একটি ছোট্ট কালো জিনিস তার হাতের মধ্যে আগুনের আলোয় চক্‌চক্‌ করে উঠল। এমন জিনিস সে দারোগাদের হাতে দেখেছে এর আগে। জিনিসটা যে কী তা টুসিয়া জানত।

মানুষটি নিচু গলায় বলল, একদম চুপ। রান্ডীদের ছেনালি আমার একেবারেই পছন্দ নয়। তাড়াতাড়ি শাড়ি খোলো। কাজ শেষ হয়ে গেলে ঐ শাড়িতেই তোমার ঝরানো ইজ্জত মুছে নিয়ে তোমার স্বামী বা মায়ের কোলে লক্ষ্মী সতী মেয়ে হয়ে গিয়ে আবার শুয়ে থেকো। এমন অনেক দেখেছি আমি। কিন্তু তুমি, মাল কিম্‌তি। তোমাকে বিশ রুপাইয়া দেব। আমি ভারি অফ্‌সর বলেই যে বিনা পয়সায় সওদা করব, এমন কামিনা ভেবো না আমাকে।

টুসিয়া অস্ফুটে বলল, দাদা! বড়ে ভাইয়া। কিন্তু হীরু এল না। মানুষটি অদ্ভুত এক নিষ্ঠুর হাসি হাসল। টুসিয়া এতক্ষণে বুঝল যে, মানুষটি একেবারে নেশাতে চুর হয়ে আছে। মানুষটি বলল, বাবাও ডাকতে পারো। আর কথা নয়, এক্ষুনি শাড়ি খোলো; বলেই রিভলবারটা তাক্‌ করে ধরল টুসিয়ার দিকে।

মানুষটির হাত কাঁপছিল, উপর-নিচে হচ্ছিল হাতটা। টুসিয়ার হঠাৎ মনে হল, অতর্কিতে, অনিচ্ছাতেও মত্ত লোকের হাত থেকে গুলি বেরিয়ে যেতে পারে। এতদিন টুসিয়ার সংস্কারের গোপন গভীরে এই কথাই দৃঢ়মূল ছিল যে, মেয়েদের ইজ্জতের চেয়ে দামী আর কিছুই নেই। কিন্তু সেই মুহূর্তেই টুসিয়া প্রথম বুঝতে পারল যে, অভাবী, বঞ্চিত, হতভাগ্য হলেও তার এই জীবনকে সে তার ইজ্জতের চেয়েও অনেক বেশি ভালো-বাসে। নিজের প্রাণটা বাঁচাতে ইজ্জতও দিয়ে দেওয়া যায়। সকলেই বুঝি পদ্মিনী হয় না। হতে পারে না।

আর একটি কথাও নয়। তাড়াতাড়ি। রিভলবারটা যেমন ধরা ছিল তেমনই ধরা রইল টুসিয়ার বুক লক্ষ্য করে।

কী করে করল, কেমন করে করল কিছু বোঝার আগেই শীতে আর ভয়ে ভীত, বিবর্ণ, নীল হওয়া টুসিয়া সম্পূর্ণ ভাবে বিবস্ত্র করল নিজেকে। বসবার ঘরের হ্যাটস্ট্যান্ডে একটা বড় আয়না ছিল। আগুনের লাল্‌চে আভা-লাগা তার নগ্ন শরীরের হঠাৎ ছায়া পড়ল সেই আয়নায়। টুসিয়া নিজের চোখেই বড় সুন্দর দেখল নিজেকে। গত একমাস ধরে বড় যত্ন করে চান করেছিল মীরচা-বেটীতে। ওর মা যে বড় যত্ন করে করৌঞ্জ আর নিমের তেল মাখিয়েছিল। তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রূপের বান ডেকেছিল। তখন আর কোনো ভয় ছিল না টুসিয়ার। ও নিজেও মরতে পারত, কিন্তু ও নিজে না মরে, ওর ভয়টা মরে গেল। মরে গিয়ে, মরা পাখির মতো শক্ত হয়ে রইল ওর ধুপ্‌পুক্‌-করা দুটি বুকের ভিতরে। মানুষটি দুহাত, দুহাতের দশ আঙুল দিয়ে টুসিয়ার কুমারী শরীরের ভাঁজে ভাঁজে, খাঁজে খাঁজে কী যেন অধীর আগ্রহে খুঁজছিল। কী খুঁজছিল তা সেই-ই জানে। অবাক, বোকা হরিণীর মতো বনজ-বিবশ-বিস্ময়ে টুসিয়া নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিল আগুনের আভায় এবং কামনায় লাল, ভারি শহরের, বহত্‌ পড়োলিখে খুবসুরৎ অফ্‌সর জানোয়ারটার দিকে।



সকাল থেকেই আজ হৈ হৈ চলেছে।

গণেশ মাস্টার আর গজেনবাবু এসেছেন চিপাদোহর থেকে জীপ নিয়ে। সঙ্গে গণেশের বারো বছরের এক দূর সম্পর্কের ভাইপো। সে তার মায়ের সঙ্গে এসেছে গণেশের কাছে, পালামৌব শীতে দিন কয থেকে স্বাস্থ্য ভালো করে ফিরে যেতে। উত্তর কোলকাতার প্রায়ান্ধকার গলির মধ্যে বাস ওদের। উত্তেজনা বলতে, ক্যাম্বিশের বল দিয়ে গলিতে ক্রিকেট খেলা। এবং ফুটবল ক্রিকেট সিজ্‌নে একে-ওকে ধরে কোনক্রমে একটু খেলা দেখা। তাও কচিৎ-কদাচিৎ। তাই ছেলেটি এই বন-জঙ্গলে এসে কী যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। এত এ্যাডভেঞ্চার! এত মজা! তার খুশি আর ধরে না। এই বয়সী ছেলেদের মতো প্রাণবন্ত, উৎসাহে ভরপুর ছেলেরা যে কোলকাতার মতো দম-বন্ধ শহরে তাদের প্রাণশক্তি কী ভাবে নিঃশেষ কবে. তা সকলেই জানি আমরা। অথচ ওদের জন্যে কিছু মাত্রই করি না। আমরা সকলেই যার যার ভাবনা নিযে ব্যস্ত। যার অবস্থা খারাপ তার ভাবনা ক্ষুন্নিবৃত্তির, যেন-তেন প্রকারেণ। যে স্বচ্ছল, তার ভাবনা আরও ধনী হওয়ার। যে রাজনীতি করে, তার ভাবনা নেতা হওয়ার। যে নেতা, তার ভাবনা আরো কত বেশি ক্ষমতা, টাকা ও মেয়াদ করতলগত করা যায়। এই ছেলেদের কথা ভাবার সময় কার আছে?

ছেলেটার নাম বাপী। এই অল্পদিনেই বন-জঙ্গল পাহাড় দেখে ঘুরে বেড়িয়ে তার শারীরিক উন্নতি নিশ্চয়ই হয়েছে। মানসিক অবস্থার হেরফেরও বিলক্ষণ হয়েছে। কোলকাতার ইঁট-চাপা ঘাসের মতো ওর ফ্যাকাসে মনকে এই আলো হাওয়া, এই অসীম আকাশ এক সজীবতা এনে দিয়েছে। বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু গজেনবাবু যেভাবে ছেলেটাব কল্যাণে নিরন্তর লেগে আছেন তাতে তার কিছু অবনতিও যে হচ্ছে না এমনও নয়।

গজেনবাবু বললেন, বাপী তুমি ইংরিজী জানো?

বাপী লাজুক মুখে বলল, পড়ি ত! স্কুলে ত ইংরিজী পড়ি।

আচ্ছা, একটা কবিতা বলছি বাংলায় তার ইংরিজী ট্র্যান্‌স্লেশান কি হবে বলো দেখি?

এত লোকের সামনে ছুটিতে বেড়াতে এসে; হঠাৎ পড়াশুনোর মতো নীরস বিষয়ের অবতারণা করায় এবং তার ওপর ট্র্যান্‌স্লেশান করতে বলায় বাপী একটু নিষ্প্রভ হয়ে গেল। কিন্তু তার অসহায়তা দেখেই গজেনবাবু দ্বিগুণ উৎসাহে বললেন, শোনো,

"বড় বড় বাঁদরের বড় বড় পেট
লঙ্কা ডিঙোতে করে মাথা হেঁট।"

বলো ত দেখি, এর ইংরিজী কি হবে?

বাপী এত শীতেও ঘেমে উঠল। মুখ লাল হয়ে গেল।

গজেনবাবু তখন তাকে রেহাই দিয়ে তার কাকাকে নিয়ে পড়লেন। বললেন, অলরাইট। ভাইপো পরে। আগে, কাকাই বলুক ত দেখি!

গণেশ মাস্টার চিপাদোহর স্টেশানে টক্কা-টরে-টরে-টক্কা করে। ইংরিজীতে চালান-ফালান, রসিদ ইত্যাদি লেখে। ভাষার, সে কথাই হোক আর লেখ্যই হোক, চর্চা না করলে মরচে পড়ে যায়। যতটুকু ইংরিজী শিখেছিল, তা কবে ভুলে মেরে দিয়েছে। এখানে ইংরিজী খবরের কাগজটা পর্যন্ত পায় না। পেলেও, রাখার পয়সা নেই।

এক ধরনের লোক আছেন, যারা বিনা প্রয়োজনে, ভাল ইংরিজী বলতে পারেন না এমন লোকেদের সঙ্গে খামোখা ইংরিজীতে কথা বলে শ্লাঘাবোধ করেন। তেমনই একজন শহুরে বাঙালি যাত্রী একদিন চিপাদোহর প্লাটফর্মে পায়চারি করতে করতে ট্রেন অনেক লেট থাকায় হঠাৎ গণেশ মাস্টারের ঘরে ঢুকে পড়ে বলেছিলেন, হোয়াট্স্ দ্যা ম্যাটার? হোয়েন্ উইল দ্যা প্যাসেঞ্জার ট্রেইন্ এরাইভ্?

গণেশ মাস্টার ঘেবড়ে গিয়ে টেলিফোনে বাঁ কান লাগিয়ে ডানহাত নেড়ে তাঁকে বলে-ছিল, আব বলবেন না স্যার। নো-রিপ্লাই টেলিফোনিং এন্ড টেলিফোনিং টু বাড়কাকনা এন্ড গেটিং ফেরোশাস্। রিয়্যালি ফেরোশাস্।

এই বনে জঙ্গলে এমনিতেই ফেরোশাস্ জানোয়ার অনেকই আছে। তার ওপরে হঠাৎ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশান মাস্টারও যদি টেলিফোন করতে করতে ফেরোশাস্ হয়ে ওঠেন তাহলে ভয়ের ব্যাপার বৈ কি! ভদ্রলোক তক্ষুনি গণেশ মাস্টারকে বলেছিলেন, নো-হারি, নো-হারি টেক্ ইওর টাইম এন্ড প্লিজ লেট দি ট্রেইন কাম এট ইটস্ ওন সুইট উইল। বাট ফর গডস্ সেক্, ডোন্ট গেট ফেরোশাস্।

তার পর দিন থেকেই 'গেটিং ফেরোশাস্' কথাটা গজেনবাবুর কল্যাণে চিপাদোহরে চালু হয়ে গেছে।

গণেশ মাস্টার, ভাইপোর সামনে, তাকেও ইংরিজীর এমন কঠিন পরীক্ষাতে বসানোয় মনে মনে গজেনবাবুর ওপরে খুবই চটে গেল। তারপর গম্ভীর মুখে বলল, এসব বাঁদরামোর কি মানে হয়? সি পি এম ত এই সব কারণেই ইংরিজী তুলে দিচ্ছে নিচু ক্লাস থেকে। ঠিকই করছে।

আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম। কারণ আমার ইংরিজীর জ্ঞান গণেশের চেয়ে সামান্য বেশি হলেও হঠাৎ এমন দুরূহ বাঙলা কবিতার ইংরিজী তর্জমা করা সাধ্যাতীত ছিল।

গজেনবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন, বাঁদরের পেটের ইংরিজী জিগগেস্ করলেই যদি বাঁদরামো হয় তাহলে আমার তোমাকে বলার কিছুই নেই।

কি কারণে জানি না, গজেনবাবু মার্সিফুলি আমাকে সে যাত্রা স্পেয়ার করলেন। তারপর উপস্থিত সকলেই যখন ইংরিজী ভাষায় তেমন ব্যুৎপত্তি নেই বলে নীরবে স্বীকার করে নিলেন তখন গজেনবাবু নিজেই গর্ব গর্ব মুখে তর্জমা করলেন।

বললেন, ভের ইজি। শোনো বাপী! ট্র্যান্স্লেশান করার আগে বাংলাটা ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কী বলেছিলাম আমি তোমাকে?

বাপী বলল: "বড় বড় বাঁদরের বড় বড় পেট
লঙ্কা ডিঙোতে করে মাথা হেঁট।"

গজেনবাবু সিগারেটে গাঁজার কল্কের মতো একটা টান লাগিয়ে বললেন,
"বিগ্ বিগ্ মাঙ্কি, বিগ্ বিগ্ বেলি,
সিলোন জাম্পিং মে-লা-ঙ্ক-লি।"

আমি হেসে উঠলাম।

গজেনবাবু বললেন, এর জন্যেই ত বাঙালীর কিস্‌সু হলো না। মুরোদ নেই এক রতি, মস্করা করতে বড়ই দড়। কেন? ঠিক হয় নি ট্র্যান্‌স্লেশান?

ততক্ষনে বাপী মুখস্থ করে ফেলেছে। ঠিক হয়েছে কি ভুল হয়েছে তা নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। তর্জমাটা কিন্তু তার খুবই পছন্দ হয়েছে : বার বার হাত নেড়ে বলে চলেছে :

বিগ্‌ বিগ্‌ মাঙ্কি, বিগ্‌ বিগ্‌ বেলি,
সিলোন জাম্পিং মেলাঙ্কলি।"

কোলকাতা ফিরেই পাড়ার বন্ধুদের কবিতাটা বলে তাক্‌ লাগিয়ে দেবে বাপী।

মানিয়া সকালের দুধ নিয়ে এসেছিল। আজ একটু দেরি করেই এসেছিল। বললাম, বড়ী দের্‌ কর্‌ দেলী মানিয়া আজ।

ও চিন্তান্বিত মুখে বলল, কা করে বাবু, মাহাতো এসেছিল সকালে। নান্‌কুয়ার সঙ্গে আমার বাড়িতেই হাঙ্গামা হল। বড় ভয়ে ভয়ে আছি বাবু। আপনারা একটু দেখবেন। পাগলা সাহেবকেও বলে রাখবেন, আপনারাই আমাদের ভরসা। ঐ নান্‌কুয়া ছোঁড়াটার জন্যে আমাদের সর্বনাশ হবে একদিন।

মানিয়ার বাঁ গালে একটা কালো জন্মদাগ ছিল। বাপী সবিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে, গজেনবাবুকে শুধোল, ওটা কিসের দাগ গজেন জেঠু? গজেনবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ভূতের হাতের থাপ্পড়ের দাগ। এখানে কত রকমের ভূত আছে তার খবর রাখো? তোমার গণেশকাকু কিছুই বলে নি? তারপর বললেন, অনেক ভূত, দার্‌হা ভূত, চুরাইল্‌ ভূত, ধড়্‌গালিয়া ভূত!

গজেনবাবু থামতেই আমি বললাম, গজেন ভূত!

গজেনবাবু হেসে ফেললেন।

বললেন, কেন ওসব কথা বাচ্চার সামনে।

কথাটার একটা ইতিহাস ছিল।

প্রথম জীবনে যখন গজেনবাবু ডালটনগঞ্জে আসেন তখন বেকার ছিলেন। শরৎচন্দ্র বেঁচে থাকলে ওঁর ওই সময়কার ক্যারিয়ার নিয়ে একখানি গজেনকাণ্ড স্বচ্ছন্দে লিখতে পারতেন। সেই সময়ে ডালটনগঞ্জ শহর আজকের মতো ছিল না। বড় বড় গাছে ঘেরা লালমাটির কাঁচা রাস্তায় ভরা একখানি ঘুমন্ত গ্রাম যেন। সেই ঘুমন্ত, শান্ত ডালটন-গঞ্জে যখন প্রতি শুক্রবারে হাট-ফিরতি দেহাতি লোকেরা সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরত, কাছারির রাস্তার বড় গাছগুলির ছায়াচ্ছন্ন রাস্তা দিয়ে; তখন গজেনবাবু কোনো গাছের মগ্‌ডালে বিকেল থেকে উঠে বসে থাকতেন। আর ওরা নিচে এলেই, গাছের ডাল ঝাঁকিয়ে : "ভুঁখু ভুঁখু, খাঁ খাঁ, খাঁবো খাঁবো!" বলে চিৎকার করে উঠতেন। অমনি বেচারীরা মাঈরে, বাপ্পারে, দার্‌হারে বলে যে যার পুঁটলি ফেলে দিয়ে প্রাণের দায়ে পড়ি-কি-মরি করে দৌড়ে পালাতো। তখন গজেন ভূত গাছ থেকে নেমে পুঁটলি-গুলো জড়ো করে বাড়িতে ফিরে আসতেন। তবে, লাভ বিশেষ হতো না। গরীব দেহাতিদের বেশি কিছু কেনার সামর্থ্যই থাকত না। কারো পুঁটলিতে একটু ছাতু, কারো নুন, কারো বা একটু আটা, কারো দুটো বেগুন, একটা লাউকি এই-ই সব। মাঝে মধ্যে কারো পুঁটলি থেকে ছেঁড়া জুতোও বেরুত। যা পেতেন তাই-ই সই। নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো ছিল সেই সব দিনে!

যে ক্ষণজন্মা মানুষ ভূতের নাম ভাঙিয়েও খাওয়ার সাহস রাখেন তাঁকে মানুষ হয়েও ভয় না পেয়ে আমাদের কারোই উপায় ছিল না। কিন্তু গজেনবাবুর চরিত্রের অন্য একটা দিকও ছিল। সে-দিকটার কথা না বললে মানুষটির প্রতি অবিচার করা হয়। বহুবছর

আগে ডালটনগঞ্জ শহরে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক একটি দিশি বিস্কুটের কারখানা করেছিলেন। গজেনবাবু তার কম্‌পিটিটর বনে গেলেন একটি বিস্কুটের কারখানা খুলে। হাতে-পায়ে ঠেসে-ঠুসে ময়দা মাখা হতো। তাতে ময়ান টয়ান দিয়ে, ভাল করে লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে, বিস্কুট তৈরি হতো একেবারে বিশুদ্ধ দিশি প্রক্রিয়ায়। গজেনবাবুর কাছে যা শুনেছি তাতে আমি নিশ্চিত যে, মাঝে মাঝে তাঁর ম্যানেজারের লালরঙা দাড়িওলা রামছাগলের ছাগলাদ্যও বিস্কুটের সঙ্গে অনবধানে মিশে যেত। কখন দেখা গেল ক্রেতারা বলছে, এই বিস্কুটের অতিরিক্ত গুণ হচ্ছে এই-ই যে, তাঁর বিস্কুট মৃদু জোলাপের কাজও করে, তখন নিয়মিতই অনুপাতমতো ছাগলাদ্য মেশানো হতো। রামছাগলকে মাঝে মাঝে জোলাপ খাইয়ে যাতে ছাগলাদ্যর পরিমাণ বাড়ে তার চেষ্টাও করা হতো। পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে গজেনবাবু পথে বসিয়ে দিলেন আরও একটি মারাত্মক হরকৎ করে। তাঁর কারখানার বিস্কুটের প্যাকেটে বজ্‌রঙ্গ্‌বলীর ছবি ছেপে দিয়ে। প্যাকেটের ওপর ছাপা হল, হনুমানজী একটি বিস্কুটের গন্ধমাদন পর্বত হাতে করে উড়ে চলেছেন লেজ উঁচিয়ে। উত্তর কোলকাতার ব্রিলিয়াল্ট্‌ বাঙালী ব্রেন্‌। গজেনবাবুর সঙ্গে হরিয়ানার সাদামাটা আড়িয়া পাঞ্জাবী পেরে উঠবেন কেন? হৈ-হৈ করে বিক্রি হতে লাগল বিস্কুট। গজেনব্যাবুর বিস্কুট খেয়ে ঠোঁট জ্বলে গেলেও, সরল, ধর্মপ্রাণ, দেহাতি লোকেরা বজ্‌-রঙ্গ্‌বলীর ছবিওলা প্যাকেট দেখে সেই বিস্কুটই কিনতে লাগল। তার ওপর ছাগলাদ্যর কী যে এ্যাডিশানাল্‌ এফেক্‌ট হতো তা কবরেজ মশাইরাই ভাল বলতে পারবেন।

কোলকাতায় সবে তখন নিওন-সাইন বেরিয়েছে—বিজ্ঞাপনে। কোলকাতা থেকে অর্ডার দিয়ে গজেনবাবু নিওনের আলো আনালেন ডালটনগঞ্জে ফার্‌স্ট। সবুজ-রঙা হনুমানজী হলুদ বিস্কুটের গন্ধমাদন পর্বত হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তার লাল লেজ একবার উঠছে আর একবার নামছে।

ভির্‌মি খেয়ে গেলো লোকে। এমন মোক্ষম এবং এফেক্‌টিভ ক্রিয়েটিভ্‌ বিজ্ঞাপন তার আগে এ অঞ্চলে আর কেউই দেখে নি। বেচারী পাঞ্জাবী ভদ্রলোক! স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে উপোস যেতে লাগলেন। আর গজেনবাবুর তখন বৃহস্পতি তুঙ্গে। মার মার কাট্‌ কাট্‌ ব্যাপার। এমন সময় একদিন সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী, ছেলেমেয়ের হাত ধরে এসে গজেনবাবুর কাছে একেবারে কেঁদে পড়লেন। অমন যে রমরমে ব্যবসা, বিস্কুটেব গন্ধমাদনের মতো টাকার গন্ধমাদন গড়ে উঠতে শুরু করেছে তখন গজেনবাবুর ঘরে, সেই ব্যবসা সেই দিন থেকেই এক বাক্যে তুলে দিলেন তিনি। ভদ্রমহিলাকে বললেন, ভাবীজী, আপ বেফিক্কর্‌ রহিয়ে। কাল্‌সে হামারা কারখানা বরাব্বর্‌কে লিয়ে বন্ধ্‌।

সেদিন থেকে কারখানা সত্যি সত্যিই বন্ধ করে দিয়েছিলেন গজেনবাবু।

গজেনবাবুরা যে খাসীর মাংস এনেছিলেন, তিত্‌লি তাই-ই কষা মাংসর মতো করে রেঁধেছিল। গরম রুটি, কষা মাংস আর লেবুর আচার! এই মেনু ঠিক হয়েছিল দুপুরে। এমন সময় রাম্‌ধানীয়া চাচা এসে হাজির। শালপাতাতে মুড়ে আধকেজি খানেক গড়াই মাছ নিয়ে। কোথাকার পাহাড়ী নালাতে ধরেছিল। আর কিছুটা চালোয়া মাছ। গড়াই, শোল মাছের মতোই দেখতে হয়, খেতেও। আর চালোয়া ত পুঁটির মতোই দেখতে।

গজেনবাবু বললেন, জীতে রহো চাচা!

তারপর তিত্‌লিকে বললেন, লঙ্কার ফোড়ন দিয়ে সামান্য একটু হলুদ দিয়ে, নুন দিয়ে সেদ্ধ করে দে তো তিত্‌লি শিগ্‌গিরী।

তারপরই আমার দিকে তাকিয়ে, গলা নামিয়ে বললেন, একটু মহুয়া আনান না

স্যার। চালোয়া মাছ দিয়ে মহুয়া যা জমবে না! আপনি স্যার আমাদের একেবারেই পাত্তা দেন না। ন মাসে ছ'মাসে আসি। তবুও।

বাপীর দিকে চোখ ঠেরে, ও'কে থামতে বললাম।

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী!

বললেন বাপী? বাপীও কি একটু মহুয়া খাবে নাকি হে গণেশ মাস্টার?

গণেশ মাস্টার বাপীর সামনে কি বলবে ভেবে না পেয়ে হঠাৎ বলে ফেলল, মহুয়া ত শম্বরে খায়, ভাল্লুকে খায়। গজেনবাবুও খান নাকি?

গজেনবাবু পকেট থেকে টাকা বের করে রামধানীয়াকে দিতে গেলেন। বললেন, লাও ত' চাচা।

ও'কে মানা করে, আমি ঘরে গিয়ে টাকা এনে দিলাম। ঘরের মধ্যে থেকে শুনলাম, গজেনবাবু বাপীকে বলেছেন: শোনো বাপী, তোমাকে বলি। মহুয়া এক রকম ফল। ঐ যে মস্ত বড় ঝাঁকড়া গাছটা দেখেছো, ঐ গাছটার নাম মহুয়া। যখন বড় হবে, তখন পড়বে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই গাছটাকে কত ভালোবাসতেন। ভালোবাসতেন বলেই একটা বই লিখেছিলেন তিনি এই গাছ সম্বন্ধে। এবং তার নামও দিয়েছিছেন "মহুয়া"।

বলেই গণেশের দিকে ঘুরে বললে, কি হে মাস্টোর? তুমিও কি এ তথ্য জানতে? বাপীর কাকা? আমাকে সবসময়ই তোমরা আন্ডারএস্টিমেট করে গেলে।

ভাগ্যিস গজেনবাবু বলেন নি যে, রবীন্দ্রনাথও মহুয়া ভালোবাসতেন বলেই বইয়ের নাম রেখেছিলেন মহুয়া।

এই গাছগুলোই এখানের প্রাণ। গরমে প্রথমে এর ফল ফলে। গোল গোল, ঠিক গোল নয়, নিচের দিকটা একটু লম্বাটে, হলদে সাদা, সাদা রঙ ফলগুলোর। হাওয়ায় হাওয়ায় তখন কী যে মিষ্টি গন্ধ ভাসে তা...

আমি বললাম, ভাসে যে তারপর?

গজেনবাবু বাঁ হাতটা হাওয়ার নাড়িয়ে বললেন, তখন মনটা কী রকম করে, কী রকম কী রকম করে, মনে হয় কবিতা লিখি।

কবিতাও লেখেন নাকি আপনি?

বাঙালীর ছেলে কবিতা লিখবো না? তবে, জীবনে মাত্র দুটিই কবিতা লিখেছিলাম। গজেনবাবু গর্ব গর্ব গলায় বললেন।

গজেনবাবুর ওপর বদলা নেওয়ার সুযোগ পেয়ে গণেশ মাস্টার এবার চেপে ধরল। মাত্র দুটো লিখেছিলেন যখন, তখন তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। বলে ফেলো।

উনি মাস্টারকে ডোন্ট-কেয়ার করে বললেন, তবে শোনো। প্রথম কবিতা যখন লিখি তখনও ত' আমার পতিভের তেমন বিকেশ হয় নি।

কিসের বিকাশ হয় নি?

পতিভে, আরে প্রতিভে, মানে প্রতিভা।

রেগে বললেন, এত বাধা দিলে কাব্য হয় না।

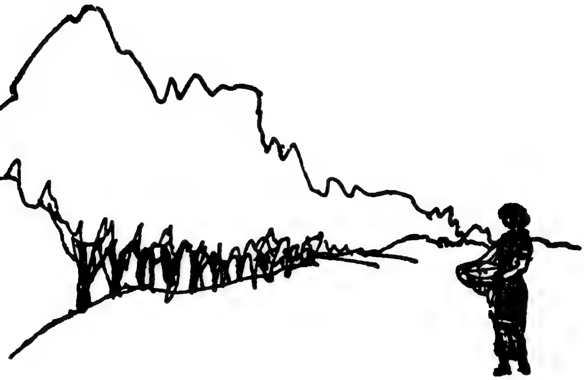
"এক ঠোঙা খাবার নিয়ে যায় শ্যামলাল,
তাই দেখে দূরে থেকে মারলো ছোঁ চিল।"

বাপী হেসে উঠল। বলল, এমাঃ। এ কবিতায় মিল কোথায়?

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম।

গজেনবাবু ধমকে বললেন, আধুনিক কবিতা এইরকম হয়। তাও ত' আমি অত্যাধুনিক কবিতা লিখি না! বড় হও বুঝবে। তখন বুঝবে যে আজকালকার দিনে অনেকে যারা ইয়া ইয়া বড় কবি বলে কেটে যাচ্ছে, তাদের কবিতার চেয়ে এ কোনো অংশেই খারাপ নয়।

তারপর নিজেই বললেন, তুমি ছেলেমানুষ, তাই-ই তোমাকে বুঝিয়ে বলা যায়। এই কবিতার মিলটা হলো শ্যামলালের, 'ল' এবং চিলের 'ল' তে।



বইটা অনেকদিন হলো পড়ে আছে। রণীদার কাছ থেকে পড়তে এনেছিলাম। কিন্তু পড়া হয়ে ওঠে নি। আজ সকালে পড়া আরম্ভ করে শেষ করে ওঠা পর্যন্ত এবং তার পরও একটা ঘোরের মধ্যে আছি যেন। যে জগতকে ভাল করে জানি, এই অরণ্যানী ঝোপ-ঝাড়, ফুল-লতাপাতাকে, যাদের সঙ্গে এক নিবিড় একাত্মতা বোধ করে এসেছি চিরদিন, যাদের ভালোবেসেছি, তাদের প্রাণবন্ততার প্রকৃত স্বরূপ যে কী এবং কতখানি সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

গাছের অনুভূতি ও সাড়া দেবার ক্ষমতা যে আছে এ-কথা তো অনেকদিন আগেই আমাদের জানা। তারপর এ বিষয়ে কতদূর কী গবেষণা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, তার কোনো খোঁজই রাখি নি। রাখার কথাও ছিল না। বাঁশবাবু আমি। বাঁশ কাটি, ট্রাকে লাদাই করি, ইয়ার্ডে চালান দিই। আমার বিদ্যা-বুদ্ধিও এমন নয় যে, এসব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার খোঁজ রাখতে পারি, সমস্ত রকম শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত এরকম জংলী জায়গায় বসে। তবে এই বইটি না পড়লে বঞ্চিত হয়ে থাকতাম এক মস্তবড় জানা থেকে। বইটির নাম : "দ্যা সিক্রেট লাইফ অফ প্লান্ট্‌স।" যুগ্ম লেখক, পিটার টম্‌কিনস্‌ এবং ক্রিস্টোফার বার্ড।

এ বিষয়ে, মধ্যযুগ অবধি অ্যারিস্টটলের বক্তব্যই নাকি চালু ছিল। তাঁর মত ছিল গাছ-গাছালির প্রাণ থাকলেও অনুভূতি নেই। এরপর আঠারোশো শতাব্দীতে কার্ল ভন্‌ লিনে বললেন যে, গাছ-গাছালির প্রাণ আছে কিন্তু জীবজন্তু ও মানুষদের সঙ্গে তাদের তফাত এই-ই যে, তারা অনড়। চলাচলের ক্ষমতারহিত। লিনেরও পর উনিশশো শতাব্দীতে, পৃথিবী বিখ্যাত চার্লস ডারউইন্‌ লিনের মতকে উল্টে দিয়ে বললেন যে, উদ্ভিদরা মানুষ এবং জানোয়ারদের মতোই। তারা যে চলচ্ছক্তিহীন এ কথা ঠিক নয়। তবে তারা এই শক্তিতে তখনই শক্তিমান হয়ে তা প্রয়োগ করে; যখন তাদের সুবিধার জন্যেই তা করা প্রয়োজন মনে করে। বিনা প্রয়োজনে তারা চলাফেরা করে না। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ভিয়েনার গুণী বৈজ্ঞানিক রাওল ফ্রাসে সবাইকে আবারও চমকে দিয়ে প্রথম বললেন যে, তা মোটেই নয়। গাছপালারা জীবজন্তু বা মানুষের মতোই সমান সৌন্দর্যের সঙ্গে, সমান অবলীলাতেই নড়াচড়া করে। তবে তারা তা এত আস্তে আস্তে করে যে, মানুষের চোখে সহজে তা ধরাই পড়ে না আমরা তেমন লক্ষ করে দেখি না বলেও। ফ্রাসেই প্রথম বললেন যে, এমন একটি উদ্ভিদ নেই যা গতিরহিত। একটি গাছ বা লতার বেড়ে উঠে পূর্ণাবয়ব হওয়ার মধ্যেই এক সুষম ছন্দোবন্ধ সামগ্রিক

গতিপ্রকৃতি নিহিত আছে। একটি লতানো লতা যাতে ভর দিয়ে লতিয়ে উঠবে তেমন ভরযোগ্য নিকটতম কিছুর দিকে গুঁড়ি মেরে এগোয়। যদি সেই ভরযোগ্য জিনিসটি সরিয়ে নেওয়া যায়, তবে দেখা যায় যে, লতাটিও মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুখ ঘুরিয়েছে। তবে কি তারা দেখতে পায়? ওদের কি চোখ আছে? দুটি বাধার মধ্যে যদি কোনো লতাকে পুঁতে দেওয়া যায় তো দেখা যায় যে, সেই লতাটি বাধাগুলো এড়িয়ে নতুন কোনো ভরযোগ্য জিনিসের প্রতি ধাবমান হচ্ছে। এমন কি এও দেখা যায় যে, দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রাখা কোনো ভরযোগ্য জিনিসের প্রতিও সে এগিয়ে যাচ্ছে নির্ভুল ভাবে।

শুধু তাই-ই নয়, ফ্রাঁসের মতে, গাছ-গাছালি লতাপাতা সকলেই তাদের ইচ্ছামত নড়ে চড়ে। তারা যা চায় সেই চাওয়া পাওয়াতে পর্যবসিত করতে তাদের যতটুকু কম বা বেশী চলা-ফেরা করা প্রয়োজন তা তারা নির্দ্বিধায় করে। ওদের এই ইচ্ছা ও চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপার-স্যাপার মানুষের ইচ্ছে বা চাওয়া-পাওয়ার চেয়েও অনেক বেশি সফিস্টিকেটেড। ওরা বুঝতে পারে কোন্ পিঁপড়েরা ওদের রস চুরি করবে। যেই তেমন জাতের পিঁপড়েরা ওদের কাছাকাছি আসে, তখনই তারা তাদের নিজেদের বুজিয়ে ফেলে। যখন আবার খোলে, তখন শিশিরে ভেজা থাকে ওদের গা। পিঁপড়েরা তখন পিছল গা বেয়ে আর উঠতে পারে না।

আফ্রিকার এ্যাকাসিয়া গাছেদের মধ্যে যারা বেশি সফিস্টিকেটেড, তারা এমন কোনো কোনো জাতের পিঁপড়েদের আকর্ষণ করে নিয়ে আসে যে, সেই জাতের পিঁপড়েদের কটুস্ কুটুস্ কামড়ের ভয়ে রস-চুরি-করা অন্যজাতের পিঁপড়ে বা জিরাফ বা অন্য জানোয়ার সেই গাছেদের এড়িয়ে চলে। নিজেদের বাঁচাতে ওরা নিজেদের গায়ে কাঁটার সৃষ্টি করেছে যুগ-যুগান্তর ধরে। প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটে, তার পিছনে নিশ্চয়ই কারণ থাকে। "লজ্জাবতী" লতারা তারা তাদের গায়ে পিঁপড়ে বা অন্য পোকা-মাকড় ওঠা মাত্র বা মানুষের আঙুলের ছোঁওয়া পাওয়া মাত্র মাথা লম্বা করে উঁচু হয়ে গিয়ে হঠাৎ পাতা গুটিয়ে ফেলে। আর ঐ অপ্রত্যাশিত আলোড়নে পিঁপড়ে বা পোকারা ভয় পেয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়।

পৃথিবীতে পাঁচশরও বেশি মাংস-ভোজী প্ল্যান্টস্ আছে। জলা জায়গাতে তারা নাইট্রোজেন পায় না বলেই মাংসাশী হয়ে ওঠে। মাংসাশী গাছেদের শুধু মুখই নেই, পেটও আছে এবং তাদের শরীরে এমন সব যন্ত্রপাতি আছে যা দিয়ে তারা শুধু জীবন্ত প্রাণী শিকারই করে না, রক্ত, মাংস, চামড়া, মেদ বেমালুম হজম করে শুধু কঙ্কাল ফেলে রাখে।

গাছপালা লতাপাতা যে চেহারায়, যে আকৃতিতে বেড়ে ওঠে, তাতে তাদের আকৃতি-গত উৎকর্ষ আমাদের মেধাবী ইঞ্জিনীয়রদেরও লজ্জা দেয়। ঝড়, তুফান, হারিকেন, সাইক্লোন সব কিছুই সহ্য করে তারা তাদের নরম, আপাত-ভঙ্গুর সাবলীল শরীরে। মানুষের তৈরি বাড়ি-ঘর-বহুতল প্রাসাদ, কখনই এমন নমনীয় অথচ দৃঢ় হয় না। গাছ যেমন ওপরে বাড়তে থাকে তেমনই সঙ্গে সঙ্গে সে ঘন হতে থাকে ডালপালায়; হাত-পা ছড়াতে থাকে দুধারে। আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু ভালো করে তাকালেই দেখা যায় যে, একটি গাছের শরীরের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের এক আশ্চর্য সুন্দর ভারসাম্য আছে।

মিসিসিপির প্রেইরী অঞ্চলে একরকমের সূর্যমুখী ফুল ফোটে। শিকারীরা সেই ফুল প্রথমে আবিষ্কার করেন। সেই ফুলের পাতারা নির্ভুলভাবে কম্পাসের কাঁটার দিক নির্দেশ করে। ইনডিয়ান লিকোরিস, যার বটানিকাল নাম, আব্রাস প্রেকাটোরিয়াস্; সমস্ত

রকম বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক অনুভূতিগুণসম্পন্ন। সবচেয়ে প্রথমে লান্ডানের কিউ গার্ডেনে (বটানিকাল গার্ডেন) উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে, এই গাছেরা সাইক্লোন, হারিকেন, টর্নাডো, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এসব কিছু ঘটবার অনেক আগেই তার আভাস পায়। আবহাওয়াবিদরা এখন এদের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

ফ্রাঁসে এও বলেছেন যে, গাছদের আমাদের চোখের চেয়েও সূক্ষ্ম ও তীব্র দৃষ্টি-সম্পন্ন চোখ আছে। আমাদের চোখে যা ধরা পড়ে না সেই সব আলট্রাভায়োলেট ও ইন্‌ফ্রারেড রঙও তারা দেখতে পায়। তাদের কানে এমন সব সূক্ষ্ম শব্দতরঙ্গ ধরা পড়ে, যা আমাদের কানে পৌঁছয় না। শুধু তাইই নয়, গাছপালা লতা-পাতারা এক্স-রে এবং হাইফ্রিকুয়েন্সী টেলিভিশনের শব্দ-তরঙ্গতেও বিশেষ ভাবে সাড়া দেয়।

আমাদের ধর্ম, আমাদের সংস্কৃতি যে কত গভীর, কত প্রাচীন, কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তা বারবার নতুন করে মনে হয়; যখন দেখি এই ফ্রাঁসের মতো বৈজ্ঞানিকেরও অবশেষে হিন্দু ধর্ম ও সাধুসন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হতে হয়। বছর পঞ্চাশ আগে. যখন ফ্রাঁসে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এইসব তথ্য প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, গাছেরাও ভালোবাসে এবং মানুষের ভালোবাসা ও ঘৃণাতে রি-অ্যাক্ট করে এবং গাছের ও উদ্ভিদজগতের সমস্ত ছোট বড় প্রাণী মানুষের চেয়ে কোনো অংশে ইতর নয়, তখন তাঁকে সকলেই অবিশ্বাস করেছিলেন। এবং ভালোভাবে নেন নি। তৎকালীন পশ্চিমী বৈজ্ঞানিকদের যা মর্মাহত করেছিল. তা হচ্ছে এই যে, ফ্রাঁসে বলেছিলেন উদ্ভিদজগতের এই প্রাণবত্তা, এই আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ, এদের ভালোবাসার ও ঘৃণা করার ক্ষমতা এবং মানুষের সঙ্গে একই ভাবতরঙ্গে মন বোঝাবুঝি; এ সবের মূলে কোনো অতিপ্রাকৃত ব্যাপার আছে। যীশুখ্রীস্টের জন্মের বহু আগে থেকে যে সব রশ্মি-প্রাণী, জিন-পরীদের মতো, হিন্দু-সাধুদের বর্ণিত দেবগণের মতো, এই পৃথিবীর তাবৎ ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্ত আছেন তাঁরাই আসলে উদ্ভিদজগতের এই আশ্চর্য প্রাণশক্তি ও হৃদয়বত্তার কারণ ঘটান। 'দ্যা সিক্রেট লাইফ অফ প্ল্যান্টস্'-এর লেখক স্বয় লিখেছেন: "দ্যা আইডিয়া ওজ কন্‌সিডার্ড বাই ভেজিটাল সায়ান্টিস্টস্ টু বী এজ চার্মিংলী জেনুইন এজ ইট ওজ্ হোপলেস্‌লি রোম্যান্টিক্।"

কিন্তু বর্তমানে এই ব্যাপারে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং যে সব ফল পাওয়া গেছে, তাতে ফ্রাঁসে যে সত্যদ্রষ্টা ছিলেন তা বোঝা যাচ্ছে। উদ্ভিদজগতের ওপর চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব আছে বলে জানা যাচ্ছে; মনুষ্য-জগতেরই মতো। আমাদের শরীরের জলীভূত উপাদানের মতো উদ্ভিদজগতের প্রত্যেকের শরীরেই জলীভূত উপাদান আছে। এবং এই জলীভূত উপাদানের ওপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব স্পষ্ট। মানুষের জন্ম, জীবন ও মৃত্যু যদি গ্রহনিচয়দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে উদ্ভিদদেরও তাই-ই হচ্ছে। মানুষদের মধ্যে যাদের বাত আছে তাদের যদি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে ব্যথা বাড়ে তাহলে বাত-সম্পন্ন গাছপালার গাঁটে গাঁটেও ব্যথা বাড়বে। ব্যাপারটা ভাবতেই আমার গা শিউরে উঠছে। আমি বৈজ্ঞানিক নই, কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস আমার জন্মেছে প্রকৃতি থেকেই; প্রকৃতির মধ্যে এতো-বছর থাকার কারণে ভগবানে বিশ্বাস জন্মেছে বলেই আমি ইডিয়ট: রোম্যান্টিক ফুল। কিন্তু এই বইটি পড়ে উঠে ভগবানে বিশ্বাস আমার দৃঢ়তর হচ্ছে। আমি যে একটি করৌজ ফুলের গাছকে ভালোবাসতে পারি অথবা ঠাকুমা-দিদিমার মতো কোনো মহুয়াকে, এবং তারাও যে আমার ভালোবাসায় সাড়া দিতে পারে এবং দেবে, এ কথাটা আমি কাল অবধিও জানতাম না। প্রকৃতিকে আমি ভালোবাসতাম তা সমগ্রতাতে। কোনো বিশেষ গাছ বা লতা বা ফুলকে আমি ভালোবাসি নি। ভালোবাসা যায় যে, তা জানতামও না। জানলাম যে, কোনো বিশেষ গাছের মৃত্যু কামনা করলে সে মরেও যেতে পারে। সে মেয়েদের মতো

অভিমানী; তার সামনে দাঁড়িয়ে অন্য গাছের সঙ্গে তুলনা করে তাকে খারাপ বললে, সে অভিমানে, দুঃখে শুকিয়ে যায়। ভাবা যায়?

অল্প ক'দিন অগেই আমি তিতলিকে ঠাট্টা করেছিলাম। শেষ শীতের জঙ্গল থেকে ও মৃতপ্রায় দুটি রাহেলাওলা ফুলের চারা গাছ তুলে এনে একটা রান্নাঘরের বারান্দার সামনে আর অন্যটা কুয়োতলার পাশে লাগিয়েছিল। সেদিন আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কুয়োতলার গাছটা মরে গেল, অথচ রান্নাঘরের সামনের গাছটা সুন্দর বেড়ে উঠল কী করে?

তিতলি বলেছিল, বেশি সময়ই ত' আমি রান্নাঘরে থাকি, তাই এই সামনের গাছটা সব সময় আমার নজর পায়, ভালোবাসা পায়; মনে মনে সব সময় ওকে বেড়ে উঠতে বলেছি। রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে ওর দিকে মুখ করেই ত' বসে থাকি আমি। আর কুয়োতলার গাছে চোখ পড়ে যখন শুধু বাসন মাজি তখন। আমি ত' আর এখানে চান করি না। চান তুমিই করো একা। আর তুমি ত' আমার দিকে তাকিয়েই একটা ভালো কথা বলো না তার বদনসীবি গাছের কথা!

আমি সেদিন হেসেছিলাম ওর কথা শুনে।

বলেছিলাম, দেখিস, তুই আবার যেন শুকিয়ে না যাস!

কিন্তু আজ এই বই পড়ে দেখেছি, এই ঘটনা হুবহু সত্যি। একই গাছ থেকে তিনটি পাতা ছিঁড়ে এক মহিলা একই বাড়ির তিন ঘরের ফুলদানিতে রেখেছেন। একটিকে ভালোবাসা হয়েছে, সকাল-সন্ধ্যে শুভকামনা জানানো হয়েছে। এবং অন্যদের হয় নি। অন্যরা শুকিয়ে গিয়ে মরে গেছে কিন্তু যে ছিন্ন পাতাটিকে মহিলা ভালোবেসেছিলেন সে শুধু বেঁচেই রয়েছে তাই-ই নয়, শরীরের যে অংশ থেকে পাতা ছেঁড়া হয়েছিল, সে জায়গার ক্ষতও প্রায় শুকিয়ে এসেছে।

এই বইতেই একটা চ্যাপ্টার আছে তার নাম: "প্ল্যান্টস্ ক্যান রিড ইওর মাইন্ড।" এই অধ্যায়ের মার্সেল ভোগেল বলে একজন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন উদ্ভিদবিজ্ঞানীর কথা আছে এবং বিশদ ভাবে বলা আছে, কিভাবে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নিঃসংশয় হয়েছেন যে, উদ্ভিদজগতের সকলেই আমাদের মন পড়তে পারে। আমরা ভালোবাসলে ওরা ভালোবাসা জানায় স্পষ্টভাবে। আমরা ঘৃণা করলে ওরাও ঘৃণা করে। কে যে ফুল তুলতে বা পাতা ছিঁড়তে যাচ্ছে সে তারা দূর থেকেই বুঝতে পারে। যে গাছ কাটতে এসেছে কুড়ুল নিয়ে, তাকে তারা দূর থেকে চেনে এবং ভীষণ ভয় পায়। মুষড়ে পড়ে। যখন কাটা-গাছ পড়ে যায় মাটিতে তখনও গাছেদের এত কষ্ট হয় না; যতটা হয়, কেউ গাছ কাটবে বুঝতে পারলে। একেবারে আমাদের মতো। মৃত্যুর সময়টার চেয়ে যেমন মৃত্যু-ভয় আমাদের অনেক বেশি পীড়িত করে।

পঞ্চাশ বছর আগে ফ্রান্সে যা বলে "হোপলেস্লী রোম্যান্টিক" আইডিয়ার জনক বলে পরিচিত হয়েছিলেন—সেই কথাই নতুন করে পৃথিবীকে শোনালেন বিংশ শতাব্দীর এই দশকে মার্সেল ভোগেল। উনি বললেন, ফ্রান্সের মতটি শুধু মাত্র সাজেশশান্ নয়, আ ফাইন্ডিং অফ্ ফ্যাক্ট। ভোগেল বললেন: "আ লাইফ ফোর্স, আর কস্মিক্ এনার্জি, সারাউন্ডিং অল্ লিভিং থিংগস্ ইজ শেয়ারেবল্ এমাঙ্গ প্লান্টস্, এ্যানিম্যালস্ এন্ড হিউম্যানস্। থ্রু সাচ শেয়ারিং আ পার্সন এন্ড আ প্লান্ট বিকাম ওয়ান। দিস ওয়াননেস্ মেকস্ পসিবল্ আ মিউচুয়াল সেন্সিটিভিটি এ্যালাওয়িং প্লান্ট এন্ড ম্যান নট ওনলি টু ইন্টারকম্যুনিকেট্; বাট টু রেকর্ড দীজ কম্যুনিকেশানস্ ভায়া দ্য প্লান্ট অন আ রেকর্ডিং চার্ট।"

একজন জার্মান মিস্টিক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল জ্যাকব বোমে। তিনি বলতেন যে, একটি শাড়ন্ত গাছ বা লতার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, হঠাৎ ইচ্ছে করলে তিনি সেই গাছের বা লতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারতেন এবং তার সঙ্গে মনে মনে অঙ্গীভূতও হতে পারতেন। তখন তিনি অনুভব করতে পারতেন সেই উদ্ভিদসত্তার সংগ্রাম। তার আলোর দিকে ধাবিত হওয়ার জীবনসংগ্রাম তিনি স্পষ্ট বোধ করতেন তাঁর মনে, কল্পনার শরীরেও। তখন তিনি সেই গাছ বা লতার উচ্চাশার ভাগীদার হতেন, পুরোপুরি আলোর দিকে, সবুজ পাতার বা লতার দিকে হাত বাড়িয়ে।

জ্যাকব বোমে বলতেন, "হি ইউজড্ টু রিজয়েস উইথ্ আ জয়াস্‌লি গ্রোয়িং লিফ্।"

হিন্দু শাস্ত্রে আছে যে, লম্বা হাই তুলে মানুষ নিজেকে নতুন শক্তিতে ভরপুর করে নিতে পারে। যে-শক্তি সমস্ত এনার্জির উৎস। হিন্দু দর্শনের দুজন অল্পবয়সী আমেরিকান ছাত্র, ভোগেল-এর বক্তব্য অনুসরণ করে উদ্ভিদজগৎ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। একদিন ক্লান্ত হয়ে তাঁরা ল্যাবরেটরীতে বসে রয়েছেন, এমন সময় ওঁদের মধ্যেই একজন হাই তুললেন। হাই তুলতেই ল্যাবরেটরীর মধ্যের একটি গাছ সেই হাইটি কুড়িয়ে নিল—জীবনীশক্তি হিসেবে। ওঁরা বিশ্বাস করেন নি। তবু, ব্যাপার পুরো অলীক বলে উড়িয়ে দিয়ে এই ঘটনা নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গিয়ে আবিষ্কার করলেন যে, প্রত্যেক পাতার কোষে কোষে এক বৈদ্যুতিক এনার্জি বা জীবনীশক্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই নিরীক্ষা ওঁরা, ডঃ নর্ম্যান গোল্ডস্টিন বলে ক্যালিফর্নিয়ার এক প্রফেসারের সাহায্য নিয়ে করেছিলেন একটি আইভি লতার ওপর। বর্তমানে ফন্টেস্ নিটেল্লা বলে একরকমের জলজ উদ্ভিদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন এই ব্যাপারেই।

প্যাট্ প্রাইস্ বলে পুলিশের একজন প্রাক্তন বড়কর্তা এবং টেস্ট পাইলটের সাহায্যও নিয়েছেন ফন্টেস্ তাঁর মনের বিভিন্ন ভাবের ক্রিয়া নিটেল্লার ওপর ঘটাতে পারেন। নিটেল্লা লতাটি প্রাইসের মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবনার তরঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিচ্ছে। এখন ফন্টেস্, ডঃ হাল পুটোফ্ নামে একজন পদার্থ বিজ্ঞানী এবং প্রাইসের সহযোগিতায় দেখতে চাইছেন যে, প্রাইস্‌কে বহুদূর ধরা যাক, হাজার মাইল দূরে নিয়ে গেলেও তাঁর মনের ভাবনা ও ভাবতরঙ্গ নিটেল্লার ওপর প্রতিফলিত হয় কী না!

সামনে থাকলে একেবারে নির্ভুলভাবেই সাড়া দিচ্ছে নিটেল্লা।

হাজার মাইল দূর থেকেও কি তেমনি করেই দেবে?

একরকমের অর্কিড আছে, যাদের বটানিক্যাল নাম "ট্রিকোচেরোস্ পার্ভিফ্লোরাস।" তারা তাদের পাপড়িগুলোর গড়ন এমন করে তোলে যাতে হুবহু একজাতের স্ত্রী মাছির মতো দেখতে লাগে। ফলে সেই জাতে পুরুষ মাছিরা স্ত্রী মাছি বলে ভুল করে সেই পাপড়ির ওপরে মিলিত হতে চেষ্টা করে এবং তা থেকেই কি অর্কিডের ফুল ফোটে? রাতে যে সব ফুল ফোটে তাদের বেশির ভাগেরই রঙ সাদা হয় কেন? রাতের প্রজাপতি আর মথদের আকৃষ্ট করার জন্যই কি? রাতের ফুলেরা তীব্রগন্ধী হয় কেন? অন্ধকারে যাতে গন্ধ চিনে মথ, প্রজাপতিরা আসতে পারে? সেই জন্যে?

আর এক জায়গায় পড়েছিলাম যে, মানুষের মূল ভাবাবেগ ও ক্রিয়াকলাপে উদ্ভিদজগৎ প্রচণ্ডভাবে অনুপ্রাণিত হয়। সে-কারণেই বোধহয় প্রাচীনকালে ক্ষেতে বীজ বোনার পর কোনো দেশে, সেই ক্ষেতেই স্ত্রী ও পুরুষ সঙ্গম করত, যাতে ফসল ভালো হয়।

আমি একা বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে বসে ভাবছিলাম পশ্চিমে আকাশের দিকে চেয়ে ; সত্যিই কি ফন্টেস্-এর এই পরীক্ষা সফল হবে? সফল হলে আমি ত' কলকাতা, দিল্লী,

বোম্বে যেখানে খুশি বসে আমার ভালুমারের বনজঙ্গলকে এমনি করেই ভালোবাসতে পারব। তারাও তাদের ভালোবাসার তরঙ্গ পাঠাতে পারবে আমার কাছে।

কী আশ্চর্য! ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

আজ থেকে কোনো গাছপালার দিকে আর নৈর্ব্যক্তিক চোখে তাকাতে পারবো না। কোনো মানুষের মুখের দিকে, নারীর মুখের দিকে যেমন নৈর্ব্যক্তিক চোখে তাকানো যায় না; তেমন ওদের প্রতিও আর যাবে না। ওরা প্রত্যেকে যে আলাদা! আলাদা ওদের ব্যক্তিত্ব। ওরা ভালোবাসতে জানে, ওরা দূর থেকেও ভালোবাসতে পারে। ওরা দেখতে পায়, শুনতে পায়, ওদের মন আছে। হয়তো ওরা মানুষের চেয়েও ভালো। হয়তো আমাকে দুঃখ দেওয়া নারী জিন্‌-এর থেকেও অনেক ভালো। মেয়ের গাছেরা কি পৃথিবীর মেয়েদের মতোই দুঃখ দেয়? তেমনই নির্দয় হয় কি তারা?

এই যে উদ্ভাবন, একে কি বলব বৈজ্ঞানিক জয়-জয়কার? না কি বলব, যা আমি চির দিনই বলি, তাই। এ উদ্ভাবন নয়, এ নিছক আবিষ্কার। যে শক্তি, এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্রকে চালিত করেছেন তিনিই সমস্ত প্রাণীকে, জীবকে, গাছকে, লতাপাতাকে এবং মানুষকেও কী অসীম সব ক্ষমতায় সম্পৃক্ত করে পাঠিয়েছেন। আমাদের ব্রহ্মাকেই কি মানতে হয় না? যিনি সৃষ্টিকারী!

একই শক্তি থেকে আমরা সকলে উদ্ভূত হয়েছি, সেই শক্তির নির্দেশে। তাঁরই সামান্য অঙ্গুলিহেলনে আমাদের বিনাশ। যত দিন যাচ্ছে ততই বিজ্ঞান ঝুঁকছে অবিশ্বাস আর নাস্তিক্যবাদ ছেড়ে বিশ্বাস আর আস্তিকতার দিকে। এই অদৃশ্য নিরাকার শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার প্রতি বৈজ্ঞানিকদের প্রবণতা দিনে দিনে কি গভীরতর হচ্ছে?

যেদিন এই গ্রহর বৈজ্ঞানিকরা এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে, ঈশ্বর বা কোনো শক্তি আছেন এবং তাঁরা বড়ই ঘোরাপথে ভগবানেরই বিভিন্ন সৃষ্টি নেড়ে-চেড়ে, কেটে-ছিঁড়ে তাঁর নির্বিবাদ অস্তিত্বের বিশ্বাসে এসে পৌঁছলেন; তখন আমি হয়তো বেঁচে থাকবো না। কিন্তু বেঁচে থাকলে আমার বড়ই আনন্দ হতো।

সূর্য পশ্চিমে হেলেছে। নরম বিষণ্ণ হলুদ আলোয় ভরে গেছে অরণ্যানী, ফসলতোলা ক্ষেত, দূরের টাঁড়। শাঁটাখাম্বায় জল তোলার আওয়াজ হচ্ছে ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর করে। কী শান্তি চারিদিকে! এখানে ঈশ্বর থাকেন আমার মধ্যে; দৃশ্যমান, স্পর্শকাতর সব কিছুর মধ্যে। এ এক খোলামেলা দারুণ মন্দির। দরজাহীন, খিলানহীন, চূড়োহীন। পোকা-মাকড়, প্রজাপতি, মহীরুহ, গাছ, লতা, ঝোপ-ঝাড়, ফুল-পাতা, আমার মতো মানুষ সকলেই। নিত্য তার পুজো, নিঃশব্দে; অলক্ষ্যে।

এই মুহূর্তে আমার ডেরার গেটের পাশের রাধাচূড়া কিছু কি ভাবছে?

কী ভাবছে?

ভারী জানতে ইচ্ছে করছে আমার। নিজেকেও জানতে ইচ্ছে করছে।

"আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, ফুরাবে না; সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।"



লগনের প্রাণের বন্ধু পরেশনাথ। পরেশনাথ আর বুলকির কাছে লগন গত একমাস ধরে শুধু তার দাদার আসার গল্পই করেছে। দাদা নিশ্চয়ই এসে গেছে, তাই লগনের পাত্তা নেই একেবারে। দাদা কী কী নিয়ে এসেছে তার জন্যে, কে জানে? কত খাবার, কত খেলনা, কত জামাকাপড়। আর তা থেকে লগন নিশ্চয়ই ভাগ দেবে পরেশনাথকে। লগনের দিদির জন্যে যে মালাটালা আনবে তা থেকেও টুসিয়া দিদি নিশ্চয় একটা দেবে বুলকি দিদিকে। পরেশ আর বুলকি তাই হাত ধরাধরি করে, রোদ ভাল করে উঠতে না উঠতেই চলেছে লগনদের বাড়ির দিকে। মুঞ্জরী বার বার বলে দিয়েছে, অসভ্যতা করবে না; হ্যাংলামি করবে না। লগনদের বাড়ি একটু থেকে জিনিসপত্র দেখেই চলে আসবে তোমরা।

পরেশনাথ আর বুলকি সরগুজার ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে যথারীতি শর্টকাট করলো।

মুঞ্জরীর রাগে গা জ্বালা করে উঠল। চেঁচিয়ে ডাকল দুটোকেই।

ওরা গুটি গুটি ফিরে এলো। মুঞ্জরী তাদের ধরে মাথা ঠুকে দিল। বলল, এতবার মানা করি, একদিনও কি তোমাদের হুঁশ থাকে না? কতদিন বলেছি, পথ ধরে যাবি, ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে হাঁটবি না। দেখেছিস, তোদের পায়ে পায়ে কত চওড়া রাস্তা হয়ে গেছে ফসলের মধ্যে। কতগুলো সরগুজা গাছ মেরেছিস বল্ তো তোর? কম করে দুকেজি তেল হতো তা থেকে। আর কতদিন বলতে হবে। লজ্জা বলে কি তোদের কিছুই নেই?

পরেশনাথ একটু কেঁদেছিল।

বুলকি খুব শক্ত মেয়ে। একটুও কাঁদে নি।

মোটে বারো বছর হলে কী হয়, দারিদ্র্য, জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে; বাইশ বছরের প্রাপ্তমনস্কতা দিয়েছে বুলকিকে। হাঁটায়, চলায়; কথা বলায়।

ওরা যখন এগোচ্ছে তখন মুঞ্জরী হেঁকে বলল, গোদা শেঠের দোকান থেকে দশ পয়সার নুন নিয়ে আসবি বুলকি।

বলেই, ঘরে গিয়ে ঘরের কোণায় কাপড়-চোপড় চাপা দেয়া কালো মাটির-হাঁড়ি থেকে গুনে করে দশ নয়া এনে দিল ওর হাতে। আর বলল, নুনের পয়সা দিয়ে দিবি। ধার করে নুন আনতে নেই।

পয়সাটা ওর হাতে দিতে দিতে মুঞ্জরী আতঙ্কিত হয়ে হঠাৎ লক্ষ করল, ছেঁড়া নীল-রঙা ফ্রকটার আড়ালে তার ছোট্ট মেয়ে বুলকি যেন রাতারাতি বড় হয়ে গেছে। কী জ্বালা! তার মেয়েটা চিরদিন কেন ছোটই থাকল না। আজকালকার দিনে শাড়ির খরচ কত! বুলকি মেয়ে না হয়ে, ছেলে হলেই ভালো হতো। মেয়েদের নিয়ে কী কম জ্বালা! মুঞ্জরী ভাবছিল, চলে যাওয়া মেয়ের দিকে তাকিয়ে।

ওরা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর নানকুয়া এলো। সাইকেলে করে। কিছু শেওই আর গুজিয়া নিয়ে এসেছে।

সাইকেলটা গাছে ঠেস দিয়ে রেখে বলল, নাও মাসী।

তারপর বলল, তোমরা কেমন আছো? মেসো কোথায় গেল?

মঞ্জরী খুশি হয়ে ওকে বসতে দিল।

বলল, গোন্দনি ধানের পায়েস করেছিলাম কাল একটু। গাইটা এখন ভালোই দুধ দিচ্ছে। বাঁশবাবুকে দুবেলা দিয়েও কিছু থাকে। খাবি একটু?

দু-স্-স্-স্।

নানকুয়া বলল, আমি নাস্তা করেই বেরিয়েছি। তাছাড়া দুধ ত বাচ্চা আর বুড়োরাই খায়।

তারপর বলল, এদিকে হরিণ খুব বেড়ে গেছে, না? আমার সাইকেলের সঙ্গে একটা বড় দলের প্রায় ধাক্কা লেগে গেছিল আর একটু হলে।

মঞ্জরী বলল, হরিণদের আর কি? সারারাত বস্তির ফসল খেয়ে ধীরে সুস্থে রোদে হেঁটে জঙ্গলে ফিরছে। এখানে বাড়ে নি কি? শুয়োর আর খরগোশই বা কী কম? মটরছিম্মিতো এবারে মাত্র পাঁচ কে-জি বিক্রী করতে পেরেছি। হওয়ার কথা ছিল মণ খানেক, তা, ক্ষেতে কি কিছু থাকতে দিল?

মেসো কোথায়? নান্‌কু আবার শুধলো।

জঙ্গলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মঞ্জরী বলল, নালাটাকে গাড্‌হা করছে। যাতে সামনের বর্ষায় ক্ষেতে জল একটু বেশি থাকে। এবারে যদি মকাই ভালো হয় তবেই বাঁচোয়া। নইলে, বড়ই মুশকিল হবে।

এমন সময় পায়ে-চলা পথে মাহাতোকে মঞ্জরীদের ডেরার দিকে আসতে দেখা গেল। আসতে আসতে সে কর্কশ গলায় চিৎকার করতে লাগল, এ মানি, মানিয়া হো।

মানি আওয়াজ পেয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এদিকে এগিয়ে আসতে লাগল। হাতে কোদাল।

নান্‌কুয়া যেন মাহাতোকে দেখেও দেখে নি এমন করে অন্যদিকে মুখ করে বসে রইল।

মানি এলেই, মাহাতো বলল, তোর বলদ দুটোকে এক্ষুনি নিয়ে চল, আমার ক্ষেতে লাঙল দিবি।

মানি মিন্ মিন্ করে বলল, আমার নিজের ক্ষেতের কাজই ত' শেষ হয় নি মালিক। আর সাত দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে। গতবারের টাকাটাও মিটিয়ে দিলে না এখনও। বড়ই অসুবিধার মধ্যে আছি।

মাহাতোর পায়ে শুঁড়-তোলা নাগড়া জুতো, পরনে ফিন্‌ফিনে মিলের ধুতি আর বাদামী রঙের টেরীলিনের পাঞ্জাবি। সোনার বোতাম দেওয়া। একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে মাহাতো বলল, তোদের অসুবিধা ত' সারাজীবনই। কিন্তু তোদের সুবিধা দেখতে গেলে যে আমার বড়ই অসুবিধা। অত কথা শুনতে চাই না। আসবি কি না বল্ এক্ষুনি।

সাংসারিক বুদ্ধি, মানিয়ার চেয়ে মঞ্জরীর চিরদিনই বেশি। মঞ্জরী বলল, আগের টাকাটা মিটিয়ে দিলে তবু কথা ছিল। আর টাকা বাকি থাকতে, নিজের চাষের ক্ষতি করে কী করে বলদ নিয়ে যাবে ও। আপনিই বলুন মালিক!

আচ্ছা! এই কথা? তা কত টাকা বাকি আছে শুনি?

বলে, মাহাতো কুটিল চোখে তাকালো মঞ্জরীর দিকে।

মঞ্জরী মাটির দিকে চেয়ে বলল, তিরিশ টাকা।

ভালো কথা।

তারপর বলল, মানিয়া বয়েল নিয়ে চল্ এক্ষুনি, আমার নিজের চার জোড়ার ওপরেও

তোর দুটো চাই। চার দিনই আমার কাজ হয়ে যাবে। সব টাকা শোধ করে দেবো একবারেই। গতবারের এবং এ-বারের।

মানিয়া হাত জোড় করল, বলল, দয়া করো মালিক, গরীবের ওপর দয়া করো। আমি আমার ক্ষেত চষতে না পারলে বাল-বাচ্চা নিয়ে উপোস থাকব সারা বছর। কয়েকটা দিন সবুর করো। আমার ইজ্জৎ-এর দোহাই।

এই রকম ব্যাপার? তোরও ইজ্জৎ? মাহাতো বলল। বলেই, মুঞ্জরীকে, উদ্দেশ্য করে বলল, তুই-ই ত' দেখছি মানিয়াকে চালাস, তুই-ই বদ বুদ্ধি যোগাস ওকে। নইলে ও লোক খারাপ নয়। তারপরই, মুঞ্জরীর কাছে এগিয়ে এসে বলল, ঠিক আছে। গোদা শেঠের কাছে কত ধার তোদের? আমি গোদাকে বলে দিচ্ছি যে, আর ধার যেন না দেয়। ধার যা বাকি আছে তাও যেন এক্ষুনি সুদে আসলে ওসুল করে। শোধ না করলে হাটের মধ্যে তোর শাড়ি খুললেই বা লজ্জা কিসের? গোদাকে তোরা সকলেই চিনিস। তকখন তোদের ইজ্জৎ কোথায় থাকে দেখব।

হঠাৎই মানিয়া মাহাতোর নাগড়া জুতো পরা দুই পায়ের ওপর হুমড়ে পড়ে বলল, দয়া করো মালিক, গোদা শেঠকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিও না। তোমাদের দয়া ছাড়া, ধার ছাড়া; আমরা বাঁচি কী করে?

মানিয়াকে একটা লাথি মেরে সরিয়ে দিল মাহাতো, তারপর বলল, দয়া করে করেই ত এত বড় আস্পদ্দা তোদের। নিজ বাড়ি বয়ে একটা উপকার চাইতে এলাম, তার বদলে এই নিমকহারামের ব্যবহার তোদের!

নান্‌কুয়া রোদে পিট দিয়ে চৌপাইয়ে বসেছিল। হঠাৎ ও ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো সটান হয়ে দাঁড়িয়েই উবু হয়ে বসে-থাকা মানিয়ার কাছে গেল, গিয়ে মানিয়াকে ওর ফতুয়া শুদ্ধ তুলে ধরল বাঁ হাতে, তুলে ধরেই ঠাস্ করে এক চড় লাগালো গালে।

মাহাতো, মুঞ্জরী এবং মানিয়া, নান্‌কুয়ার এই অতর্কিত আক্রমণে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

নান্‌কুয়া বলল, ইজ্জৎ? তোমার আবার ইজ্জৎ কিসের মেসো। যে, কথায় কথায় লোকের পায়ে পড়ে, তার ইজ্জৎটা আর আছে কি? ধার কি গোদা শেঠ এমনি-এমনিই দেয়? সুদ নেয় না তোমাদের কাছ থেকে? তবে মাহাতোর এতো বক্তৃতার কি?

নান্‌কুয়া মাহাতোর দিকে চোখ তুলে তাকালো না পর্যন্ত। ওর হাবভাবে মনে হলো, লোকটা যে সামনেই আছে তা নান্‌কুয়া লক্ষ্য করে নি।

তেল-চুক্‌চুক্ মাহাতো অনেকক্ষণ একদৃষ্টে স্থির চোখে চেয়ে রইলো নান্‌কুয়ার দিকে।

তারপর স্তম্ভিত হয়ে, আস্তে আস্তে বলল, কী দাঁড়ালো তাহলে ব্যাপারটা! এই যে, নান্‌কুয়া! এদিকে যে তাকাচ্ছিসই না আমি কি একটা মানুষই নই?

নান্‌কুয়া অন্যদিকে মুখ করে বলল, ব্যাপারটা যা ছিল, তাই-ই। নতুন কিছু নয়। তুমি মানুষ হলে, মানুষদের লজ্জা রাখার জায়গা থাকবে না। তারপরই বলল, তোমার সঙ্গে আমি কথা বলছি না। আমি আমার মেসোর সঙ্গে কথা বলছি।

মাহাতো ধমকের স্বরে বলল, কিন্তু আমি তোর সঙ্গে বলছি। তুই-ই তাহলে এখন মানিয়ার পরামর্শদাতা? তাই-ই এত সাহস মানিয়ার আর তার বৌ-এর?

এবার নান্‌কুয়া মাহাতোর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, সাহস? মানিয়ার সাহস কোথায়? সাহস থাকলে তোমার পায়ে পড়ে? কিন্তু এও জেনে যাও মাহাতো, যা হয়েছে তা হয়েছে। মানিয়া আর কখনও তোমার পায়ে পড়বে না। আজ থেকে তোমাকে বলে দিলাম, তুমি এ বাড়ির চত্বরে ঢুকবে না। তোমার সঙ্গে মানি ওরাওঁ-এর

কোনো লেনদেন নেই। আর বাকি টাকাটা এক্ষুনি চাই ওদের। গোদার দোকানের ধার শোধ করার জন্যে।

মাহাতো গভীর বিস্ময়ে স্পর্ধিত নানকুয়ার দিকে চেয়ে রইল। তার দু'শ বিঘা চাষের জমি। দেড়শ গোরু বাছুর। তার অঙ্গুলিহেলনে এই ভালুমারের বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। তার মুখের ওপর এত বড় কথা বলে অন্য লোকের উপস্থিতিতে! এত বড় সাহস যে কারো হতে পারে, এটা মাহাতোর ভাবনারও বাইরে ছিল।

মাহাতো বিস্ময় কাটিয়ে উঠে বলল, আমি তোর বাপের চাকর নইরে ছোকরা, যে, তোর কথায় উঠব বসব। টাকা চাইলেই, টাকা পাওয়া যায় না। টাকা নেই। ঐ টাকা আমি দেবোই না। দেখি, তুই কী করতে পারিস।

নানকুয়া এবার ঘুরে দাঁড়ালো মাহাতোর দিকে।

বলল, দ্যাখো মাহাতো, আমার সঙ্গে লাগতে এসো না। তোমার কপালে আগুন লেগে যাবে। বেশ জাঁকিয়ে বসে আছো, ঘিয়ে ভাজা পরোটা খাচ্ছো; আর বস্তির যত ছোকরীদের নিয়ে মজা লুটছ। যা করছ, করে যাও আরও কিছুদিন; যতদিন না তোমার সময় আসে। তোমার সময় ফুরিয়ে আসছে। সাবধান করছি তোমাকে। আমাব সঙ্গে লাগতে এসো না। খুব খারাপ হয়ে যাবে।

খারাপ হয়ে যাবে?

মাহাতো কথাটার পুনরাবৃত্তি করলো। তারপর বলল, বটে! এই করম ব্যাপার! আচ্ছা!

বলেই, চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

নানকুয়া পথ আগলে বলল, চললে কোথায়? টাকাটা দিয়ে তবে যাও। টাকা না দিলে, যেতে দেব না তোমায়।

যেতে দিবি না। আমায়? আজীব বাত্!

মাহাতোর মুখে একটা ক্রুর হাসি ফুটল।

বলল, টাকা-ফাকা আমার কাছে নেই। থাকলেও দিতাম না। তোর কথাতেই। তোর কথায় আমায় চলতে হবে নাকি রে ছোকরা?

নানকুয়া অদ্ভুত ভাবে হাসল একবার। বলল, টাকাটা না দিলে তোমার ধুতি-পাঞ্জাবি, জুতো-আংটি, হাতের ঘড়ি পর্যন্ত খুলে রেখে দেব। টাকা এনে, ছাড়িয়ে নিও পরে।

মানিয়া চেঁচিয়ে উঠলো, নানকুয়া; এই নানকুয়া তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এ কি করছিস? এ কি করছিস? বলতে বলতে, মানিয়া এগিয়ে এল নানকুয়ার কাছে। কাছে আসতেই, নানকুয়া আরেক থাপ্পড় লাগালো মানিয়াকে। বলল, তোমার ইজ্জৎ তোমার বুকের মধ্যে মরে গেছে। তোমাকে অনেক থাপ্পড় মারলে যদি সে কখনও জাগে! বলেই, মাহাতোর গলার কাছে বাঁ হাত দিয়ে পাঞ্জাবিটা মুঠি পাকিয়ে ধরলো। ধরেই বলল, বের কর টাকা, শালা মাহাতোর বাচ্চা।

মাহাতো নানকুয়াকে একটা লাথি মারলো নাগরা জুতো-সুদ্ধু। সঙ্গে সঙ্গে নানকুয়া তার মুখে প্রচণ্ড এক ঘুষি মারল; মেরেই তাকে মাটিতে চিৎ করে ফেলে তার বুকের ওপর বসল। বসেই, দু হাত দিয়ে গলা টিপে ধরল। মাহাতো ছট্‌ফট্ করতে লাগল। ভয়ে, উত্তেজনায় মুঞ্জরীর ঠোঁট নীল হয়ে গেছিল। সারা শরীর কাঁপছিল থরথর করে। মানিয়া হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে ছিল।

হঠাৎ কারা যেন নানকুয়ার পিছনে হাততালি দিয়ে উঠল।

সকলেই চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখে, পরেশনাথ, বুলকি আর জুগনুর ছোট ছেলে লগন এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে নানকুয়াকে বাহবা দিয়ে। জোরে জোরে হাততালি দিচ্ছে। নানকুয়া, মাহাতোর গলা থেকে হাত ছেড়ে দিয়ে ওর বুকে বসা অবস্থাতেই ওর পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিয়ে টাকা আর কাগজ বের করল এক তাল। বের করেই, পরেশনাথ আর লগনকে ডাকল।

ওরা দৌড়ে কাছে যেতেই, মানিয়াকে শুধলো, কত টাকা মেসো?

মানিয়া ঘোরের মধ্যেই অস্ফুটে বলল, তিরিশ টাকা।

এতো ভয় মানিয়া জীবনে কোনোদিন পায় নি। জঙ্গলে বাঘের মুখে পড়েও নয়।

নানকুয়া টাকাগুলো গুণে, তিরিশ টাকা পরেশনাথের হাতে দিয়ে, বাকি টাকাটা আবার পকেটে রেখে দিল। রেখে দিয়ে, মাহাতোকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু মাহাতো উঠল না। মরার মতো পড়ে রইল।

মুঞ্জরী দৌড়ে গেলো ঐ দিকে। বুলকিকে বলল, দৌড়ে জল নিয়ে আয় বুলকি। মাহাতো বোধ হয় মরেই গেছে।

নানকুয়া আবার এসে চৌপাইতে বসল। নানকুয়া জানতো যে, মাহাতো প্রাণে মরে নি। কিন্তু মরেছে ঠিকই। ভালুমারে মাহাতো বলে প্রবল-পরাক্রান্ত, ধনশালী, কর্তৃত্বর বাহক যে লোকটা এতদিন বেঁচে ছিল সে মরে গেলো। আজ এই মুহূর্তে। মানিয়ারাই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এতদিন। ঘন ঘন তার কাছে হাত জোড় করে, তার পায়ে পড়ে। কিন্তু পরেশনাথ, লগন, ওরা আর সেইভাবে মাহাতোকে বাঁচতে দেবে না। ঐ শিশুদের হাততালিই তার প্রমাণ। একটুকু শিশুরাও অত্যাচারের স্বরূপ বুঝেছে, যদিও সেটাকেই নিয়ম বলে জেনে এসেছে এতদিন; তাদের গুরুজনদের সাহসের অভাবেব জন্যে। নানকুয়ার মতো একজনের দরকার ছিল এদের কাছে; যে এসে নিয়মের ব্যাতিক্রম ঘটালে, অন্যায়কে অন্যায় বলে আঙুল তুলে বলার সাহস দেখালে, ওরা সব দৌড়ে, হাততালি দিতে দিতে নানকুয়ার পিছনে এসে দাঁড়াবে। নানকুয়া জানে, তার আসল জোরটা তার নিজের শরীরের জোর নয়। সেটা কিছুই নয়। তার আসল জোর অসংখ্য মূক, সরল, নির্যাতিত মানুষের মদতের মধ্যে। ওরা জানে না, ওরা সকলে এক জোটে দাঁড়ালে ওরা হাতির দলের চেয়েও বেশি বল ধরবে। তখন মাহাতোর মতো, গোদা শেঠের মতো ; একটা দুটো শেয়াল কুকুর ওদের এমনি করে ভয় দেখিয়ে কুঁকড়ে রাখতে পারবে না আর। নানকুয়া জানে যে, পরেশনাথরা তার সঙ্গে আছে। সঙ্গে আছে ভবিষ্যৎ-এর সব মানুষ, আবালবৃদ্ধবণিতা। নানকুয়া এও জানে যে, আজকের ছোট্ট-মুঠির, হালকা-শরীরের শিশুরা একদিন যুবক হবে। মানিয়ার মতো কাপুরুষ, ভীরু পরিবেশের ভারে ন্যুব্জ জীব হবে না তারা। তারা মরদ হবে সত্যিকারের। এই সমস্ত গরীব-গুরবো মানুষগুলোর ভবিষ্যৎ তখন ওদের শক্ত মুঠিতে ধরা থাকবে। সে ভবিষ্যৎ নাড়ানোর ক্ষমতা মাহাতোদের, গোদা শেঠদের আর কখনই হবে না।

প্রায় দশ মিনিট পরে মাহাতো উঠল। জল খেলো। মুঞ্জরী আর বুলকি তার মুখে-চোখে জল-দেওয়াতে মাহাতোর বুকের কাছে পাঞ্জাবির অনেকটা জায়গা ভিজে গেছিল। মাহাতো উঠে দাঁড়াতেই নানকুয়া মাহাতোকে ডাকলো ওর দিকে। বলল, এদিকে একটু শুনে যাও। অবাক চোখে মানিয়া, মুঞ্জরী, বুলকি, পরেশনাথ আর লগন দেখল যে, নানকুয়াই যেন মাহাতো হয়ে গেছে হঠাৎ আজ সকালে। আর মাহাতো, ওদেরই একজন। আশ্চর্য!

মাহাতো আস্তে আস্তে নানকুয়ার কাছে এসে দাঁড়াল।

নান্‌কুয়া ধীরে সুস্থে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে, তার লাল-নীল রঙ টিনের লাইটার বের করে কুটুং করে আগুন জেবলে সিগারেটটা ধরালো, এবং একটা সিগারেট দিল জবালিয়ে, মাহাতোকে। মাহাতো নেবে কি-না একটা ভেবে, সিগারেটটা নিলো নান্‌কুয়ার কাছ থেকে। ধরে রইল। কিন্তু টানলো না। নান্‌কুয়া আস্তে আস্তে নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, মাহাতো, আমি ছেলেমানুষ নই, বোকাও নই। আমি জানি যে, তুমিও নও। আমি এও জানি যে, তুমি এরপর কী করবে। মানে, কী করে আমাকে শায়েস্তা করবে। তোমার লেঠেলরা, তোমার লোকজনেরা আমাকে মেরেও ফেলতে পার। তার জন্যে আমার ভয় নেই। তোমাকে শুধু একটা কথাই বলতে চাই। আজ থেকে ঝগড়াটা তোমার সঙ্গে আমার। আমাকে যা করতে পারো, কোরো। কিন্তু এই মেসোদের, মানিয়া-মুঞ্জরীকে এর মধ্যে টেনো না। ওদের ওপর যদি তুমি অথবা গোদা শেঠ অথবা তোমাদের কোনো লোক, কোনো হামলা করে, তাহলে খুবই খারাপ হবে। ব্যস্‌স্‌, এইটুকুই বলার ছিল।

মাহাতো কিছু না বলে চলে যাচ্ছিলো। ওর চোখ দুটো বাঘের মতো জবলছিল। নাকের ফুটো দিয়ে ক্ষীণ ধারায় রক্ত গড়িয়ে এসে পাঞ্জাবির বাঁ দিকের বুক ভিজিয়ে দিচ্ছিলো।

নান্‌কুয়া চিৎকার করে বলল, কোতোয়ালিতে গিয়ে কিন্তু নালিশ কোরো না। তাতে আমার হাজত হতে পারে, কিন্তু ছাড়া পেয়েই আবার আমি ফিরে আসব এখানেই। তার চেয়ে আমার ওপরেই বদলা নিও, যা পারো। পুরুষ, ফালতু ফালতু কোতোয়ালিতে যায় না। তারা নিজেদের ব্যাপারের ফয়সালা নিজেরাই করে।

মাহাতো দাঁড়িয়ে পড়ে ওর কথা শুনে আবার চলতে লাগলো, টলতে টলতে।

নান্‌কুয়া আরেকবার চেঁচিয়ে বলল, আরও একটা কথা। জেনে রেখো যে, আমি একা নই। তুমি বুদ্ধিমান। তোমার বোঝা উচিত যে, আমি একা হলে, আমার এত সাহস হতো না।

মাহাতো দাঁড়িয়ে, বিকৃত মস্তিষ্ক, বিবশ, স্তব্ধবুদ্ধি লোকের মতো একবার চাইল নান্‌কুয়ার মুখের দিকে। তারপরই আবার চলতে লাগল।

মাহাতো জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবার অনেক, অনেকক্ষণ পর প্রথম কথা বলল মানিয়া, অস্ফুটে বলল ; ক্যা খাত্‌রা বন গৈয়ো, হো রাম।

নান্‌কুয়া বলল, কি হল মাসী? গোন্দনির পায়েস খাওয়াবে না? পায়েস খাওয়াও।

পরেশনাথ নান্‌কুয়ার কাছে এগিয়ে এসে ওর কোলের মধ্যে বসে বলল, নাক ফাটিয়ে দিলে বড়ে-ভাইয়া। ঈস্‌স্‌, তোমার হাতে কী জোর? নান্‌কুয়া পরেশনাথের রোগা হাড় জিরজিরে হাত দুটোকে আদর করে নিজের হাতে তুলে বলল, তোর হাতেও অনেক জোর আছেরে। জোর আছে কি নেই, জোর না খাটালে তা জানবি কী করে?

লগন পরেশনাথের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল নান্‌কুয়ার দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে। বলল, পরেশনাথ এবারে আমি যাইরে। মা রাগারাগি করবে দেরি করলে। বলেই, ও চলে গেলো।

নান্‌কুয়া লগনকে বলল, তোর মা-বাবা কেমন আছে রে?

ভালো।

তারপর লাজুক গলায় বলল, তোর দিদি?

সেও ভালো।

বলেই, লগন দৌড়ে গেলো।

বুলকি একটা অ্যালুমিনিয়ামের কালচে হয়ে যাওয়া প্লেটে করে একটু পায়েস নিয়ে

এলো নান্‌কুয়ার জন্যে। অন্য হাতে লোটাতে করে জল। কিন্তু লগনকে পায়েস খেতে ডাকল না কেউ। মুঞ্জরীরা বড়ই গরীব। ভদ্রতা, আদব-কায়দা, এসব ওরা জানতো এক-সময় কিন্তু এখন সবই ভুলে গেছে। কখনও যে এ সব জানতো; এখন সেই কথাটাও বোধহয় ভুলে গেছে। নান্‌কুয়া পায়েসটা হাতে নিয়ে বুল্‌কিকে বলল, কোথায় যাওয়া হয়েছিল সাত-সকালে সকলে দল বেঁধে?

লগনদের বাড়ি। লগনের হীরুদাদা আসবার কথা ছিলো ত'! অনেক জিনিস আর খেল্‌না-টেল্‌না সব নিয়ে আসবে বলেছিল। তাই আমরা গেছিলাম ওর জিনিস দেখতে।

তাই? নান্‌কুয়া বলল। কী এনেছে? দেখলি?

দূর্। আসেই নি। ঠোঁঠ উল্টে বলল, বুল্‌কি। মানে, এসেছে কিন্তু ওদের কাছে আসে নি। দেখাও করে নি ওদের সঙ্গে। এখন লগনের দাদা ভারী অফ্‌সর। নাম বদলে ফেলেছে নাকি! হীরু দাদা এখন আর ওঁরাও নেই। সিং হয়ে গেছে। ফরেস্ট বাংলোয় উঠেছে।

নান্‌কুয়া পায়েস খাওয়া থামিয়ে অবাক গলায় বলল, বলিস কি রে?

হ্যাঁ! সত্যি। তুমি পরেশনাথকে জিগেস করো। কালকে সারারাত টুসিয়া দিদি খুব কেঁদেছে।

তাই বুঝি। নান্‌কুয়া বলল। অন্যমনস্ক গলায়।

নান্‌কুয়ার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এল। টুসিয়ার জন্যে তার আর কোনো ভালোবাসা নেই। খুব ভালো হয়েছে। শিক্ষা হোক ওর। বড় অফ্‌সরকে বিয়ে করবে। নান্‌কুয়ার মতো ছেলে কী ওর যোগ্য? নিজের অফ্‌সর দাদাই যদি এমন করে, তাহলে আর দাদার বন্ধুর ভরসা কি? খুবই ভালো হয়েছে।

নান্‌কুয়া বলল। মনে মনে।

তারপর টুকিটাকি অনেক কথা হলো।

বুল্‌কি আর পরেশনাথ নান্‌কুয়াকে পেলে ছাড়তেই চায় না। মুঞ্জরীও না। কেবল মানিয়াই বিব্রত বোধ করে এ ছেলেটা এলে। এ ছেলেটা তার এতদিনের শুভবুদ্ধি, ন্যায়-অন্যায় বোধ, ভালো-মন্দ, বড়-ছোট সম্বন্ধে ধারণা সব ওলোটপালোট করে দিয়ে চলে যায়। যখনি ও আসে।

কিছুক্ষণ পর সাইকেলে উঠে, নান্‌কুয়া গোদা শেঠের দোকানের দিকে চলল।

নান্‌কুয়া জানে, এতক্ষণে কী কী ঘটেছে। মাহাতো অনেকক্ষণ বাড়ি পেঁৗছে গেছে। গোদা শেঠকে খবর দেওয়া হয়েছে নিশ্চয়ই।

ওর সাইকেলের ক্যারিয়ারে একটা চেন বাঁধা থাকে। সেটাকে ক্যারিয়ার থেকে খুলে নিয়ে হ্যান্ডেলের সঙ্গে ঝুলিয়ে নিল নান্‌কুয়া। গোদা শেঠের দোকানের সামনে এসে সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে ভিতরে ঢুকে বলল, সিগারেট। এক প্যাকেট।

কি খবর? নান্‌কু মহারাজ?

গোদা শেঠ কপট বিস্ময়ের সঙ্গে বলল।

গোদা শেঠের চোখ দেখেই নান্‌কুয়া বুঝল যে, খবরটা মাহাতোর কাছ থেকে গোদা শেঠের কাছে ইতিমধ্যেই পেঁৗছে গেছে। মাহাতোর একজন লোক দোকানের গদীতে শেঠের পাশেই বসে ছিল।

বিশেষ কোনো খবর নেই। চলে যাচ্ছে একরকম করে।

কয়লা খাদের কাজ বন্ধ বুঝি?

হ্যাঁ। স্ট্রাইক চলেছে।

সরকার কয়লা খাদগুলো নিয়ে নেবার পর এত মাইনে বাড়ালো আর কয়লার দাম সোনার দাম হয়ে গেলো, তবুও বুঝতাম যদি কয়লা ঠিক পাওয়া যেত। তবে বন পাহাড়ের হাটের বড় বড় সব মোরগাগুলো এখনতো ত' তোমাদেরই জন্যে। ভারত সরকারের জয় হোক। সরকার মালিক হওয়ার পরে সব সুবিধা তোমাদেরই। তোমাদের যে অনেক ভোট। হাঃ। আজকাল আমরা ত' হাতই দিতে পারি না কিছুতে। তবুও আবার স্ট্রাইক কিসের? এততেও তোমরা সন্তুষ্ট নও?

ওতো আমার ব্যাপার নয়। ইউনিয়নের ব্যাপার। ইউনিয়ন বলে, সব সময় লড়ে যেতে হবে। আমাদের অবস্থা আগের থেকে ভালো হয়েছে বলেই যে, আরো ভালো হতে পারবে না; এমন কথা কি আর কিছু আছে?

এত মাইনে বাড়িয়েও ত' খাদ থেকে বেশি কয়লা উঠছে না। সব সরকারী খাদই লস্ এ চলেছে।

নান্‌কুয়া বলল, তা ত' চলবেই। এতদিন মালিকবা যা চুরি করত, ট্যাক্স ফাঁকি দিত, তার কিছুটা অংশ কয়লা খাদের উন্নতির জন্যেও খরচ করত। এখন চুরি আরও বেড়েছে। তবে চুরি করছে অনেকে মিলে, অফসর, অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট, কেরানী সবাই। টিভি, ফিরিজ, মোটর সাইকেল, গাড়ি মদ আর মেয়েমানুষে খরচ হচ্ছে সেই টাকা। কয়লার দাম আর সস্তা হবে কি করে? খাদের মধ্যে নেমে কালি-ঝুলি মেখে আমরা কাজ করি বলেই তো আমরা একাই দায়ী নই। পুরো ব্যাপারটা অনেকই গোলমেলে। ভালুমারের দোকানের এই গদীতে বসে সুদে টাকা খাটিয়ে এই গর্তের মধ্যে থেকেই তো তুমি আর সব খবর রাখতে পারো না গোদা শেঠ। রাখোও না। তাই এসব আলোচনা তোমার অথবা আমার মতো কয়লা খাদের সামান্য মেটের না করাই ভালো। আমরা কতটুকুই বা বুঝি, কিসে কী হয়, তার?

আমি ত' মুখ্যু-সুখ্যু লোক, চিরদিনই কম বুঝি। তা যা শুনতে পাচ্ছি, তাতে তুমি যে অনেক বোঝো, বা বুঝছ আজকাল; তাতে কোনেই সন্দেহ নেই। তোমার মতো ছেলে দু-চারটে থাকলে ভালুমারের মতো অনেক বস্তির লোকের অবস্থা ভালো হয়ে যেত। মানুষ হয়ে উঠত তারা। কি বল?

খোঁচাটা নান্‌কুয়া বুঝল।

বলল, তা সত্যি। তবে, হবেও হয়তো একদিন। আমার মতো কেন? আমার চেয়ে সর্বদিক দিয়ে ভালো ছেলেরাই আছে, থাকবে সব গ্রামে। ক্রমে ক্রমে দেখতে পাবে।

সে আর দেখছি কই? এই আমাদের জুগ্নুর ব্যাটা হীরু! পুলিশ সাহেব হয়ে, অ্যাফিডেভিট্ করে নাম বদলে সিং হয়ে গেলো। ভাবা যায়? নিজের বস্তিতে এসে নিজের বাড়ি যায় নি, বাপকে চেনে নি, বোনকে মানে নি, তা এই-ই যদি ভালত্বর নমুনা হয়, তাহলে আর বস্তির ছেলেদের ভরসা কি?

নান্‌কুয়া, সিগারেটের প্যাকেটটা খুলতে খুলতে বলল, ভালোর নানা রকম আছে। হীরু ভাইয়া একরকম ভালো। সেই সব ছেলেরা অন্য রকম ভালো হবে। এটুকু বলেই, আর কথা না-বাড়িয়ে বলল, মানিয়া মেসোর হিসাবটা বের করো ত'?

গোদা শেঠ অবাক হবার ভাণ করে বলল, মানিয়ার হিসেবে তোমার কি দরকার?

নাঃ, কিছু টাকা পাঠিয়েছে মেসো; তোমাকে দেওয়ার জন্যে।

কেন? মানিয়ার কি পক্ষাঘাত হয়েছে? সে নিজে আসতে পারলো না?

অত কথা দিয়ে তোমারই বা দরকার কি? আমি ত' ধার করতে আসি নি তার হয়ে টাকা শোধ করতেই এসেছি। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। হিসেবটা বের করো।

গোদা শেঠ একটা খাতা বের করে বলল, অত তড়বড় করলে হবে না। গত মাসের

সন্দ কষা হয় নি। একটু বসতে হবে।

হিসেব করতে করতে গোদা শেঠ বলল, এখান থেকে তুমি যাবে কোথায়?

নান্‌কু উত্তর দিল না।

নান্‌কুয়া যাবে না কোথাওই। কারণ এখানেই ওর বিপদ কম। ও জানে যে, মাহাতো ওকে খুন করালে, জঙ্গলের নির্জন রাস্তায় এই বস্তির বাইরেই খুন করাবে। করে, লাশ গুম করে দেবে।

গোদা শেঠের এ প্রশ্নের তাৎপর্য নান্‌কুয়া আঁচ করে বলল, যাবো চিপাদোহরে। কাজ আছে। সেখানেই থাকব দিনকতক। কয়লা খাদের স্ট্রাইকটা মনে হচ্ছে মিটে যাবে দিন সাতেকের মধ্যে।

স্ট্রাইক মিটতে যে এখনও কমপক্ষে দিন পনেরো বাকি, তা নান্‌কুয়া জানে। এখানে পাগলা সাহেবের সঙ্গে একটু পরামর্শ করবে। বিপদে-আপদে উনিই নান্‌কুয়ার সব। নান্‌কুয়া ভাবছিলো যে, হীরুও ত পাগলা সাহেবের দাক্ষিণ্যেই মানুষ। তাকে রাঁচীতে কলেজে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখানো, অফ্‌সর হওয়ার পরীক্ষাতে বসানো, সবই ত তাঁরই করা! অথচ হীরু ভাইয়া এমন অমানুষ হলো কেন? নিজে বড় হয়ে কোথায় নিজের অত্যাচারিত, বঞ্চিত, বুভুক্ষু স্বজাতিদের ভালো করবে, তাদের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নেবে, তা নয়, নাম পাল্টে অন্য জাতে গিয়ে উঠলো? নিজের পূর্ব পরিচয়, নিজের বাবা-মা, নিজের গ্রামের লোককে এমন করে ধুলোয় ফেলে দিল? একে কি সত্যিকারের বড় হওয়া বলে? কে জানে? হীরু ভাইয়ার কথা হীরু ভাইয়াই বলতে পারবে।

গোদা শেঠ সুদ কষে বলল, নাও। দুশো তেরো টাকা হয়েছে সবশুদ্ধু। আরও পঞ্চাশ টাকা ধারের কথা বলে গেছে মানিয়া পরশুই, ফসল উঠলে শোধ করে দেবে বলেছে।

নান্‌কুয়া টাকাটা ফেলে দিয়ে বলল, খাতাটা দেখি। তারপর নিজে হাতে বুক পকেট থেকে বল-পয়েন্ট পেনে টাকার অঙ্কটা বসিয়ে দিয়ে দিল।

গোদা শেঠ-এর চোখে চেয়ে বললো, একশ টাকা দিয়ে গেলাম।

আমাকে বিশ্বাস হলো না বুঝি তোমার? নিজেই লিখলে?

যা দিনকাল পড়েছে। দেখলে না, জগুন্ ও'রাও তার নিজের ছেলেকে বিশ্বাস করে কিরকম ঠকল? আজকাল কাউকে বিশ্বাস না করাই ভালো।

ওঃ তাই-ই। গোদা শেঠ বলল। গোদা শেঠ নান্‌কুয়ার ঔদ্ধত্যে ক্রমাগতই চটে যাচ্ছিল। কিন্তু বানিয়ারা কখনও রাগ প্রকাশ করে না। রাগ হাসিমুখে চেপে রাখার ক্ষমতা যার যত বেশি, সে তত বড় বানিয়া।

এমনভাবে নান্‌কুয়া কখনও কথা বলে নি গোদা শেঠের সঙ্গে এর আগে। হয়তো কেউই বলেনি।

নান্‌কুয়া ভাবছিলো, যারা হাসতে হাসতে এখন তাকে খুন করাবার প্ল্যান আঁটছে, তাদের কাছে হাত কচ্‌লে, আমড়াগাছি করে লাভ কি? ওদের মানে না এমন কিছু লোকও যে আছে, যারা গোদা শেঠ বা মাহাতোকে তোয়াক্‌কা করে না এবং না করেও বাঁচে; বেঁচে থাকতে চায় এই কথাটাই ওদেরও জানান্ দেওয়ার সময় হয়েছে।

নান্‌কু বললো, আরও একটা কথা। আমি না বললে, মানিয়া মেসোকে তুমি আর একটা টাকাও ধার দেবে না। আর যে টাকাটা বাকী আছে সেটা একমাসের মধ্যেই আমি এসে শোধ করে দেব।

তোমাকে একটা খৎ লিখে দিই যে, তোমার কথাই মেনে চলব?

গোদা শেঠ কৃত্রিম বিনয় এবং বিদ্রূপের সঙ্গে নান্‌কুয়াকে বলল।

তার দরকার হবে না। আমার মুখের কথাই তোমার কাছে যথেষ্ট বলে মনে করি আমিই

নান্‌কু কেটে কেটে বললো। তারপর গোদার দু'চোখে তার দু'চোখ রেখে বলল, আশা করি, তুমিও তা-ই মনে করবে। কিছুক্ষণ চোখে চোখ রেখে, গোদা শেঠের জবাবের অপেক্ষা না করেই ; দোকান থেকে বাইরে বেরিয়ে সাইকেলে উঠে নান্‌কুয়া চলে গেলো। কাঁকুরে মাটির রাঙা ধুলোয় কিরকির শব্দ উঠলো।

নান্‌কুয়া চলে গেলে মাহাতোর লোকের দিকে চেয়ে, একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে তন্ময় ভাবে কান চুলকোতে চুলকোতে গোদা বলল, তাহলে? সব ত নিজের চোখেই দেখলে শুনলে? বোলো গিয়ে মাহাতোকে।

গোদার ডান চোখটা আস্তে আস্তে গুটিয়ে ছোট হয়ে এলো কান চুলকোবার আরামে। আর বাঁ চোখটা, পুরোপুরি বন্ধ। ঐ অবস্থায় গোদা বিড় বিড় করে বলল, কালকে দোকানে একটা নতুন হনুমান ঝাণ্ডা লাগাতে হবে। আর বজ্‌রঙ্গ্‌বলীর পুজোও চড়াতে হবে।

কত পুজো চড়াবে? পাঁচ সিকের?

গোদা শেঠ বলল, আরে না, না। পাঁচ সিকের পুজোয় এ-রাবণ বধ হবে না। মোটা পুজো চড়াব।



ঋজুদা মানুষটার শেকড় সম্বন্ধে আমরা প্রত্যেকেই অজ্ঞ। এখানের একজন মানুষও জানে না ঋজুদার দেশ কোথায়, বাড়িতে কে কে আছেন অথবা আগে উনি কি করতেন! কেউ জানতে চাইলে, উনি চিরদিনই এড়িয়ে যান। যদি কেউ বেশি বাড়াবাড়ি করেন তাহলে হাব-ভাবে বুঝিয়ে দেন যে, তিনি নিজের ব্যাপারে অন্যের বেশি ইন্‌কুইজিটিভ্‌নেস্‌ পছন্দ করেন না। এখানে ঋজুদা আছেন গত পনেরো বছর। আমি ভালুমারে বদলি হয়ে এসেছি হান্টারগঞ্জ-জৌরী-পর্‌তাপ্‌পুরের জঙ্গলের এলাকা থেকে, তাও বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। হাজারীবাগ জেলার হান্টারগঞ্জ-জৌরীতে ছিলাম দু'বছর মাত্র। তার আগে পালামৌ। পরেও পালামৌ। আমি আসার পর-পরই একদিন আমার ভালুমারের পূর্বসূরী নান্টু-বাবু ঋজুদার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন। প্রথম দিনই ঋজুদা আমাকে বলেছিলেন, দ্যাখো সায়ন, আমার কেবল দুটি শর্ত আছে। প্রথম শর্ত হল, আমার সম্বন্ধে আমি যত-টুকু বলি, বা জানাই, তার চেয়ে বেশি কিছু জানতে চেয়ো না। আর দ্বিতীয় শর্ত হল এই যে, সকাল দশটার আগে কখনও আমার বিনা অনুমতিতে আমার বাড়িতে এসো না।

শর্ত মেনে নিয়েছিলাম।

প্রথম শর্তের মানে বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় নি। দ্বিতীয় শর্তর মানেও প্রাঞ্জল। আমি স্বভাবতই ভেবেছিলাম যে, উনি দেরি করে ঘুম থেকে ওঠেন এবং হয়তো যোগাভ্যাস-টাস করেন। যাই-ই হোক এ-পর্যন্ত শর্ত দুটি মেনে চলেছি, অতএব কোনো ঝামেলা হয় নি। কিন্তু মাঝে মাঝেই ঋজুদা সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছে করে। মানুষটার অতীত বলতে কি কিছুই নেই? অতীতকে এমন করে লুকিয়ে বেড়ায় একমাত্র খুনী আসামীরা। নয়ত সাধু-সন্তরা। ঋজুদাকে ত এই দুইয়ের কোনো পর্যায়েই ফেলা যায় না। একজন পণ্ডিত অথচ অমায়িক, কোনোরকম এয়ার-হীন অতি উদার মানুষ। ধর্ম সম্বন্ধে গোঁড়ামি নেই, পুজোআচ্চাও করেন না। সব কিছুই খান, অনেক বই পড়েন, ভালুমারের প্রত্যেকের ভালো ভাবেন এবং ভালো করেন। বলতে গেলে, বনদেওতার থানের বিরাট জটাজুট-সম্বলিত প্রাগৈতিহাসিক অশ্বত্থ গাছটাকে যেমন এ গ্রামের সকলে একটি চিরাচরিত প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নিয়েছে, ঋজুদাকেও তেমনি। ঋজুদার বর্তমান অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখানের বড় ছোট কারো মনেই কোনো সন্দেহ বা জিজ্ঞাসা নেই। নীরব জিজ্ঞাসা থাকলেও, হুলুক্‌ পাহা-ড়ের গুহাগাত্রের ছবিগুলির মতোই ঋজুদার অতীতও সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে মূক, নিথর। যেভাবে ঋজুদা এ গ্রামের সকলের জন্য সবসময় ভাবেন ও করেন, বিপদে-আপদে অকাতরে অর্থব্যয় করেন, তাতে এ-কথা মনে হওয়ার বিন্দুমাত্র কারণ নেই যে, ঋজুদার অবস্থা স্বচ্ছল নয়। কিন্তু একথাটা একজন মহামূর্খের পক্ষেও বোঝা অসুবিধের নয় যে, এই স্বচ্ছলতার সামান্য এক অংশও ওঁর বাংলো সংলগ্ন এবং ভালুমার বস্তির শেষপ্রান্তে অব-

স্থিত জমি-জমার গে'হ্‌বাজরা ধান-মাকাই ইত্যাদি থেকে যা রোজগার হয় তা থেকে কখনোই আসতে পারে না। সেই ক্ষেত-খামারে যা হয়, তা থেকে নিজের সারা বছরের খাওয়ারট্‌কু রেখে, বাকিটা যারা চাষ করে তাদের মধ্যেই বিলিয়ে দেন। রথীদার যে অন্য কোনো স্‌ত্রে আয় নিশ্চয়ই আছে, বা ছিল তা বোঝা যায়।

নান্ট্‌বাব্‌ই একদিন ডালটনগঞ্জ থেকে এখানে বেড়াতে এসে বলেছিলেন, ডালটনগঞ্জে যে ব্যাঙ্কে রামদার এ্যাকাউন্ট আছে সেখানে তাঁর এক বন্ধ্‌ কাজ করেন। তাঁর কাছ থেকেই নাকি উনি শ্‌নেছেন যে, রথীদার নামে ঐ ব্যাঙ্কেই ফিক্সড্‌ ডিপোজিট আছে মোটা টাকার। প্রতিমাসে তাঁর কারেন্ট এ্যাকাউন্টে সেই ফিক্সড্‌ ডিপোজিটের স্‌দ জমা পড়ে। তার থেকেই খরচ চালান রথীদা। মাঝে মাঝে আমার যে একট্‌ গোয়েন্দাগিরি করতে সাধ হয় না এমন নয়। মান্‌ষটার রহস্যটা কি এবং সেই রহস্য এমন করে ল্‌কিয়ে রাখার চেষ্টাই-বা যে কেন তাও জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সমস্ত গোয়েন্দাদেরই যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তা হচ্ছে সময়। হাতে অফ্‌রন্ত সময় না থাকলে গোয়েন্দাগিরি করা যায় না। তাই আমার গোপন ইচ্ছাটা সফল করা হয়ে ওঠে নি।

রথীদা সেদিন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ও'র লোকে এসে তিত্‌লিকে বলে গেছিল যে, আমি জঙ্গল থেকে ফিরে যেন ও'র কাছে যাই এবং আজ রাতে যেন ওখানেই খাই। যেতে যেতে রাত হয়ে গেল। হ্‌ল্‌ক্‌ থেকে ফেরার পথে রাস্তাতে একটি কাল-ভার্ট ভেঙে ছিল। আমাদেরই অন্য কোনো ট্রাক ভেঙে থাকবে, তাই, ট্রাক থেকে কুলিদের নামিয়ে হাতে হাতে জঙ্গল এবং মাটি কেটে ডাইভার্সন তৈরি করে তবে ট্রাক পার করা গেল। ধ্‌লোতে গা-মাথা একেবারে ভরে গেছিল। বাড়ি ফিরে চানটান করেই রথীদার কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি, নান্‌কুয়া বসে আছে।

আমাকে দেখেই রথীদা বললেন, শ্‌নেছিস নাকি? নান্‌কুয়া ত এদিকে বেশ গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে আছে।

কী রকম?

মাহাতোকে মেরেছে। গোদা শেঠের দোকানে মানিয়ার ধারের টাকার অনেকখানি শোধ করে দিয়েছে। মনে, হি হ্যাজ থেনা দ্যা গন্ট্‌লেট্‌ ট্‌ দিজ গাইজ। এর পর কী হবে, বা হতে পারে; তা অন্‌মান করা শক্ত নয়। কি বলিস?

বললাম, তা ঠিক।

নান্‌কুয়া কাল কিংবা পরশ্‌ খাদে চলে যাচ্ছে। ওকে বলেছি, কয়েক মাস আর এদিকে যেন না আসে। কিন্তু কথা শ্‌নছে না ও।

নান্‌কুয়া মেঝেতে বসে ছিল, কার্পেটের ওপর। আমার দিকে চেয়ে ও বলল, বাপ-দাদার গ্রামে ক'টা ঘেয়ো কুকুর আছে বলে আমি কোন দ্‌ঃখ আমার নিজের গ্রাম ছাড়তে যাব? তাহলে ত ওরা আরও পেয়ে বসবে। আর ভাববে নান্‌কু ও'রাও ওদের ভয়ে পালিয়ে আছে। পালাতে হলে, ওরাই পালাক। নান্‌কুয়া পালায় না।

ওরে গাধা! যারা য্‌দ্ধ করতে জানে, এমন কি প্‌থিবীর বড় বড় সেনাপতিরাও পালাতে জানে। সময়মত পালিয়ে যাওয়া বা পিছ্‌ হটে যাওয়াটাও য্‌দ্ধের একটা অঙ্গ, স্ট্র্যাটেজী। সাময়িকভাবে পালিয়ে বা পিছ্‌ হটে গেলেই যে হার হলো এমন মনে করা ভুল। তাতে অনেক সময় জিতটাই পোক্ত হয়। রথীদা বললেন।

নান্‌কুয়া হাসল। বলল, আমি ওসব জানি না। আমি ত বড় সেনাপতি নই, ছোট সেনাপতি।

রথীদা নান্‌কুকে শ্‌ধোলেন, গোদা শেঠের দোকানে মানিয়ার আর কত ধার আছে রে?

একশ কত টাকা যেন।

টাকাটা আমি তোকে দিয়ে দিচ্ছি। তুই এখান থেকে যাওয়ার আগেই শোধ করে দিবি। আর মানিয়াকে বলে দিয়ে যাবি যে, এর পরেও কোন হাঙ্গামা হলে যেন ও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দেয়।

নান্‌কুয়া বলল, আচ্ছা।

রথীদা আমাকে বললেন, তুই নিশ্চয়ই শুনেছিস, হীরু কি করেছে? নাম পাল্টেছে অ্যাফিডেভিড্ করে। জাতে উঠেছে। ভালুমারে এসেও নিজের মা-বাবা ভাই-বোনের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে নি।

সে কি? আমি ত জানি না। আমি ত সারাদিন কুপে থাকি। এখানের কম খবরই আমার কাছে পৌঁছয়। তিত্‌লিরও ত সারাদিন কাজে-কর্মেই কাটে। ও-ও খবর রাখে কম।

তাহলে আর বলছি কী? আমার সঙ্গে ও দেখা করতে এসেছিল। পাঁচ মিনিটের জন্যে। কিন্তু কেন জানিস?

কেন?

রথীদা অন্যদিকে মুখ করে বললেন, ওরা বন্ধুর জন্যে হুইস্কী চাইতে এসেছিল। অবাক হয়ে বললাম, বলেন কি?

দু'বোতল বেশি ছিল আমার কাছে। দিয়ে দিয়েছিলাম। ও যে জগুনুর সঙ্গে বা ভাইবোনের সঙ্গে দেখা করে নি তাও ত জানলাম নান্‌কুয়ার কাছ থেকেই। জগুনু নাকি মানিয়াকে দুঃখ করে বলেছে যে, পাগলা সাহেব আমার ছেলেটাকে মানুষ করতে গিয়ে এতবড় একটা জানোয়ার করে তুলল! এর চেয়ে আমার ছেলের লেখাপড়া না শেখাই ভালো ছিল।

বললাম, আপনি তাহলে সত্যিই ভুল লোককেই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন; কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষায় বসিয়েছিলেন। সে যদি বড় হয়ে ফিরে এসে নিজের জাতের মানুষ, নিজের গ্রাম, নিজের আত্মীয়-পরিজনের জন্যে কিছুমাত্রই না করে; তাহলে সেই বড় হওয়ার মানে কি?

নান্‌কুয়া বলল, গ্রাম বড় না হলে, গ্রামের মানুষকে টেনে তুলতে না পারলে দেশ কি শুধু শহরের বাবুদের ভালো নিয়েই আগে বাড়তে পারবে? সেই বড় হওয়া কি বড় হওয়া? গ্রাম বাদ দিয়ে এদেশের থাকে কি?

বোঝাই যাচ্ছিল যে, হীরুর ব্যাপারে রথীদা প্রচন্ড শক্‌ড হয়েছিলেন। বললেন, আমি সে কথাই ভাবছি। হীরু আর ওর বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে আমার সঙ্গে রাতে খেতে বললাম একদিন, তা পর্যন্ত এলো না। পাছে আমার কথাবার্তায় ওর বন্ধুর সামনে ওর ইমেজটা নষ্ট হয়। বুঝলি নান্‌কুয়া, আমি যদি বিয়ে করতাম, তবে হীরুর মতো বা তোর মতোই আমারও ছেলে থাকত। তোরাও তো আমার ছেলেই। হীরু বলছিল, ওরা একটা জরুরী এনকোয়ারীতে এসেছে। এই বন-পাহাড়ে নাকি সিংভূম ডিস্ট্রিক্ট থেকে কিছু নকশাল ছেলে এসে লুকিয়ে আছে। তারা নাকি এই অঞ্চলের গ্রামের অল্পবয়সী ছেলেদের মাথা খাচ্ছে। গোপনে মিটিং করছে জঙ্গলে। অস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছে। শ্রেণীশত্রু কারা, সে সম্বন্ধে জ্ঞান দিচ্ছে। হীরুদের ইনফরমেশান্ এইই যে, এই সব ঘুমন্ত গ্রামেও নাকি সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম শুরু হবে শীগ্‌গিরই। সেই সব কারণে ওরা তদন্তে এসেছে পাটনা থেকে। সময় ছিলো না নাকি একেবারেই।

নান্‌কুয়া মুখ নিচু করেই বলল, হীরু ভাইয়া নিজেই ত সবচেয়ে বড় শ্রেণীশত্রু। বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, নিমকহারাম। যে নিজের গ্রামকে ভুলে যায়, মা-বাবাকে ভুলে যায়, চাকরির ভারে, ঘুষের টাকার গরমে যে বামুন-কায়েতের মেয়ে বিয়ে করে জাতে উঠতে

চায় তার মতো শ্রেণীশত্রু আর কে আছে? আমরা আগে কখনও বড় হবার, দশজনের একজন হবার সুযোগ পাই নি। যখন সুযোগ পেল কেউ কেউ, তারা অমনি যারা এতোদিন আমাদের বঞ্চিত করেছে, মানুষ বলে মনে করেনি তাদের দলেই ভীড়ে গেল।

রথীদা একটা হুইস্কী ঢাললেন গ্লাসে।

বললেন, খাবি নাকি একটা? বড় ঠান্ডা পড়েছে আজকে।

নাঃ জর্দা পান রয়েছে মুখে। আমার ঠাণ্ডা লাগে না।

তুই যে দিলেও খাস্ না, এটা আমার খারাপ লাগে। মনে হয়, তুই এই ব্যাপারে আমাকে ছোট জাতের লোক বলে মনে করিস।

আমি হেসে উঠলাম। নান্কুও।

আজকাল এ সব খেলেই ত বড় জাতের বড় মাপের বলে গণ্য হয় সকলে। রথীদা আপনি উল্টোটাই বললেন। আমি ছোট, ছোটই থাকতে চাই।

রথীদা বললেন, তথাস্তু! তুমি তাই-ই থাকো।

আত্মমগ্ন হয়ে রথীদা বললেন, এই জাত-পাত করেই দেশটা জাহান্নমে গেল। কি বলিস? এমন একটা দেশ! সোনার দেশ! কতকগুলো মিছিমিছি কারণ কিছুতেই এগোতে পারছে না। অক্টোপাসের মতো এইসব কারণগুলো পা জড়িয়ে আছে। এগোবে কী করে? আরও একটা ব্যাপার আছে। গভীর ব্যাপার। যে সব অফিসারদের তৈরী করছেন সরকার দেশ চালানোর জন্যে, তাঁদের ট্রেনিং-এর জন্যে মুসৌরীতে ইনস্টিট্যুট আছে। সেই ইনস্টিট্যুটে যে রকম শিক্ষা দেওয়া হয় তা, প্রায় সাহেবী আমলের শিক্ষারই অনুরূপ। তাঁরা কাঁটা চামচে খান। লাউঞ্জ স্যুট পরে মদের গ্লাস হাতে টোস্ট প্রোপোজ করা শেখেন সেখানে। হীরুও শিখেছে নিশ্চয়ই। দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। কিন্তু কোনো নেতা বা সরকারী আমলার শিকড় রইল না আর দেশের গভীরে। একমাত্র লালবাহাদুর শাস্ত্রী ছাড়া পুরোপুরি ভারতীয় পটভূমির কোনো লোক প্রধানমন্ত্রীই হলেন না আজ পর্যন্ত। যাঁরা হলেন, তাঁরা নামেই ভারতীয়, দেশের গরীবদের সঙ্গে, মাটির কোনো যোগাযোগই ছিল না তাঁদের। দেশটা চালানোর ভার এখনও সাহেবী-ভাবাপন্ন, ইংরিজী-শিক্ষিত, পশ্চিমী ভাবনায় দীক্ষিত কিছু লোকের হাতে। তাদের নিজেদের শিকড়গুলি যত দিন দেশের মাটিতে গভীর ভাবে না ছড়িয়ে যাচ্ছে, তারা এই দেশ শাসন করবে কী করে?

নান্কু এবং আমি সমস্বরে বললাম ঠিক।

বললাম, দেশটা ত ভালোই রথীদা। দেশের লোকেরাও ভালোই ছিল। এই অসৎ, ভন্ড, পাজী নেতাগুলোই দেশটাকে চোরের দেশ বানিয়ে তুলল। ভণ্ডামির কম্পিটিশান্ লাগিয়ে, গণতন্ত্রকে একটা ফাল্তু বুলি করে তুলল এই তিরিশ বছর। এই শালারাই দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু। কাগজে বক্তৃতা ঝাড়ে প্যারালাল ইকনমি আর কালো টাকার সমস্যা সম্বন্ধে। কালো টাকা তৈরি করল কারা? তিরিশ বছর আগে ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলালে দেশে স্মাগলার আর ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের এমন মোচ্ছব লাগত না। নেহরু বলেছিলেন যে, ঝোলাবেন। যত কালো টাকা দেশের নেতাদের আর কিছু সরকারী আমলাদের কাছে আছে, তার কণামাত্রও বোধহয় নেই অন্যদের কাছে। অথচ চোখ রাঙায় সবচেয়ে বেশি তারাই।

রান্নার লোকটিকে ডেকে রথীদা শুধোলেন, রান্নার কতদূর?

সে বলল, হয়ে এসেছে।

জানিস সায়ন, আজ নান্কু হাট থেকে সবচেয়ে বড় মোরগটা কিনে এনেছে আমার জন্যে।

নান্‌কুর দিকে ফিরে বললেন, কি রে? বল্‌ নান্‌কুয়া?

নাঃ। বলল নান্‌কুয়া। তারপর বলল, চিপাদোহরের গণেশ মাস্টারবাবু এসেছিলেন গাড়ুর হাটে। সস্তায় মুরগী কিনবেন বলে। সবচেয়ে বড় মোরগটা ও'রই কেনার ইচ্ছা ছিল। দরও দিয়েছিলেন ভালই। কিন্তু আমার জেদ চেপে গেল।

আমার দিকে চেয়ে নান্‌কু হেসে বলল, বুঝলে, বাঁশবাবু। তোমরা এই বাবুরা, চিরদিনই আমাদের চোখের সামনে থেকে যা কিছু ভালো সবই কিনে নিয়ে গেছ। ছিনিয়ে নিয়ে গেছ যা-কিছুই আমাদের ভালোবাসার। সময় বদলাচ্ছে, বদলাবে। হাসতে হাসতে আবার বলল, বুঝলে, তাই আমি দর চড়িয়ে দিয়ে মাস্টারবাবুর হাত থেকে কেড়ে নিলাম মোরগটা। মাস্টারবাবুর মুখটা যদি দেখতে তখন!

রথীদা হো হো করে হেসে উঠলেন।

হাসিটা ভালো লাগলো না আমার। ভাবছিলাম, পৈতৃক রোজগারের ফিকসড্‌ ডিপোজিটের সুদের টাকায় স্বচ্ছল, হুইস্কী-খাওয়া রথীদা কোনোদিনও গণেশ মাস্টারের দুঃখটা বুঝবেন না! মধ্যবিত্ত, সাধারণ স্কুলে অল্প-স্বল্প লেখাপড়া শেখা আমরা যে এই কেরানিবাবুর দল, আজকে আমাদেরই সবচেয়ে বড় দুর্দিন। আমাদের পোশাকী 'বাবু' পদবীটাই রয়ে গেছে শুধু, বাইরে বেরোলে এখনও আমাদের ফর্সা, ইস্ত্রি-করা জামা-কাপড় পরে বেরোতে হয়। আমাদের মেয়েরা আব্রু রাখার জন্যে ন্যূনতম ভদ্র ও সভ্য পোশাক পরেন এখনও। বংশপরম্পরায় সাহিত্য ও সংগীতের সঙ্গে যোগসূত্র বাঁচিয়ে রাখতে এখনও বই এবং রেকর্ড কিনতে হয় একটা দুটো। ছেলেমেয়েদের এখনও স্কুলে-কলেজে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখাতে হয় আমাদের। নিজেরা খেয়ে কি না-খেয়ে। এবং এ সবই এই দুর্দশা ও কষ্ট, উঠতি-বড়লোক নান্‌কু বা পৈতৃক সম্পদে বড়লোক রথীদারা বুঝতে পারবেন না।

নান্‌কুয়া আমার দিকে চেয়ে হাসল। বলল, কি বাঁশবাবু? রাগ করলে?

না রে নান্‌কুয়া, ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আমরা বাবু বলে পরিচিত হলেও আসলে ত কখনই বাবু ছিলাম না! সরকারের, রেল কোম্পানীর, চা বাগানের বা কয়লাখাদের মালিকের বা বড় বড় ঠিকাদারের আমরা কর্মচারীমাত্র। চিরদিনই তাই-ই ছিলাম। আমরা না ঘর্‌কা না ঘাট্‌কা। না সত্যিকারের পুরানো বাবুরা আমাদের দুর্দশা বোঝে, না বুঝিস তোরা; এই নতুন বাবুরা। আজকে তোর মতো কয়লাখাদের একজন শ্রমিক বা চা-বাগানের একজন শ্রমিক যা রোজগার করিস একা, এবং সপরিবারে তো বটেই; তা গণেশ মাস্টারের বা আমার মতো বাবুর রোজগারের অনেকগুণই বেশি। তোরা যে বেশি রোজগার করিস, এটা আনন্দের। তোরা অনেক কষ্ট করেছিস অনেকদিন। কিন্তু আমাদের, এই মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্তদের অবস্থাটাও ভাববার। আমাদের জন্য কারুরই সমবেদনা নেই। আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছি, কৃষ্টিতে, শিক্ষায়, রুচিতে এবং জীবনেও। আমাদের কোনোই ভবিষ্যৎ নেই! আমাদের মতো মধ্যবিত্তরাই জানে তাদের অবস্থার কথা। আমাদের কথা নেতারা কেন ভাববে বল্‌? আমাদের আর ক'টা ভোট? এদেশে এখন ভোট যার, সব তার। তোদের কথা না ভেবে যে তাদের উপায় নেই! এখন দায়ে পড়েই ভাবতে হবে। ভুজুংভাজুং দিয়ে আর কতদিন চলবে?

রথীদা কিছুক্ষণ চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, তুই কিন্তু খুব উত্তেজিত হয়ে গেছিস। স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা ক্ষতিকর।

হাসবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না।

সায়ন, ইটস্‌ অ্যা ম্যাটার অফ পারস্‌পেকটিভ্‌। তোর একার কথাই তুই ভাবছিস। তুই ভাবছিস, তোর নিজের বা তোর কাছাকাছি লোকদের ভালোর কথা। একটু থেমে

বললেন, আমিও হয়তো তাই ভাবছি। কিন্তু যে-দেশের লোকে এখনও কান্দা-গেঁঠি খুঁড়ে খায়, শম্বরের সঙ্গে ভাল্লুকের সঙ্গে রেষারেষি করে বনে. কুল বা মহুয়া খেয়ে বেঁচে থাকে ; সে দেশের বৃহত্তম সংখ্যার কারণে তোর ও আমার স্বার্থ বা ভালো-মন্দ বিসর্জন দেওয়ার সময় কি এখনও আসে নি? ভেবে দ্যাখ, যেসব দেশ এগিয়েছে, তারা সকলেই তাই দিয়েছে।

চটে উঠে বললাম, শুয়োরের বাচ্চার মতো মানুষের বাচ্চা পয়দা হবে, একগাদা অশিক্ষিত, স্বাস্থ্যহীন, ভবিষ্যৎহীন মানুষ প্রতি মুহূর্তে জন্মাবে বলেই তার খেসারৎ দিতে হবে অন্য সকলকে? জন্মরোধ করানো হয় না কেন? যে মা-বাবা ছেলে মেয়েকে খাওয়াতে পারে না, তাদের ছেলেমেয়ে হয় কেন। আমি জানি কেন হয়। ঐ ভোট। বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কোন ইঁদুর। কোন্ পার্টি আছে এখন দেশে, যে দেশের ভালো চায়? তারা শুধু তাদের ভালো চায়। জন্মরোধ করতে গেলে ভোট যে বেহাত হয়ে যাবে। আর ভোট বেহাত হলে, গদীও বেহাত। তাতে দেশের যা হয় হোক, দেশ জাহান্নমে যাক্।

রথীদা চুপ করে থাকলেন।

নান্কুয়াকে বিচলিত দেখাল। কিঞ্চিৎ উত্তেজিতও।

কিন্তু নান্কুয়াই ঠান্ডা গলায়, শান্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, তুমি ঠিকই বলেছো বাঁশবাবু। সবচেয়ে বড় সমস্যা এটাই। আমি সেদিন পাগলা সাহেবকে বলেছি যে, আমরা সকলে চাঁদা দেব। সেই চাঁদায় ভালুমারে একটা ফ্যামিলী প্ল্যানিং-এর স্কুল খুলতে হবে। মেয়েদের সবচেয়ে আগে বোঝাতে হবে এর সুফলের কথা তুমি কি বল বাঁশবাবু? করলে কেমন হয়?

নান্কুয়ার চেয়ে আমি অনেক বেশি লেখাপড়া করেছি। শিক্ষিত সমাজেই আমার মুখ্যত ওঠা-বসা। তা সত্ত্বেও আমি অতখানি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম আর নান্কুয়া নিরুত্তাপ গলায় শান্তভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারল দেখে বড় লজ্জা লাগল। বললাম, খুবই ভালো। করো না, আমরাও চাঁদা দেব।

বাঁশবাবু! তুমি কিন্তু আমাদেরই একজন। মিথ্যামিথ্যি দূরে থাকতে চাইলে চলবে কেন? আমরা যারাই দেশকে ভালোবাসি, দেশের কথা ভাবি, তারা সকলেই একটা জাত! এতে কে ওঁরাও, কে কাহার, কে ভোগ্তা, কে মুণ্ডা, কে দোসাদ, কে চামার অথবা তোমার মতো কে মুখার্জী বামুন তাতে কিছুই যায় আসে না। তাছাড়া আমি একটা কথা বলব ? কিছু মনে করবে না বলো?

বলো।

না, আগে বলো যে মনে করবে না?

না।

অনেকক্ষণ আমার চোখের দিকে চেয়ে ও বলল, আমি তোমার চেয়ে কম ক্লাসে পড়েছি। তিত্লি আমার চেয়েও কম পড়েছে এবং আমরা দুজনেই এই জংলী গ্রামে বড় গরীবের ঘরে জন্মেছি বলেই মানুষ হিসেবে আমরা কি তোমার চেয়ে খারাপ? যে সুযোগ আমরা পাই নি, আমাদের যে সুযোগ দেওয়া হয় নি, তোমার মতো সাহিত্য পড়বার, গান শুনবার, ভালো ভালো বই পড়বার, সেই জন্যেই কি তোমরা আমাদের চেয়ে অন্যরকম? তোমার ছেলে যদি আমার মতো হতো, অথবা মেয়ে তিত্লির মতো, তাহলেই তুমি আমাদের দুঃখটা কোথায়, কেন তা বুঝতে পারতে। তুমি এবং তোমাদের মতো অনেকেই আমাদের মধ্যেই আছো অথচ তবু তোমরা আমাদের কেউই নয়। তোমাদের মন পড়ে

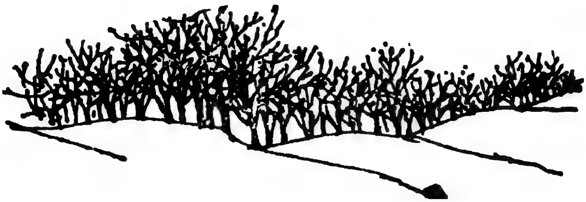
থাকে সব সময় কোলকাতায় বা অন্য শহরে। বিয়ের কথা হলে, কোলকাতা বা অন্য জায়গা থেকে তোমাদেরই সমাজের, তোমারই মতো শিক্ষিত মেয়ে আসে তোমাকে দেখবার জন্যে, তোমার সঙ্গে মেশবার জন্যে। তাই, তোমরা তোমরাই থেকে যাও। আমরা, আমরাই। আমরা তোমাদের বুঝি না; তোমরা বোঝ না আমাদের। আমরা এক হতে পারলাম না, এই সব মিছিমিছি কারণে। আর তোমাকেই বা কি বলব? আমাদের হীরুকে দেখছি না চোখের সামনে! ও কিন্তু আমাদের গর্বের একজন হয়েও আমদের ঘেন্না করছে এখন। দ্যাখো। যেই সুযোগ পেয়েছে, অমনি তোমাদের একজন হয়ে গেছে পুরানো স্লেট মুছে ফেলে। বেইমান, হারামী, শালা!

রথীদাকে খুব আপসেট্ দেখালো এই কথায়।

নান্‌কু আবার বলল, আসল কথাটা কি জানো বাঁশবাবু? সাহিত্যের খিদে, সংগীতের খিদে, সংস্কৃতির খিদের চেয়েও অনেক বড় একটা খিদে আছে। তার নাম পেটের খিদে। ছোটবেলা থেকে তুমি সে খিদেকে কখনও জানো নি। জানলে আমার সঙ্গে তর্ক করতে না তুমি। আমি এখন পেটভরে খেতে পাই। মোরগাও খাই মাঝে মধ্যে। কিন্তু যতক্ষণ ভালুমারের একজন মানুষের পেটেও সেই গন্‌গনে খিদে আছে, ততক্ষণে যাই-ই খাই না কেন, আমার কিছুতেই পেট ভরে না। আচ্ছা, বাঁশবাবু, তুমি তিনদিন একদম উপোস করে থাকো। তারপরই না হয় আমরা আবার আলোচনা করব সাহেবের বাড়িতে। এই বিষয়ে। একসঙ্গে তিনদিন কখনও না খেয়ে থেকেছো? একবার থেকে দ্যাখো।

রথীদা আরেকটা হুইস্কী ঢাললেন।

একটু হেসে বললেন, বেশ জমে গেছে তোদের তর্ক। কী বল্ সায়ন?



গজেনবাবু সেদিন যাওয়ার সময় অতর্কিতে প্রশ্ন করলেন, কি মশায়? আপনার ডাল গলল?

মানে?

অবাক হয়ে জিগ্‌গেস করেছিলাম।

কোলকাতা থেকে ডাল এলো, ডালটনগঞ্জ থেকে এত মোরগা-আণ্ডা সঙ্গে নিয়ে, সব কি বরবাদ হল? ডাল গলাতে পারলেন, কি পারলেন না?

আমি হেসে ফেলেছিলাম।

বলেছিলাম, জানি না।

জানি না মানে? এখনও খবর পান নি? তাহলে, কেস্ গড়বড়। ডাল গলার থাকলে, সে কোলকাতায় পৌঁছেই বালিশে উপুড় হয়ে শুয়ে নীল প্যাডে খস্‌স্ আতর মাখিয়ে এতক্ষণে লম্বা লম্বা চিঠি লিখে ফেলত অনেকগুলো। নাঃ মশাই! আপনি যে নাম ডোবালেন। নিজে যদি নাইই গলাতে পারলেন, ত আমাদের খবর দিলেন না কেন? আমি নান্টুকে পাঠাতাম। এই পালামৌর ফরেস্ট বাংলোয় কত বিদেশী মেমসায়েব নান্টুকে দেখে প্রেমে পড়ে গেলো। আর উনি তো কোলকাতারই মেমসায়েব।

সত্যিই লজ্জিত হয়ে বলেছিলাম, খুবই অন্যায় হয়ে গেছে।

ও'রা চলে যাওয়ার পর থেকেই সেই কথাই ভাবছি। গজেনবাবু মানুষটা বড় চাঁচাছোলা। সত্যি কথা, তা যতই নির্মম সত্যি হোক না কেন, মুখের ওপর একটুও না ভেবেচিন্তে এমন করে ছ'ুড়ে দেন যে, হজম করাও মুশকিল হয়।

আজ ট্রাকের সঙ্গে একটা বড় মোরগা পাঠিয়ে দিয়েছি গণেশ মাস্টারের জন্যে। খুব বড় মোরগা। বাপী ও বাপীর মাও এখনও ওর বাড়িতেই আছেন। অন্য দু-একজনকেও খেতে বলে দিতে পারবে গণেশ। যে মোরগাটা, নান্‌কুয়া ওর হাত ছিনিয়ে কিনে এনেছিলো সেটা খেয়ে গণেশকে একটা বড় মোরগা পাঠাবো বলে ঠিকই করে রেখেছিলাম।

নান্‌কুয়া ছেলেটা ভালো। তার দুটো চোখ সব সময় জ্বলজ্বল করে। কী যেন জ্বলে সব সময় ওর চোখে। বেশিক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না চোখ দুটোতে। নান্‌কুয়ার সেই কথাটা নিয়ে গত কয়েকদিন অনেকই ভেবেছি। এ কথাটা সত্যি যে, জন্মাবার পর থেকে খিদে পাওয়া সত্ত্বেও খেতে পাই নি এমন কখনই হয় নি জীবনে! যদিও বড়লোক কখনই ছিলাম না। তিতলির কারণে এই বনবাসেও আমার সাধ্য নেই যে, একদিনও কিছু না খেয়ে থাকি। কপালে হাত দিয়ে জ্বর এসেছে কি আসে নি পরীক্ষা করার পর জ্বর এলেও কিছু না কিছু খেতেই হবে। তাই মাঝে দুদিন যখন হুলুক্-এর ওপরের ক্যাম্পেই কাজের চাপে থাকতে হয়েছিল, তখন ইচ্ছে করে একদিন শুধুই জল খেয়ে ছিলাম। বড়ই কষ্ট! পরদিন সকালেই ক্যাম্পের কুলীকে বলে এক থালা যবের ছাতু আনিয়ে নুন কাচালংকা দিয়ে খেয়ে তবে বাঁচি। তিনদিন না খেয়ে থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে নি। একদিনেই খিদের জ্বালা কাকে বলে তা মর্মে মর্মে বুঝেছিলাম।

দেশ-টেশ, জনগণ, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি এসব আমার বিষয় নয়। আমি কবিমনের মানুষ। বাঁশবাবু হয়েই বাকি জীবনটা এই উদার অসীম পরিবেশে কাটাতে পারলেই আমি খুশি। আমার দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হবে না। সেসব করার ইচ্ছাও নেই। তবে, কেউ নতুন কিছু ভাবছে বা করছে দেখলে ভাল লাগে।

ট্রাক বিদায় করে দিয়ে এসে গরম জলে চান করেছি ভাল করে। তিতলি ধোওয়া পাজামা ও পাঞ্জাবি এবং বাড়িতে যে আলোয়ান জড়িয়ে থাকি, তা রেখে গেছে খাটের ওপর। জামা কাপড় পরে ইজিচেয়ারে বসেছি। তিতলি চা দিয়ে গেছে।

চায়ের গ্লাসটা হাতে নিয়েই জিগ্গেস করলাম, কি রেঁধেছিস?

ডিমের ঝোল আর ভাত। আজ ত সারাদিন ভাত খাওয়া হয় নি।

অন্যমনস্ক গলায় বললাম, না।

কয়েকদিন হল একটু অন্যমনস্কই আছি। ছোট-মামা ছোট-মামীর কাছ থেকেও কোনো চিঠি এল না দেখে, মাঝে মাঝেই বড় দুর্ভাবনায় পায় আমাকে। নিরাপদে সকলে কোলকাতায় পোঁছেছিল ত? নারাণ সিং-এর সঙ্গে পরে দেখা হয়েছিল। তার কাছ থেকে খবর পেয়েছিলাম যে, সে রাঁচীতে ভালোমতই পোঁছে দিয়েছিল ওঁদের এবং ট্রেন ছাড়া অবধি অপেক্ষাও করেছিল। অসুখ-বিসুখ করল কি কারও? জিন-এর কিছু হল? কি জানি? এই জংলী গর্তে বসে, ভেবে ভেবে আমি আর কী করতে পারি?

এমন সময় তিতলি বলল, ভেবেছিলাম আজ পোলাউ আর মাংস রান্না করব। এমন একটা ভাল দিন আজকে।

চায়ে চুমুক দিয়েই, ওর দিকে তাকালাম।

ভাল দিন মানে?

খুবই ভাল দিন। তিতলি বলল।

একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, চিঠি এসেছে আজ অনেকগুলো। একসঙ্গে অনেকগুলো চিঠি।

ধীরে সুস্থে চায়ের গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রেখেই যেন উত্তেজনার কোনোই কারণ ঘটে নি এমন ভাবে বললাম, এতক্ষণ দিস নি কেন? আন্ শীগগিরী।

আমি ভীষণরকম উত্তেজিত হব আশা করেছিল নিশ্চয়ই তিতলি। ও কেমন ব্যথিত, অবাক চোখে তাকাল আমার দিকে। তারপর নিজের বুকের মধ্যে থেকে, ব্লাউজের মধ্যে রাখা চারটে চিঠি একসঙ্গেই বের করে দিল আমায়। চিঠিগুলো গরম হয়ে ছিল ওর বুকের উত্তাপে। তাড়াতাড়ি উল্টে-পাল্টে দেখলাম। একটি ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়ামের নোটিশ। অন্যটি আমার এক বন্ধু লিখেছে দীঘা থেকে। আরেকটি ভারী চিঠি। কোলকাতার একটি নামী সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে। গল্প পাঠিয়েছিলাম সেখানে। সম্পাদক ফেরত দিয়েছেন, অতি বিনয়ের সঙ্গে। আশাতীত ভদ্রতা!

অন্য সব চিঠি ফেলে রেখে প্রথমে ছোট মামীমার খামটা খুললাম। সঙ্গে আর একটি চিঠি। মেয়েলী হাতের লেখা। অচেনা। ছোট্ট চিঠিতে ছোটমামীমা লিখেছেন,

৩০।১২
কলকাতা

স্নেহের বাবা খোকা,

কী লিখব আর কেমন করে লিখব তা ভাবতে ভাবতেই এতদিন চলে গেল। আমার ও তোর ছোটমামার লজ্জা রাখার জায়গা নেই। তোর সামনে আমরা বোধ হয় আর

কখনও বড়-মুখ করে কথা বলতে পারবো না।

আজকালকার মেয়েদের আদব-কায়দা কিছুই বুঝি না। খবর ত রাখিই না। বাণী ও রণও এ ব্যাপারে বিশেষ লজ্জিত। বাণীর চিঠিও সঙ্গে পাঠালাম।

জিন্ তোকে বিশেষই পছন্দ করেছে। অথচ বলছে যে, তোকে বিয়ে সে করতে পারবে না। কেন পারবে না, সে কথার জবাবও কেউই তার কাছ থেকে বের করতে পারে নি। তোর ছোটমামা ফেরার পথে রোশনবাবুর সঙ্গেও কথা বলেছিলেন তোর বদলির ব্যাপারে। তোর ছোটমামার মনে হয়েছিল যে জংলী জায়গা বলে জিন্‌এর হয়তো অমত হতে পারে এ বিয়েতে। তাতে রোশনবাবু বলেছিলেন যে, এই কারণে যদি বিয়ে বন্ধ হয়ে যায়, তবে তোকে ডালটনগঞ্জে অথবা রাঁচীতে বদলি করে আনবেন। ডালটনগঞ্জেও ভাল স্কুল আছে। বাচ্চা হলে, তার বা তাদের পড়াশুনায়ও কোনো অসুবিধে হতো না।

যাই-ই হোক। সবই কপাল। তোর মাকে কথা দিয়েছিলাম মৃত্যুশয্যায়, সেই কথা রাখা হলো না। আমার মন এতই ভেঙে গেছে যে, নতুন করে অন্যত্র যে চেষ্টা করব সেই জোরটুকুও আর পাচ্ছি না। তোর ছোটমামা জিন্-এর ব্যবহারে ভীষণই রেগে গেছেন। বলেছেন, ওর সঙ্গে এ জীবনে কোনো সম্পর্কই রাখবেন না। তাঁর বর্তমান মানসিক অবস্থায় তোকে কিছু আলাদা করে লেখা সম্ভব নয় বলেই লিখছেন না।

বাবা খোকা, তুই আমাদের ক্ষমা করিস্।

ইতি—তোর ছোটমামী

সঙ্গের চিঠিটি লিখেছেন বাণী।

সুচরিতেষু, ১১।১২

আমার বিশেষ কিছু লেখার নেই।

শুধু এইটুকু বলবার জন্যেই এই চিঠি লেখা যে, আমি যদি জিন্ হতাম তাহলে এমন সৌভাগ্য থেকে নিজেকে নিশ্চয়ই বঞ্চিত করতাম না। জিন্‌টা বড় বোকা! জিন্ বলেছে যে, সেও আপনাকে একটি চিঠি লিখবে।

তবে এখন নয়।

কখন লিখবে, সে নিজেই তা জানে। কিন্তু বলেছে যে, লিখবেই।

রণ কিছুতেই লিখতে পারছে না। তার বোনের অপরাধের জন্যে সে আপনার কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাইছে। আমাকেও ক্ষমা করবেন।

ভালুমারের চারটে দিন আমার সারা জীবনের এক অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। সত্যি!

ইতি—বাণী চ্যাটার্জী

অন্য চিঠিগুলো তখন আর পড়ার উৎসাহ ছিলো না।

হঠাৎ তিতলি বলল, আবার চা নিয়ে আসছি। চা'টা ত একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেল। লক্ষ্য করি নি যে তিতলি আমার মুখের দিকে চেয়েই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে কিছু বলার আগেই লঘু পায়ে ও ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি ছাত্রাবস্থায় কখনও কোনো পরীক্ষায় ফেল করি নি। যদিও দারুণ ভালো ছাত্র ছিলাম না। যে সব পরীক্ষায় বসার ইচ্ছা ছিল, আই-এ-এস, ডাবলু-বি-সি-এস সেই-সব পরীক্ষার বসার সুযোগ হয় নি। তার আগেই চাকরি নিয়ে পালামৌতে চলে আসতে হয়েছিল। কিন্তু যে সব পরীক্ষাতে বসার কথা ভেবেছি, সে সব পরীক্ষাতে কখনই অকৃতকার্য হবো ভাবি নি। বসতে পারলে, হয়তো অকৃতকার্য হতামও না। কিন্তু এটা একটা অন্য পরীক্ষা! এই পরীক্ষায় ফেল করার লজ্জা এবং গ্লানি বড় গভীর। আজ

এই শীতের সন্ধ্যেতে ভালুমারে আমার ডেরায় লণ্ঠনের আলোতে একা বসে থাকতে থাকতে এই মুহূর্তে হঠাৎ আমার লক্ষ লক্ষ বাঙালি মেয়ের কথা মনে হল। আমার মায়েরা, বোনেরা, আমার অপরিচিত লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্ত ঘরের বিবাহপ্রার্থী মেয়েদের কথা। সে সব অশিক্ষিত, আধা-শিক্ষিত, এমনকি শিক্ষিত মানুষেরাও আজ সিঙাড়া-রসগোল্লা খেয়ে বাড়ি বাড়ি পণ্য যাচাই করার মতো বিবাহযোগ্যা মেয়ে দেখে বেড়ান তাঁদের অপোগণ্ড ছেলেদের জন্য এবং অবলীলায় তাদের ফেল করান; তাঁরা কখনই, আমি আজ যেমন করে বুঝেছি, তেমন করে সেই ফেল-করা মেয়েদের মনের কথা বুঝতে পারবেন না।

এই সমাজ যে, কতখানি ঘৃণিত এবং পুরুষশাসিত সে কথা জিন্ আমাকে এমন ভাবে সব সাবজেক্টে ফেল না করালে কখনও হয়তো বুঝেই উঠতে পারতাম না।

দেওয়ার মতো পণের টাকা বাবার নেই বলে কোনো মেয়ে ফেল করছে, কেউ ফেল করছে তার গায়ের রঙ চাপা বলে, কেউ করছে ইংরিজী মিডিয়াম স্কুলে লেখাপড়া শেখে নি বলে। কত কারণে, আজকেও এই নব্য-সভ্যতার দিনেও প্রতি সন্ধ্যায় ঘরে, সিনে-মাতে, রেস্তোরাঁতে, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে এবং যেখানেই এই প্রাগৈতিহাসিক মেয়ে-দেখা প্রথা চলছে সেইখানেই কত শত মেয়ে যে অনুক্ষণ ফেল করছে।

জিন্ বোধ হয় উইমেনস্ লিব্-এ বিশ্বাস করে। নারী-স্বাধীনতার ইতিহাসে জিনই বোধ হয় প্রথম বঙ্গীয় পুরুষদের এক অপোগণ্ড প্রতিভূ আমার মতো অক্ষম, কুদর্শন, অতি-সাধারণ এই বাঁশবাবুর ওপরে প্রতিশোধ নিল। এদেশীয় মেয়েদের যুগ-যুগান্ত ধরে অপমানিত হওয়ার প্রতিশোধ! বেশ মেয়েটা! জিন্। বাঁশবনের শেয়াল-রাজার কল্পনার সম্রাজ্ঞী।

তিতলি আসার আগেই, আমি পার্সটা খুলে, তার ভিতর থেকে সেই সুগন্ধি মেয়েলি চুলটিকে বের করলাম। কী লম্বা চুলটি। পার্সের মধ্যে থাকায় এখন আর সে সুগন্ধ নেই। আস্তে করে লণ্ঠনের ওপরে রাখলাম। চুলটি কুঁকড়ে উঠে পুড়তে লাগল। পুড়ে গেল আমার চোখের সামনে আমার স্বপ্নের জিনের চুল। আমার দীর্ঘ-দিনের কল্পনার শোলার সাজ।

তিতলি চা হাতে করে এঘরে এসেই নাক কুঁচকে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। বলল, কি যেন পুড়ছে। বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোচ্ছে একটা। ইঃ!

আবার পুড়বে কি?

ও কিছুক্ষণ সান্ত্বনা দেবার ভাষায় নীরবে আমার চোখে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলল, কারো কপাল পুড়ছে।

বড় বেশি কথা বলছিস, তুই আজকাল। বড্ড বাড় বেড়েছে তোর। কপাল পুড়ছে মানে?

তিতলি লজ্জিত কিন্তু খুব খুশি গলায় বলল, তুমি মিছিমিছিই আমাকে বকছ, এই গন্ধটা আমার চেনা।

চেনা?

বিরক্ত এবং অবাক গলায় শুধোলাম, কিসের গন্ধ এটা?

হেসে বলল, নিশ্চয়ই কোনো মেয়ের কপাল পোড়ার গন্ধ। একমাত্র মেয়েরাই এই গন্ধ চেনে।

তারপরই জিভ কেটে বলল, তুমি আমার মালিক, আমি কি তোমার কপাল পোড়ার কথা বলতে পারি?

অপ্রতিভের মতো বললাম, তাড়াতাড়ি খাবার লাগা। আমার খিদে পেয়েছে। খেয়েই আমি ঘুমবো।

এক্ষুনি লাগাচ্ছি। বলেই ও চলে গেল।

আমি টেবিল থেকে 'ক্ষণিকা'টি তুলে নিলাম। রথীদার কাছ থেকে এই একটি পাওয়ার মতো পাওয়া পেয়েছি। মনটা অশান্ত হলেই, খুলে বসি। পাতা ওলটাতেই চোখে পড়ল "বোঝাপড়ায়"।

"মনেরে আজ কহ, যে
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।
কেউ বা তোমায় ভালোবাসে
কেউ বা বাসতে পারে না যে,
কেউ বিকিয়ে আছে, কেউ বা
সিকি পয়সা ধারে না যে।
কতকটা সে স্বভাব তাদের,
কতকটা বা তোমারো ভাই,
কতকটা এ ভবের গতিক,
সবার তরে নহে সবাই।
* *
মনেরে আজ কহ, যে
ভালো মন্দ যাহাই আসুক,
সত্যেরে লও সহজে।"

বই বন্ধ করে ভাবছিলাম যে, এই দাড়িওয়ালা ঋষিতুল্য মানুষটি না থাকলে বাঙালির যে কী দশা হতো। মনের মধ্যে এমন কোনো ভাবই তো আজ পর্যন্ত অনুভব করলাম না, যা আমার সেই অনুভবের মুহূর্তের অনেক আগেই নিজস্ব অনুভবের চেয়েও নিখুঁত এবং পূর্ণতর করে আমার জন্যে এবং আমার মতো অনেকের জন্যে লিখে রেখে যান নি মানুষটি!

তিতলি একটু পর খাবার লাগিয়ে ডাকল আমাকে। পিঁড়ি পেতে, সব কিছু বন্দোবস্ত করে, সামনে একটা ছোট জলচৌকির ওপর লণ্ঠনটা রাখল, যাতে আমার পাতে আলো পড়ে। আমি জোড়াসনে বসে খাচ্ছিলাম। তিতলি ওর বাঁ হাঁটুর ওপরে বাঁ হাতটি রেখে, বাঁ হাতের পাতা বাঁ গালে চেপে ধরে, ডান হাতে হাতা নিয়ে বসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। রোজই খাওয়ার সময় ও আমার সামনে বসে থাকে, কিন্তু রোজ ওর নজর থাকে আমার পাতের দিকে। কী লাগবে না লাগবে তার দিকে। আজ ও আমার মুখেই তাকিয়ে ছিল বাড়িতে ফেরার পর থেকে। আমার মুখে কি কোনো দুঃখ, কোনো আশাভঙ্গের ছাপ ফুটে উঠেছিল?

হঠাৎ তিতলি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, দিদিটা বড় বোকা!

আমার চোখ থেকে চোখ না সরিয়েই বলল, জিন্ দিদি।

বললাম, তোর তা দিয়ে কি দরকার? বোকা না চালাক সে, সে-ই বুঝবে। হঠাৎ তার কথা?

অভিমানের গলায় ও বলল, সব কিছুই লুকোও কেন তুমি বলোত? আমি না হয় নোকরানী; কিন্তু তোমার কাছে থাকি সব সময়, তোমার সুখ-দুঃখের খবর জানা কি দোষ আমার? তুমি যদি দুঃখ পেয়ে থাকো, তোমার অযোগ্য কেউ যদি তার বোকামির কারণে তোমাকে দুঃখ দিয়ে থাকে তা হলে তুমি মনমরা হও কেন?

তারপরই বলল, আমাকে কি তুমি চিরদিনই ছেলেমানুষ ভাববে? আমি কি বড়

হই নি এখনও? কিছুই কি বুঝি না? তোমার দুঃখে আমার দুঃখিত হওয়াও কি অপরাধের? যদি তোমার নোকরানির তাতে অপরাধ হয়ে থাকে, তা হলে মাপ করে দিও আমাকে। আরও কখনও তোমার সুখে সুখীও হবো না, দুঃখেও দুঃখী নয়। তোমরা তোমরা; আমরা আমরা। আমরা কি কখনো তোমাদের বুঝতে পারি? আমি এক গরীব কাহার নোকরানী। আর তুমি বাবু ব্রাহ্মণ, আমার মালিক।

খাওয়া থামিয়ে বললাম, তিতলি।

আমি ওকে বকি নি। ওকে প্রশ্রয়ও দিই নি। কিন্তু আমার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে তিতলি আমার মনের কথা বুঝতে পারল। আশ্চর্য! তিতলি আমাকে যতটুকু বোঝে, যেমন করে বোঝে, এ পর্যন্ত সত্যিই কেউ তা বুঝল না!

তিতলি পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল।

হঠাৎ ওর চোখের কোণা দুটি চিক্‌চিক্ করে উঠল।

আমার চোখে চোখ রেখেই ও বলল, তুমি নিজে আর কত কষ্ট পাবে আর আমাকেও যে কত কষ্ট পাওয়াবে তোমার কারণে, তা এক ভগবানই জানেন!

তারপরই বলল, আজ আর রাত করে পড়াশুনা করো না। খেয়েই শুয়ে পড়ো। কেমন?

হঠাৎ ও যেন আমার স্বর্গতা মা, আমার সুদূর-প্রবাসী বোন অথবা আমার কল্পনার স্ত্রী হয়ে গেল।

অজানিতেই মাথা নেড়ে বাধ্য ছেলের মতো বললাম, আচ্ছা!



পরেশনাথ আর বুলুকি শীতের দুপুরের বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শুধুই ঘুরে বেড়াচ্ছিল বললে ভুল হবে। আসলে আমলকী কুড়োতে গেছিল। উপরন্তু বুলুকির উদ্দেশ্য ছিল কুঁচফল আর কাঁকোড় সংগ্রহ করার। কুঁচফল এই সময় হয়। শুকনো পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে থোকা-থোকা উজ্জ্বল রঙের ছোট ছোট ফলগুলো। আগেকার দিনে স্যাকরারা কুঁচ দিয়ে সোনার গয়না ওজন করতো দেখেছি; সোনার বাট-খাবার সঙ্গে। বুলুকির বৈচিত্র্যহীন রুক্ষ বিবর্ণ জীবনে এই বিচিত্র বর্ণের ফলগুলোই একমাত্র বৈচিত্র্যের বাহন হয়ে আসে। রঙের বন্যায় ভেসে যায় ওর চোখ; ওর কিশোরী মন।

ভাইবোনে নিথর, ঝিম্ ধরা জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে আঁকাবাঁকা বনপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। বাঁদিকে একটা মাঠমত জায়গা। বহুদিন আগে ক্লিয়ারফেলিং হয়েছিল জঙ্গলে। সব গাছ, পরিষ্কার নিশ্চিহ্ন করে কাটা। হয়তো কখনও বনবিভাগ সেগুন কী শাল কী ইউক্যালিপটাস প্ল্যানটেশান করবেন। ইউক্যালিপটাস প্ল্যানটেশানের ওপর খুব রাগ দুই ভাই বোনের। ইউক্যালিপটাস গাছে পাখিরা বসে না, বাসা বাঁধে না, ইউক্যালিপটাস বনও তাই প্রাণহীন মনে হয়। পাখিরা আসে না। কারণ এই গাছে ফল হয় না; ফুল ধরে না, পোকামাকড় বাস করে না, তাই পাখিদের কোনো খাবারেরই সংস্থান নেই সেখানে। আর পাখিরা আসে না বলেই, বাসা বাঁধে না বলেই সাপ ও অন্যান্য প্রাণীদেরও কোনো ঔৎসুক্য নেই এই গাছগুলোর প্রতি।

পালামৌর এই বনে-পাহাড়ে একরকমের গাছ হয়, চিল্ বিল্ তার নাম। ভারি মসৃণ উজ্জ্বল তাদের কাণ্ড। প্রায় ইউক্যালিপটাসের মতোই। এই গাছগুলোকে মনে মনে উল্টো করে নিয়ে দেখলে গা শিরশির করে। প্রতিটি ডালের সংযোগস্থলকে মনে হয় নারীর জঘন এবং কাণ্ডগুলোকে মনে হয় উরু। কত বিচিত্র মাপের ও গড়নের হস্তিনী, পদ্মিনী, শঙ্খিনী নারীরা এইসব জঙ্গলে বৃক্ষীভূত হয়ে আছে যে, যদি কেউ তেমন করে চেয়ে দেখেন, তাহলেই তাঁর চোখে পড়বে।

পরেশনাথ আর বুলুকি অতসব বোঝে না। অতসব বোঝার বয়সও হয়নি ওদের। জঙ্গলই ওদের বাড়িঘর। তবুও জঙ্গল কখনোই একঘেয়ে লাগে না ওদের চোখে। প্রতি ঋতুতে প্রকৃতি ওদের জন্যে নতুন সাজে সেজে আসেন। যদিও খিদের জ্বালায় আর কান্দা-গেঁঠী খুঁড়ে খেতে খেতে ওদের সৌন্দর্যবোধ ভোঁতা হয়ে যাবে হয়তো ধীরে ধীরে এক-দিন, কিন্তু ওরা যেহেতু এখনও শিশু ও কিশোর, ওদের চোখ এখনও অনাবিল আছে। তাই এখনও সৌন্দর্য ওদের মনকে ঝর্ ঝর্ করে নাড়া দেয়, শরতের হাওয়ায় আমলকী

গাছের পাতার মতন।

হঠাৎ, পরেশনাথ চমকে দাঁড়াল, একটা চিতাবাঘ শীতের রোদের ঝলমল্ করা তার হলুদ-কালোয় জমকালো চামড়ার জামদানী শাল গায়ে, মাঠের সোনারঙা ঘাসে ঢেউ তুলে কোথায় যেন চলছে চুপিসারে। ওদের দেখে একবার চোখ তুলে তাকিয়েই নিজের পথে চলতে লাগলো বাঘটা। বুল্‌কির হাতে ধরা পরেশনাথের ছোট্ট হাতের পাতা ঘেমে উঠলো উত্তেজনায়। একটু পরই একদল ছোট-বড় মাদী শম্বর ঢাংক্ ঢাংক্ করে ডাকতে ডাকতে জঙ্গলের ঝরে-পড়া শুকনো পাতায় তাদের খুরে খুরে মচ্‌মচানি তুলে ডানদিকের পাহাড়ের কচি-শালের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাদের কালচে-লাল শরীর নিয়ে দৌড়ে গেলো। দুটো ময়ূর এই আলোড়নে ভয় পেয়ে কেঁয়া কেঁয়া রবে ভারী ডানায় ভর্‌ভর্ শব্দ তুলে উড়ে গেল পাহাড়ের গভীরে। তাদের নীলচে-সবুজ ডানায় লাল রোদকে চম্‌কে দিয়ে। আমলকীর গাছ খুঁজে খুঁজে বুল্‌কি আর পরেশনাথ একটা টিলার ওপর উঠে এল। ফলাভারাবনত আমলকী গাছে ছেয়ে আছে টিলাটা। চিতল হরিণের একটা দল একটু আগেই চরছিল এই টিলাতে ; আধকামড়ানো আমলকীতে ছেয়ে আছে জায়গাটা আর ওদের নাদি আর খুরের দাগে। চিতাটা নিশ্চয়ই এই চিতল হরিণের দলের পিছনেই গেছে চুপিসারে। এখানে আলোর বুকের মধ্যেই কালো। জীবনের উষ্ণতার একেবারে আলোকিত অন্তস্তলে অন্ধকার। মৃত্যুর শৈত্য।

টিলার ওপরে উঠেই পরেশনাথ অবাক হয়ে গেল। সামনে যতদূর চোখ যায় জঙ্গলের সবুজ গড়িয়ে গিয়ে মিশেছে আকাশের নীলে। একটা পাহাড়ী নদীর সাদারেখা দেখা যাচ্ছে দূরে। কত মাইল দূরে, তা কে জানে। আন্‌জান্, সুন-সান্নাটা নদী।

পরেশনাথ বলল, গড়িয়ে গিয়ে এই জঙ্গল কোথায় থেমেছে রে দিদি?

বাড়্‌কাকানা, করনপুরা, পান্নুয়ান্না টাঁড়ের দিকে। বিজ্ঞের মতো উত্তর দিল বুল্‌কি। আসলে ও-ও জানে না। বড়দের মুখে শোনা কতগুলো অসংলগ্ন নাম বলে গেল শুধু পরপর। তার ছোটভাই পরেশনাথের কাছে ও হারতে চায় না। সে যে দিদি!

বুল্‌কি নিচে দাঁড়াল, পরেশনাথ গাছে উঠে ডাল ঝাঁকাতে লাগল। পরেশনাথকে হনুমান বলে ভুল করে দূর থেকে হনুমানের দল হুপ্-হাপ করে ডেকে উঠল। টপা-টপ্ করে আমলকী ঝরতে লাগল নিচে। বুল্‌কি কুড়িয়ে কুড়িয়ে ঝুড়ি ভরতে লাগল।

এমন সময় পরেশনাথ হঠাৎ চিৎকার করে উঠল দিদি! দিদি!

পরেশনাথের ভয়ার্ত স্বরে চমকে উঠে বুল্‌কি চকিতে চারধার দেখে নিল বাঘ কি বুনো কুকুরের দল কি হাতি এসেছে ভেবে। কিন্তু নাঃ! কোথাও কিছু নেই। চারদিকের জঙ্গল যেমন অচঞ্চল, নিথর, তেমনই আছে। বুল্‌কি মুখ তুলে ওপরে পরেশ-নাথের দিকে তাকাল। পরেশনাথ আতঙ্কিত গলায় বুলকির দৃষ্টি আকর্ষণ করে গাছের ওপরের দিকে আঙুল তুলে বলল, তিত্‌লি। দিদি, লাল-তিত্‌লি। বুল্‌কি দেখল, একটা বড় লাল-প্রজাপতি আমলকী গাছের মাথার কাছে উড়ছে আর বসছে। পশ্চিমের রোদ পাখায় পড়াতে তার লাল রঙটাকে এতই লাল দেখাচ্ছে যে, তার দিকে তাকানো যাচ্ছে না। ওটাকে তিত্‌লি বলে বোঝাও যাচ্ছে না। অবাক হয়ে তিত্‌লি দেখল যে, পরেশনাথের হাত আলগা হয়ে আসছে গাছ থেকে! মুহূর্তের মধ্যে পরেশনাথ সড়্ সড়্ করে ডাল বেয়ে নেমে আসতে লাগল, তারপর যখন মাটি থেকে হাত ছয়েক উপরে তখন পরেশনাথের পাও আলগা হয়ে গেল, ধুপ্ করে পরেশনাথ নিচে পড়ে গেল—পাথুরে জমিতে। পড়েই, মাঈরে! বলে, অজ্ঞান হয়ে গেল।

বুল্‌কি ওর কোলে পরেশনাথের মাথাটা নিয়ে অনেকবার ডাকল, ভাইয়া ভাইয়া বলে। নাম ধরে ও বারবার ডাকল, পরেশনাথ, পরেশনাথ। কিন্তু পরেশনাথ সাড়া দিল না। চোখ

খুলল না। কী করবে ভেবে পেল না বুলকি। এই জঙ্গলে কোথাও জলও নেই একটু যে, চোখে-মুখে দেবে। ওর সাধ্য নেই যে একা ও পরেশনাথকে বয়ে জঙ্গলের বাইরে নিয়ে যায়। ওরা প্রায় এক ক্রোশ চলে এসেছে কুঁচফল, কাঁকোড় আর আমলকী খুঁজতে খুঁজতে গভীর জঙ্গলে। বুলকি আবার ডাকল ভাইয়া, ভাইয়ারে—এ-এ-এ। পরেশনাথ তবুও নিরুত্তর ; নিস্পন্দ।

ওপরে তাকিয়ে বুলকি দেখলো যে, সেই লাল তিতলিটা আমলকী গাছ ছেড়ে ওদের একেবারে মাথার ওপরে উড়ছে। ওপরে উঠছে ; নিচে নামছে।

ঠিক এমন সময় নিস্তব্ধ বনের মধ্যে কোনো মানুষের পায়ের শব্দ শুনলো বুলকি। টিলাব নিচে আঁকা বাঁকা বনপথে। সেদিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল ও। এদিকে বস্তির কেউই আসে না। এলে, একমাত্র আসে ফরেস্ট গার্ডরা। আমলকীর ঝুড়িশুদ্ধু ফরেস্ট গার্ডের সামনে পড়লে এই নিয়ে নতুন ঝামেলা বাধাবে ওরা, বুলকি তা জানে। সব আমলকী—এমন কি ঝুড়িটা দিয়েও হয়তো নিষ্কৃতি মিলবে না বুলকির। ভাগ্যিস্ বুলকি এখনও ছোট আছে। বুলকির বয়স তেরো হয়ে গেলেই আর মুঞ্জরী বুলকিকে একা একা জঙ্গলে আসতে দেবে না কখনও। এখনও বুলকি তা জানে না। ঋতুস্নাতা মেয়েদের অনেক ভয়, অনেক রকম ভয়, এই নিথর নির্জন বনে। সে সব ভয়, বাঘের ভয়ের চেয়েও বেশি ভয়াবহ। বনে-পাহাড়ের অসহায় সহায়-সম্বলহীন মেয়েদের যে কত-জনকে খাজনা দিতে হয়, কোনোরকম বাজনা ছাড়াই, তা এ সব অঞ্চলের যে-কোনো যুবতী ও একসময়কার যুবতী মেয়ে মাত্রই জানে। যৌবনের ফুল বনফুলের মতই বিনা-আড়ম্বরে দলিত হয় বনপথে, বিনা প্রতিবাদে।

ভয় মিশ্রিত কৌতূহলের সঙ্গে অপাপবিদ্ধা বালিকা বুলকি চেয়ে রইল পথের দিকে, আগন্তুককে দেখবে বলে। হঠাৎই বাঁকের মাথায় বুলকি দেখতে পেলো কাড়ুয়াকে। এক হাতে তার তীর ধনুক, অন্য হাতে দুটো পাটকিলে-রঙা বড় খরগোশকে কান ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে কাড়ুয়া চাচা।

টিলার উপরে বসে-থাকা বুলকিদের দেখতে পায় নি কাড়ুয়া। বুলকির গলার স্বরও নিশ্চয়ই শোনে নি। শুনলে তার আসার ধরনে বুঝতে পারত ও। বুলকির ধড়ে প্রাণ এল। জোরে ডাকলো, চাচা, এ কাড়ুয়া চাচা।

মানুষের গলা পেয়েই কাড়ুয়া অভ্যেস বশে মুহূর্তের মধ্যে সরে গেল জঙ্গলের আড়ালে। তারপর আড়াল থেকে বোধ হয় ভালো করে দেখে নিয়ে আবার বেরিয়ে এল। তারপর খরগোশ দুটো আর তীর ধনুক জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে রেখে দৌড়ে এল টিলার ওপরে।

বলল, কা বাত্? কা রে বুলকিয়া?

বুলকি সব বলল।

কোথায় লাল তিতলি? বলেই কাড়ুয়া সেই লাল প্রজাপতিটাকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথাওই আর তাকে দেখা গেল না। কোনো মন্ত্রবলে তৃতীয় মানুষের আগমনে তিতলিটা যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। চারধারে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। তিতলিটা সরে গেলেও তাকে দেখতে পাওয়ার কথা ছিল।

বুলকির গা ছম্‌ছম্ করে উঠল। ভয়ে হাত পা অবশ হয়ে এল।

কাড়ুয়া পরেশনাথের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ওকে ঝাড়ফুক্ করতে লাগল। ওর হাতে হাত ঘষল। দৌড়ে গিয়ে ধনুকটাকে নিয়ে ধনুকের ছিলা শোঁকাল তাকে। বেশ কিছুক্ষণ পর পরেশনাথ চোখ খুলল। চোখ খুলেই, ভয়ে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল। কাড়ুয়া পরেশনাথকে তুলে বসালো। পরেশনাথ চোখ বুজেই বলল, তিতলি!

তিতুলি! ভয়ে ওর মুখ তখনো নীল হয়ে ছিল। কাড়ুয়া বলল, ভয় কিরে পরেশনাথ? আমাকে এ বনের বাঘে-হাতিতেও ভয় পায়, আমি থাকতে তিতুলি কি করবে তোকে? পরেশনাথ বারবার মাথা নাড়ছিলো। জড়ানো গলায় বলছিলো, দেওতার ভর আছে। ওটা এমনি তিতুলি নয়। বহত খতরনাগ্। আমার মওত্ বয়ে আনবে ও। আমি স্বপন দেখেছি। আরেক দিনও এসেছিল এই তিতুলিটা সেদিন। বাঁশবাবু বাঁচিয়েছিলো আমাকে। সেবার আমাকে জলে ডুবিয়ে মারছিলো ও। আর আজকে গাছ থেকে ফেলে দিলো। শিউরে উঠে পরেশনাথ বলল, আমি আর কখনও জঙ্গলে আসবো না। কখনও না।

কাড়ুয়া বলল, পাগলামি করিস না। জংলী লোক আমরা, জঙ্গলই আমাদের জীবন, মা-বাপ। জঙ্গলে না এলে বাঁচবি কি করে? খাবি কি? তোর মন থেকে এই সব ভুল ভাবনা ঝেড়ে ফেল্। আমি ত একা একা রাতবিরেতে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। ক্রোশের পর ক্রোশ। কই কখনও ত আমি ভয়ের কিছু দেখিনি। যেখানে যেখানে ভয় আছে সে সব জায়গাই আমি জানি। সেদিকে যাইই-না। কিন্তু এখানে ভয়ের কি? ফাঁকা জঙ্গল। গাঁয়ের এক ক্রোশের মধ্যে। এ জঙ্গলে দেওতা কি দারুহা কেউ নেই। জিন্-পরীরাও নেই। জিন্-পরীরা চাঁদনী রাতে কোথায় খেলা করে, আমি জানি। তাদের আমি খেলতেও দেখেছি হোলির রাতে। তুই মিথ্যাই ভয় পাচ্ছিস। চল্ চল্ এবার ত হাঁটতে পারবি, যেতে পারবি তোরা একলা? আমলকীর ঝুড়ি এখানেই ফেলে রেখে যা না-হয়। আমি কাল পৌঁছে দেব তোমাদের বাড়িতে। নয়ত আজ রাতেই। তারপর হঠাৎ কাড়ুয়া রুক্ষ গলায় বলল, আর দ্যাখ্। কান খুলে শোন্, তোরা। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোদের আর আমার হাতে কী ছিল, তা যেন কেউই না জানে। তোদের বাবা মাও নয়। কেউ জানলে, বলেই, একটু চুপ করে থেকে ওদের দিকে একটা ভীষণ ভয়সূচক মুখভঙ্গী করে বলল, খুবই খারাপ হয়ে যাবে। মনে থাকে যেন। লাল-তিতুলির চেয়েও ভয়ংকর আমি। বুঝেছিস্।

বুল্কির হৃৎপিন্ড স্তব্ধ হয়ে গেল। মাথা নেড়ে জানালো, বুঝেছে।

পরেশনাথ মুখে কিছু বলল না। বিস্ফারিত চোখের ভাষায় জানালো যে, সেও বুঝেছে।

পরেশনাথ বুল্কির হাত ধরে ধীরে ধীরে ফিরে চলল সুঁড়িপথে তাদের বাড়ির দিকে।

কাড়ুয়া যে চোরা শিকার করে তা গ্রামের সকলেই জানে। দিনে তীর ধনুক নিয়ে বেরোয়, যাতে শব্দ না শোনে কেউ। রাতে যায় বড় শিকারের খোঁজে খোঁজে টুপী পরানো গাদা বন্দুক হাতে নিয়ে, হুম্মচুকে বারুদ গেদে তাতে ; দূর দূর গহীন জঙ্গলে, যাতে সেখান থেকে শব্দ না-ভেসে আসে ভালুমারে বা, অন্য কোনো বস্তিতেও।

কাড়ুয়া জানে যে, চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা। হাতে-নাতে কেউ কখনও ধরতে পারে নি আজ অবধি কাড়ুয়াকে। যেদিন কোনো ফরেস্ট-গার্ড বা অফি-সারের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যাবে কাড়ুয়ার, সেদিন কাড়ুয়া যে মাথা নীচু করে হাত-কড়া পরবে না একথাও ভালুমার বস্তির সকলে জানে। সে রক্ত কাড়ুয়ার নয়। কাড়ুয়া চাচা মানুষটা এমনতে নম্র, বিনয়ী, নির্বিরোধী। কিন্তু মনে প্রাণে ও বড় স্বাধীন, বেসামাল ; বেপরোয়া। মাথা সে একমাত্র নোয়াতে পারে এই বন-জঙ্গলেরই কাছে। কোনো মানুষের কাছে নয়। তাই এত কড়াকড়ি, এত ভয় সত্ত্বেও ও বন্দুক বা তীর ধনুককে ছাড়ে নি।

বুল্কির বাবা মানিয়া বলে, আমরা নেশা করি মহুয়ার। আর কাড়ুয়ার একটাই

নেশা। বারুদের গন্ধের নেশা। ফোটা-বন্দুকের বারুদের গন্ধেই ও একমাত্র বুঁদ হয়ে থাকে তাই অন্য কোনো নেশাই পেতে পারেনি ওকে। কাড়ুয়া চাচা জেলে যাবার আগে যারা জেলে পুরতে যাবে ওকে, তাদেরই মেরে দেবে চাচা. নইলে নিজেকেই মেরে ফেলবে। কাড়ুয়া চাচার লাশকে বন্দী করা গেলেও যেতে পারে, কিন্তু কাড়ুয়া চাচাকে কেউ হাত-কড়া পরাতে পারবে না এ কথা ভালুমার বস্তির ছেলেবুড়ো যেমন জানে; ফরেস্ট-গার্ডরাও জানে; তাই কাড়ুয়ার গতিবিধি সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারলেও ওকে কেউই ঘাঁটায় না। বরং ও যে পথে গেছে বলে জানতে পায় তারা, সেই পথ এড়িয়েই চলে। এ বনে বাঘ অনেক: কিন্তু কাড়ুয়ার মতো বাঘ একটাও নেই।

জঙ্গল থেকে বেরোতে বেরোতেই সূর্য পশ্চিমে হেলে এল। বুলকি আর পরেশনাথ যখন ওদের বাড়ির কাছে পেঁছিল তখন সন্ধ্যের আর দেরি নেই। পিঠছেঁড়া নীল ফ্রকটাতে শীত যেন ছুঁচের মতো বিঁধছে। পরেশনাথকে লাল-তিতলির ভয়টা তখনও আচ্ছন্ন করে ছিল। শীতের বোধ তার ছিল না। বেহুঁশ হয়ে পথ চলছিলো সে।

হঠাৎ বুলকি ও পরেশনাথ লক্ষ্য করল যে, ওদের ঘরের সামনে চার-পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে দূর থেকেই মাহাতোকে চিনতে পারল বুলকি। লম্বা লোকটা। দামী গরম পাঞ্জাবি পরে দাঁড়িয়ে আছে ওদের দিকে ফিরে। পরেশনাথ বুলকির ফ্রক ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন বাড়ি যাবার ইচ্ছা নেই ওর।

বুলকি শক্ত করে ওর হাত ধরল। এই আচ্ছন্ন অবস্থায় আসন্ন রাতের অনিশ্চয়তায় ছোট্ট ভাইকে একা ছাড়বার সাহস নেই আর বুলকির। এমনিতেই দেরি হয়েছে বলে মায়ের কাছে নির্ঘাৎ মার খাবে আজ! তাড়াতাড়ি করার জন্যে পরেশনাথের হাত ধরে বুলকি আবার সরগুজা ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করল।

সঙ্গে সঙ্গে মুঞ্জরী চেঁচিয়ে উঠল।

আসলে মুঞ্জরী ওদের পালিয়ে যেতে বলছিল।

কিন্তু বুলকি ভাবল, মা ওদের বকছে আবারও ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ওরা আসছে বলে। বুলকি আর ঘোরে-থাকা পরেশনাথ ওদের বাড়ির সামনে এসে পেঁছতেই সঙ্গে সঙ্গে মাহাতো তার একজন অনুচরকে বলল, ধর ও ছোকরাকে।

একটা তাগড়া লোক এসে পরেশনাথকে ধরল।

লোকটা বলল, বল্ তুই? কোথায় রেখেছিস টর্চটা।

মানিয়া কিছুই বলছে না দেখে, বুলকি অবাক হয়ে তাকাল তার বাবার দিকে। তাকিয়ে দেখল, বাবার নাক-মুখ মারের চোটে ফুলে গেছে। ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। কেবল তার মা মুঞ্জরী চোখে আগুন নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাহাতোর মুখের দিকে চেয়ে।

মাহাতো বলল পরেশনাথকে, এ্যাই ছোঁড়া সেদিন হাটে যখন আমি উবু হয়ে বসেছিলাম কাপড়ের দোকানে তখন তুই আমার পকেট থেকে টর্চটা চুরি করেছিলি। কোথায় রেখেছিস বল্?

পরেশনাথ বলল, আমি, আমি......।

লোকটা ঠাস্ করে প্রচন্ড এক চড় লাগাল পরেশনাথকে।

অন্য একটা লোক বলল, আমি তোকে নিতে দেখেছি টর্চটা। ছোট্ট লাল প্লাস্টিকের টর্চ তুই মাহতোর পকেট থেকে তুলে নিসনি?

মুঞ্জরী বলল, ছেলের বাপকে ত' তোমরা অনেকই মারলে ছেলের অপরাধে, অতটুকু ছেলেকে আর কেন? ছেড়ে দাও। চুরি যে করেছে ও, তার প্রমাণ কি? চুরি করা জিনিস কি তোমরা পেয়েছো? মিথ্যা অপরাধ দিয়ে কি হবে? অতটুকু একটা ছেলে!

মাহাতো ঘুরে দাঁড়িয়ে মুঞ্জরীকে একটা অশ্লীল গাল দিয়ে লোকগুলোকে বলল, এ্যাই। তোরা যা ত' ঘরের মধ্যে। খুঁজে দ্যাখ্ সব জিনিসপত্র। কোথায় লুকিয়ে রেখেছে টর্চটাকে? বের কর। তারপর দেখছি আমি বিচ্ছুর বাচ্চাকে।

মাহাতোর কথা শেষ হতে না হতেই লোকগুলো মানি ও মুঞ্জরীকে কিছু না বলেই ঘরের ভিতরে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করে সেই ছোট্ট কল্পনার চর্টটা খুঁজতে লাগল। হাঁড়ি-কুড়ি, টিনের তোরঙ্গ, কাঁথা-বালিশ, সব লাথি মেরে, লাঠির বাড়ি মেরে ছত্রখান্ করে দিল। পরেশনাথের সম্পত্তি বলতে একটা মরচে-পড়া টিন ছিল ডালডার। টিনের উপর হলুদ-সবুজে লেখা 'ডালডা' নামটাও উঠে গেছে। একটা লোক সেই টিনটা উপুড় করে ঢাললো মেঝেতে। ঢালতেই দুটো কাঁচের মারবেল, টিনের বাঁশি, একটা ব্লেড, দু-টুকরো হয়ে-যাওয়া একটা চামড়ার বেল্ট, টুকিটাকি, বড়দের কাছে মূল্যহীন কিন্তু পশে-নাথের মতো একটি শিশুর কাছে মহামূল্যবান নানা জিনিস এবং একটা লাল রবারের বলের সঙ্গে...

বুলকি অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে দেখল, একটা লাল ছোট্ট প্লাস্টিকের টর্চ। ওরা হৈ হৈ করে বাইরে এসে মাহাতোকে বলল, এইটা? এইটা আপনার টর্চ? মাহাতোর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, হ্যাঁ! এইই ত! কোথায় ছিল? লোকটা বলল, ঐ ছোকরার সম্পত্তির মধ্যে। ডালডার টিনের মধ্যে।

মাহাতো দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ছোকরাকে বাঁধ ঐ আমগাছের সঙ্গে।

মুঞ্জরী, মানি ও বুলকিও পরেশনাথের সম্পত্তির মধ্যে ঐ টর্চটি দেখে বড় আশ্চর্য হয়ে গেছিল। প্রথমটা বোকা বনে চুপ করে ছিল, ওরা সকলে।

মুঞ্জরী বলল, চোর যখন ধরা পড়েছে তখন কোতোয়ালিতে নিয়ে যাও; পুলিশে দাও। তুমি নিজেই কি কাজী? দেশে কি আইন নেই? চোরের যা শাস্তি তাই-ই পাবে ও! জেলে দাও ওকে। তারপর কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তোমার পাঁয়ে পড়ি, পায়ে পড়ি; অতটুকু ছেলেকে মেরো না।

কেন? তোদের নানকু মহারাজ সেদিন বলল না, পুরুষ মানুষ কোতোয়ালিতে যায় না, নিজের ফয়সালা নিজেই করে। টর্চ চুরির জন্যে থানা-পুলিশ করবার সময় নেই আমার। বিচার যা করার আমিই করছি, করব এক্ষুণি। আমিই কাজী! তোরা সব শুনে রাখ। ভালুমারের কাজী এখনও আমিই।

মাহাতো পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা কালো রঙের লম্বা চাবুক বের করল। বুলকি জানে না ওটা দিয়েই তার বাবাকেও মেরেছিল কি-না ওরা। সপাং করে চাবুক পড়ল পরেশনাথের মুখে। পরেশনাথকে পিছমোড়া করে বুলকিদেরই গাই-বলদ বাঁধা দাড়ি দিয়ে আমগাছে বেঁধেছিল ওরা। মা! মাঈ......বলে, চিৎকার করে উঠল ন'বছরের পরেশনাথ। বুলকি দৌড়ে গিয়ে পরেশনাথকে জড়িয়ে ধরল। ওদের বলতে লাগল, এই যে শোনো, ভাইয়া অজ্ঞান হয়ে গেছিল, অজ্ঞান হয়ে গেছিল একটু আগে। শোনো।

সপাং করে চাবুক পড়ল বুলকির পিঠেও। পিঠ-ছেঁড়া নীল ফ্রকটার ফাঁকে পিঠের উপরে সঙ্গে সঙ্গে কাঁকড়া বিছের মতো লাল হয়ে ফুটে উঠল চাবুকের দাগ। বাবাঃ, বলেই, বুলকি ছিটকে সরে এলো।

মানুষ নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। বড় আদরের ছোট্ট ভাইয়ের চেয়েও প্রত্যেক মমতাময়ী দিদিও নিজেকে বেশি ভালোবাসে। এমন এমন মুহূর্তে সেই সত্যটা ঝিলিক্ মেরে ওঠে। বুলকি এ কথাটা বুঝতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে রইল। টুসিয়া যেমন সেদিন জেনেছিল রাতের বাংলোর ঘরে, চক্চকে রিভলবারের মুখোমুখি হয়ে যে, তার নিজের প্রাণকে সে তার ইজ্জৎ বা সম্ভ্রমের চেয়েও অনেকবেশি ভালোবাসে।

তেমনি করেই জানল বুলকি! একটা অন্য জানা। মস্ত জানা।

চাবুকের পর চাবুক পড়তে লাগল ছোট্ট পরেশনাথের বুকে, মাথায়, মুখে। প্রতি চাবুকের ঘা দূরে দাঁড়ানো মুঞ্জরীর মুখেও পড়তে লাগল দু-ফণা সাপের মতো। এক ফণা ছোবল মারছিল শিশু ছেলের যন্ত্রণার শরিক হয়ে মুঞ্জরীকে। আর চাবুকের অন্য ফণা জর্জরিত করেছিল একটি চোরের মায়ের গ্লানিকে। পরেশনাথ এখন আর কোনো শব্দ করছে না। মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়েছে। নড়ছেও না। বোধহয় মরে গেছে। বুলকি এক অদ্ভুত বোবা-ধরা ঘড়ঘড়ে চাপা কান্না কেঁদে যাচ্ছিল। মানির চোখে জল ছিল না। হতভাগা, অযোগ্য, মবদহীন বাপ তার শিশুর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে বসেছিল! মুঞ্জরী দাঁড়িয়েছিল ঠোঁট কামড়ে। দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। মুঞ্জরী অন্ধ হতেই চেয়েছিল, বধির হতেও; সেই মুহূর্তে।

অন্ধকারে একসময় চাবুকের শব্দ থামলে, চাবুকটাকে পকেটে পুরে মাহাতো বলল, আমি চললাম রে মানি। তোদের মুরব্বী নানকুয়া এলে বলিস যে, আমি এসেছিলাম। চোরের যা শাস্তি, তাই দিয়ে গেলাম। এগোতে গিয়ে থেমে দাঁড়িয়ে বুলকির সামনেই বলল, তোদের নানকুয়ার মার সঙ্গে আমি শুয়েছি বহুবার। রান্ডীর ছেলেকে ভয় পাবার মতো মরদ মাহাতো নয়। ঐ রান্ডীর বাচ্চাকেও একবার কায়দা মতো পেলে কী দশা করব তখন বুঝবে ও। তোদের সামনেই করব। আমার পা ছুঁইয়ে ক্ষমা চাওয়াব। নইলে এই বস্তি, এই জমিজমা, সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে যাব আমি। ও ওতো চোর। তোরা সব চোর। তোরা সব বেইমান, নিমকহারাম; বজ্জাত। তোরা এই বস্তির গরীব মাত্রই চোর।

পরেশনাথের জ্ঞান এসেছিল মাঝরাতে। একবার চোখ খুলেই বলেছিল, দিদি! দিদি! মা! তিতলি। লাল—তিতলি আশ্চর্য। প্লাস্টিকের টর্চটার রঙও লাল ছিল। তিতলিটার মতন। আয়তনও তিতলিটারই মতো। অবাক হয়ে ভাবছিল বুলকি। টর্চটা কখন চুরি করল পরেশনাথ? আর কেনই বা চুরি করল? চুরি যে করেছে তাতে ত কোনোই সন্দেহ নেই, নইলে সেটা ওর টিনের মধ্যেই এলোই বা কি করে? বুলকি ভাবছিল শুয়ে শুয়ে। বাইরে শিশির পড়ছিল ফিস্ ফিস্ করে।

ওরা গরীব, বড়ই গরীব, কিন্তু কেউ কখনও ওদের চোর বলতে পারে নি। মাহাতো আর মাহাতোর লোকজন কাল সকালেই সারা বস্তিতে একথা ফলাও করে বলবে। কাল থেকে বস্তিশুদ্ধ লোক ওদের চোর বলবে। ওর বাবাকে বলবে চোর—পরেশনাথের বাপ। ওকে বলবে চোরের দিদি। ছিঃ! ছিঃ! ভাইয়া।

মানি বাঁশবাবুর কাছে দুধ দিতে গেছিল অনেক রাত করে সেদিন। বাঁশবাবু ছিল না। তিতলি সব শুনে দাওয়াই দিয়েছিল অনেক রকম। সেগুলো লাগাচ্ছে মা আর মাঝে মাঝেই ঝুঁকে পড়ে পরেশনাথকে দেখছে। মুখটা ফুলে ফেটে বীভৎস হয়ে গেছে পরেশনাথের। চেনা যাচ্ছে না ওকে। বাবাকেও ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছে বুলকি। ভাইয়াকে ও কি চিনত? ভাইয়া যে চোর তা কি ও জানতো আগে? ভাইয়া কি মরে যাবে? বেঁচে উঠবে ত এত মার খেয়েও? একথা মনে হতেই বুলকির চোখ জলে ভরে গেল। চোর হোক, কি ডাকাতই হোক, তার ভাইয়া যেন বেঁচে থাকে চিরদিন। ভাবল বুলকি। ভাইয়া না থাকলে, সেও বাঁচবে না।

সন্ধ্যের পরে কাড়ুয়া চাচা এসেছিল আমলকীর ঝুড়িটি নিয়ে। কাড়ুয়া চাচা অন্ধকারে বিনা-আলোতে জংলী জানোয়ারের মতো চলাফেরা করে। বাঘের মতোই। যখন একেবারে কাছে চলে আসে, তখনই বোঝা যায় যে সে এসেছে! কাড়ুয়া

চুপ করে দাঁড়িয়ে সব শুনল। মানিয়া কাঁদতে কাঁদতে সব বলছিল ওকে। মানিয়ার খুব যন্ত্রণা হয়েছিল। কিন্তু যেই পরেশনাথকে ওরা এইভাবে বেঁধে মারল অমনি ওর নিজের শারীরিক ব্যথার বোধ সবই ওকে ছেড়ে চলে গেল। পরেশনাথের জন্যে একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করছে সে বুকের মধ্যে। সেটা মনের ব্যথা। কোনো শারীরিক ব্যথাই সে ব্যথার মতো যন্ত্রণাদায়ক নয়।

কাড়ুয়া প্রশ্ন করল, মাহাতো নিজেই মারল পরেশনাথকে?

হ্যাঁ।

সঙ্গে আর কারা ছিল?

নাম জানি না। মনে হল ওরা অন্য বস্তির লোক। একজন বোধহয় গাড়ু বস্তির খুন-খারাপি করে। হাটে দেখেছি কখনও সখনও। ওরা ভালুমারের নয়।

অন্ধকারে কাড়ুয়ার চোখ দুটো বাঘের মতো জ্বল জ্বল করছিল। কাড়ুয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেহারা পোশাক ইত্যাদির কথা জিগগেস করছিল। মানিয়া বলল, আর কিছু জানি না কাড়ুয়া ভাইয়া। আমার কিছু আর মনে পড়ছে না। নান্‌কুকে একটু খবর পাঠাতে পারো? ও যেন বস্তিতে না আসে। ওর খুব বিপদ। খুবই বিপদ ওর। আসলে মাহাতো যা করল আমাদের উপর তা নান্‌কুকে শেখানোর জন্যেই। আমার মনে হচ্ছে, নান্‌কুকে ওরা শেষ করে দেবে।

শেষ করে দেবে? নান্‌কুকে?

তারপরই, যে-কথা কাড়ুয়া কোনোদিনও বলেনি কাউকে, কখনও সেই মুহূর্তের আগে এমন করে ভাবেও নি হয়তো, সেই কথাই বলে ফেলল হঠাৎ মানিয়াকে। বলল, নান্‌কুকে মেরে ফেললেই নান্‌কু মরবে না। নান্‌কু কোনো একটা লোক নয়। নান্‌কুর রক্ত ঝরালে সেই রক্তের বীজ থেকে এখন অনেক লোক লাফিয়ে উঠবে। এক সময় নান্‌কুয়া একা ছিল। আজ আর নেই।

মানিয়া ভয় পেয়ে বলল, তুমি কি মাহাতোকে গুলি করে মারতে চললে নাকি?

কাড়ুয়া খুব জোরে হাসল। এত জোরে কখনও হাসে না।

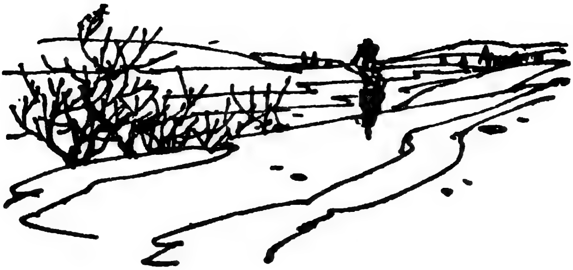
হাসতে হাসতে বলল, আমি যেদিন বন্দুক হাতে নেবো সেদিন মাহাতো তার মায়ের গর্ভে গিয়ে ঢুকলেও বাঁচবে না। জানো মানিয়া ভাইয়া, গুলি খেয়ে মরে যারা তারা হয় বড় বড় প্রাণ, নয় বড় বড় প্রাণী। বাঘের মতো! মাহাতোর কপালে অত মহান মওত্ নেই। আমার বন্দুক ত ইন্দুর-ছুঁচো মারার জন্য নয়। একটু থেমে বলল, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও। আর কাল সকালে উঠেই পাগলা সাহেবকে ঘটনার কথা জানিয়ে এসো। চলে যাবার সময়, দাঁড়িয়ে পড়ে কাড়ুয়া বলল, আর শোনো! আমি যে আজ এসেছিলাম, তোমার সঙ্গে যে আমার কথা হয়েছে এ বিষয়ে সে-কথা যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও না জানে। তোমার বৌ ছেলেমেয়েকেও বলে দেবে। একজনও যদি জানতে পারে, তাহলে খারাপ হয়ে যাবে।

কাড়ুয়ার চোখ দুটো আবারও জ্বলে উঠল অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে।

মানিয়া ভয় পেয়ে বলল, আচ্ছা।

"খারাপ হয়ে যাবে" কথাটা এমন ভাবে বলল কাড়ুয়া যে, মার পাশে শুয়ে বুলকি ভয়ে কেঁপে উঠল।

মানিয়া ভাবছিল, অনেক খারাপই ত ইতিমধ্যে হয়েছে মানিয়ার। আরও খারাপের কথা ভাবার মনের জোর আর নেই।



দিন দুয়েকের জন্যে আমায় চিপাদোহরে গিয়ে থাকতে হবে। এ ক'দিন তিতলির ছুটি। ডেরা বন্ধ করে ও মা-বাবার কাছে গিয়ে থাকবে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রথীদা হঠাৎ হাজির হয়ে প্রায় জোর করেই আমাকে পাকড়ে নিয়ে চললেন। বললেন, তোকে এতদিন যে কেন নিয়ে যাইনি ঐ জায়গাটাতে তা জানি না।

আমি এখানে আছি বেশ কয়েক বছর অথচ কখনও ভাবতেও পারি নি যে, এমন একটা জায়গা আমার ডেরার মাত্র তিন মাইলের মধ্যেই আছে। কী করে জায়গাটা এতদিন আমার চোখে পড়ে নি তা ভেবে নিজেও অবাক হলাম। কাড়ুয়ার মুখে বহুবার শুনেছি যে গভীর বনের মধ্যে গা-ছম্ ছম্ সুন্-সান্নাটা জায়গায়, যেখানে দুধ্লি আর কাশ ফুল ফোটে বছরের বিভিন্ন সময়ে, জিন্-পরীরা হাত ধরাধরি করে খেলতে নামে পূর্ণিমার রাতে। পরেশনাথের সঙ্গে একদিন যে নালাটার উপর দাঁড়িয়েছিলাম বড় বড় আমলকী বনে ছাওয়া পায়ে চলা পথে, যেখানে পরেশনাথ জলে পড়ে গিয়ে লাল তিত্লি বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল; সেই নালাটার পাশ দিয়েই মাইল দুয়েক হেঁটে গিয়ে আমরা শেষ বিকেলে একটি বিস্তীর্ণ দোলামত জায়গায় এসে পেঁছিলাম। বহুদূর অবধি ঘাসে ছাওয়া ছিল সেই দোলা, ঐ শেষ শীতেও। যেখানে মাটি নরম সেখানে অসংখ্য জানোয়ারের পায়ের দাগ। বাইসন, শম্বর, চিতল, হরিণ, বার্কিং ডিয়ার, বুনো মোষ, সজারু, শুয়োর, নীল গাই, বড় বাঘ এবং চিতারও। পরেশনাথের সেই নালাটিই একটি নদীর মতো হয়ে বয়ে গিয়ে মাঝে একটি বিলের মতো সৃষ্টি করেছে। তারপর বিলের অন্য পার দিয়ে আবার বহতা নদী হয়ে চলে গেছে। পশ্চিমদেশীয় এই রুখু মাটিতে কোন্ অদৃশ্য চিত্রকর নরম নীল সবুজের আচমকা তুলি বুলিয়ে কেমন যে এক শান্ত স্নিগ্ধতা দিয়েছেন সমস্ত পারিপার্শ্বিককে তা বুঝিয়ে বলার মতো কলমের জোর আমার নেই! যে সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করা যায় না, যা চোখের সম্পূর্ণ দৃষ্টি মেলে এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়র সামগ্রিকতা দিয়েও পরিপূর্ণ ভাবে অধিকার করা যায় না। যা আমাদের চেনা-জানার পরিচিত অনুভূতির এবং করায়ত্ত জ্ঞানের সমস্ত সীমিত ও চিহ্নিত অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি অতিক্রম করে এক নৈর্ব্যক্তিক ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য জগতে পেঁছে দেয; তাই-ই বোধহয় অমৃত। তাই-ই বোধহয় ঐশ্বরিক সৌন্দর্য!

কী একটা পাখি ডাকছিল জোরে জোরে। রথীদা আমার তাৎক্ষণিক অন্যমনস্কতা ছিঁড়ে দিয়ে আঙুল তুলে বললেন, দ্যাখ্ দ্যাখ্ বারবেট্ ডাকছে কেমন। তাকিয়ে দেখলাম বসন্তবৌরি। ইংরিজী নাম নিশ্চয়ই বারবেটই হবে। পাখির নাম ত' মানুষের দেওয়া; দেশ ভেদে নাম ভেদ। কোনো বিশেষ নামে নাই-ই ডাকলাম কোনো পাখিকে কারণ পাখি ত আর এই পরিপূর্ণ আদিগন্ত ক্যানভাসে একা নয়, একমাত্রও নয়। এই শেষ বিকেলের কোমল নরম আলোয় উদ্ভাসিত আশ্চর্য এই আকাশ, শীত যাই-যাই

গোধূলির বিধুর কমলা রঙে ছাপানো গাছ-গাছালি ; এই নীল সবুজে মাখামাখি তিরতিরে নদী ও সেই নদীতে গা-ধুতে আসা প্রকৃতির গায়ের এই মিষ্টি শান্ত স্নিগ্ধ গন্ধ, এই সামগ্রিকতার মধ্যে এই হলুদ পাখিটি একটি আঙ্গিক বইত' নয়! এর নিজস্ব ভূমিকাকে এই সমগ্রর মধ্যে মিলিয়ে দিলেই ত আর তার নাম জানার প্রয়োজন নেই আমার। সে ত আমার চোখে, আমার নাকে, আমার মস্তিষ্কর কোষে কোষে চিরদিন একটি ফ্রিজ-শটের মতোই রয়ে গেল ; রয়ে যাবে চিরদিন ; যতদিন না আমি চিতায় ছাই হয়ে যাচ্ছি। মনে হয় এই সহজ সরল চোখ দিয়ে রথীদা বা বিজ্ঞানীরা কোনো কিছুকে দেখতে বা মানতে রাজী নন। আজকের যুগ তাঁদেরই যুগ। সায়ান্টিস্ট্ থেকে কম্যুনিস্ট্ সকলের কাছেই ঈশ্বরে বা কোনো শক্তিতে বিশ্বাস করাটা একটা প্রাগৈতিহাসিক মূঢ়তা।

কিন্তু আমি যে মূঢ়! মূঢ়ই থাকতে চাই। আবিষ্কারকে কখনও আমি সৃষ্টি বলে মানতে রাজী নই। তাকে অস্বীকার করি এমন স্পর্ধা বা বিদ্যা ত আমার নেই। কখনও যেন না-ও হয়। আমি এমনিই থাকতে চাই। রথীদা রথীদাই থাকুন।

কত যে পাখি! যেন পাখির মেলা বসেছে। কতরকম তাদের ডাক। কিছু কিছু ডাক চেনা আর অনেকই অচেনা। জলের পাখি এবং জলভেজা স্নিগ্ধ জঙ্গলের পাখিরা সচরাচর এই পালামৌ অঞ্চলের রুক্ষ, দুর্দম, পৌরুষময় পটভূমি ভালোবাসে না। তারা নরম বাংলার জলজ প্রকৃতিকেই বুঝি বেশি পছন্দ করে। কিন্তু এতরকম ও এত পাখি যে এতদিন এখানে লুকিয়ে ছিল বনের বুকের কাঁচুলির আড়ালের সুগন্ধী স্নিগ্ধ উষ্ণতায় এ এক বিস্ময়!

রথীদাও পাগলের মতো করতে লাগলেন। বললেন, প্রায় বছর পাঁচেক পরে এলাম এই জায়গাতে বুঝলি। এখানে ইজ্জীলি একটা বার্ড স্যাংচুয়ারী করা যায়। পাখির সংখ্যাও বেড়ে গেছে দেখছি অনেক। আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে রথীদা একটা উঁচুপাথুরে জায়গায় বসলেন। কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। বললাম, একটু চুপ করবেন রথীদা? এই জায়গাটারও হয়তো কিছু বলার আছে আমাকে, আপনাকে। একটু চুপ করে শোনাই যাক। রথীদা বিরক্ত হলেও, মুখে বললেন ; বেশ! বেশ! বলেই, সিগারেট ধরালেন একটা। দেশলাই জ্বালানোর ফস্‌স আওয়াজের পর সমস্ত জায়গাটি, নদী, ছোট ছোট তরঙ্গর বিলটি, গাছের পাতায় ধীরে-সুস্থে বয়ে যাওয়া মন্থর হাওয়াতে মন নিবদ্ধ করে রথীদা যেন চমকে উঠলেন! এদের যে সত্যিই এত কিছু বলার ছিল, বলার থাকতে পারে ; তা বোধহয় রথীদাও মানতেন না।

ভাবছিলাম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যকে'র সরস্বতী কুণ্ডর কথা। চার-দিকে গাছ-গাছালি, মধ্যে জল, স্পাইডার লিলি এবং নানারকম জলজ গাছ আর সেই একান্ত পাগল মানুষটি, কি যেন নাম তার? মনে পড়ছে না, যে কোথা থেকে-না কোথা থেকে কত না গাছ এনে সরস্বতী কুন্ডে পুঁতেছিল! কত বাংলা ইংরাজী বই-ই ত পড়ি, পড়লাম ; কিন্তু আরণ্যকের মতো বই ক'খানা পড়লাম? যা থাকার তা থাকেই। আপাত দৃষ্টিতে কাগজের বড় বড় হরফের বিজ্ঞাপনে ; স্তাবক এবং মদের-টেবিলের মোসাহেব সঙ্গীদের উচ্চগ্রাম প্রশংসায় ; বা প্রবল ক্ষমতা ও দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন এবং নিজ উদ্দেশ্য সাধনের নিরন্তর চেষ্টায় ব্যাপৃত কোনো সম্পাদকের উচ্চমন্য মতামতে ; যা থাকবেই বলে মনে হয়, তা দেখি প্রায়শই থাকে না। উঁচু করে তুলে ধরে তাতে চতুর্দিক থেকে আলো ফেললে শাড়ি জামা বা অন্য বস্ত্রজাত দ্রব্যাদি হয়তো উচুমানের বলে পরিগণিত হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যকর্ম কোনোক্রমেই হয় না। যাঁর সম্মানে কোনো রিগিং নেই, যে—নির্বাচনে কোনো দলের প্রভাব নেই, কালো-টাকার খেলা নেই, শুধুমাত্র পাঠকের বিবেচনায় যে-লেখক নামী লেখকত্ব অর্জন করেন তিনিই প্রকৃত লেখক। নইলে, আজ বিভূতিভূষণের

মৃত্যুর এতবছর পরও এই গহন বনের মধ্যে বসে বিভূতিভূষণকে এমন করে মনে পড়ে কেন?

নানারকম পাখি ডাকছে চারধার থেকে। সুরে, গমকে গিটকিরিতে, আরোহণ-অবরোহনে শুদ্ধ কোমল ও কড়িমার ছোঁয়ায় গমগম্ রমরম্ করছে। সেই সব সুরে কত যে রাগরাগিণীর আলাপ, তান; বিস্তার। নেশা লাগে। আমার বড় নেশা লাগে। প্রকৃতির নেশা, যে কী নেশা, তা যদি মদ, গাঁজা, আফিং, গুলি, মারিজুয়ানা, হাশীস্ ও নানারকম ডোপ্ খাওয়া মানুষেরা একটু জানত। এ নেশায় মানুষ পবিত্র হয়, সিদ্ধ হয়, মুক্ত হয়। ওরা জানে না। কিন্তু আমি জানি। এই নিবিড় নেশার খোঁজ বিলক্ষণ রাখি। একদিন এই শহুরে সভ্য মানুষদের সকলকে, প্রত্যেককে, স্কাইস্ক্র্যাপারের জঙ্গল ছেড়ে ডিজেল আর পেট্রোলের ধুঁয়ো-ভরা পরিবেশ ছেড়ে, নেশার জন্যে নয়, শুধু একটু বেঁচে থাকার জন্যে, একটু সবুজ চোখে দেখার জন্যে, বনের পটভূমিতে একটু পাখির ডাক শোনার জন্যে নিতান্ত অমানুষ হয়ে যাবার পর একদিন শুধুমাত্র তার স্বাভাবিকতা ও মনুষ্যত্ব ফিরে পাবার জন্যেই ভালুমারের মতো জংলী জায়গায় ফিরে ফিরে আসতেই হবে।

আমি অতি নগণ্য একজন মানুষ। কোনো প্রশংসা বা খেতাব বা স্তুতির লোভ আমার নেই। কিন্তু এই আমার ভবিষ্যদ্বাণী। তথাকথিত শিক্ষায় শিক্ষিত শহুরে মানুষরা ভুল স্টেশনে নিয়ে চলেছে নিজেদের দ্রুতগামী আত্মঘাতী পথে। এখনও বোধ-হয় সময় আছে আমাদের সকলেরই সামনের কোনো বড় জংশনে ট্রেন বদলে কাড়ুয়ার ট্রেনে চড়ে পড়ার।

হঠাৎ রথীদা বললেন, ঐ দ্যাখ্ টুনটুনি। বেশ কিছুদিন হল রথীদা পাখি নিয়ে পড়েছেন। আগে পাখি সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ ছিল না বললেই চলে। আর বোধহয় চুপ করে থাকা সম্ভব হল না রথীদার পক্ষে। আবার বললেন, দেখেছিস্। বিরক্ত গলায় বললাম, টুনটুনি ত ছোটবেলা থেকেই দেখছি। এ ত চেনা পাখি। নতুন পাখি দেখাও। রথীদা উত্তর না দিয়ে নিজের মনেই বললেন, ইংরিজী নাম জানিস? টেইলর বার্ড। চুপ করে থাকলাম। জানতাম, সব টুনটুনিরাই মিথ্যা কথার জাল বোনে আর তারপর নিজের সুবিধামত ছিঁড়ে ফেলে নতুন কথার ছুঁচসুতো নিয়ে সেই জাল আবার রিপু করে। ঐ যে! ঐ যে! ঐ দ্যাখ্ ঐ কাঠঠোকরাটা। ওটার নাম জানিস? লিটল স্কালীবেলিড্ গ্রীণ উড্পেকার। আর দ্যাখ্ ঠিক তার উল্টোদিকের গাছে একটা ব্রাউন (রুফার্স) উড্পেকার। চুপ করে শুনছিলাম। শুধু মাছরাঙাই কত রকমের দেখেছিস?

নিজেই স্বগতোক্তি করলেন, কী মাছ পায় রে ওরা এখানে?

বিলটাতে বোধহয় অনেক রকম মাছ আছে। রামধানীয়া চাচাকে নিয়ে এলে হতো। ও জলের গন্ধ শুঁকেই মাছের নাম বলতে পারে।

চুপ কর। তুই বড্ড কথা বলছিস—পাখিগুলো উড়ে যাবে। দাঁড়া, তোকে মাছরাঙা-গুলো চেনাই। বাঁয়ে আঙুল তুলে, রথীদা জলের পাশে ঝুঁকে পড়া একটা হরজাই গাছের ডালে-বসা বড় একটা মাছরাঙাকে দেখিয়ে বললেন, ওটা চিনিস? কিং-ফিশার! আর ঐ দিকে দ্যাখ, ঐ যে রে, ডানদিকের একেবারে কোণে, স্কর্টবিল্ড। তার চেয়ে একটু এগিয়ে আয়, ব্রাউন-হেডেড। এবার সোজা তাকা, ঐ যে পাখিটা উড়ে গিয়ে বসল মরা গাছটার কালো ডালে; ওটাকে বলে পাইড কিং-ফিশার? রঙ দেখেছিস—সাদা কালো?

ঐদিকে অবাক হয়ে একদৃষ্টে, চেয়ে রইলেন রথীদা। বললেন, আহা! কত রকমই আছে!

একটা ছোট পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল আমাদের মাথার উপর দিয়ে।

ওটা কি পাখি? আমি চমকে উঠে বললাম।

এক ঝলক দেখে নিয়েই রথীদা বললেন, মিনিভেট্।

আমি বললাম, স্কার্লেট মিনিভেট দেখেছি আমি।

বাংলা নাম্, সহেলী। রথীদা বললেন।

সহেলী?

অবাক হলাম নামটি শুনে।

এতেই অবাক! আরও কত সব মিষ্টি নাম আছে পাখিদের। নামগুলো যেন পাখিগুলোর চেয়েও মিষ্টি। যেমন ধর বাটান্, সবুজ বাটান্, গ্রীণ স্যান্ডপাইপার। তারপর টিটি!

টিটি সকলেই চেনে।

তারপর ধর, বাতাসী, হাউস-সুইফট্ বাঁশপাতা, কমোন গ্রীণ বীটার, পাতা ফুটকি, ডাস্কি লিফ্ ওয়ার্ব্লার, ব্ল্যাক রেড স্টার্ট। আরও শুনবি, ত' শোন্। ফুল্কি, ফিরোজা, ভেরিডিটর ফ্লাইক্যাচার।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, রামগাংরা ; গ্রে—টিট্।

ধ্যুত্। আমি বললাম। শেষকালে একেবারে এ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স্। এত সব মিষ্টি মিষ্টি নামের পর রামগাংরা একটা নাম হলো।

কেন? কেন? কাংড়া পেইন্টিং ভালো হতে পারে, ভাংড়া ড্যান্স চমৎকার হতে পারে আর রামগাংরা পাখির বেলায় যত দোষ! সব ঘরানা ভালো করে খুঁজে দেখলে ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল মিউজিক-এ এই নামেই কোনো দুর্ধর্ষ রাগ-রাগিনীও বেরিয়ে পড়তে পারে। আশ্চর্য কিছুই নয়।

রথীদার কথা শেষ হবার আগেই আমাদের ঠিক উল্টোদিকে, ছোট্ট বিলটার ওপারের জঙ্গলের গভীরে বেশ কাছে থেকেই বড় বাঘ ডাকল। উঁ—আঁউ! অত কাছ থেকে ডাকাতে, মনে হলো জলে যেন ঢেউ খেলে গেল। গাছে, পাতায়, ফুলে, ঘাসে কানাকানি হলো। আমার আর রথীদারও সঙ্গে সঙ্গে চোখাচোখি হলো। জঙ্গলের সব জিনিসের, সব জায়গার, নির্দিষ্ট সময় আছে। অধিকার-অনধিকার ভেদ আছে। এই জায়গা এখন বড় বাঘের! এই গোধূলিবেলার পর আবার অন্য প্রাণীদের হবে। পূর্ণিমার মাঝরাতে জিন-পরীদের। আর একটু আগেতো পাখিদেরই ছিল।

বাঘের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জায়গাটা উৎকণ্ঠিত, উন্মুখ হয়ে রইল এক স্তব্ধ নীরবতায়। আমি আর রথীদা আস্তে আস্তে ফেরার পথ ধরলাম: বনের রাজাকে সম্মান দেখিয়ে। কিছুটা এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললাম, কেমন শুনলেন বাঘের ডাক?

রথীদা মুখটা আকাশের দিকে তুলে দাঁত চেপে ফিসফিস করে বললেন, রামগাংরা!

হাসি সামলে, জোর পায়ে আমরা বাঘের এলাকা পেরিয়ে এলাম।

যখন ভালুমারের বড় রাস্তায় এসে উঠলাম। তখন রাত নেমে গেছে। রথীদা ডাইনে মোড় নিলেন, আমি বাঁয়ে। বললেন, ওখানেই চল্ সায়ন।

না থাক, গোছগাছ করে নেব একটু। কাল একেবারে ভোরে-ভোরে বেরিয়ে পড়ব।

কোথায় যাবি?

চিপাদোহর।

ফুঃ! গোছগাছের বহর দেখে মনে হচ্ছে যেন বিলেতেই যাচ্ছিস।

তারপর নিজের বাংলোর পথ ধরলেন।

দূর থেকে ডেরার বারান্দায় বাঁশের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হ্যারিকেনটা দেখা যাচ্ছিল। আজকাল বনের বুকের মধ্যে কী যেন সব ঘটনা ঘটছে। ঋতু বদল হবে শিগগির। চারদিকে ফিসফিস করে কারা যেন কথা কয় চুপিসারে। ভালুমারের বন বুঝি ঋতুমতী হবে। শীত কমে এসেছে। দোলের পরই গরম পড়তে শুরু করবে। সরস্বতী পুজোটা কাটবে আমার চিপাদোহরে। বাল্মীকি-প্রতিভার বাল্মীকি লক্ষ্মীকে বলেছিলেন, "যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়, এসো না, এসো না এ গহন বনে!" কিন্তু এখানে আমাদের এই জঙ্গলের বাঁশবাবুদের সরস্বতীর সঙ্গে প্রায় সংস্রবই নেই কোনো! লক্ষ্মী আছেন অটুট কমলাসনে, আমার মালিকের ভাণ্ডারে মার্সিডিস ট্রাকে, প্রাইভেট গাড়িতে। যদিও ট্রাকের মাথায় গণেশ মহারাজের ছবি ঝোলে। আসল দেবী কিন্তু লক্ষ্মী! আরও আছেন বিশ্বকর্মা। সরস্বতীর আরাধনা কেউই করে না। নান্টুবাবু আর নিতাইবাবু অবশ্য বাংলা বই পড়েন, নানা জায়গা থেকে জোগাড় করে এনে। কিন্তু ওঁরা এখানে একেবারেই বেমানান।



বড় হবার পর থেকে মেয়েরা যে ভয়টাকে সবচেয়ে বেশি করে পায়, সেই ভয়টাই সত্যি হয়ে এল টুসিয়ার জীবনে। ওর মতো নিশ্চিতভাবে আর কেউ জানে না যে ও মা হতে চলেছে। খবরটা অনেকেই আনন্দের হতে পারতো। কিন্তু হয় নি। বড় লজ্জার এবং গ্লানির সঙ্গে তার শারীরিক অস্বস্তি ও মানসিক ভয়কে বয়ে বেড়াচ্ছে টুসিয়া। তার মায়ের কাছেও লুকিয়ে রেখেছে ব্যাপারটা। কিন্তু ও জানে যে, মায়ের চোখে বেশি-দিন ধুলো দিতে পারবে না।

বাংলোতে সেই রাতের দুর্ঘটনার পর নান্কুর সঙ্গে আর দেখা হয় নি টুসিয়ার। যদিও ও খু-উ-ব চেয়েছে যে, দেখা হোক। নান্কু কি ওকে ক্ষমা করবে? নিশ্চয়ই করবে না। তাছাড়া টুসি ক্ষমা চাইবেই বা কেন? বরং টুসি শাস্তি চাইবে। যে-কোনো শাস্তি। তার কৃতকর্মের ন্যায্য শাস্তি। তাতে যদি নান্কু নিজে হাতে খুনও করে তাহলেও তার কোনো দুঃখ থাকবে না। যদি নান্কু তাকে ক্ষমা করে তার পরও। কিন্তু নান্কুর দেখা চাইলেই ত পাওয়া যায় না। এই ভালুমারের রুখু, দুঃখী মানুষগুলো যারা কান্দা-গেঁঠি খুঁড়ে, জিনোর আর সাঁওয়াধানের মুখে চেয়ে হাতি, বাইসন থেকে খরগোশ পাখি পর্যন্ত তাবৎ জংলী জানোয়ার ও পাখির করুণা ভিক্ষা করে কোনোক্রমে বেঁচে থাকে শীত থেকে বসন্ত, বসন্ত থেকে গ্রীষ্ম, গ্রীষ্ম থেকে বর্ষা, বর্ষা থেকে শরৎ, শরৎ থেকে হেমন্ত এবং হেমন্ত থেকে শীত—তাদের কাছে নান্কু এক দৈববাণী বিশেষ। মাঝে মাঝেই উদয় হয়ে কোন অজানা, অচেনা অচিন দেশের কথা বলে যায় নান্কু ওদের। যে দেশ-এর অস্তিত্ব কোথায় তা ওরা জানে না। কিন্তু নান্কু বলে, একদিন তেমন কোনো দেশ নতুন করে জন্মাবে পুরোনো অভ্যেসের ধূলিমলিন এই দেশেরই মধ্যে। যেখানে, ওরাও সুযোগ পাবে সমান। দুবেলা দুমুঠো খেতে পাবে। লজ্জা ঢাকার শাড়ি পাবে। মাথা উঁচু করে পরিশ্রমের বিনিময়ে মানুষের মতো বাঁচতে পারবে। সেই সোনার খনি কোথায় আছে? কোন অজগর-এর মাথার মণিতে, সেই খনির হদিস্ বুঝি কেবল নান্কুই জানে।

নান্কু বলতো, আর ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি সকলেই ওরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনত। ওর সব কথাই যে সকলে বুঝত এমনও নয়, কিন্তু তাদের বুকের রক্তের মধ্যে কেমন যেন ছলাৎ ছলাৎ দোলা অনুভব করত প্রত্যেকে। নান্কু বলতো, বুঝলে, এই দেশে ধন-রত্নের কোনো অভাব নেই। হাজার মাইল চাষের জমি, আবাদী এবং এখনও অনাবাদী—টাঁড়, বেহড়; নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত এবং কোটি কোটি লোক। কিন্তু যা নেই, যে জিনিসের দরকার তা কেবল একটি মাত্রই। অভাব শুধু মানুষের মতো মানুষের। যারা ভাগ্যে বিশ্বাস করে, রাজনৈতিক নেতাদের বুজরুকিতে বিশ্বাস করে, সমতার বুলির

মিথ্যা ভাঁওতায় বিশ্বাস করে গত তিরিশ বছর শুধু ঠকেই এসেছে, তাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন শুধু ঐ একটি জিনিসের। মানুষের মতো মানুষের ; নেতার মতন নেতার। যে নেতারা বাধ্যতামূলকভাবে জনগণের ঘাড়ে জনগণের সম্মান বা ভালোবাসা ছাড়াই চেপে বসে, তেমন নেতা নয়। যারা এই জঙ্গল টাঁড়ে গর্তের ডিম থেকে বেরুনো মহা বিষধর সাপেদেরই মতো, এই জঙ্গলের পাথরের নিচে জন্মানো পোকার মতো, বিছের মতো, পাহাড়ের গুহাতে পয়দা-হওয়া বাঘের বাচ্চার মতো, যারা এইখানেরই, এই দেশেরই, তেমন নেতারা। যাদের শিকড় প্রোথিত আছে গহন গভীরে, গ্রামে-গঞ্জে, জঙ্গলে-পাহাড়ে, যারা সৎ, যারা লোভী নয়, যারা দেশের মানুষকে ভালোবাসে, দেশকে ভালোবাসে, কোনো দলমত অথবা পুঁথিপড়া ডান বাম কেরদানির চেয়ে অনেক বেশি করে, তেমন নেতাদেরই দরকার আজকে। যারা দেশজ নেতা, দেশের নেতা, দশের নেতা।

নান্‌কু বোধহয় তেমনই একজন কেউ। জানে টুসিয়া, সবই জানে, এবং জানে বলেই কাঁদে। এতসব জেনেও শহরে থাকার লোভে, অফসর্‌-এর বউ হওয়ার লোভে সে তার সবচেয়ে যা দামী, তাই-ই খুইয়ে ফেলেছে অবহেলায়। কাঁদে আর ভাবে, এতসব কথা জানতো না কি টুসিয়া? নান্‌কুয়া শিখিয়েছে ওকে ধীরে ধীরে। ঠিকই করেছিল নান্‌কু। ঘৃণায় থুথু ফেলে যখন বলেছিল, যে, টুসিয়া নান্‌কুর যোগ্য নয়। টুসিয়ার মতো এমন করে এই মুহূর্তে আর কেউ জানে না যে, কথাটা কতখানি সত্যি।

টুসিয়া, মানিয়া-মুঞ্জরীদের বাড়ি গেছিল সেদিন শেষ দুপুরে। সেখানে মাসীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করে, মাসীকে মকাই শুকোতে সাহায্য করে ও মীর্‌চাবেটির দিকে চলল। মনটা বড় পাগল পাগল করে। কী করবে ও বুঝতে পারে না। ও কী আত্মহত্যা করবে? কী করে মানুষ আত্মহত্যা করে? মীর্‌চাবেটির পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়বে নীচে? ইঁদুর মারার বিষ গিলবে? মাহাতোর বাড়ি থেকে গেঁহুর ক্ষেতে দেওয়ার সার চেয়ে এনে খেয়ে ফেলবে? কিছুই বুঝতে পারে না টুসিয়া।

মীর্‌চাবেটির কাছাকাছি পৌঁছতেই ওর কানে গান ভেসে এল। নান্‌কুর গলা মনে হল। নান্‌কু? সত্যিই কি নান্‌কু? বুকের মধ্যে ধকধক করতে লাগল টুসিয়ার। হ্যাঁ, নান্‌কুই ত'! নান্‌কুই গাইছিল!

তোর বিদাইয়া করণপুরা
মোর ছাতি বিহরে......

"বিহরে" কথাটা টেনে কোথায় যেন ও নিয়ে যাচ্ছিল! আর নান্‌কুর দরদী গানের সুর ঝর্নার জলের মতো ঝর্‌ ঝর্‌ করে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে গিয়ে সমস্ত জঙ্গলে প্রান্তরে, ক্ষেতে, জমিতে পৌঁছেই ছড়িয়ে যাচ্ছিল। একটা পাগলা কোকিল ডাকছিল জঙ্গলের গভীর থেকে। পাগলের মতো। এই সময়, যখন বনে পাহাড়ে একটা-দুটো করে পলাশ ফুটতে থাকে, যখন পাহাড় চূড়োর বড় শিমুল গাছটা লাল রঙের নানান বাহারের পতাকা নেড়ে সকলকে জানান দেয় যে, বসন্ত এসে গেছে ; যখন রাতের হাওয়াতে মহুয়ার তীব্র মিষ্টি গন্ধ আর করৌঞ্জ ফুলের পাগল করা বাস ভেসে বেড়ায়, তখনই পাগল হয়ে যায় কোকিলগুলো। নান্‌কুর কাছে হঠাৎ এসে পড়ার আনন্দে টুসিয়াও বোধ-হয় পাগল হয়ে যেত। কিন্তু এ জীবনে বোধহয় ও বসন্তের বাতাস আর পলাশ ফুলের লালে পাগল আর হবে না। ও যে চিরদিনের মতই পাগল হয়ে গেছে ভেবে ভেবে। ওর শরীরের নিভৃত পিছল অন্ধকারে অন্য পুরুষের শরীরের বীজ বোনা হয়ে গেছে। মাটির নিচে যেমন চোখের অলক্ষ্যে শিকড় ছড়িয়ে দেয় গাছ, রস টানে, নতুন পাতায় ভরে নিজেকে, মাটিতে শুষে ; তেমনি করে টুসিয়াকেও শুষে দিচ্ছে এক অনাগত, অদেখা, এখনও অবয়বহীন প্রাণের আভাস। টুসিয়ার নাড়ি আর জরায়ুই জানে কেবল সে কথা।

যে পুরুষ বীজ বুনে চলে গেছে দূরের জলার শীতের পাখির মতো খেলা শেষ করে, সে এখন কোথায় কে জানে? পুরুষরা বোধহয় এমনই হয়। বীজ বুনেই ওদের ছুটি। বীজকে অঙ্কুরিত করার সব দায় মেয়েরাই বয়, সেই স্বপ্ন, অথবা টুসিয়ার মতো দুঃস্বপ্ন, কেবল মেয়েরাই দেখে।

যে গানটা নানকু গাইছিল তার মানে, তোর বিয়ে হয়ে গেল করণপুরাতে, আমার বুক ফেটে যায়। দুঃখে...সত্যিই বুক ফেটে যায় রে...। গানটা শুনে টুসিয়ার কষ্ট আরও বাড়ে সত্যি সত্যিই। হীরুর বন্ধুর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেলে এতখানি দুঃখ ও পেত না নানকুর জন্যে, আজ যতখানি পাচ্ছে। ও ত শুধু নিজে অপমানিত করে নি নিজেকে, ও যে নানকুকেও চরম অপমান করেছে। যে নানকুর মতো মানুষের ভালোবাসা পেয়েছে, সে কি না...

হঠাৎ গান থামিয়ে নানকু বলল, কওন্ রে?

ম্যায় হুঁ। টুসিয়া বলল।

কওন্। গলায় যেন একটু রুক্ষতা লাগল নানকুর।

ম্যায়। লজ্জার আবার বলল টুসিয়া, মুখ নিচু করে।

নানকু বুঝতে পেরে বলল, টুসি? তাই-ই বল্। তা, তুই এখনও এখানে যে! শহরে যাবি না? তোর লগন্ কবে? নেমন্তন্ন করতে ভুলিস না যেন আমাকে।

টুসিয়া কোনো কথা না বলে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল নানকুর দিকে। ও ঠিক করল গাছতলায় বসে থাকা নানকুর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে ও সব বলবে। ও কী করবে এখন জানতে চাইবে নানকুর কাছে। নানকু একবার মুখ তুলে চাইল টুসিয়ার দিকে। টুসিয়ার সুন্দর চেহারাটা কেমন যেন রাক্ষুসীর মতো হয়ে গেছে। অবাক চোখে চেয়ে রইল নানকু টুসিয়ার দিকে। কিন্তু যেই টুসিয়া ওর কাছাকাছি চলে এল, এক লাফে নানকু গাছতলা ছেড়ে উঠে সরে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই, টুসিয়ার পায়ের কাছে থুথু ফেলল। বলল, টুসি। আমি যা কিছু পিছনে ফেলে আসি তো পিছনেই পড়ে থাকে। আমি পিছনে কখনও তাকাই নি। তাকাবোও না। আমার কথা মাড়িয়ে গিয়ে আমি কখনও পিছনে হাঁটি না। তুই আমার যোগ্য নোস, যোগ্য নোস; যোগ্য নোস। হাতের এক থাবায় পাশের গাছের এক গোছা পাতা ছিঁড়ে মুঠোর মধ্যে কচ্লাতে কচলাতে বলল, নানকু ওরাও* বিয়ে করলে, একমাত্র তোকেই করত। কিন্তু বিয়ে যদি করত। এখন সব শেষ হয়ে গেছে। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।

কোথায়?

টুসিয়া বললো।

জঙ্গলের সুঁড়িপথের মোড় দেখেছিস ত! তোর আর আমার পথ সেইরকম একটা মোড়ে এসে আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। আর কিছু করার নেই। সব শেষ হয়ে গেছে সেদিনই। তোকে আর আমি চিনি না।

বলেই, নানকু আবার সেই গানের কলিটি ভাঁজতে ভাঁজতে পাহাড় বেয়ে নীচের পাকদণ্ডীর দিকে নেমে গেল।

তোর বিদাইয়া করণপুরা,
মোর ছাতি বিহারে—এ—এ—এ—এ...

অবাক হয়ে, চলে-যাওয়া নানকুর দিকে চেয়ে রইল টুসিয়া। ওর বড় বড় চোখ-দুটি জলে ভরে এল। নানকু এমন করে টুসিয়াকে ফেলে চলে গেল যেন সত্যিই ও কখনও চিনত না। কিন্তু টুসিয়ার মতো করে কেউই জানে না, কার বিদাইয়ার কথা গাইছে নানকু, আর কার বিদাইয়াতে তার বুক ফেটে যাচ্ছে। অথচ সেই টুসি সামনে

এলে তার মুখে থুথু দেয় নান্‌কু। একটা অদ্ভুত মানুষ। অদ্ভুত! ভুল করে ভুল লোককে ভালোবেসেছিল টুসিয়া। আবার ভুল করে সে লোককে ফেলে অন্য ভুল লোকের আশায় ছুটেছিল। ছোট্ট হলেও টুসিয়া সারাটা জীবনে সে কেবল ভুলই করে এল। তখনও পাকদণ্ডীর রাস্তায় জঙ্গলের মধ্যে নান্‌কুর গান শোনা যাচ্ছিল। ঝোপ-ঝাড়, গাছ-লতা, পাহাড়-ঝর্নার আড়ালে আড়ালে। টুসিয়ার মনে পড়ে গেল, এক দিন ভালুমারের বনদেওতার কাছে বসে নান্‌কু ওকে বলেছিল, দুঃখ কার না আছে? জন্মালেই দুঃখ। বড়-ছোট, গরীব-বড়লোক সব মানুষেরই দুঃখ আছে। কিন্তু কোন মানুষ দুঃখের মোকাবিলা কেমন ভাবে করে, তা দিয়েই ত' তার মনুষ্যত্বের বিচার হয়। মানুষের শরীরে জন্মালেই কি মানুষ মানুষ হয়? আর একদিন কথা হচ্ছিল মাহাতোকে নিয়ে নান্‌কুর সঙ্গে। টুসিয়া শুধিয়েছিল, মাহাতোর এত টাকা-পয়সা, কাড়া-ভইস, লোকজন, মাহাতোর সঙ্গে তুমি লড়ে পারবে? ও ত তোমাকে মেরে তোমার লাশ পুঁতে দেবে। নান্‌কু হো হো করে হেসে উঠেছিল। ওর গাল টিপে দিয়ে বলেছিল, পাগলী। মানুষ কি শরীরের জোড়ে লড়ে রে? শরীরের জোরে ত মানুষ কত সহজে জানোয়ারের কাছেও হেরে যায়, তাই বলে সেইসব জানোয়ারেরা কি মানুষের চেয়ে বড়। শরীরের সাহস হচ্ছে সাহসের মধ্যে সবচেয়ে কম দামী সাহস। আসল হচ্ছে মন; মনের সাহস। প্রতিবাদ করার সাহস। অত্যাচার সইবার সাহস। তারপর বলেছিল, তুই প্রহ্লাদের গল্প জানিস না?

টুসিয়া হেসে বলেছিল, প্রহ্লাদকে ত ভগবান বাঁচিয়েছিলেন। তোমাকে কে বাঁচাবে?

নান্‌কু হেসে বলেছিল, কেন? তোরা বাঁচাবি? তোরা কী কম? প্রহ্লাদের ভগবান অন্য ভগবান কিন্তু আমার ভগবান আমার দেশ। যার জন্যে আমি ভাবি সবসময়, সেই-ই ভাববে আমার জন্যে।

নান্‌কু যে গাছের নীচে বসেছিল, সে গাছের নীচেই বসে রইল টুসিয়া। ওর মাথাটা এখন হালকা লাগছে। কিন্তু এর পরে কী হবে ও জানে না। মোহাবিষ্টের মতো অবশ হয়ে বসেছিল টুসিয়া। এদিকে বেলা যায় যায়। ভাবল, এবারেও উঠবে। এমন সময় পাহাড়ের উপর থেকে দুটো জানোয়ার যেন হুড়োহুড়ি করে নেমে আসতে লাগল পাকদণ্ডী বেয়ে। সন্ত্রস্ত হয়ে টুসিয়া উঠতে যাবে, এমন সময় দেখল পরেশনাথ আর বুলকি নেমে আসছে দুহাত ভর্তি কুঁচফলের ঝাড় নিয়ে। পাতাগুলো শুকিয়ে হলুদ হয়ে গেছে আর তার মধ্যে উজ্জ্বল লাল আর কালোরাঙা কুঁচফলগুলো জ্বল-জ্বল করছে।

পরেশনাথ বলল, কোথায় গেল? নান্‌কু ভাইয়া, কোথায় চলে গেল রে দিদি? বুলকিও অবাক হয়ে চারধারে দেখল। তারপরই টুসিয়াকে দেখতে পেয়ে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, টুসি দিদি..। টুসি উঠে দাঁড়াল। বলল, তোদের নান্‌কু ভাইয়া ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। ভয়? নান্‌কু ভাইয়া কিসের ভয় পেল? বুলকি শুধোলো। পরেশনাথ প্রতিবাদের স্বরে বলল, ঝুঠো বাত্। নান্‌কু ভাইয়া কই চিজ্‌সে ডর্‌তা নেহি।

টুসি ওদের সঙ্গে নামতে নামতে বলল, উও বাত্ ত সাহি। মগর্ হাম্‌সে বহুত্‌ই ডর্‌কা।

তুমসে? বলেই হো হো করে শিশু পরেশনাথ হেসে উঠল।

তোদেরই বাড়িতে গেছিলাম একটু আগে। তোরা না জঙ্গলে কুল কুড়োতে গেছিস। গেছিই ত! কুলে ঝাড় ভর্তি করে রেখে এসেচি নীচে। নান্‌কু ভাইয়ার সঙ্গে ত নীচেই

দেখা হল। আমরা ত নান্‌কু ভাইয়ার সঙ্গেই এলাম এখানে। বলল, বুল্‌কি। বেশ লোক ত! আমাদের ফেলে রেখে চলে গেল। কেন? আমি ত আছি।—আমি আছি বলেই হয়তো চলে গেল। টুসিয়া বলল।

পরেশনাথ চোখ বড় বড় করে বলল, জানো টুসিদিদি আজকে কি হয়েছিল? একটা মস্ত ভাল্লুকে মুখ নীচে, পেছন উপরে করে কুল গাছে উঠছিল। এমন দেখাচ্ছিস না। আমি ত ঐ ভয়ের মধ্যে হেসে ফেলেছি, আর আমার হাসি শুনে ভাল্লুকটার কী রাগ! তর্‌তর্‌ করে নেমে আসছিল আমাদের ধরবে বলে, আমরা ত সে ব্যাটা গাছ থেকে নামার আগেই চোঁ—চোঁ দৌড় লাগিয়ে পালিয়ে এলাম। টুসি ওদের সঙ্গে নামতে নামতে বলল, মহুয়া গাছতলাতে আর কুলগাছ তলাতে সাবধানে যাবি, জঙ্গলে। বিশেষ করে গরম পড়লে। আমগাছ তলাতেও। ভাল্লুকরা ঐসব খেতে খুব ভালোবাসে।

পরেশনাথ খুব সমস্যায় পড়ে বলল, তাহলে? কি হবে? আমরাও যে ভীষণ ভালোবাসি।

এই শিশু ভাইবোনের সঙ্গে অনাবিল মনখোলা হাসি হেসে মুহূর্তের জন্যে টুসিয়া ওর নিজের দুঃখ ভুলে গেল। তারপর ভাবল, পরেশনাথ আর বুল্‌কিরও দুঃখ কম নেই। এক এক জনের মনের দুঃখ এক এক রকম। ওরা শিশু হলে কি হয়? ওদের কত রকম দুঃখ। হীরু ত তাও কিছু কিছু টাকা পাঠিয়ে এসেছে এতদিন। যে-টাকা পাঠিয়েছে হীরু প্রতিমাসের জন্যে এক সময় তা মানিয়া চাচার সারা বছরের রোজ-গারের চেয়ে বেশি। শিশু দুটির জন্যে হঠাৎ কষ্ট হল টুসির। আহা! ওরা যেন ভগবানের দূত! এই প্রথম বসন্তের কোকিল-ডাকা, প্রজাপতি-ওড়া, হলুদ-লাল বনে বনে ওরা দেবশিশুর মতো খেলে বেড়ায়। পেটে সবসময় খিদে, কিন্তু মুখে হাসির বিরাম নেই। ওদের সঙ্গে নামতে নামতে হঠাৎ টুসিয়া পশেনাথের ছোট্ট হাতটা নিজের মুঠির মধ্যে শক্ত করে ধরল। পরেশনাথ বুঝতে না পেরে টুসির মুখের দিকে তাকাল। দেখল, তার টুসি দিদির মুখটা হঠাৎ যেন কেমন ফ্যাকাশে, রঙহীন হয়ে গেছে, আর টুসিদিদির হাতটা তার হাতের মুঠোটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে সাঁড়াশীর মতো শক্ত হয়ে চেপে বসছে আস্তে আস্তে। পরেশনাথ যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল, উঃ লাগে!

টুসি যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে পরেশনাথের হাতটা ছেড়ে দিল। টুসির কপাল এ শীতেও বিন্দু বিন্দু ঘামে ভিজে উঠল। হাতটা ছেড়ে দিতেই পরেশনাথ এক দৌড়ে সামনে নেমে গেল অনেকখানি পথ বেয়ে। বুল্‌কি অবাক হয়ে টুসিয়া দিদি এবং পরেশনাথ দুজনের দিকেই তাকাল। কিছুই বুঝতে পারল না। টুসির মাথার মধ্যে অনেকগুলো ঝিঁঝিঁপোকা একসঙ্গে ডেকে উঠলো। ওর গর্ভের মধ্যের অনভিপ্রেত প্রাণটা যেন নড়ে চড়ে উঠল। যা-কিছু জীবন্ত, প্রাণস্পন্দিত, সবকিছুকেই হঠাৎ ভেঙে চুরমার করে দিতে ইচ্ছে হল টুসির। হঠাৎ ও আর ওর নিজের মধ্যে রইল না। ওর মনে হল এই উচ্ছল, প্রাণবন্ত টগ্‌বগে পরেশনাথকে গলা টিপে মেরে ফেলে। ওকে মেরে ফেললে, যেন টুসি স্বস্তি পাবে। শান্তি পাবে। ওর জ্বালা জুড়োবে। প্রাণকে, প্রাণ-বন্ততাকে টুসি ঘৃণা করে।

হঠাৎ টুসিয়া পিছনে আঁচল লুটিয়ে দৌড়ে গেল পরেশনাথের দিকে; চিল যেমন ছোট পাখির দিকে ছোঁ-মারে তেমন করে। অবাক-হওয়া বুল্‌কি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ঐ দিকে চেয়ে রইল আরও অবাক হয়ে। টুসির পায়ের শব্দে পরেশনাথ ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে পড়েই, টুসিয়ার দিকে চেয়ে আতঙ্কিত বিস্ফারিত চোখে চেঁচিয়ে উঠল, লাল তিত্‌লি। লাল তিত্‌লি দিদি! লাল তিত্‌লি! পিছনে দাঁড়ানো বুল্‌কিও যেন দেখতে পেল যে লাল শাড়ি-পড়া টুসিয়া দিদি হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড বড়, কিন্তু

ভারশূন্য লাল তিতলি হয়ে গিয়ে, ওদের চেয়ে অনেক নীচে দাঁড়ানো পরেশনাথের দিকে উড়ে যাচ্ছে। টুসিদিদির হঠাৎই বিরাট ডানা গজিয়েছে। পরেশনাথ প্রাণপণে দৌড়তে লাগল উৎরাইয়ের পাকদণ্ডীতে। বুলকি কী করবে বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি একটা পাথর কুড়িয়ে নিল পথ থেকে; নিয়ে লাল তিতলি হয়ে-যাওয়া টুসিয়াকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল পাথরটা। পাথরটা ছুঁড়তেই টুসি একটা বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাথরটা লাগল কিনা বুঝতে পারল না বুলকি। বাঁক ঘুরেই দেখল, পরেশনাথ আছাড় খেয়ে পড়ল পাথর আর কাঁটা ঝোপের উপর আর একটু এগিয়ে যেতেই দেখল যে, টুসিয়া উবু হয়ে বসে আছে, পথের উপর। যে পাথরটা ও ছুঁড়েছিল, সেটা বোধহয় তার পিঠে লেগেছিল। কিন্তু ততক্ষণে সেই খতরনাগ, লাল তিতলিটা পালিয়ে গেছে। অল্প অল্প হাওয়ায় টুসি-দিদির লাল আঁচলটা উড়ছে শুধু তখনও। দৌড়ে গিয়ে পরেশনাথের মাথাটা কোলে তুলে নিল ও। কপাল আর নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে এল পরেশনাথের। টুসি দিদি স্বাভাবিক গলায় বুলকিকে শুধোল, কী করে এমন হল রে বুলকি? পরেশনাথ পড়ল কী করে? বুলকি এবার টুসিদিদির চোখের দিকে চেয়ে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পেল না। তবুও, ভয়ে ভয়ে বলল, পড়ে গেছে দৌড়ে পালাতে গিয়ে। বুলকির বুকটা ভয়ে টিপ টিপ করছিল।

পালাতে গিয়ে? কিসের ভয়ে পালাল? কার ভয়ে?

টুসি শুধোল।

বুলকি কী বলবে ভেবে না পেয়ে বলল, কি জানি!

ইস্স্, কী অবস্থা ছেলেটার—বলেই, টুসিদিদি দৌড়ে গেল জঙ্গলে, জংলী পাতা ছিঁড়ে আনবে বলে। অজ্ঞান হয়ে যাওয়া পরেশনাথের মাথাটা কোলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একা বসে থাকতে বুলকির ভীষণ ভয় করছিল। বুলকির মনে হচ্ছিল যে, এই লাল-তিতলিটা কোনদিন পরেশনাথকে সত্যিই মেরে ফেলবে। কখন? কবে? কোথায়? তা সে লাল তিতলিই জানে। সবসময় একটা চাপা ভয় কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে ওর বুকের মধ্যে। তখন যদি বুলকি পরেশনাথেব সংগে না থাকে ত কি হবে? পরেশ-নাথকে ও কি বাঁচাতে পারবে? ওর একমাত্র ছোট ভাইটাকে? এইসব কারণেই সেই আমলকী গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার পর থেকেই বুলকি পরেশনাথকে কক্ষণো আর একা জঙ্গলে যেতে দেয় না। ওর যতই কাজ থাকুক, তবু সঙ্গে যায়।

টুসি দুমুঠোয় জংলী গ্যাঁদার পাতা ভরে নিয়ে এলো। তার দুহাতের পাতা ঘেমে একেবারে জল হয়ে গেছিল। টুসি নিজেও জানে না একটু আগে কী হয়েছিল টুসির। টুসির হাতের পাতা খুব ঘামে। সন্ধ্যে হতেও বেশি দেরি নেই। বস্তি এখনও বেশ খানিকটা দূরে। ছেলেটার জ্ঞান তাড়াতাড়ি ফিরলে হয়। ওরা দুজনে মিলে পরেশ-নাথের ক্ষতস্থানে পাতা কচলে ভালো করে লাগিয়ে দিল। তারপর টুসি আরেকবার গেল জল আনতে। কাঁটা ভেঙে নিয়ে শালচারার পাতা ছিঁড়ে দোনা বানিয়ে, ঝর্না থেকে জল নিয়ে এল টুসি। একটু একটু করে জল পরেশনাথের ঠোঁটে দিতে আস্তে আস্তে পরেশনাথের জ্ঞান ফিরে এল। পরেশনাথ একবার চোখ খুলেই বিস্ফারিত ভয়ার্ত চোখে বলল, লাল তিতলি, লাল তিতলি! টুসিয়া বলল, এ্যাই পরেশনাথ, কি বলছিস? কিসের তিতলি? এই যে আমি! তোর টুসিদিদি! আমি লাল শাড়ি পড়েছি। আমার শাড়ির আঁচল উড়ছিল রে বোকা! পরেশনাথকে জোর করে টেনে দাঁড় করাল বুলকি। ও আর দেরি করতে চায় না।

এই পাকদণ্ডীর শেষে একটা ঝাঁকড়া পিপুল গাছ আছে; ঘন জঙ্গলে ভরা, পাহাড়-তলিতে সন্ধ্যের পর তার তলা দিয়ে ভালুমারের একজনও যায় না। কাড়ুয়া গেলেও

যেতে পারে। বুলকি ইঙ্গিতে আঙুল তুলে গাছটার দিকে টুসিকে দেখাল। টুসির গা-ছম্ ছম্ করে উঠল। ওর মনে পড়ল যে, ও ছোটবেলা থেকে শুনেছে যে, প্রথম পোয়াতিদের বনে জঙ্গলে কখনও একা একা যেতে হয় না। সন্ধ্যেবেলা ত নয়ই। নানা-রকম আত্মার ভর হয় তাদের ওপর। জিন্‌পরী, কিটুং। বুলকি আর টুসিয়া, ঘোরের মধ্যে থাকা পরেশনাথকে দুজন দুহাতে ধরে প্রায় হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নুড়ি আর গাছ-গাছালিতে ভরা অসমান পথ বেয়ে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলল বস্তির দিকে। ওরা যখন সেই ঝাঁকড়া পিপুল গাছটার কাছে এসে গেল, তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। বস্তির নানা ঘর থেকে কাঠের আগুনের ধুঁয়ো উঠে, গোরু ছাগলের খুরে-ওড়ানো ধুলোর মেঘে আটকে রয়েছে। পিছনের গাঁয়ে সবুজ জঙ্গলের পটভূমিতে সেই নীলচে ধুঁয়ো আর লালচে ধুলোকে অদ্ভুত এবং বিস্তৃত এক ভিনদেশী মাকড়সার জালের মতো দেখাচ্ছে।

ওরা পিপুল গাছটি পেরিয়ে আসতেই একটা বড় পেঁচা দুরগুম্ দুরগুম্ দুরগুম্ আওয়াজ করে ঐ গাছটা থেকেই উড়ে এসে ওদের মাথার ওপরে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল ক্রমাগত। ঘুরতে ঘুরতে ওদের সঙ্গে চলতে লাগল। বুলকি একবার ওপরে তাকিযেই চোখ নামিয়ে নিল। পরেশনাথ চোখ দুটো বন্ধ করেই আছে। টুসিয়ার বুকের ভিতরের, স্তনবৃন্ততে, জরায়ুতে, নাভিতে কার অসূশ্য অসভ্য হাত যেন কী একটা ঠান্ডা জিনিস এক মুহূর্তে ছুঁইযে দিয়েই চলে গেল। একটা ভয়, টুসিয়ার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা কালো কুৎসিত কোঁকড়ানো ভয় টিকটিকির মতো তর্‌তরিয়ে নেমে গেল।

অদূরে বস্তির দিক থেকে কেউ তার কুকুরের নাম ধরে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে উঠল। তারপর ডাকতেই থাকল। আঃ বিকি, আঃ আঃরে বিকি আঃ—আঃ—আ—আ...। ওরা বস্তির লাগোয়া ক্ষেতে না ঢোকা অবধি লোকটি ডেকেই চলল। কাছে আসতেই টুসিয়া এবারে লোকটির গলা চিনতে পারল। এ গ্রামের লোহার; ফুদিয়া চাচা। টুসির মন বলল, আজ আর ফুদিয়া চাচার বিকি কুকুর ফিরে আসবে না। তাকে নিশ্চয়ই চিতাতে নিয়েছে। ঐদিকে মুখ ঘুরিয়ে টুসি অবাক হয়ে গেল। এবং টুসির চোখ অনুসরণ করে বুলকিও অবাক হয়ে দেখল যে, ফুদিয়া চাচা ঐ ঝাঁকড়া পিপুল গাছটার দিকেই সোজা মুখ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বিকিকে ডাকছে।

বুলকি দাঁড়িয়ে পড়ে শুধলো, কতক্ষণ থেকে পাচ্ছো না চাচা, তোমার বিকিকে?

আরে এই ত ছিল পায়ের কাছে এইখানেই। পাঁচ মিনিটও হবে না, হঠাৎ মুখে অদ্ভুত একটা গোঁ—গোঁ আওয়াজ করতে করতে ঐ খতরনাগ্, পিপুল গাছের দিকে দৌড়ে গেল। যেন কেউ ডাকল ওকে। আমি ভাবলাম, এই ফিরে এল বলে। কিন্তু তারপর তার আর পাত্তা নেই, দ্যাখো ত কান্ড! এদিকে অন্ধকার হয়ে এল। তোরা ত ঐদিক থেকেই এলি? দেখিস নি বিকিকে? শোন্‌চিতোয়া বেরিয়েছে নাকি?

বুলকি চোখ নামিয়ে নিল। বলল, শোন্‌চিতোয়া?

বিকিকে তোরা সত্যিই দেখিস নি? না ঠাট্টা করছিস?

না ত! সত্যি আমরা কেউই কোনো কুকুর দেখি নি। শোন্‌চিতোয়াও না। টুসি বলল। পা চালিয়েই বুলকির হঠাৎই মনে হল যে, আজ বিকিই বাঁচিয়ে দিল পরেশ-নাথকে। লাল তিতলি অথবা টুসিয়াদিদির হাত থেকে। মনে হতেই, ওর গাটা আবারও ছমছম্ করে উঠল। এই জঙ্গলে পাহাড়ে কখন যে কী ঘটে।

পেঁচাটা দূরের সায়ান্ধকার পাহাড়তলিতে তখনও ঘুরে ঘুরে ডাকছিল দুরগুম্, দুরগুম্, দুরগুম্। ভাইয়ের হাত ধরে বড় পা ফেলে বাড়ির দিকে চলল বুলকি। টুসিয়া যে সঙ্গে আছে একথাটা যেন ভুলেই গেল ও।

আসলে, ভুলে যেতেই চাইছিল।



চিপাদোহরে পেঁৗছতেই হৈ হৈ পড়ে গেল। নান্টুবাবু আর গজেনবাবু কোনো গোপন কারণে বনদেবতার কাছে পাঁঠা মানত করেছিলেন। কারণটা কি তা জানবার জন্যে আমি আর বিশেষ ঔৎসুক্য দেখালাম না। পাঁঠার স্বাদ খুবই ভালো ছিল। ডালটনগঞ্জের পাঁঠাদের খুব নামডাক আছে। বুদ্ধিমানদেরও নিশ্চয়ই আছে। তবে, তাঁদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। শহরের চারধারেই জঙ্গল। তাই পাঁঠাদের বিচরণ ক্ষেত্রের অভাব নেই এবং সে কারণেই এখান থেকে ট্রাক ট্রাক পাঁঠা কলকাতায় চালান যায়। কলকাতার ইন্টেলিজেন্ট বাবুরা খোঁজও রাখেন না যে, যে-পাঁঠাদের রেলিশ করে তাঁরা খান তাদের একটি বড় ভাগ কোথা থেকে আসে। কিন্তু এই ছাগল-পাঁঠার মতো শত্রু একোলজির আর কিছুই নেই। কিছুদিন আগেই ইউনেস্কোর একটি সমীক্ষা হাতে এসেছিল। যা পড়লাম, তাতে তাবৎ ছাগজাতি সম্বন্ধে এমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে যে, পাঁঠা দেখলেও ঘেন্না হয়! ছাগল দেখলেও হয়। কারণ ছাগলের দুধ-খাওয়া স্বাধীনতা পেয়েছিলাম বলেই বোধহয় আমাদের স্বাধীনতায় এত রকম ভেজাল বেরুলো।

সাইপ্রাস, ভেনেজুয়েলা এবং নিউজিল্যান্ড ত ছাগজাতেব বিরুদ্ধে রীতিমত জেহাদই ঘোষণা করেছে। উর্বর জমি ও বনজঙ্গলকে পাঁঠাদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ঐসব দেশ স্লোগান নিয়েছে, "Even one single goat at large is a danger to the nation." এই ছাগলরাই আফ্রিকার সাহারা এবং সাভানা তৃণভূমির আয়তন বাড়াতে সাহায্য করেছে। প্রতিবছর সাভানাভূমির এক মাইল করে মরুভূমির পেটে চলে যাচ্ছে এদেরই দৌরাত্ম্যে। গত কয়েক শতাব্দীতে মূলত এদের জন্যেই মরুভূমি তিনশ কিলোমিটার উর্বর জমি জবরদখল করে নিয়েছে। আমি ঐ রিপোর্ট পড়ার আগে নিজেও জানতাম না যে, পাঁঠারা ঘাস এবং গাছের গোড়া উপড়ে নির্মূল করে খায়। মাটিরতলার শিকড় শুদ্ধু সাফ হয়ে যাওয়াতে, রোদ বৃষ্টি এবং হাওয়ার কাছে ধরিত্রীকে অসহায় করে তোলে। মাটি ধুয়ে যায়, উড়ে যায় এবং তার সঙ্গে চলে যায় মাটির উর্বরতা। আমাদের দেশেও ছাগল-পাঁঠা কেউ বেড়া দেওয়া জায়গায় রাখে না। বেওয়ারিশ জমিতে অথবা পড়শির খেতে এবং টাঁড়ে-জঙ্গলে, ঝোপে-ঝাড়ে পাঁঠারা আপন মনে চরে বেড়ায় এবং সর্বনাশ করে। প্রত্যেক দেশেই এদের এই উন্মুক্ত বিচরণ বন্ধ করার জন্যে আইন হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে কি হবে? যেখানে মানুষদের নিয়েই ভাবার মতো মানুষ বেশি নেই, সেখানে ছাগল-পাঁঠার ব্যাপারে কেউ বিশেষ মাথা গলাবেন? মাথা আমরা সব ব্যাপারেই গলাই ; কিন্তু বড় দেরি করে। এখন বাঘ গেল, বাঘ গেল করে, প্রায় চোখ গেল, চোখ গেল রব উঠছে তামাম দেশ জুড়ে, অথচ আমাদেরই উর্বর মস্তিষ্ক থেকেই এই আইডিয়া বেরিয়েছিল যে, বিদেশীদের দিয়ে বাঘ মারিয়ে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে রাতারাতি বিদেশী মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানো হোক। প্রতি রাজ্যে রাজ্যে প্রাক্তন রাজন্যবর্গ ও বড়লোক শিকারীদের

আনুকূল্যে নানারকম শিকার কোম্পানী রাতারাতি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছিল। তাদের কারও টার্মস ছিল "টু প্রডিউস্ আ টাইগার উইদিন শুটেবল্ ডিস্‌ট্যান্স"। কারও বা ছিল, বাঘ মারিয়েই দেওয়ার। বদলে বাঘ-প্রত্যাশী আগন্তুকরা দিতেন নানা অঙ্কের ডলার বা মার্কস্। খানা-পিনা ফালানা ঢামকানা অল ইনক্লুডেড্। তা, আমেরিকান জার্মান ট্যুরিস্ট্‌রা কম টাকার শ্রাদ্ধ করে যান নি সেই অল্প ক'বছরে। কম বাঘের চামড়া সঙ্গে করে নিয়েও যায় নি। প্রতি রাজ্যের প্রতিটি ভাল শিকারের ব্লকে যে কতগুলি করে বাঘ মারা পড়েছিল উনিশ-শ' সাতচল্লিশ থেকে উনিশ-শ' সাতষট্টির মধ্যে তার হিসেব নিলেই মোট সংখ্যা যে আতঙ্কের কারণ তা বোঝা যাবে। এর আগে চোরা শিকার যে হতো না তা নয়। কিন্তু চোরাশিকারীরা সাধারণত বাঘকে এড়িয়ে যেতেন। তাঁরা সাধারণত বাবুরাম সাপুড়েদের পথ অনুসরণ করে নিরাপদ শিকারই বেশি করতেন। বাঘ নির্মূল হতে বসেছিল বড়কর্তাদের বিদেশী মুদ্রা অর্জনের এই ব্রিলিয়াণ্ট আইডিয়ার দরুন। বাঘ যখন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল, তখন আরম্ভ হল টাইগার প্রোজেকট। ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের দাক্ষিণ্যে। টাকাও কম পাওয়া গেল না। এখন মানুষ মেরে বাঘ বাড়াবার প্রচণ্ড চেষ্টা চলছে। এই চেষ্টা কতদূর ফলপ্রসূ হবে তা আমরা, যারা জঙ্গলে থাকি তারাই একমাত্র বলতে পারব। খাতাপত্তরের হিসেবে যাই-ই বলুক—আগের থেকে বাঘের সংখ্যা যে বেড়েছে এ পর্যন্ত, তা আপাতদৃষ্টিতে একেবারেই মনে হয় না। বড় বাঘ আজকাল ত খুব একটা চোখেই পড়ে না। আগে আকছার দেখা যেত। ট্রাক থামিয়ে, জীপ থামিয়ে রাস্তা কখন ছেড়ে যাবে সেই অপেক্ষায় বসে থাকতে হতো, বিশেষ করে বর্ষার এবং প্রচণ্ড শীতের রাতে। শীতের রাতে বাঘ বনের বড় রাস্তা দিয়ে যাতায়াতই পছন্দ করে। কারণ, বিড়ালেব সমগোত্রীয় বলে, চামড়াতে জল পড়ুক তা তাদের একেবারেই পছন্দ নয়। শীতের রাতে শিশিরে ভেজা বন থেকে বৃষ্টির জলের মতই প্রায় জল ঝরে।

অনেকদিন পর লালটু পাণ্ডের সঙ্গে দেখা। মুখে সেই অমায়িক হাসি, পবিত্র, অপাপবিদ্ধ। এখন দুপুরবেলা, তাই সিদ্ধির সরবৎ পেটে পড়ে নি বলে, লালটু এখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট সোবার। আমি ওকে অনুরোধ করলাম ক'টি শায়ের শোনাতে। লালটু ডান হাত দিয়ে পেল্লায় হাতা ধরে তার মধ্যে ঘি ঢেলে তা খেসারীর ডালের হাঁড়িতে নাড়তে নাড়তে বাঁ হাত তুলে আঙুল নাড়িয়ে বলল :

'পীরতম্ বসে পাহাড় পর্
ম্যায় কোয়েল নদীকে তীর
তুমসে কব্ মিলন হোগা
পাঁও পাড়ি জাঞ্জীর।'"

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ক্যা বাত্ ক্যা বাত্ করে উঠলেন। বললাম, আর একটা হোক। লালটু আমার পাতে ভাতের পাহাড়, ডালের নদী বইয়ে দিয়ে বলল :

"বাসি ভাত্‌মে ভাপ্ নেহী।
পরদেশকি পিয়াকে আশ নেহী।"

গজেনবাবু বললেন, কিছু বুঝলেন বাঁশবাবু? এটা লালটুর বউএর কথা!

তা বুঝেছি।

নান্টুবাবু বললেন, ঐটা শোনা লালটু, যেটা গত মাসে পূর্ণিমার রাতে লিখেছিস। আমার দিকে ফিরে বললেন, শুনুন, স্বামীর সওয়াল আর স্ত্রীর জবাব।

লালটু গর্বিত মুখে হাত নাড়িয়ে শুরু করল :

"লিখ্‌তা হুঁ খাতে খুনসে, সিয়াহী না সমঝ্ না।
মরতা হুঁ তেরি ইয়াদ্‌মে, জিন্দা না সমঝ্ না।"

অর্থাৎ রক্ত দিয়েই চিঠি লিখছি। কালি দিয়ে লিখছি না। তোমার কথা ভেবে ভেবেই ত মরতে বসলাম ; আমাকে আর জীবন্ত ভেব না।

লালটুর স্ত্রী উত্তরে লিখল :

"কেয়া, সিয়াহী নেহী থা? যো খুন্‌সে লিখতে?
কেয়া ঔর কোহি নোঁহি থী, যো হাম্‌পর মরেথে?

মানে হল, আ মরণ! তোমার কি কালি ছিল না যে রক্ত দিয়ে লিখতে গেলে চিঠি? আর অন্য কেউই কি ছিল না তোমার যে, আমারই জন্যে মরতে এলে!

এরপরে গজেনবাবুর পীড়াপীড়িতে আরও দুটি শায়ের শোনাল লালটু, কিন্তু সে দুটি এতই অশ্লীল যে লেখা যাবে না। লালটু কিন্তু সরল মনেই সেই শায়ের রচনা করেছিল। যা সহজ সরল ছিল, গজেনবাবুর উপক্রমণিকাতে তাইই কদর্য ও অশ্লীল হয়ে উঠল।

খেতে খেতে ভাবছিলাম যে, শ্লীলতা বা অশ্লীলতা বোধহয় রচনাতে থাকে ন প্রায়শঃই ; তা থাকে পাঠক শ্রোতার মনে। এবং তার দৃষ্টিভঙ্গিতেও। সুন্দরকে কদর্যতা দেবার এক ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল গজেনবাবুর!

লালটু পাণ্ডে চিপুয়া মাছের ঝোল রেঁধেছিল। দারুণ স্বাদ এই মাছগুলোর। ঔরঙ্গা নদীর মাছ। প্রায় সারাবছরই পাওয়া যায়। ডালটনগঞ্জ থেকে নান্টুবাবু আমার অনারে সকালে পাঁঠার মাংসের সঙ্গে এই মাছও নিয়ে এসেছিলেন। এত সুস্বাদু মাছ খুবই কম খেয়েছি। রোশনলালবাবুর একজন অতিথির কাছে শুনেছিলাম যে আসামের গারো পাহাড়ের নিচে বয়ে-যাওয়া কুমিরে ভরা জিঞ্জিরাম নদীতে, একরকমের মাছ পাওয়া যায়, তার নাম ভাঙনি। সেই মাছের স্বাদ নাকি অনেকটা ঔরঙ্গার এই চিপুয়া মাছেরই মতো। খেয়ে দেয়ে উঠে সারাদুপুর গেল বাঁশ, কাঠ, ট্রাক, কুলী ও রেজার হিসেব নিয়ে। সন্ধ্যার সময় রোশনবাবু এলেন। যথারীতি হিসেব-নিকেশ চলল কিছুক্ষণ। আমরা সব চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

রোশনলালবাবু যখন কথা বলেন তখন আমরা কেউ কথা বলি না। বলার নিয়ম নেই। রোশনলালবাবুর গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। কালো রঙের এ্যাম্বাসাডার গাড়ি চতুর্দিকে নানান্ রকমারি ঝক্‌মকে জিনিস। রকম-বেরকমের লাল-নীল আলো। এখানের রইস্ আদমীদের রুচিই এরকম। এখানে বড়লোকদের দামী পোশাক পরে দামী আংটি পরে শুধু দামী গাড়িই নয়, সেই গাড়িকে নানারকম উদ্ভট সাজে না সাজিয়ে রাখলে লোকে বড়লোক বলে মানতেই চায় না। বড়ই বিপদ। এবং হয়তো এই কারণেই চরম দারিদ্র্য আর প্রচণ্ড আড়ম্বরের পার্থক্যটা এখানে এত বেশি করে চোখে পড়ে।

কুলিরা জটলা করে দূরে দাঁড়িয়েছিল। আজ ওদের পে—ডে। বাবু সঙ্গে করে টাকা নিয়ে এসেছেন। কিন্তু আসতে আসতে আজ রাত হয়ে গেছে। এবং বাবু থাকা-কালীনও পেমেন্ট পাবে না ওরা। কারণ গোলমাল উনি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেন না। বাবু চলে গেলে তারপর। বেচারীরা! এদিকে চিপাদোহরের হাট ভেঙে গেছে অনেকক্ষণ। ওদের কুকুর-কুণ্ডলী পাকানো জমায়েত থেকে চাপা বিরক্তিমাখা গুঞ্জরন শোনা যাচ্ছে। টাকাটা তাড়াতাড়ি পেলে খুশি হতো ওরা, কিন্তু একথা এসে বাবুকে বলে, এমন সাহস কারোরই নেই ওদের। আমাদেরও কারো নেই। আমরা যে বাবুর মাইনেকরা চাকর। রক্ষিতারই মতো। আমাদের মধ্যে মাথা উঁচু করে কথা বলার মতো সাহস ক'জনের আছে? তাছাড়া, আমরা ত বহাল তবিয়তেই আছি। আমাদের মাইনে একদিনও দেরি হয় না। ও ব্যাটা কুলিদের জন্যে আমরা অপ্রিয় হতে যাই কেন মালিকের কাছে? যাদের গরজ তারাই বলুক। চাকরিটা চলে গেলে যে বুড়ো মা-বাবা অথবা অল্পবয়সী

ভাই-বোন না খেয়ে থাকবে। নিজেরাও হয়তো থাকবো অথবা যে-জীবনযাত্রার মান-এ মালিক আমাদের অভ্যস্ত করে দিয়েছেন তা থেকে আমাদের নেমে আসতে হবে। সে বড় কঠিন কাজ। না-খেয়ে থাকার চেয়েও কঠিন। কারণ মাঝে মাঝে না খেয়ে-থাকা লোকদের মধ্যেও সত্যি কথা বলার সাহস দেখতে পাই, কিন্তু আমাদের মতো ইংরিজী জানা রক্ষিতবাবুদের মধ্যে সেই সাহস ত একেবারেই দেখি না।

মানুষের আত্মসম্মান, স্বাধীনতাবোধ, ব্যক্তিত্ব সব কেড়ে নেবার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে তার মুখে টাকা ছুঁড়ে দেওয়া, তাকে এমন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত করে দেওয়া যা থেকে কোনোমতেই নেমে যেন আসতে না পারে। পৃথিবীর সব প্রান্তরে মালিকরাই এ খবরটা রাখেন। আর রাখেন বলেই এই গভীর গহন জঙ্গলের মধ্যেও আমাদের মতো রক্ষিত মানুষদের তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে দেখতে পাওয়া যায়।

রোশনলালবাবু অবশ্য এক্ষুণি উঠে যাবেন। সঙ্গে তার দুই মোসাহেব। এ'দের আগে কখনও দেখি নি। একজন কালো মোটা মোষের মতো দেখতে। সর্বক্ষণ পান খেয়ে খেয়ে মুখের দুটি পাশ চিরে গেছে। তার পরনে পায়জামা আর পাঞ্জাবি। পেটে বোমা মারলেও বোধহয় অ, আ, ক, খ, বেরবে না; অন্যজন বেঁটেখাটো—গাট্টাগোট্টা নর-পাঁঠার মতো দেখতে। চেহারা দেখে মনে হয় গাঁজা-গুলি খায়; খুন-খারাপী করে। তাদের রকম দেখে মনে হল যে, মালিক যদি এই রাতের বেলাতেও বলেন যে, সূর্য উঠেছে ঐ দুজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠবেন, আলবাৎ মালিক নেহি ত ক্যা? মালিক এদের ছাড়া নাকি নড়েনই না আজকাল। এদের চোখ দিয়েই পৃথিবী দেখেন।

ব্যাপার দেখে মনে হল মালিকের ভীমরতি হয়েছে।

কুলিদের মধ্যে একটি অল্পবয়সী ছেলে এগিয়ে এসে রোশনলালবাবুর গাড়ির সামনের দুই বাম্পারে লাগানো ঝকঝকে আয়না দুটিকে দেখছিল। তারপর হঠাৎ তার কি খেয়াল হল, তার কোঁচড়ের মধ্যে থেকে একটি কাঠের কাঁকই বের করে সে চুল আঁচড়াবে বলে ঠিক করল, আগুনের আভা-পড়া আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। আয়না দুটি এমনভাবে লাগানো যে, নড়ানো যায় না। কিন্তু ও অত না বুঝে ডানদিকের মাডগার্ডে বসানো আয়নাটি ধরে শক্ত হাতে এক হ্যাঁচকা টান দিতেই আয়নাটি খুলে এল মাডগার্ড থেকে।

আর যায় কোথায়? এক নম্বর মোসাহেব চেয়ার ছেড়ে দৌড়ে গিয়েই ছেলেটির পেটে এক লাথি মারল, বেহেনচোত্ বলে গাল দিয়ে! পরক্ষণেই দু'নম্বর মোসাহেবও ভিড়ে গেল। কী হয়েছে, তা বোঝার আগেই ছেলেটি মাটিতে শুয়ে পড়ল মারের চোটে। মালিক একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখে বললেন, অনেক হয়েছে, ছেড়ে দে। জানে মারিস না। এস. পি-র সঙ্গে আমার এখন একটু খটাখটি চলছে। অসময়ে তোদের যত ঝামেলা। সমবেত কুলিরা এবং বাবুরা কিছু বোঝার আগেই ঘটনা ঘটে গেল। পাঁড়েজী বলে উঠলেন, এসব দামী জিনিস। ছোঁওড়াপুত্তান। দরকার কি তোর হাত দেবার। সারাজীবন খেটেও এইরকম একটা আয়না কিনতে পারবি? শালার কুপ্-কাটা কুলির আবার টেরি, তার আবার আঁচড়ানো! শখ কত!

কিছুক্ষণ পর বাবু চলে গেলেন মোসাহেবদের নিয়ে ধুলো উড়িয়ে। বাবুরা চলে গেলে, কুলিরা পেমেন্টের জন্যে এগিয়ে এল সেরেস্তার সিঁড়ির সামনে। অদ্ভুত কায়দায় বসল, দুটো হাঁটু দুদিকে দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে। ওরা এমনি করেই ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে পারে, নড়া-চড়া না করে। মাঝে মাঝে শুধু মাটিতে থুথু ফেলে এদিক ওদিক পিচিক্ পিচিক্ করে।

গণেশ মাস্টার এসে পেঁছিল। তাকে আগেই খবর দেওয়া হয়েছিল যে আমি এসেছি বাবুরা চলে যাওয়ার পর বাবুর বাবুরা বসলাম, বাবুদের ফেলে যাওয়া চেয়ারে। একটা চেয়ার তখনও বাবুর পশ্চাৎ দেশের গরমে গরম হয়ে ছিল। জাজমেন্ট সীট অব বিক্রমাদিত্যের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। তাই আমি ঐ চেয়ারটি এড়িয়ে গেলাম। গণেশ মাস্টার ঘটনা শুনে বলল, রোশনলালবাবু অনেক বদলে গেছেন। তাই না সায়নদা? নান্টুবাবু বললেন, কিছু লোক থাকে, পয়সাই যাদের একমাত্র পরিচয়। পয়সায় কোনো-রকমে টান পড়লে, বা রোজগারে ভাঁটা পড়লে সেই মানুষগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মনে করে সব গেল, সব গেল। তখন তাদের অমানুষ হয়ে উঠতে সময় লাগে না। তবে কি জানেন, সকলেই বদলায়। মানুষ হচ্ছে নদীর মতো। চলতে চলতে আমরা অনবরত নিজেদের বদলাচ্ছি। চর পড়ছে একদিকে, পাড় ভাঙছে অন্যদিকে। আমরাও কি একই আছি?

গণেশ বলল, বাবা! নান্টু তোর হলটা কি? সাহিত্যিকের মতো কথা বলছিস?

তোমাদের কথা আলাদা। তোমরা ও'র চাকরি কর—তোমাদের মালিককে তোমরা হয়তো অনেক ভালো করে চেন। আমি বাইরের লোক—তবুও, আমার সঙ্গেও ও'র ব্যবহার ছিল চিরদিনই চমৎকার। ইদানীং লক্ষ করি, উনি যেন দেখেও দেখেন না; চিনেও চেনেন না আমাকে। সত্যি কথা বলতে কি, উনি থাকলে আমার এখানে আসতেও লজ্জা করে। বছরে কিছু টাকা যে আমি পাই না তোমাদের কোম্পানী থেকে তা নয়। উপরি সেটা। ঘুষও বলতে পার। কিন্তু এখানে এটাই রেওয়াজ। নইলে আমার মতো রেলবাবুর চলত না। এত প্রথম থেকেই চলে আসছে। কিন্তু আজকাল ও'র হাবভাবে মনে হয় যেন, আমি ও'র দয়ার ভিখিরি! তোমরা হতে পার; আমি নই। আপনি কি বলেন? সায়নদা?

গজেনবাবু বললেন, আস্তে আস্তে, মাস্টার! কে শুনে ফেলবে! দেওয়ালেরও কান আছে।

শুনতে পেলে পাবে। আমি ত রেল কোম্পানীর চাকর। তোমার বাবুর চাকর ত নই। আমাকে তোমার বাবু আর করবে টা কি? উপরি বন্ধ হলে, আমিও বাড়কাকানা থেকে রেক্ আটকে দেব। বরাবরের মতো হয়তো পারব না। গোমোতে বেশি খরচ করলে অথবা বাড়কাকানাতে—রেক্ তোমরা পাবেই। কিন্তু কিছুদিনের মতো ত টাইট্ করে দেব। তাছাড়া তোমার বাবুর একার ভরসায় ত আর আমি এখানে পড়ে নেই। এখানে আরো অনেক অনেক বড়াসে—বড়া ঠিকাদার আছে। পয়সাওয়ালা লোকও আছে। তোমার মালিক একাই লক্ষ্মী ঠাকুরের ঠিকা নিয়েছে নাকি? বলে, আমার দিকে চেয়ে, আপনি কি বলেন?

ব্যাপারটা আমি বুঝছিলাম না। আজকের হাওয়া যেন ভীষণ অন্যরকম।

নান্টু বলল, খামোখা চটাচটি করার কোনো মানে নেই। ভাবলাম, কোথায় নতুন গান-টান শোনাবি, বাঁশবাবু এয়েছেন, না তুই বাবুর পিণ্ডি দিতে বসলি।

না রেঃ, এইসব ছোট ছোট কথা, ছোট ছোট উপেক্ষা, অপমান, মনে বড় লাগে। সেদিন তোদের বাবু আমাকে কি বলেছে জানিস? আমি আমার টাকার অঙ্কটা একটু বাড়াতে বলেছিলাম, বলেছিলাম, টাকার দাম ত বাঁশপাতার সমান হয়ে গেল; যদি-না একটু কন্‌সিডার করেন...

বাবু কি বললেন জানিস?

কি? নান্টু শুধোল।

হেসে বললেন, আমার বউ থাকলে বলতাম রোজ সকালে টাকার বাণ্ডিল বিয়োতে।

বউ ত নেই, কী করি।

শালা পাঞ্জাব থেকে রিফিউজি হয়ে এসে হঠাৎ এত টাকার মালিক হয়ে কাকে কী বলতে হয় তা ভুলে গেছে। বল্, এরকম ভাষায় কেউ কথা বলে?

নান্টু হেসে ফেলল।

বলল, তুইও শালা! ঘুষও নিবি, আবার সতীগিরিও করবি। ঘুষ দিলে লোকে সুযোগ পেলে একটু বলবে না?

গণেশ চটে উঠে বলল, ঘুষ যেন আমি এদেশে একাই নিচ্ছি! শালার মিনিস্টারেরা, এম-পি, এম-এল-এরা সব ধোওয়া তুলসীপাতা! দেশে ইলেকশান্ চলছে কিসের টাকায় রে? বেশি পেঁয়াজী করবি না। শালাদের বগলের তলা দিয়ে সব হাতি চলে যাচ্ছে, সেদিকে চোখ পড়ে না।

নিতাইবাবু হঠাৎ গেয়ে উঠলেন, "থা—ম্ তোরা থাম্! নিশি বয়ে যায় রে, তন্ন তন্ন করি অরণ্য আন্ বরা আন রে; এই বেলা; যা রে!

এইসব কথার মধ্যে হঠাৎ বাল্মিকী-প্রতিভার কথা আমদানি করাতে আমি চমকে উঠলাম। কথাই বলব। কারণ, কবিতারই মতো। সুরের কোনো বালাই ছিল না।

আজকে এসে পর্যন্ত, সকাল থেকেই শুনছি যে, নিতাইবাবুর কচি শুয়োরের কাবাব খাওয়ার শখ হয়েছে। শিকার টিকার ত একদম বারণ। চারধারের পুরো এলাকাই হচ্ছে স্যাংচুয়ারীর এলাকা—তাই শিকারের প্রশ্নই ওঠে না। বস্তিতে লোক পাঠিয়েছেন সারা দিনে তিনবার। নিজেও গেছেন দু'বার। কিন্তু মনোমত শুয়োরের ছানা মেলে নি।

নান্টুবাবু বললেন, আসল ব্যাপারের খোঁজ রাখেন বাঁশবাবু? চামারটোলীতে এক-জন মেয়ে আছে সে দেখতে একেবারে হেমা মালিনী। শুয়োর ছানার খোঁজে হলে ও শালা নিজে যেত না। আসলে ও অন্য কোনোরকম ছানা খাওয়ার মতলবে আছে। বলেই নিতাইবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, কিরে নিতে?

শাট্-আপ্। বলে উঠলেন নিতাইবাবু।

বলেই, সেরেস্তাতে নিজের ছোট্ট ঘরে চলে গেলেন।

কেন জানি না, আজ এরা সকলেই খুব পেন্ট্-আপ্ হয়ে আছেন। প্রচণ্ড টেন্স্। আমি জানি, নিতাইবাবু এখন কী করবেন ঘরে বসে। ওল্ড-মংক রাম্-এর বাদামী রঙা পেটমোটা বোতল থেকে একটু রাম্ ঢালবেন। তাতে জল মেশাবেন। তারপর গেলাসটা নিয়ে চৌপাই-এর ওপরে গুটিয়ে রাখা তোষকে হেলান দিয়ে বসে দেওয়ালে ক্যারু-কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের অর্ধনগ্না মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে একটু একটু করে রাম্-এ চুমুক দেবেন। যোগভ্যাস নানারকমের হয়। মনকে কেন্দ্রীভূত নানা প্রক্রিয়াতে করা যায়। নিতাইবাবু এই প্রক্রিয়াই বেছে নিয়েছেন।

ফুট্‌ফাট করে আগুন জ্বলছে। আগুন কত কী যে স্বগতোক্তি করে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে! এখন কৃষ্ণপক্ষ। লাল আগুনের কম্পিত আভায় ছায়াগুলো সব কাঁপাকাঁপি করছে, চারিদিকে। আমাদের গল্প চলে নানারকম, চারপাশে গোল হয়ে বসে। এ কথার থেকে সে কথা।

উল্টো-পাল্টা কথা হওয়াতে মাঝে মাঝে তুমুল ঝগড়াও হয়। পরে আবার মিট-মাটও হয়ে যায়। অন্তত এতবছর তাই-ই হয়েছে। আজই আবহাওয়াটা একটু অন্যরকম দেখছি। খুবই অন্যরকম। আমিই এদের কাছ থেকে দূরে থাকি এবং একাও। কিন্তু একে অন্যের সঙ্গে এদের সম্পর্ক, অনেকটা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মতো। সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর না হলে ক্ষণে ক্ষণে ঝগড়া করাও যায় না; আবার ভাব করাও যায় না। চিপাদোহরে এসে, এদের দেখে আমার প্রায়ই মনে পড়ে যায়, আমার মাসীমার মৃত্যুর পর

আমার মেসোমশাই সকলকেই বলতেন : আমার ঝগড়া করার লোক চলে গেছে। মেসোমশাইয়ের বলার ধরন দেখেই বুঝতে পারতাম যে, তাঁদের সম্পর্কটা কতখানি গভীর ছিল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হয়তো সাধারণত এমনই গভীর হয়। ব্যাচেলর আমি। অনুমান ছাড়া আর কিছু করার নেই আমার। গণেশ মাস্টার এতক্ষণ নান্টুবাবু আর গজেনবাবুর সঙ্গে মহুয়া খাচ্ছিল। একটু একটু মৌতাত এর মধ্যেই হয়েছে বলে মনে হল। সঙ্গে পাঁঠার কল্‌জে ভাজা। লালটু পাঁড়ে সমানে জোগান দিয়ে যাচ্ছে। গণেশ মাস্টারের যেন আজ কী হয়েছে! বারে বারেই একই কথাতে ফিরে আসছে। নেশা হয়ে গেলে অনেককেই এরকম করতে দেখেছি। কিন্তু গণেশকে এর আগে বহুবার নেশা করতে দেখেছি; কিন্তু কখনও ঠিক এরকম মুডে দেখি নি। গণেশ বলল দড়াম্ করে, যাদের পয়সা আছে, অনেক পয়সা; তারা বোধহয় মনে করে পয়সা দিয়েই জীবনে সব পাওয়া যায়। আপনি কি বলেন সায়নদা?

আজ ও আমাকে নিয়ে যে কেন পড়েছে বুঝলাম না।

হঠাৎ? এ কথা?

উত্তর না দিয়ে ও আবারও বলল, অশিক্ষিত লোক যখন অনেক পয়সার মালিক হয়ে পড়ে তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করে তাই না?

তুমি হঠাৎ এত চটে উঠলে কেন? রোশনলালবাবু ত তোমার সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহারই করতেন! কিছু কি ঘটেছে? আমাদের সঙ্গেও ত কখনও খারাপ ব্যবহার করেন নি। এমন নিমকহারামী করছ কেন হঠাৎ?

আপনি ত ও'র দালাল।

দালাল কথাটা আজকাল খুব চালু হয়েছে। তুমি যদি বলে সুখ পাও ত বলো। একজন খারাপ মানুষ আমার একার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেই সকলের কাছে বা সকলের জন্যে সে ভালো হয়ে যেতে পারে না।

হলোটা কি?

যেটুকু আগে শুনলেন, সেটুকু কিছুই নয়। হয়েছে নিশ্চয়ই কিছু। তবে এখন থাক্। সময় হলে আপনি নিজেই জানতে পারবেন।

তারপর বলল, কিন্তু আপনি এ সম্বন্ধে কী বলেন?

বললাম, আমি কী বলব? তাছাড়া বলব কী সম্বন্ধে? আমার কিছু বলার নেই, তার চেয়ে বরং অন্য কথা হোক্।

বুঝলাম, আজ গণেশের প্রচণ্ড নেশা হয়ে গেছে। বোধহয়, খালি পেটে ছিল।

গজেনবাবু হাত দিয়ে গণেশকে থামিয়ে দিয়ে, হঠাৎ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললেন, আপনার তিতলির কী খবর?

'আপনার' কথাটার তাৎপর্য এড়িয়ে গিয়ে গজেনবাবুর দিকে ফিরে, একটু ভেবে বললাম, ভালোই। ও ছুটিতে আছে।

কিসের ছুটি? ম্যাটার্নিটি লিভ্ নাকি?

কথাটা শুনেই আমার সারা গা জ্বালা করে উঠল। হঠাৎ আমার মনে হল, কী কুক্ষণে এই চাকরিতে এত বছর এইসব জায়গাতে, এইরকম সব লোকেদের সঙ্গে পড়ে আছি? এরা এত নোংরা প্রকৃতির, এত ইতর, এতই ছোট এদের জগৎ, এদের চেনা-জানা ও পড়াশোনার গণ্ডী এত সীমিত যে এখানে থাকতে দম বন্ধ হয়ে আসে। অথচ এরাই আমার কাছের লোক—বন্ধুর মতো। বিপদে এরাই দৌড়ে আসে। এদের কাছেও দৌড়ে যাই আমি। কিন্তু লেখাপড়া না শিখলেই যে মানুষ খারাপ হয় একথা আমি কখনও বিশ্বাস করি নি। বরং উল্টোটাই করেছি। গজেনবাবু সম্বন্ধেও আমার ধারণা

অন্যরকম ছিল। তিনিই এমন একটা কথা বললেন, বলতে পারলেন আমাকে, যতই নেশা-গ্রস্ত হোন না কেন, তবুও? আমার মনে পড়ে গেল হাজারীবাগের চাত্‌রার জঙ্গলের একজন মুনশী আমাকে উপদেশ দিয়েছিল : "মালিক, পীনেওয়ালা আদমী ওর কাট্‌নে-ওয়ালা জানোয়ার সে হামেশাকে লিয়ে দূর মে রহিয়েগা।"

গজেনবাবু আবার বললেন, কি হল? চুপ করে রইলেন যে!

মুখ তুলেই বুঝতে পারলাম যে, আজ রাতে গজেনবাবু একা নন। নান্টুবাবু ও গণেশও যেন চোখে চোখে হাসাহাসি করছেন। আমাকে নিরুত্তর দেখে গণেশ আবার বলল, সায়নদা, আপনাকে একটা কথা বলব? আপনি যতখানি মহত্ত্ব বইতে পারেন তত-টুকুই বইবেন, তার চেয়ে বেশি মহৎ হবার চেষ্টা করবেন না।

আমি তখনও চুপ করেই ছিলাম!

নান্টুবাবু বললেন, নান্‌কুর সঙ্গে আপনার খুব বন্ধুত্ব না? নান্‌কুকে কি আপনি মদত দিচ্ছেন?

আমি? মদত দিচ্ছি? কিসের মদত?

অবাক হয়ে বললাম আমি।

এবারে গজেনবাবু বললেন, আজ রোশনলালবাবুর বডিগার্ডরা হঠাৎ কুলিটাকে ধরে এমন পেটাল কেন? কিছু কি বুঝতে পারলেন?

আরও অবাক হয়ে বললাম, না ত!

নান্টু বললেন, এই নান্‌কু এখানকার সব আদিবাসীদের এবং অন্যান্য জংলীদের নতুন সব মন্ত্র শেখাচ্ছে। ওদের খারাপ করে দিচ্ছে।

মন্ত্র যদি শেখায় তাহলে সুমন্ত্রই শেখাবে, কুমন্ত্র নয়। নান্‌কু করলে, ওদের ভালোই করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আপনার যে এই বিশ্বাস, তা আমরাও জানি। এবং জানি বলেই এত কথা!

আচ্ছা বাঁশবাবু, আপনি তিত্‌লিকে খুব ভালোবাসেন? কিরকম ভালোবাসেন?

এ প্রসঙ্গ থাক্‌ না।

কেন থাকবে? বলে গজেনবাবু ফুঁসিয়ে উঠলেন।

থাকবে, কারণ অপ্রাসঙ্গিক, তাই। অশোভনও বটে।

না। আপনাকে বলতেই হবে, তিত্‌লিকে কি আপনি পোষা কুকুর-বিড়ালের মতো ভালোবাসেন, না মানুষেরই মতো ভালোবাসেন?

তার মানে? আমি এবারে রেগে বললাম।

তিত্‌লিকে আপনি এতই ভালোবাসেন ত' বিয়ে করলেই পারেন। ওকে বিয়ে করে দেখাতে পারেন যে, আদিবাসীদের, জঙ্গলের এদের আপনি সত্যিই ভালোবাসেন। কিন্তু আমি এবং আমরা সকলেই জানি যে, আপনি তিত্‌লিকে বিয়ে কখনই করবেন না! হয়তো ওর সঙ্গে শোবেন। হয়তো শুচ্ছেনও আপনি নিয়মিত। আপনি ওকে ভোগে লাগাবেন। যেমন চিরদিন তাদের ভোগে লাগানো হয়েছে। আপনার সঙ্গে আমাদের কোনোই তফাত নেই বাঁশবাবু। আমার, আপনার এবং আমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য এবং লাভ-ক্ষতি একই। তিত্‌লির মতো লাজোয়ন্তী সুন্দরী মেয়েকে দাসী এবং রাখনি বানিয়ে, নান্‌কু ও তার দলবলকে মদত দিয়ে, নিজে যা নন তাই-ই হবার চেষ্টা করেছেন। একদিন আপনার অবস্থা ময়ূরপুচ্ছ-পরা কাকের মতো হবে। আপনি সাবধানে থাকবেন।

আমি সত্যিই বড় বিপদে পড়েছি মনে হল। এরা কী বলছেন, কেন বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। এমন কি গণেশও।

এমন সময় নিতাইবাবু সেরেস্তার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আগুনের কাছে এলেন। তিনি

নিজেকে বরাবরই একটু আলাদা মনে করেন। আমাদের মধ্যে কৌলীন্যে তিনি সবচেয়ে উঁচু। ব্রাহ্মণের সেরা ব্রাহ্মণ। তাই দশজন সাধারণের সঙ্গে নেশা-ভাঙ তিনি করেন না কখনও। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পা'টা সামান্য একটু টলল। নিতাইবাবু চেয়ারে ধপ করে বসে পড়েই বললেন, তোদের একটা শ্রীধর পাঠকের গান শোনাই—বলেই, রাতের বেলা ভৈরবীর সুর ভেঁজে তার নিজস্ব সুরে ও স্কেলে গান আরম্ভ করতেই অন্য সকলে থাক্ থাক্ এখন গান শোনার মুড নেই বলে থামিয়ে দিলেন।

গণেশ মাস্টার বলল, অ্যাই যে, নিতাইদা, আমরা সায়নদাকে অনুরোধ করছি তিতলিকে বিয়ে করতে।

নিতাইবাবুর যেন নেশা কেটে গেল।

বললেন, তিত্‌লি? কে তিত্‌লি? কোন্ তিত্‌লি?

নান্টুবাবু ও গজেনবাবু সমস্বরে বললেন, তিত্‌লি গো তিত্‌লি। বাঁশবাবুর মেইডসারভেন্ট্।

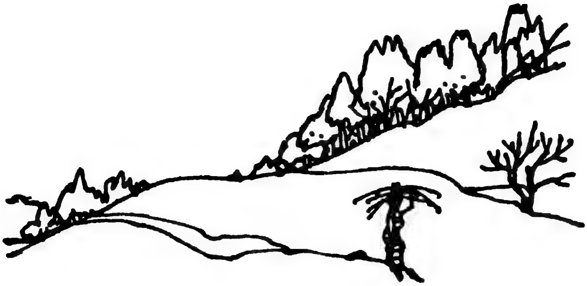
নিতাইবাবু চেয়ারের হাতলে সবে ধরতে যাওয়া গানের মুখটা তব্‌লার বোলে বাজিয়ে বললেন, বলিস কি রে? বিয়ে? কাহার মেয়েকে? বামুনের ছেলে হয়ে ছ্যাঃ ছ্যাঃ।

তারপর একটু থেমে, যেন বমি পেয়েছে এমন ওয়াক্ ওয়াক্ শব্দ তুলে বললেন, ছ্যাঃ ছ্যাঃ হ্যাঃ...

আমার সব যেন কেমন গোলমাল লাগতে লাগল।

আমি কী কোনো ষড়যন্ত্রের মধ্যে এসে পড়েছি? এরা সকলেই কি আমাকে নিয়ে এক দারুণ ঠাট্টার খেলায় মেতেছে আজ? পূর্ব-পরিকল্পিত ঠাট্টায়? এরা সকলেই ত আমার খুবই কাছের মানুষ ছিল। সুখের ও দুঃখের ভাগীদার, শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায়? কিন্তু—

কোথায় যেন এ ক'দিনে কিছু ঘটে গেছে। কোনো দুর্ঘটনা?



বিস্‌পাতিয়া আর শনিচারিয়া এই দুই বোনের মতো কুৎসিতদর্শন নারী খুব কমই দেখেছি। অবশ্য গড়বার সময় বিধাতা অসুন্দর করে গড়েন নি; এদের দুজনকেই গাড়ুর কাছে কোয়েলের পাশে, এক শীতের দুপুরে ভল্লুকে আক্রমণ করেছিল। তখন তাদের বয়স ছিল আট-নয়। মা-বাবা কেউই ছিল না। মামাবাড়িতে অনাদরে পালিত হচ্ছিল তারা। বিস্‌পাতিয়ার নাকের জায়গায় একটা বিরাট ক্ষত, ওপরের ঠোঁটটা নেই। তার নেই গালের ডানদিকের অনেকখানি। শনিচারিয়ার অবস্থা আরও শোচনীয়। তার একটি চোখ খুবলে নিয়েছিল ভল্লুকটা বড় বড় নখে এবং কানমলা দিয়েছিল দুটি কানেই। তাই কান থাকবার কথা ছিল যেখানে সেই দুটি জায়গাতেই দুটি বীভৎস গর্ত।

এই দু'বোনের কারোই বিয়ে হয় নি, বয়স এখন চল্লিশ পেরিয়েছে। ভালুমার এবং এবং আশেপাশের বস্তিতে এদের খুব নামডাক আছে ভাল ধাত্রী বলে। কাছাকাছি প্রায় সব বস্তির মেয়েরাই প্রসবের সময় এই দুই বোনের সাহায্য নেয়। এদের একজন দূর সম্পর্কের ভাইপো আছে। তার বয়সও হবে এখন তিরিশ। সেই-ই হাটে যায়, গোরু দেখে এবং ওদের সামান্য ক্ষেত-জমিন দেখাশোনা করে। ওদের দুজনেই, চেহারার বীভৎসতার জন্যে বাইরে বিশেষ একটা বেরোয় না, রাতেরবেলা ছাড়া। এবং প্রসূতিদের ডাক ছাড়া। এ অঞ্চলে কোনো নতুন আগন্তুক এদের দুজনের একজনকেও হঠাৎ জঙ্গলের পথে রাতে দেখলে ভূত-পেত্নী ভেবে অতি সহজেই অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

বিস্‌পাতিয়া আর শনিচারিয়ার, আগেকার দিনের বড় বড় শহরের অনেকানেক গায়নাকোলজিস্টেরই মতো, দুরকমের রোজগার আছে। এই রকমের তফাতটা কি এবং কোথায় তা একমাত্র ওরাই জানে। গোদা শেঠ এবং মাহাতো প্রায়ই ভালুমার কি অন্য কোনো কাছাকাছি গ্রামের অল্পবয়সী কুমারী এবং বিবাহিতা মেয়েদেরও নিয়ে আসে রাতের অন্ধকারে—গর্ভপাত করাতে। তখন মোটা বকশিস পায় ওরা দু'বোন। মাহাতো এবং গোদা শেঠ এই জঙ্গলের হায়না আর শেয়ালদেরই মতো। পর-উচ্ছিষ্ট গলিত, মৃত কুৎসিত অথবা দুর্গন্ধময় কোনোকিছুই ওদের রুচিতে বাধে না। তাই দুষ্টুলোকে বলে, যে-শারীরিক মিলনের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের বীভৎস চেহারার কারণে এই দুই বোন চিরদিনই বঞ্চিত থেকেছে, সেই আনন্দে মাহাতো এবং গোদা শেঠ এদের দুজনকেই ধন্য করে! এ বক্‌শিস, উপরি বক্‌শিস। ওদের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে ওদের খরচটা ওরা এইভাবে উশুলও করে নেয় কিছুটা।

আনন্দ বলতে এই একটিই আছে এখানে। সারাদিনের খাটুনির পর, কচিৎ বৈভবের খেসারীর ডাল আর রুটি খেয়ে ভগবানদত্ত খেলনা নিয়ে নিজেদের খেলবার বাক্স বের

করে খেলতে বসে ওরা। "ছোট পরিবার সুখী পরিবার", এসব এরা শোনে বটে ; কিন্তু বিশ্বাস করে না। পয়সা খরচ করে নিরোধ পর্যন্ত কেনার পয়সাও নেই এখানের লোকেদের। যাদের সে সামর্থ্য আছে, তাদের ইচ্ছে নেই। প্রকৃতির মধ্যে বাস করে কোনো অপ্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতে তারা বিশ্বাস করতে ভয় পায়।

এই বিস্‌পাতিয়া শনিচারিয়ার কাছেই গোদা শেঠ নিয়ে এসেছিল পাঁচবছর আগে বুল্‌কির বড় বোন জীরুয়াকে! বড় হাসিখুশি প্রাণবন্ত মেয়ে ছিল জীরুয়া। যখন বাসন্তী রঙা শাড়ি পরে, চক্‌চকে কালো সাপের মতো চিকন জীরুয়া, মুখে করোঞ্জ তেল মেখে কাঁকড়ের মালা পরে, চুলে ফুল গুঁজে হাটে যেত, তখন অনেক লোকই চেয়ে থাকত তার দিকে। বিয়ে দিয়েছিলাম মানি আর মুঞ্জরী একজন সর্দারজী ঠিকাদারের কুপ-কাটা কুলিদের মেট-এর সঙ্গে ওর। একটু বেশি বয়সেই বিয়ে হয়েছিল। প্রায় আঠারোতে। বিয়ের পরই যখন প্রথম ফিরে আসে জীরুয়া, তখন গোদা শেঠ তাকে ফাঁসায়-জোর করে। খবরের কাগজের ভাষায় যাকে পাশবিক অত্যাচার বলে, তাই করে। পশুদের যতটুকু জানি, তারা ঠিক এ ধরনের মানবিকতার মহত্ত্ব থেকে বঞ্চিত। এই উপাধি দিয়ে পশুদের যে কেন বিনা-কারণে ছোট করা হয়, বুঝতে পারি না।

ভীত এবং অসহায় জীরুয়া নতুন এবং প্রেমময় স্বামীর কাছে লজ্জায় মুখ দেখাবে না ভেবে গোদা শেঠের পরামর্শ মেনে বিস্‌পাতিয়া আর শনিচারিয়ার কাছে আসে। কিন্তু তাদের ওষুদ খাওয়ার তিনদিন পর পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় কঁকিয়ে কেঁদে জীরুয়া মরে যায়। মানি-মুঞ্জরী ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিল শুধু। কিন্তু ঠিক কখন হাট-ফিরতি জীরুয়াকে ঝাঁঝর নালার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে তার সস্তা হলুদ ছিটের ব্লাউজের মধ্যে একটা লাল-রঙা দুটাকার নোট গুঁজে দিয়ে গোদা শেঠ ওর সর্বনাশ করেছিল তা মৃত্যুর মাত্র কিছু-ক্ষণ আগে স্রাব-সিক্ত জীরুয়া ওর মা-বাবাকে বলে। বিস্‌পাতিয়া ও শনিচারিয়ার কথাও বলে। এবং তারপরই হঠাৎ মারা যায়।

আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ের এমন মর্মান্তিক মৃত্যু হল, অথচ মানি-মুঞ্জরী কোনো প্রতিবাদ করতে পারলো না। গোদা শেঠ-এর বিরুদ্ধে এমন সাংঘাতিক অভিযোগ আনলে এখানে তারা আর থাকতে পারত না। শেঠের চোখদুটো সবসময় লাল হয়ে থাকে, ফর্সা বেঁটে গোলগাল চেহারা। লোকটার চোখের দৃষ্টিতে মুঞ্জরী চিরদিন ঘেন্না করে এসেছে। যখন ও নিজে হাটেবাজারে যেত, তখন গোদা শেঠ একা পেয়ে মুঞ্জরীকেও এক-দিন প্রস্তাব দিয়েছিল। মুঞ্জরী তখন এরকম রুখু-শুখু হয়ে যায় নি! এক সময়ে ভালুমার বস্তিতে মুঞ্জরীরও খ্যাতি ছিল সুন্দরী হিসাবে। তাই গোদাকে দেখলে জীরুয়ার কথা মনে পড়ে যেত, আর তার বুকের গভীরে প্রোথিত একটা ঘিন্‌ঘিনে ঘৃণা ওর বুক ঠেলে অগ্ন্যুৎপাতের মতো বেরিয়ে আসতে চাইত।

জামাই এসেছিল জীরুয়ার মৃত্যুর খবর পেয়ে। বুল্‌কিটা আর একটু বড় হলে বুল্‌কির সঙ্গে বিয়ে দিত ওরা। কিন্তু তখন বুল্‌কি খুবই ছোট ছিল। সে সব দিনের কথা ভাবে না আর মানি-মুঞ্জরী। কিন্তু জীরুয়ার শোকটাই ওদের দুজনকে একেবারে ভেঙে দিয়ে গেল। শরীরে, মনে। মানিয়ার হাড়ের মধ্যে কেমন একরকমের ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। তাই নানকু আজ মানিয়াকে সাহস জাগানো, আত্মসম্মান জাগানো ; থাপ্পড় মারলেও বুকের মধ্যে সেই ভয়টা নড়ে না। নড়বেও না, মরবেও না, মানি, যতদিন নিজে না মরে। মানি, একথা মেনেই নিয়েছে যে, আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে ক'জন আর পারে? তেমন বাঁচার বরাত করে আসে নি ও এ জীবনে।

রাত হয়েছে ন'টা-দশটা। ভালুমারে ন'টা-দশটা গভীর রাত। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। একটা প্রকাণ্ড জংলী মহানিমের গাছের নীচে বিস্‌পাতিয়া আর শনি-

চারিয়ার বাড়ি। সামনে কাঠের বেড়া-লাগানো এক ফালি উঠোন। ওদের বাড়ির ঠিক সামনেই একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ পড়ে। অনেক শাখা-প্রশাখা ঝুরি। তার ফোকরে থাকে একজোড়া শঙ্খচূড়। গরম পড়লেই তারা রাস্তার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে। কখনও বা লেজে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে উঠে মিলিত হয় রাস্তার ওপরেই। তখন কেউ কাছে এলেই বিপদ। রামধানীয়া চাচার বড় ছেলেকে আধমাইল তাড়া করে নিয়ে গিয়ে এই জোড়া শঙ্খচূড় তার পিঠে কামড়ে দিয়েছিল। পিঠে কামড়াতে, বাঁধন দেবার সময় বা সুযোগও আসে নি। শক্এই মারা গেছিল সে। নিজে স্বয়ং গুণিন্ হয়েও বাঁচাতে পারে নি ছেলেটাকে। টুসিয়া আর তার মা ঐ জোড়া সাপের কথা জেনেশুনেই অন্ধকারে হেঁটে এসেছিল অশ্বত্থ গাছ অবধি। ভরসা ছিল, গরম এখনও পড়ে নি। তবু গাছের সামনে পৌঁছবার আগেই আঁচলের আড়াল করে লণ্ঠনটা জ্বালল।

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে এইসব অঞ্চলে অলিখিত সান্ধ্য আইন জারি হয়ে যায়। যদিও পুলিশকে বা মিলিটারিকে টহল দিয়ে বেড়াতে হয় না পুরো এলাকা। এদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতা, এদের অসুবিধা, রাতের বাঘ, বাইসন, হাতি, ভল্লুক এবং সাপের ভয় ত আছেই, তাছাড়া কুসংস্কার এবং অতিপ্রাকৃত কত কিছুর ভয়। অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বারান্দা বা বড় জোর উঠোন থাকলে, উঠোনে বসে থাকে চৌপাইতে ওরা খাওয়া-দাওয়ার পর। পরদিন আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে উঠেও পড়ে। ওদের জীবন বাঁধা ; সূর্যের সঙ্গে।

লণ্ঠনের আলোয় টুসিয়া মার মুখের দিকে তাকায়। যে মা, তাকে এক মাস ধরে সুন্দর করে তুলেছিল, চুল বেঁধে দিয়েছিল, করৌঞ্জ আর নিমের তেল মাখিয়েছিল মুখে, যে মায়ের মুখ আশা আর আনন্দে সব সময় ঝলমল করত সেই মায়ের মুখে আজকে ঘেন্না আর গ্লানি। আর ভয়। যে-ভয়ের কোনো ব্যাখ্যা হয় না। যে-ভয়ের স্বরূপ অন্তঃসত্ত্বা কোনো কুমারী মেয়ের মায়ের পক্ষেই একমাত্র জানা সম্ভব।

মান বাঁচাতে গিয়ে মেয়েটাকে বাঁচাতে পারবে ত টুসি-লগনের মা? নাকি এমন মহুয়া ফুলের মতো মিষ্টি মেয়ে টুসি মরেই যাবে। মরে যাবে জীরুয়ারই মতো? জীরুয়ার কথা কানাঘুষোয় শুনেছিল সে। এত ছোট্ট বস্তিতে কোনো কথাই চাপা থাকে না। জানতে পারে সকলে সবকিছুই। শালীনতা ও ভব্যতার কারণে ভাব দেখায় যে, জানে না। টুসিয়ার কথাও কি সকলে জেনে যাবে? পুলিশ সাহেবের বোন টুসিয়া তার ছেলে হল গিয়ে কত বড় অফসর। আর আজ তারই মেয়ের জন্যে তাকে এইভাবে এতবড় ঝুঁকি নিতে হচ্ছে। কী ছেলেই পেটে ধরেছিল হীরুর মা। ধন্য হীরু! ধন্য হীবুর বন্ধু!

বিস্‌পাতিয়া আর শনিচারিয়ার বাড়ির প্রায় সামনেই যখন পৌঁছে গেছে ওরা, ঠিক সেই সময় ঘরের দরজা খুলে গেল। খোলা দরজার আলোতে দেখল, মাহাতো বেরিয়ে এল ঘর থেকে, পিছন পিছন গোদা শেঠ। আর তার পিছনে টিহুলের বউ। টুসিয়া জানত যে, সে লাতেহারে আছে। কবে ফিরে এসেছে সেই-ই জানে। উজ্জ্বল টর্চের আলোর বন্যা বয়ে গেল চারপাশে। টুসি আর টুসির মা লুকোতে চেষ্টা করল জঙ্গলের মধ্যে, কিন্তু ততক্ষণে উঠোনের বেড়াতে হেলান দেওয়া দুটো সাইকেল তুলে নিয়ে মাহাতো আর গোদা বাইরে চলে এসেছে।

আলোটা প্রথমে টুসির মুখেই পড়ল। যে-মুখ মানুষ যখন সবচেয়ে বেশি লুকোতে চায়, ঠিক তখনই সেই মুখ আলোকিত হয়।

মাহাতো সাইকেলটাতে না চড়ে, হাতে ধরে এগিয়ে এল। ভালো করে আলো ফেলল এদিক—ওদিক। হঠাৎই আলো পড়ল টুসির মুখে। টুসির মা গাছের আড়ালে

সরে দাঁড়াতে তাকে দেখতে পায় নি মাহাতো। টুসি কংক্রীটের খুঁটির মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাহাতো হঠাৎ তার থুত্‌নি ধরে নেড়ে দিল। বলল, লাইন পর তুম্‌ভী অগ্যায়ী। হীরু সিংকা বহীন্‌। খায়ের। মিলুগা কোই রোজ! গোদা শেঠ ভরপেট পচা-মাংস খাওয়া শেয়ালের মতো একটা ফ্যাক্‌ ফ্যাক্‌ হাসি হাসল। তারপর টিহুলের বৌকে পিছনের ক্যারিয়ারে বসিয়ে আগে গোদা শেঠ এবং পরে মাহাতো নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করতে করতে যার যার সাইকেল চড়ে পাথুরে পথে টায়ারে কির্‌ কির্‌ আওয়াজ তুলে চলে গেল।

লগনের মা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল মাহাতো আর গোদা শেঠের এলেম আছে। টিহুলের বাঁজা বউটাকেও গাভীন্‌ করে দিল এরা। আজীব বাত্‌: সেত চলেই গেছিল। ধরে আনল কোথা থেকে?

ওবা চলে যেতেই অশ্বত্থ গাছটার ফোকর থেকে, যে-ফোকরে জোড়া শঙ্খচূড় থাকে বলে ওরা জানত, লাফিয়ে নামল নান্‌কু।

নেমেই, ঠাস্‌ করে এক চড় কসালো টুসিয়ার গালে।

টুসিয়া কথা বলল না। ঠোঁটে ঠোঁটে কামড়ে ধবল! দুচোখ বেয়ে জল বইতে লাগল!

বিস্‌পাতিয়া আব শনিচারিয়ার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। খুব সম্ভব ওরা বুঝতে পারে নি টুসিয়াদের আসার কথা।

নান্‌কু, টুসির বাহু ধরে ওকে পথ দেখিয়ে শনিচারিয়াদের বাড়ি থেকে দূরে নিয়ে চলল। পিছনে পিছনে লজ্জায়, অপমানে বাক্‌রুদ্ধ টুসিব মা আসতে লাগল! একটু দূরে গিয়েই, পথের পাশের একটা ঝোপ থেকে ওর লুকিয়ে রাখা সাইকেলটা টেনে বের করল নান্‌কু। টুসিকে হ্যান্ডেলে বসাল। তারপর টুসির মাকে পিছনের ক্যারিয়ারে বসিয়ে নিয়ে অন্ধকারের ভুতুড়ে সাদা পথ দিয়ে সাইকেল চালাতে লাগল। সাইকেলে আলো নেই ওর। টর্চও জ্বালালো না।

কেউ কোনো কথা বলছিলো না। হ্যান্ডেলের ওপর-বসা টুসিয়ার কোমর, উরু ও হাতের ছোঁয়া নান্‌কুর গায়ে লাগছিল। খুব ভালো লাগছিল নান্‌কুর। কিন্তু বড় লজ্জা করছিল টুসির। এ জন্মে ত কিছুই দিতে পারল না নান্‌কুকে। অন্য সব মেয়েরা নিদেনপক্ষে যা দিতে পারে, দেয়, সেটুকুও নয়। সেটুকুও লুটিয়ে দিয়ে এল অন্য-খানে।

কিছুদূর এসে নান্‌কু বলল, কি মাসী? মেসো জানে এ কথা?

মেসো? জানলে, কেটে ফেলবে। টাঙির কোপে আস্ত টুকরো করে ফেলবে মা-মেয়ে দুজনকেই।

মেসো লোকটা মরদের বাচ্চা? আমার মানিয়া মেসোর মতো নয়।

মানিয়াই কি আর এরকম ছিল। আহা, ওর জুরীয়াটা। আর ঐ গোদা শেঠ। তার-পরই বলল, নান্‌কু, তুই জানলি কী করে টুসির...কথা, আর আমরা যে আজ এখানে আসব?

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল ও, আমার সব খবর রাখতে হয়।

টুসির মায়ের খুব রাগ হচ্ছিল, নান্‌কুর ওপর। সবই যদি জানে, তাহলে এইটুকুও কি নান্‌কু বোঝে না যে, এছাড়া টুসির আর কোনো পথ খোলা নেই? ভালো করতে পারে না, মাতব্বরি করার কে ও? ওর কথাতেই চলতে হবে নাকি ওদের? ছোক্‌রাটা ভাবে কি? ভাবে কি নিজেকে?

আমাদের তুই জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে এলি কেন? আমাদের কাজ ছিল ওখানে।

উপায় আর কি আছে? কেন, তুই যেতে দিলি না?

ধমকের সুরে নান্‌কু বলল, আমার ইচ্ছা।

তোর ইচ্ছাতেই কি আমাদের চলতে হবে?

হ্যাঁ। যারা নিজেদের ইচ্ছায় চলতে শেখোনি ভাল করে, তাদের আমার ইচ্ছাতেই চলতে হবে।

একি তোর হুকুম?

হ্যাঁ! হুকুম।

আ-চ্ছা! বড় ওস্তাদ হয়েছিস দেখছি ত তুই। জানিস্ আমার হীরু পুলিশ সাহেব! তোকে আমি...!

ও নাম তুমি মুখেও আনবে না মাসী! তুমি আর হীরুর মা নও। ভালুমারের হীরু মরে গেছে। তুমি টুসির মা, লগনের মা।

একটু থেমে বলল, আমার ত মা নেই, তুমি আমারও মা।

সাইকেল চলতে লাগল অন্ধকারে। বাঁ দিকে পথের পাশ দিয়ে কী একটা জানোয়ার হড়্ বড়্ খড়্ বড়্ আওয়াজ করে নীচে নেমে গেল।

কী ওটা?—টুসি শুধোলো আতঙ্কিত গলায়।

কিছু না। একটা বাইসন দাঁড়িয়েছিল। মস্ত বাইসন।

রাস্তার ডানদিকে দূরে শ্মশানের দিক থেকে নিদিয়া নদীর ওপার থেকে ফেউ ডাকতে লাগল বার বার। টুসিয়ার মা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, বাঘ বেরিয়েছে? না রে নান্‌কু...?

বলতে না বলতেই হুঁ-আঁ-উঁ-উঁ-আঁ-ম্ করে বাঘের ডাক ভেসে এল রাতের অন্ধকারে।

নান্‌কু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, হুঁ। তোমার ভয় করছে না'কি মাসী?

বাঘকে ভয় করবে না?

নান্‌কু গভীর আক্ষেপের গলায় বলল, তোমরা না মা! তোমরাই ত এই গোদা শেঠ আর মাহাতোদের বাড়তে দিয়েছো। তোমরা বাঘের জন্ম দিতে পারো না? ঘরে ঘরে কেবল ফেউ—ফ্যাঁচ্‌চ্ ফ্যাঁচ্‌চ্ করে কাঁদে। তোমাদের নিজেদের ঘরে ঘরে বাঘ থাকলে আর বনের বাঘকে ভয় পেতে না।

টুসির মা চুপ করে রইল। টুসিও।

নান্‌কুর প্রসারিত দু'হাতের মধ্যে ও শরীরটাকে সংকুচিত করে বসে আছে। হীরু আসার আগে একদিন মীর্‌চা-বেটিতে জঙ্গলের ছায়াতে পুরোপুরি জংলী হয়ে চান করার সময় নান্‌কু তাকে দেখে ফেলেছিল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল টুসিয়ার। কোনো মানুষ কারো শরীরে শুধু তার চোখের চাউনি ছুঁইয়ে দিয়ে যে এমন জ্বালা ধরাতে পারে তা জানত না টুসি। আসলে সেই মুহূর্ত থেকে নান্‌কুকে এক বিশেষ ভয় করতে শুরু করেছিল ও। একটা ভীষণ ভালোলাগা-মেশানো ভয়। মাঝে, সবকিছুই যে কেন এমন সাংঘাতিকভাবে গণ্ডগোল হয়ে গেল, সব কেন যে শেষ হয়ে গেল এমনভাবে! হঠাৎ, ও নিজেরই অজান্তে, হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে নান্‌কুর বুক আর ছড়ানো দুটি হাতের মধ্যে মাথা হেলিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, আমি আত্মহত্যা করব। আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনো পথই আর খোলা নেই।

ধমক দিয়ে নান্‌কু বলল, কাপুরুষেরা আত্মহত্যা করে।

আমি তাই। কাঁদতে কাঁদতে বলল টুসি।

তাহলে তোর ছেলেও কাপুরুষ হবে।

আমার ছে...? এটুকু বলেই, টুসি আবারও ভেঙে পড়ল কান্নায়।

টুসির মা বলল, থাক্ টুসি। আমরা বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছি। তোর বাবা শুনতে পেলে আমাদের মাথা আর আস্ত থাকবে না। এতক্ষণে মহুয়ার নেশা ছুটে গেলেও যেতে পারে। নান্কু লম্বা লম্বা দুটি পা মাটিতে নামিয়ে দিয়ে ব্রেক কষে, একটি গাছের ছায়ায় দাঁড় করাল সাইকেলটাকে—যেখানে রাতের অন্ধকার অন্ধকারতর। টুসি আর টুসির মা নামল। নেমে, একবার নান্কুর দিকে চেয়ে বাড়ির দিকে এগোল।

নান্কু ডাকল, মাসী। টুসি যেখানে দাঁড়িয়েছিল দাঁড়িয়েই রইল।

আজ থেকে তুমি এক নতুন ছেলে পেলে মাসী। হীরুর মতো বিদ্বান ছেলে নয়, সাধারণ, অতি সাধারণ, এই বস্তির ছেলের মতো আরেকজন ছেলে। আজ থেকে তোমাকে আমি মা বলে ডাকব। বাঘকে আর ভয় পেয়ো না মা। কখ্খনো না। বুঝেছো। আর শোনো। একটা ভালো দিন ঠিক করো। টুসিকে আমি বিয়ে করব। গাঁয়ের লোকদের বোলো যে, মালা-বদল করে গান্ধর্ব মতে আমাদের বিয়ে অনেক আগেই হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান পরে হচ্ছে। আর...। সকলেই বুঝে নেবে বাকিটা।

একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার ত কোনো আত্মীয় নেই। তোমরাই আমার সব! যখন বরাত আসবে, মাত্র দুজন মেহামান থাকবে আমার। পাগলা সাহেব আর বাঁশবাবু। বুঝলে!

বলেই, বলল, আমি চললাম।

যাবার আগে টুসির মাকে তার শক্ত দুহাতে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেল শব্দ করে নান্কু। ব্যাপারটার অভাবনীয়তায় চমকে উঠল টুসির মা। টুসির মায়ের সারা শরীরে কেমন যেন একটু কাঁপুনি উঠল, মাঝরাতের হাওয়া-বওয়া জঙ্গলে যেমন ওঠে। এক আশ্চর্য অনুভূতি, একেবারে নতুন একটা অভিজ্ঞতা। স্বামীর সোহাগে যা কখনও হয় নি, ছেলের আলিঙ্গনেও যা হয় নি, তার কাছে পরপুরুষ, তার ভাবী-জামাইয়ের গালের চুমুতে তাই-ই হল। টুসির মা জীবনে এই প্রথম বুঝতে পারল, স্বামী পাওয়ার মতো, ছেলে পাওয়ার মতো, জামাই পাওয়াটাও প্রত্যেক নারীর জীবনে এক দারুণ অভিজ্ঞতা। এক অবশ ভালোলাগায় ভরে রইল টুসির মা, শরীর মনের অণু-পরমাণুতে।

অন্ধকারে টুসি দাঁড়িয়েছিল। সবই শুনেছিল ও। ওর দুচোখ বেয়ে ঝরঝরিয়ে জল ঝরছিল। অন্ধকারে, কোরা রঙের ধুলোর রাস্তাটাতে সাইকেলের অন্ধকারতর ছায়াটা, চাকার কিরকির র্ র্ র্ শব্দটা একসময় মিলিয়ে গেল। সেই রাতের অন্ধকারে তাকিয়ে হঠাৎই টুসির মনে হল যে, খুব আস্তে আস্তে, কোমরে সামান্য দোলা তুলে একটা বড় বাঘ যেন চলে যাচ্ছে ধুলোর পথ বেয়ে। একদিন দেখেছিল ও একটা বড় বাঘকে চলে যেতে ঠিক এমনি করে, বাবার সঙ্গে মহুয়াডাঁর থেকে ফিরে আসার সময়।

শব্দটা ছায়াটা মিলিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। তবুও যেদিকে নান্কু চলে গেল টুসি সেই দিকেই চেয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। অনেকই কথা ছিল নান্কুর সঙ্গে। অনেক কিছু বলার ছিল। শোনার ছিল। কিন্তু নান্কুর কি সময় হবে? নান্কু কি জানে, কতখানি ঠকাচ্ছে নান্কু নিজেকে এবং যে আসছে তাকেও?

টুসির মা ভাবছিল, টুসিটা খুব ভাগ্যবতী।

হঠাৎ কী মনে হওয়ায় টুসির প্রতি টুসির মা এক তীব্র ঈর্ষা বোধ করতে লাগল। মানুকুর চুমুটা তার গালে তখনও নরম হয়ে লেগে ছিল। বিরক্তিমাখা ধমক দিয়ে বলল, পা চালিয়ে চল্ না মুখপুড়ি। মেয়েকে যেন পরীতে ভর করেছে। ঢঙ্ দেখলে গা জ্বালা করে।



বাতাসে একটা রুখু রুখু ভাব। পাতা ঝরতে শুরু করবে কিছুদিন ক'দিন পর। গরীব গুবরো মানুষরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে। শীতে বড় কষ্ট পায়। তবে উড়িষ্যার জঙ্গলের মতো গরীব নয় এরা।

একবার উড়িষ্যার অংগুল ডিভিশানে মহানদীর পাশের পুরুনাকোটটুম্বকা লবঙ্গী এবং অন্যান্য নানা জঙ্গলে গিয়ে থাকতে হয়েছিল মালিকেরই কাজে। বাঁশের নয়: কাঠের কাজে। ঐ অঞ্চলে যত বড় বড় সেগুন গাছ দেখেছিলাম তেমন বোধহয় আসামের ও ডুয়ার্সের কিছু কিছু জায়গা এবং মধ্যপ্রদেশ ছাড়া দেখা যায় না। আর দেখেছিলাম বাইসন এবং শম্বর। অতবড় বাইসন ও শম্বর আমাদের এইসব এলাকায় দেখাই যায় না। একটা বাইসন দেখেছিলাম, তার গায়ের কালো রঙ বয়সের ভারে পেকে বাদামী হয়ে গেছে! দেখে মনে হয়, কোনো প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার। মন্থর তার পদক্ষেপ, ঘোলাটে তার দৃষ্টি। অরণ্য-পৃথিবীর কোনো ঘটনাই তাকে আর পীড়িত বা আনন্দিত করে না বলে মনে হয়েছিল।

মানিয়া আমগাছতলায় মাদুর পেতে বসেছিল। মুঞ্জরীকে দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে রান্নায় ব্যস্ত। বুলকি আর পরেশনাথ ক্ষেতে কাজ করছে। বসন্তের মিষ্টি রোদে চারদিকের মাঠ, টাঁড়, বন প্রান্তর ভরে গেছে। এদিকে-ওদিকে পাহাড়ে-ঢালে একটি দুটি করে অশোক শিমুল আর পলাশের ডালে ডালে পহেলী ফুল তাদের ফুটি-ফুটি লজ্জায় লাল মুখ বের করেছে সবে। আর মাসখানেকের মধ্যেই চারদিকে লালে লাল হয়ে যাবে। বনবাংলোর হাতার সব ক'টি কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়ার ডালে লাল হলুদ বেগুন সামিয়ানা বাঁধবেন প্রকৃতি নিজে হাতে। কোনো কামার্তা অবুঝ যুবতীর শরীর-মনের সব ঝাঁঝ ঠিকরে বেরুবে তখন প্রকৃতির মধ্যে থেকে। তারপর প্রেমের বার্তা নিয়ে আসবে বর্ষা। বসন্তে ঋতুমতী প্রকৃতি বর্ষার ঔরসে অভিষিক্ত হয়ে সুধন্যা করবে নিজেকে। তখন মাটিতে লাঙল দেবে ওরা। ক্ষেতে লাঙল দেওয়ার মধ্যে বোধ-হয় এক ধরনের প্রাগৈতিহাসিক যৌনতা আছে, যেমন শেকস্‌পীয়র বলেছিলেন—"Ceaszar ploughed Cleopetra...। লাঙলটা পৌরুষের প্রতীক, আর মাটি, প্রকৃতি হচ্ছে নারীত্বের প্রতীক। এতসব মানিয়া জানে না। কিন্তু বই-পড়া বিদ্যার চেয়েও অনেক গভীর ও তাৎপর্যময় বিদ্যা আছে মানির মতো একজন সাধারণ অশিক্ষিত বন-পাহাড়ের মানুষের। সহজাত শিক্ষা, যুগযুগান্ত থেকে পূর্ব-পুরুষদের মুখে মুখে ও ব্যবহারে পরিশীলিত হয়ে আসা এক আশ্চর্য দেশজ শিক্ষা। সেটাকে কখনই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নিজে যতই গরীব হোক না কেন, অতিথি জল চাইলে যে তাকে শুধু

জল দেওয়া যায় না, সঙ্গে একটু ভেলী গুড় দিতে হয় এবং তাও না থাকলে, নিদেন-পক্ষে একটু শুকিয়ে-রাখা আমলকী, এটা পুরোপুরিই ভারতীয় সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি আজ আর শহরে বেঁচে নেই। আসল ভারতবর্ষ এখনও বেঁচে আছে মানি-মুঞ্জরীদের সংস্কারে, ব্যবহারে, নম্র শালীনতায়, আর ভগবৎ-বিশ্বাসে। একজন সাধারণ, অতি-গরীব, তথা-কথিত শিক্ষায় অশিক্ষিত গ্রামীণ ভারতীয়র মতো ভালো ও সৎ মানুষ পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে বোধহয় পাওয়া ভার। শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝে এসেছি এতদিন, তা ইংরিজী শিক্ষা। যে শিক্ষায় ইংরেজরা আমাদের শিক্ষিত করে গেছে এবং যে-শিক্ষার গর্বে আমরা এইসব মানুষদের অশিক্ষিত বলে ঘৃণা করে এসেছি, আসলে সেটা আদপে শিক্ষাই নয় হয়তো। সেদিন রথীদার কাছে একটা বই দেখলাম। লর্ড ওয়াভেল, ভারতের গভর্নর জেনারেল, ইংল্যাণ্ডের রাজা জর্জ দ্য সিক্সথ্‌কে তাঁর ফেয়ারওয়েল লেটারে লিখেছেন: Education is the field where we have done worst in India, I believe, because we have provided education for the mind only and not the character. As a result the average educated Indian has little character and no discipline. They will have to learn both if they are ever to become a nation.

চরিত্র বা জাতীয় স্বাতন্ত্র বলতে যা বোঝায়, তেমন স্বতন্ত্র কিছুই গড়ে ওঠে নি স্বাভাবিক কারণেই। দেশের মানুষের যে রকম চরিত্র থাকলে দেশকে ভিয়েতনাম করে তোলা যায়, অথবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গুঁড়ো হয়ে যাওয়া জার্মানী বা জাপানের মতো নতুন করে গড়ে নেওয়া যায়, আমি সেই চরিত্রর কথা বলছি। যাঁরা এদেশে ইংরিজি শিক্ষা চালু করেছিলেন, তাঁদেরই এক প্রতিভূ দুশো বছর পরে স্বীকার করলেন যে, ইংরিজি শিখিয়েছি বটে, কিন্তু চরিত্রসম্পন্ন মানুষ বলতে যা বোঝায়, তা তৈরি করতে পারি নি আমরা। তারা ত করেন নি, হয়তো তাঁদের নিজেদেরই স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই। কিন্তু আজ এত বছর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও প্রকৃত শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, সেই শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় চরিত্রের মানুষ ক'জনই বা দেখতে পাই আমরা?

মানি গর্বের চোখে চেয়ে ছিল পরেশনাথের দিকে। তার বংশধর। মুখে আগুন দেওয়ার জন। বুড়ো বয়সের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, লাইফ ইনস্যুরেন্স। এত সব মানি বোঝে না—কিন্তু মানির মনে এই মুহূর্তে যে ভাবনা স্থির হয়ে এই রোদ্দুরের মতোই উষ্ণতায় ভরে দিচ্ছিল তাকে, তা অনেকটা এইরকমই। দেখতে দেখতে তার ব্যাটা জোয়ান হবে। তার কাঁধ থেকে কাজের জোয়াল তুলে নিয়ে তাকে মুক্ত করবে। বউ আনবে ঘরে। ছেলে বউ-এর সেবা খেয়ে, বুড়ো বয়সে রোদে বসে, ছানি পড়া চোখে, দূরের চিরচেনা পাহাড়-জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক গভীর একান্ত পরি-পূর্ণ ভারতীয় সুখে সে একদিন চোখ বুঁজবে। মৃত্যুও যে কত শান্তির, কত আশ্বাসের, কত স্বাভাবিক, তা এইসব মানুষই জানে। যাদের পৈতৃক সম্পত্তি নেই, কিন্তু দায় আছে, যারা বাবার ব্যাঙ্কের টাকা ও বাবার সম্পত্তির জোরেই বাবাকে ভালোবাসেনি কোনোদিন, নিছক বাবা বলেই বেসেছিল, যারা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পারিবারিক সারল্য, নম্রতা ও শ্রমের ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই চায় নি, পায়ও নি, সেই গ্রাম-জঙ্গলের ভারতবাসীরাই একমাত্র তা জানে।

দূর থেকে মানি আমাকে দেখতে পেয়েই, উঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু উঠতে পারল না। পারার কথাও নয়। মানি যে বেঁচে গেছে এযাত্রা, তা ওর অশেষ সৌভাগ্য। দুপুরবেলা চুরি করে কাঠ কাটতে গেছিল ও হুলুক্‌ পাহাড়ের নীচে। সেখানে বাঘেদের নিরবচ্ছিন্ন মিলন ও প্রজননের সুবিধার জন্যে কারো যাওয়া একেবারেই মানা। ঠিকা-

দারদের কাজ একটি বিশেষ এলাকাতে পুরোপুরি বন্ধ। সে-কারণে, চুরি করে কাঠ-কেটে শুঁড়িপথ দিয়ে বয়ে নিয়ে আসার, এমন ভাল জায়গাও এখন আর নেই। ফরেস্ট গার্ডরাও সেখানে যায় না বিশেষ, এক যারা বাঘেদের হিসাব-নিকাশ রাখে, তারা ছাড়া। তারাও রোজ থোড়াই যায়! পাকদণ্ডী দিয়ে নেমে আসছিল মানিয়া হরজাই কাঠের একটা বড় বোঝা মাথায় করে। হঠাৎ বাঘের গর্জনে থমকে দাঁড়াল ও। বিরক্ত বাঘের গর্জন গভীর বনের মধ্যে নিরস্ত্র অবস্থায় যে মানুষ না শুনেছে তার পক্ষে তার ভয়াবহতা অনুমান করাও অসম্ভব। দিল্লী-বোম্বে-কোলকাতার বিদগ্ধ ওয়াইল্ড-লাইফ-কনসার্ভেশনের শৌখিন প্রবক্তারা বোধহয় এই মানি বা টেট্রা বা অন্যদের কথা একেবারেই ভাবেন নি। যেসব মানুষ বাঘেদের সঙ্গেই জন্মায়, বড় হয় এবং মারা যায় তাদের কথা ভাবলে বাঘ বাড়াতে গিয়ে যে অনেক মানুষের প্রাণ নিধন হচ্ছে আক্ষরিক অর্থে অনাহারে ; একথা তাঁরা হয়তো বুঝতে চেষ্টা করতেন। এ এক আশ্চর্য দেশ! বড় বড় শহরের বাসিন্দাদের এ্যানিম্যাল লাভারস্ সোসাইটির সদস্যরা পথের কুকুরের পশ্চাৎদেশে কেউ লাথি মারলে সেই শোকে কেঁদে ককিয়ে মরেই যান অথচ সেই তাঁরাই ফুটপাথে মানুষ মরে পড়ে থাকতে দেখলে বিচলিত হন না। রাতের পর রাত ক্রমান্বয়ে, দুটি রুটির জন্যে পাশবিকভাবে অত্যাচারিত হতে হতে বীভৎস রোগাগ্রস্ত কুকুরীর চেয়েও জঘন্যতর পরিণতিতে কোনো নারী পেঁছিলেও কারো তাতে কিছুমাত্র আসে যায় না। এসব চোখেও পড়ে না আমাদের। জানোয়ারদের, তা সে গৃহপালিতই হোক, আমি কারো চেয়েই কম ভালোবাসি না, কিন্তু মানুষদেরও যে ভালো না বেসে পারি না। তাই-ই এই বিরাট ক্রিয়া-কাণ্ডে যখন এদের কথা একেবারেই ভাবা হয় না তখন এক প্রচণ্ড আক্রোশ হয়। এ রকম ছিলাম না আমি। জঙ্গলে পাহাড়ে যৌবনের প্রায় পুরোটাই কাটিয়ে আমার সম্পূর্ণ অজানতেই আমি হয়তো বাঘের মতই রাগী হয়ে উঠেছি আস্তে আস্তে। এই রাগ আমাকে কোথায় ঠেলে নিয়ে যাবে জানি না। উত্তর কোলকাতার একটি অন্ধকার ছোট্ট ভাড়াটে ফ্ল্যাটে বৌ-বাচ্চা নিয়ে ইংরিজী বাংলা খবরের কাগজে দেশের অগ্রগতির খবর পড়ে সাদামাটা আত্মতুষ্ট মধ্যবিত্ত জীবন হয়তো সহজেই কাটাতে পারতাম। কিন্তু তা যখন পারি নি, অথবা হয় নি এবং নিজের অজানতে যখন আমি এই মানি-মুঞ্জরী, বুলকি-পরেশনাথ, টেট্রা, তিতলি ও নানকুদেরই একজন হয়ে পড়েছি তখন এদের কথা না ভেবেই বা কী করি? রাগ হলে, এক অন্ধ আক্রোশ বোধ করলে, নিজের মধ্যে এক ভীষণ যন্ত্রণা হয়। যেটা আমার মধ্যবিত্ত নির্বিবাদী মানসিকতার পক্ষে মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। কিন্তু কি করি...

বাঘের গর্জন শুনে মানি থমকে দাঁড়ানোর পরই ডান চোখের কোণে দেখতে পেল যে, ডানদিকে দুটি ছোট বাঘের বাচ্চা শুকিয়ে-যাওয়া নদীর বুকের গেরুয়া বালিতে গাছের ছায়ায় শুয়ে আছে। বাঘিনী উঠে দাঁড়িয়ে গর্জন করতে করতে তার দিকে দৌড়ে এসেই থেমে গেল। মানিয়া ছোটবেলা থেকেই জঙ্গলের মানুষ। বাঘিনী যে তাকে এক্ষুণি চুমু খেতে চাইছে না, এ কথা সে বুঝতে পারল ; কিন্তু বাঘিনী তখনও ভয় দেখাচ্ছিল। যা বাঘিনীর প্রথম হরকৎ, মানিয়া তাতেই প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশী ভয় পেয়ে কালবিলম্ব না করে কাঠের বোঝার নৈবেদ্য বাঘিনীরই পায়ের কাছাকাছি ধপ্পাস্ করে ফেলে দিয়ে বাঘিনীর দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে পিছন হটে আসতে লাগল। বাঘিনী তখনও তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মাথা নিচু করে ফ্ল্যাগস্ট্যাণ্ডের মতো লেজটা নাড়াতে নাড়াতে গ্ররর্র্—গরর্র্ করছিল। মানিয়া যখন বুঝল যে, অল-ক্লীয়ার, এবার সে বাড়ি বলে দৌড় লাগাতে পারে ; ঠিক তখনই পিছন ফেরা অবস্থায়ই সে পড়ে গেল একটা কাঁটা-ঝোপে ভরা নালাতে। নালাটা ফিট-দশেক গভীর ছিল। নীচে

জল ছিল সামান্যই ; পাথর ও বালির উপরে পড়ল মানিয়া। মানি ওখানে পিছন ফিরে উল্টে পড়তেই সেই ঝোপের ভিতর থেকে একদল তিতির তিতরা তিতর্ তিতর্ করতে করতে সাঁই সাঁই করে তীরের বেগে চতুর্দিকে উড়ে গেল। অজ্ঞান হয়ে গেল মানি। তার দুচোখ ভরা দিনের আলো প্রথম লাল হয়ে, তারপর হলুদ হয়ে, অবশেষে নিভে গেল। হঠাৎ বাঘের হাত থেকে বাঁচল ঠিকই, কিন্তু মরতেও বসল। মানির কপালদোষে ঠিক সেদিনই দুজন ফরেস্ট গার্ড বাঘেদের রোল'কল করবার মহৎ উদ্দেশ্যে ঐ জঙ্গলে গিয়ে, দু'বোতল মহুয়া সেবন করে কিছু দূরেই দিব্যি একটি বড় বয়ের গাছের ছায়ার নীচে শুয়ে সুখের দিবানিদ্রা দিচ্ছিল। তারা অতর্কিতে বাঘের গর্জন শুনে ঘুম-ভেঙে লাফিয়ে উঠল। বাঘ যে নিজেই প্রেজেন্ট স্যার করতে আসবে তাদের কাছে, এতটা বোধ-হয় তারা আশা করে নি। তাড়াতাড়ি কাছাকাছি একটা বড় গাছে চড়ে ব্যাপারটা সরে-জমিনে তদন্ত করতে চাইল ওরা এবং নদীর বুকের বাঘিনী ও বাচ্চাদের এবং কাছেই নালার মধ্যে মানিকেও পড়ে থাকতে দেখল। বেলা পড়ে আসছিল। একটু পরে বাঘিনী বাচ্চাদের নিয়ে নদীর গভীরে অন্যদিকে সরে গেল।

গার্ড দুজন মানির কাছে গিয়ে তাকে তুলল। ততক্ষণে মানির জ্ঞান ফিরে আসছে। চুমু খেতে চাওয়া বাঘিনীর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে যে মুখব্যাদন করা খাকি পোশাক পরা একজোড়া গুঁফো বাঘের খপ্পরে পড়বে এমন কথা সে দুঃস্বপ্নেও ভাবে নি। এক-বার চোখ খুলেই মাঈরে বলে মানি আবার অজ্ঞান হয়ে গেল। গার্ড দুজন দশটা টাকা চেয়েছিল। কোথায় পাবে সে টাকা মানি? অতএব পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের আইনের প্রতিভূ হিসেবে মহামান্য ফরেস্ট গার্ডরা মানিয়ার বিরুদ্ধে দুটি কেস্ ঠুকে দিল! এক নম্বর কেস্, কোর-এরীয়ার মধ্যে ঢুকে বাঘেদের বেডরুমের প্রাইভেসী ডিস্টার্ব করেছে মানি, এই অপরাধে। দু'নম্বর কেস্, খাস জঙ্গল থেকে সে বিনানুমতিতে কর ফাঁকি দিয়ে এবং আইন অমান্য করে এক বোঝা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। এত বড় চোর এবং আইন ফাঁকি দেওয়া এমন মারাত্মক অপরাধী ও কৃতঘ্ন লোক এই মহান জনগণের গণতন্ত্রে চোখেই পড়ে না সচরাচর!

মানির কোমরে খুবই চোট লেগেছিল। তার ওপর গার্ড সাহেবরা ভালমত উত্তম-মধ্যমও দিয়েছিল। প্রথম ক'দিন শুয়েই ছিল। গাড়ু থেকে ওঝাকে নিয়ে এসেছিল রাম্ধানীয়া চাচা। রোজ সেঁক-তুক্ হচ্ছে। এখন একটু ভাল। জ্বর আসে না এখন। বসে থাকতে পারে, হেলান দিয়ে। ওঝা বলেছে, ওর পশ্চাৎদেশে নাকি বাঘিনীর দৃষ্টি লেগেছে। ওর পশ্চাৎদেশ কখন যে বাঘিনীর নজরে এল, তা নিয়ে আর বেশি ভাবা-ভাবি করে নি মানিয়া। ওঝা বলেছে, ভাল হয়ে গেলেও একটু কুঁজো হয়ে হাঁটতে হবে মানিকে বেশ কিছুদিন। বুক কোমর টানটান করে হয়তো আর কখনও দাঁড়াতে পারবে না। কবেই বা কার সামনে বুক কোমর টান-টান করে দাঁড়িয়েছিল জন্মের পর থেকে? ভাবে মানি! সারাজীবন ত মাথা ঝুঁকিয়েই কাটিয়ে দিল, সেলাম হুজোর, পরর্ণাম মালিক করে। মানির মতো গরীবরাই জানে মালিকদের এবং সংখ্যা। অন্যে তা কখনও বুঝবে না।

সেদিন আমি যেতেই, মানি দোষীর মতো মুখ করে বলল, দুধ দিতে তোমার বাড়ি রোজ দেরি হয়ে যাচ্ছে মালিক। কি করব? মুঞ্জরী একা সবদিক সামলাতে পারে না। পরেশনাথটা বড় হয়ে গেলে...

বললাম, আর ত অল্প ক'টা দিন। দেখতে দেখতেই বড় হয়ে যাবে।

গলাটা নামিয়ে বলল, জানো মালিক, একটা ভাল খবর আছে। বুল্‌কিকে দেখে মহুয়াডাঁরের এক দোস্ত পছন্দ করেছে। তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব সামনের শীতে।

তারপর গওনা হলে, চলে যাবে শ্বশুরবাড়ি। কথা ক'টি বলতে বলতে স্নেহমাখা চোখে দূর ক্ষেতের মধ্যে কাজ করতে থাকা বুলকির দিকে চেয়ে রইল মানিয়া। বুলকি দু'পা দু'দিকে ছড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে জমি নিংড়াচ্ছিল। আগাছা হয়েছে জমিতে অসময়ে। ওর তেল-না-পড়া বাদামী চুলে ফিকে সোনালী রোদ জমে ছিল। নানারকম পাখি ডাকছিল চারদিক থেকে। রোদেরও একটা গা ছমছম্ আওয়াজ আছে। হাওয়ার ত আছেই। আর তার সঙ্গে নানান্ পাখির ডাক মিলেমিশে চারধারে এখানে যেন সবসময় একই সঙ্গে বহু-চ্যানেলে বাজনা বাজে। যার যার যে রকম ভালোলাগা, সে তার খুশির চ্যানেলে, সেইসব শুনবে। আর নেবে গন্ধ। এখন সবে সকাল দশটা। প্রকৃতি এখনও চান করে নি। চান করতে যাবার আগে ভাঁড়ার ঘরে, রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকা নারীর শরীর যেমন একরকম মিষ্টি ঘাম আর নোন্‌তা ক্লান্তি গন্ধে ভরে যায়, ঠিক তেমন গন্ধ এখন।

মুঞ্জরী ঘর থেকে বেরিয়ে আমাকে শুধোল, কী খাবে মালিক?

এমনই ভাবটা, যেন বললেই ও আমাকে জাফ্‌রান দেওয়া বিরিয়ানী পোলাউ আর খাসীর, চৌরি, চাঁব, পায়া, কাবাব সবই বানিয়ে খাইয়ে দেবে।

এক্ষুনি নাস্তা করে এলাম। কিছু খাবো না।

দেখলাম মুঞ্জরীর জামাটা ছিঁড়ে গেছে! শাড়িটাও বহু জায়গাতে ছেঁড়া। বারবার টেনে টুনে নিজের লজ্জা ঢাকছিল। ওর এই শালীনতার প্রাণান্তকর চেষ্টা দেখে নিজেই লজ্জিত হয়ে অন্যদিকে চেয়ে বসে রইলাম।

হঠাৎ যে এলে মালিক?

হঠাৎ কি? দুধের দাম দিতে এলাম। মানিটাও পড়ে আছে। দেখতে আসা উচিত ছিল আগেই। খরচাপত্র আছে তোমাদের? তোমরা পঞ্চাশটা টাকা রাখো।

কেন? কেন? কা হে মালিক?

মুঞ্জরী আর মানিয়া সমস্বরেই বলে উঠল।

তারপর মুঞ্জরী বলল, দুধের দাম ত মোট দশ টাকা।

তা হোক। মানির ঝাড়ফুঁকের খরচ আছে, তোমার একটা শাড়ির দরকার। বলে, জোর করেই টাকাটা দিলাম। শাড়ির কথাটা তুলতেই মুঞ্জরী শাড়ি সম্বন্ধে আবারও সচেতন হয়ে উঠল। আমার অযাচিত অপ্রত্যাশিত সহমর্মিতায় কিছুটা অভিভূতও হয়ে পড়ল। এসব ওরা ত দেখে নি, দেখে না বেশি। খারাপ দেখে দেখেই জীবন কেটেছে ওদের। কিছু ভালো দেখলে, তাই সন্দেহ হয়, স্বাভাবিক কারণেই ভাবে, মতলবটা কি?

ওর আরও কিছু বলতে যাওয়ার আগেই বললাম, আরও কারণ আছে। আমি কাল থেকে এখানের বাচ্চাদের জন্যে একটা স্কুল করেছি আমার বাড়িতে। রোজ সকালে আটটায় সময় স্কুল বসে—আটটা থেকে দশটা অবধি। হিন্দী, ইংরিজী একটু একটু, আর যাতে হাটে গেলে হিসাব রাখতে অসুবিধা না হয়—তেমন মামুলী অঙ্ক।

মুঞ্জরী বলল, বাঃ বাঃ।

পরক্ষণেই ওর মুখ অন্ধকার হয়ে এল। বলল, কিন্তু মাইনে কত?

মাইনে নেই। মাইনে আবার কিসের? আমার সময় আছে, সময় নষ্ট হয়। তাই, ভালো কাজে লাগাব ঠিক করেছি। আমার কীই বা বিদ্যা বুদ্ধি, কিন্তু তোমাদের এতেই হয়তো চলে যাবে।

মানি সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করল। ওর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, পরেশনাথ তোমার স্কুল থেকে গিয়ে শহরের স্কুলে ভর্তি হতে পারবে? আমাদের

জাতের জন্যে রিজার্ভ-সীট আছে তাতে পরীক্ষা দিয়ে পুলিশ সাহেব, ম্যাজিস্টর সাহেব হতে পারবে? নান্কু বলছিল যে, পারবে। কি মালিক?

পারবে না কেন? নিশ্চয়ই পারবে। সারা দেশে কত ভারী ভারী অফ্সর আছেন সব তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতিদের। তারা কত সব দায়িত্বপূর্ণ কাজ করছেন কত ডিপার্টে। শুধু পুলিশ সাহেব, ম্যাজিস্টর সাহেব? কি বলছ তুমি? জাত আবার একটা বাধা নাকি। অনেকদিন আমরাই তোমাদের কোনো সুযোগ দিই নি। সুযোগ প্রথম থেকে পেলে কত ভালো হতো। বুঝলে মানি, আসল ভাগ মাত্র দুটো। মানুষ আর অমানুষ। তোমাদের পাগলা সাহেব অবশ্য বলেন আরও অন্য একটা জাত আছে।

কি জাত? সরল মনে মানি শুধালো।

পাগলা সাহেবকে জাতের কথা জিজ্ঞেস করলে বলেন যে, উনি বজ্জাত।

মানি আব মুঞ্জরী হো-হো করে হেসে উঠল।

বলল, পাগলা সাহেব ভগবান।

আচ্ছা, পরেশনাথ যে এতদিন পড়াশুনা করল না—অনেকই ত পিছিয়ে পড়েছে, তাই না?

এমন কিছু না। ওর বয়সই বা কত? সাত-আট হবে।

কিন্তু ও যখন স্কুলে পড়বে, তখন আমাকে দেখবে কে? আমি ত প্রায় থেমে এসেছি। আমার কাজ কে চালাবে? কী খাব আমরা? মুঞ্জরীও তা মাঝবয়সী হয়ে গেল।

তা কষ্ট করলেই না কেষ্ট পাবে। তাই না?

মানি দু'হাতের পাতা নাড়িয়ে সাধু-সন্তদের মতো বলল, তা ত ঠিকই। কষ্ট না করলে কী করে কী হবে? তারপরই তুলসীদাস আওড়ে বলল,

সকল পদারথ্ হ্যায় জগ্মাহী
কর্মহীন নর পাওয়াত্ নাহি।

বলেই, কেমন উদাস হয়ে গেল। দূরে চেয়ে রইল।

হঠাৎই মুঞ্জরী চিৎকার করে উঠল; পরেশনাথ আর বুল্কি ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আবারও শর্টকাট করছে। খেতে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফসল থাকে—তাতে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। ফসল যাই-ই থাকুক ওরা তার মধ্যে দিয়ে ওদের পায়ে চলা পথ বানিয়ে যাওয়া-আসা করবেই। কখনও কথা শুনবে না। মারধোর বকা-ঝকা কিছুতেই কিছু হবার নয়।

ধমক খেয়েই, কোট্রা হরিণের মতো দুজনে দুদিকে লাফিয়ে উঠে ছিটকে গিয়ে ক্ষেতের অন্য পারে পৌঁছে মুহূর্তের মধ্যে বনপথে হারিয়ে গেল।

মানি বলল, ওরা গেল কোথায়?

মুঞ্জরী বিরক্ত গলায় বলল, তা ওরাই জানে। দুজনের যে কী ভাব! এমনটি আর দেখা যায় না। এত কষ্ট ওদের, এতোরকম কষ্ট; কিন্তু দুজনের চিত্তে সুখের অভাব নেই কোনো সময়েই। এখন, মানে মানে বুল্কির বিয়েটা......।

শুনেছেন মালিক?

হ্যাঁ, মানিয়া বলল।

বললাম, এবার উঠি। কাল থেকে ওদের তাহলে পাঠিও।

বুল্কির ত বিয়ে হয়েই যাবে। ও মেয়ে। স্কুলে গিয়ে আর কি করবে? তার চেয়ে পরেশনাথকেই পাঠাব। বুল্কি না থাকলে আমার কাজকর্মের বড়ই অসুবিধা।

বেশ। যেমন তোমাদের সুবিধে।

উঠে পড়ে বললাম মানিয়াকে, তোর কেস্ কী হল রে মানিয়া? ফরেস্ট ডিপার্ট কি সত্যিই কেস্ করল? না কি ফাইন টাইন করে ছেড়ে দেবে?

ফাইন? না, না, মালিক। ওরা বলছে যে, আমার নির্ঘাৎ জেল হবে। টাইগার পোজেক্‌টোয়ার আইন। যা অন্যায় করেছি, তার কোনো উদ্ধার নেই। এমন খতরনাগ্ মামলা নাকি এর আগে হয়নি। আমার মতো অন্যায় নাকি দেশে এর আগে কেউই করে নি। এ দুজন ফরেস্ট গার্ডের পর্‌মোশন হয়ে যাবে আমাকে বামাল ধরার জন্যে। জানি না, কী হবে? এদিকে মাহাতো, ওদিকে এই কেস্, তারপর কোমর সোজা করতে পারি না। হো রাম! রামই জানে, কী হবে।

বলেই, একটা জোর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক কথা ভাবছিলাম। দূরে গোদা শেঠের দোকানের মাথায় একটা প্রকাণ্ড বাঁশের ডগায় গাঢ় লাল হনুমান ঝাণ্ডা উড়ছে। এ অঞ্চলে এটাই যেন গভর্নরস্-হাউস অথবা বিধান সভা। শলা-পরামর্শ, মান্যগণ্য মানুষদের যাওয়া-আসা সব। সবচেয়ে উঁচু হয়ে পত্‌পত্ করে উড়ছে বাতাসে রামভক্ত হনুমানের বিজয়-পতাকা। হা রাম। মানিয়াদের রাম ছাড়া আর কেউই নেই। রাম আর রাম নাম্ সত্ হ্যায়।

ডেরায় ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম কথাটা। মানিয়ার মতো এতবড় চুরি, এতবড় অন্যায় নাকি এ তল্লাটে এর আগে কেউ করে নি। কী তামাশা! পুরো দেশটা কী এক অতল আত্মবিস্মরণের সাংঘাতিক তামাশাতে মেতে রয়েছে। যখন তামাশা শেষ হবে, হাততালি বাজবে পোষা-হাতে চতুর্দিক থেকে তখন দেখা যাবে কাঁচের স্বর্গ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। দেনা-পাওনার কিছু নেই আর।



তিতলি পরশু থেকে কাজে আসে নি। ঋতু পরিবর্তনের সময় এখানে অনেকেরই জ্বর-জ্বারি হচ্ছে। টেটরাও কোনো খবর দিল না দেখে আজ খোঁজ নিতে গেছিলাম ওদের বাড়িতে। তিতলিদের বাড়ির সামনে দিয়ে অনেকদিন গেছি এ ক'বছরে। কিন্তু কখনই ভিতরে যাই নি। আজই প্রথম ঢুকলাম। ছোট্ট একফালি উঠোন। জাংলা করা আছে। মৌসুম অনুযায়ী কুমড়ো, লাউ, ঝিঙে, সিম, বরবটি ইত্যাদি লাগিয়ে রাখে ওরা। উঠোনের একেবারে এক কোণায় একটা মস্ত আকাশমণি গাছ। কে লাগিয়েছিল কে জানে? এই গাছগুলোকেই বোধ হয় আফ্রিকান-টিউলিপ বলে। বাড়ির পিছনদিকে বিঘাখানেক জমি। তাও ভাগে চাষ করে। টেটরার নিজের নয়।

আমার গলার স্বর শুনে টেটরা বেরিয়ে এল।

বলল, পররণাম বাবু।

বলেই, চৌপাই বের করে বসতে দিল। নিজের মনেই বলল, বড়ী খাটমল্। চৌপাইটাতে খুবই ছারপোকা, তাই আমাকে বসতে দিতে লজ্জা করছিল ওর।

তিতলির কি হয়েছে টেটরা? কাজে আসে নি কেন?

ও চিন্তান্বিত গলায় বলল, কী যে হয়েছে, তা কি করে বলব বাবু? আমি তো এই বিকেলের বাসেই এলাম। মেয়েটা তিনদিন হল জ্বরে একেবারে বেহুঁশ। আমি গেছিলাম লাতেহার। আমার চাচেরা ভাই মারা গেছে—তার শ্রাদ্ধ। ফিরে এসেই দেখি, এই কান্ড।

জ্বর কত?

তা দু-কমলীর হবে। তিতলির মা একেবারে একা ছিল, ওকে ছেড়ে যেতে পারে নি এক মুহূর্তও, তাইই তোমাকে, কোনো খবরও দিতে পারি নি। আমাদের ডেরাটাতো বস্তি থেকে অনেক দূরে।

ওষুধ-পত্র খেয়েছে কিছু?

নাঃ। কাল রামধানীয়া চাচাকে খবর দেব। ঝাড়-ফুক করে দেবে। তাতেও ভালো না হলে, চিপাদোহরে যাব।

বললাম, তিতলিকে একটু দেখতে পারি?

কথাটা বলতে আমার এত সংকোচ যে কেন হল, তা নিজেই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু বলে ফেলতে পেরে খুবই ভালো লাগল। তিতলি কী-ই-ই না করে আমার জন্যে! আর ওর বেহুঁশ অবস্থাতে ওকে একটু দেখতে যাব না?

টেটরা প্রথমে খুব অবাক হল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, নিশ্চয় নিশ্চয়। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হল না যে, খুবই বিব্রত হল ও! বোধহয় কোথায় বসাবে? ঘরের

ভিতর কী করে নিয়ে যাবে? এসব ভেবেই। আমাকে বসতে বলে ভিতরে গেল তিতলির মাকে খবর দিতে। একটু পরে এসে বলল, আসুন বাঁশবাবু, ভিতরে আসুন।

বাইরে তখনও বেলা ছিল। তবে সন্ধ্যে হতে বেশি দেরিও নেই। কিন্তু ওদের ঘরের মধ্যে গভীর রাতের অন্ধকার। খাপ্‌রার চাল মাটির দেওয়াল। কোনোদিকে কোনো জানালা নেই। একটি মাত্র দরজা। গরমের দিনে ওরা উঠোনেই চৌপাই বিছিয়ে শোয়। আর শীতের দিনে দরজা বন্ধ করে, ঘরে কাংড়ী জেবলে।

তিতলিরা গরীব আমি জানতাম। খুবই যে গরীব, তাও জানতাম। কিন্তু এতখানি যে গরীব, কখনও তা বুঝতে পারি নি। নিজে এই চরম দারিদ্র্যময় পরিবেশ থেকেও তিতলি যে কী করে আমাকে এমন ঐশ্বর্যে ভরে রাখে অনুক্ষণ তা মনে হতেই বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠল। আমার ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর সব কিছুর ভারই ওর ওপর। ঐতো আমার ডেরার কর্ত্রী। আমি ত থাকি লাটসাহেবের মতো, ওরই দৌলতে। সত্যি কথা বলতে কি, ওদের ঘরের মধ্যে এই প্রথমবার ঢুকে আমি যে তিতলির মনিব একথা স্বীকার করতে আমার বড়ই লজ্জা হল। আমি জানতাম যে, কর্মচারী দেখেই মালিককে মানুষ বিচার করে। করা উচিত অন্তত কর্মচারীর স্বাচ্ছল্য, তার সুখ-সুবিধা এসব দেখেই। কিন্তু কথাটা যে, আমার নিজেদের বেলাও এমন লজ্জাকর ভাবে প্রযোজ্য সেটা একবারও মনে হয় নি এই বিকেলের আগে। তিতলির মাথার কাছে একটা কেরোসিনের কুপী জ্বলছিল। চৌপাইতে বাঁ কাত হয়ে শুয়েছিল ও; একটা ছেঁড়া কিন্তু পরিষ্কার শাড়ি পরে। আমার ধারণা ছিল ওকে আমি অনেক শাড়ি দিয়েছি, কারণ ও কাজে আসত সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অক্ষত শাড়ি পরেই। কিন্তু বাড়িতে যে ও এইরকম জামা কাপড় পরে থাকে সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।

ডাকলাম, তিতলি, আমি এসেছি। তিতলি।

কোনো সাড়া দিল না।

এদের কাছে থার্মোমিটার নেই। আমার কাছেও নেই। হয়তো রথীদার কাছে আছে। টেট্‌রার হিসেবে দু-কম্‌লীর অর্থাৎ দু-কম্বলের জ্বর ঠিক কতখানি জ্বর তা অনুমান করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। তিতলির কপালে এবং গালে ডান হাতের পাতা ছোঁওয়ালাম। ওর গা জ্বরে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। যে মুহূর্তে হাত ওর কপালে ও গালে লাগল, মন বলল, ওর সবটুকু অসুখ আমি শুষে নিয়ে ওকে নীরোগ করি। ওকে ঐ অবস্থায় দেখে মনটা এতই খারাপ হয়ে গেল যে, তা বলার নয়। তিতলির জ্ঞান থাকলে তিতলি কত খুশী হতো। কিন্তু ও জানলোও না যে, আমি এসেছিলাম ওর মাথার কাছে বসেছিলাম; ওর কপালে হাত ছুঁইয়েছিলাম। সংসারে বোধ হয় এমনই ঘটে! সবসময়ই। যখনই কোনো সুখবহ ঘটনা ঘটে, ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই সুখবোধের ক্ষমতা-রহিত থাকি আমরা। ঘর থেকে বেরিয়ে টেট্‌রাকে কিছু টাকা দিলাম রাখতে। তিতলির পথ্য-টথ্যর জন্যে। আমি নিজেও ত বাঁশবাবুই। নিজেরই বা কী সামর্থ্য। তবু তিতলি-দের তুলনাতে আমি অনেকই বড়লোক। তিতলিরাও এদেশের অন্য অনেকানেক লোকের চেয়ে বড়লোক। একথা মনে হতেই দমবন্ধ হতে লাগল। ওকে সঙ্গে আসতে বললাম, ওষুধ দেব বলে। ডেরাতে কোডোপাইরীন, কোসাভিল, সেরিডন এসব ওষুধ ছিলই। আজকে আর তিতলির জন্যে কিছুই করার উপায় নেই। কাল একটা ট্রাক ফিরবে মহুয়াডাঁর থেকে। সেই ট্রাক ধরে ডালটনগঞ্জ গিয়ে যদি কোনো গাড়ি বা জীপের বন্দোবস্ত করতে পারি। রোশনলালবাবুকে বলে, তাহলে তিতলিকে সঙ্গে করে নিয়ে ডালটনগঞ্জ সদর হাসপাতালে অথবা ডঃ ভর্মাকে দেখিয়ে আনা যাবে। দরকার হলে, রক্তটক্ত পরীক্ষা করাতেও হবে! ওর শরীরের যা অবস্থা, তাতে ট্রাকে করে এই পাহাড়ী অসমান পথে ডালটনগঞ্জে নিয়ে

যাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। সবচেয়ে ভাল হয়, ডাক্তার সাহেবকে এখানে নিয়ে আসতে পারলে।

টেট্‌রা, তিত্‌লির মাকে বলে, আমার সঙ্গেই বেরোল। হাতে একটা কুপীও নিয়ে এল। ফেরার সময় অন্ধকার হয়ে যাবে বলে টাঙ্গিটাও কাঁধে ফেলে নিল সংস্কার বশে। ডেরাতে ফিরে ওকে ওষুধের রঙ্‌টঙ্‌ চিনিয়ে, ভাল করে বুঝিয়ে, আধ শিশি হরলিকস ছিল ঘরে, সেটাও দিয়ে বললাম, এক্ষুণি ফিরে গিয়ে তিত্‌লিকে সঙ্গে সঙ্গে দিতে। দেখলাম, ভাঁড়ারে মুড়ি ও চিঁড়ে আছে, গুড়ও আছে, সবই তিত্‌লিরই সাজিয়ে রাখা। সেগুলোর প্রায় সবটাই একটা চাদরে বেঁধে টেট্‌রাকে দিলাম। টেট্‌রা মুখে কিছু বলল না, কিন্তু তার দু'চোখে অশেষ কৃতজ্ঞতা দেখলাম। নিজেকে বড় ছোট লাগতে লাগল। ভাবছিলাম, মানুষ মনের ধনে কত বড় হলে অত সামান্য জিনিসের জন্যে এতখানি কৃতজ্ঞ হতে পারে। ততক্ষণে বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। পেঁচারা হাড়গুম্‌, দুরগুম্‌, মার্‌-গুম, লাশ্‌গুম, চিৎকারে বাঁকের মুখের ঝাঁকরা বুড়ো অশ্বত্থের ডালপালা সরগরম করে তুলেছিল। একটা টিটি পাখি ডাকছিল টানা টাঁড়ের দিক থেকে—ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে। উত্তেজিত স্বরে। কোনো জানোয়ার দেখেছে বোধ হয়। টেট্‌রা বেরোতে যাবে ঠিক এমন সময় ওদের বাড়ির দিকের জঙ্গল থেকে একটা বার্কিং ডিয়ার ডাকতে লাগলো খুব জোরে জোরে। ভয়-পাওয়া ডাক। ক্রমাগত। বললাম, আমার টর্চটা নিয়ে যাও টেট্‌রা। তোমার ঐ কুপী ত হাওয়া উঠলেই নিভে যাবে। কোটরা হরিণটা কোনো কিছু দেখে ভয় পেয়েছে খুব। টেট্‌রা কান খাড়া করে শুনল একটু চুপচাপ। তারপর স্বগতোক্তির মতো বলল, শোন্‌চিতোয়া। আজ বাস থেকে নেমে বাড়ি ফেরার সময়ই, পথের উপর তার পায়ের দাগ দেখেছি। যে শোন্‌চিতোয়াটা লালুকে নিয়েছিল, সেটাই হবে হয়তো। নাও হতে পারে। কত শোনচিতোয়াইত আছে এই জঙ্গল-পাহাড়ে। ব্যাটা বোধহয় আবার কারো কুকুর-টুকুর ধরার মতলবে আছে। বললাম, সাবধানে যেও টেট্‌রা। ও হাসল। বলল, আমি ত লালু নই। আসলে, মানুষদের কোনোই ভয় নেই। জানোয়ারেরা জানে যে, সবচেয়ে খতরনাগ্‌ জানোয়ার হচ্ছে মানুষ। তাই মানুষ দেখলেই পথ ছেড়ে ওরা পালায়। যত বীরত্ব ওদের সব কুকুর-মুকুরের কাছেই।

যাও যাও আর কথা বলো না। ওষুধটা তাড়াতাড়ি দাও গিয়ে তিত্‌লিকে। টর্চটা আমাকে ফেরত দিয়ে টেট্‌রা বলল, যাই। ওষুধটা পড়লে তারপর। আসলে, আমি যদি লাতেহারে চলে না-যেতাম, তাহলে হয়তো অসুখটা এতখানি বাড়তেও পারত না। যেতে যেতেও দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, তিত্‌লিটা বেহুঁশ। কত না খুশী হতো তুমি এসেছিলে জানলে।

কাল ভোরেই ট্রাক ধরে ডালটনগঞ্জ যাচ্ছি। ডাক্তার নিয়ে আসব, নয়ত সেখান থেকে গাড়ি বা জীপ নিয়ে এসে তিত্‌লিকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করব। কোনো চিন্তা কোরো না তুমি।

টেট্‌রা হাত জোড় করে আমাকে নমস্কার করল। বলল, পরর্‌ণাম বাবু। আপনার মতো মালিক পেয়েছে, তিত্‌লির নসীব ভাল। তারপর টাঙ্গির সঙ্গে চিঁড়ে-মুড়ি-গুড়ের থলে ঝুলিয়ে ও বেরিয়ে পড়ল।

দুপুরে গাড়ুর রেঞ্জার সাহেবের বাড়িতে জবরদস্ত খাওয়া হয়েছিল, খুব দেরি করে। তাই একেবারেই খিদে ছিল না। চান করে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে লণ্ঠনটা টুলে রেখে, ইজীচেয়ারে গা-এলিয়ে একটা বই নিয়ে বারান্দাতে বসলাম। এখনও সন্ধ্যের পর ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব থাকে। এরকমই চলবে, এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তারপরই ঝুপ করে গরম পড়ে যাবে। বইটাতে বুঁদ হয়ে ছিলাম। কতক্ষণ সময় কেটে গেছে খেয়াল হয় নি। কোনো কোনো দিন এখানে সময় বড় নীরবে চলাফেরা করে। নির্লজ্জ সশব্দ গতি নেই তার

আজ রাতে। সে যে খুব দামী, এমন কোনো জাঁকও নেই তার এই ভালুমারে। লণ্ঠনটা দুবার হঠাৎ দপ্‌দপ্‌ করেই নিভে গেল। বিরক্তির সঙ্গে বইটাকে কোলের ওপর রাখলাম। এতক্ষণ আলোর সামনে বসেছিলাম, তাই হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যাওয়াতে অন্ধকারটাকে ঘোরতর বলে মনে হল। কৃষ্ণপক্ষ চলছে। কিন্তু এখানে অন্ধকারও। সচল আকাশে তারারা অনেকই আলো ছড়ায় চাঁদ না থাকলে।

শীতকালের অন্ধকার কিন্তু একেবারে অন্যরকম। জমাট বাঁধা স্তব্ধ; অনড়। চোখের জলে মেশা কাজলের মতো। কিন্তু গরমের রাতে হাওয়া বয় বলে ঘাস-পাতা ডাল-পালা আন্দোলিত হতে থাকে। অন্ধকারে, তাদের অন্ধকারতর ভূতুড়ে ছায়াগুলো নড়াচড়া করতে থাকে ক্রমাগত; তাই তখন মনে হয়, অন্ধকারেরও একটা গতি আছে। গতি না থাকলেও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে গ্রীষ্মরাতের হালকা অন্ধকার নড়ে-চড়ে হেলে দুলে দূরের ভারী অন্ধকারকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। এক ইসারায় ডাকে অন্য অন্ধকারকে। কিছুক্ষণ চুপ করে তারাভরা আকাশে চেয়ে বসে রইলাম। কুঁড়েমি লাগছিল তক্ষুণি উঠে লণ্ঠনে তেল ভরতে। তাছাড়া, এসব আমি করি না; পারিও না। তিতলি যে আমার জন্যে কী করে আর করে না, ওর ওপর যে আমি ঠিক কতখানি নির্ভরশীল তা এ ক'দিনেই একেবারে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। চুপচাপ বসেই রইলাম। পিউ-কাঁহা পাখি ডাকছিল ক্রমাগত। আর দূর থেকে তার সাথী সাড়া দিচ্ছিল। পাগলা কোকিলটার একেবারেই সাড়াশব্দ নেই কদিন হল। কে জানে, অন্য কোন জঙ্গলের রাতের সহলে গেছে সে।

বাইরের দিকে চোখ পড়ায় অবাক হয়ে দেখলাম একটা কুপী হাতে করে কে যেন খুব জোরে দৌড়ে আমার ডেরার দিকেই আসছে। আলেয়া কী এরকমই দেখতে হয়? আমি কখনও দেখি নি। কাড়ুয়া দেখেছে। জঙ্গলের মধ্যে জলা জায়গায়, বর্ষার নদীর পাশে। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে টর্চটা এনে, এই অচেনা অনাহূত ভগ্নদূত কোন খবর নিয়ে আসছে, তার প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। তিতলির কি কিছু হল? তিতলির? এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের মধ্যে যেন বন-পাহাড়ের দামাল শ্রাবণের ঝড় উঠল। ভেজা, জোলো, গভীর রাতের দূরাগত এক্সপ্রেস ট্রেনের শব্দের মতো অস্পষ্ট। কিন্তু অত্যন্ত দ্রুতগতি, ভারী এক গভীর বিষণ্ণতা আচ্ছন্ন করে ফেলল আমাকে। আমি যে তিতলিকে এতখানি ভালোবেসে ফেলেছি, তা আগের মুহূর্তেও জানতাম না, বুঝতে পারি নি। আমার ভাবনার জাল ছিঁড়ে তিতলির মা কুপী হাতে এক সত্যিকারের ঝড়ের মতোই ডেরার মধ্যে এসে যেন আছড়ে পড়ল। এসেই ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। টর্চটা ওর মুখে জেবলে রেখে শুধু একটি প্রশ্ন করলাম ওকে।

তিতলি?

সে আর্তস্বরে বলে উঠল, নেহী, নেহী, উস্‌কো বাপ্‌।

সেই মুহূর্তে টেট্‌রার ভালো-মন্দ সম্বন্ধে জানতে আমি বিন্দুমাত্রও উৎসুক ছিলাম না। বুক থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তিতলি—...তিতলি--তাহলে ভালোই আছে। ভালো আছে তিতলি। আঃ!

ঘোরটা কাটিয়ে উঠেই বললাম, টেট্‌রার কি হল? এই ত গেল আমার এখান থেকে। টেট্‌রার যাই-ই হোক না কেন তখনও তা নিয়ে কিন্তু আমার সত্যিই তেমন মাথাব্যথা ছিল না। টেট্‌রার কথা ধীরে সুস্থে জানলেই তখন চলবে। আমার তাড়া নেই কোনো। তিতলির মার যতই তাড়া থাকুক। হাউ-মাউ করে কাঁদতে লাগল সে। ঘর থেকে বর্শাটা তুলে নিয়ে টর্চটা হাতে করে ওর সঙ্গে আমি এগোলাম। মুখে কোনো কথা বলতে পারছিলো না সে। হাউ-মাউ কান্নাটা বন্ধ রেখে এখন একটা বোবা চাপা ঘড়ঘড়ে স্বগতোক্তি করতে লাগল। এদিকে ওদিকে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে যখন আমরা প্রায়

দৌড়ে তিতলিদের বাড়ির কাছে পৌঁছলাম, তখন দেখি, ওদের বাড়ির উঠোনের দরজার প্রায় সামনেই আমার দেওয়া মুড়ি-চিঁড়ে-গুড় আর হরলিক্‌স-এর শিশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে পথের ধুলোতে। টাঙ্গিটাও। আর পথের লাল নরম ভারী ধুলোর ওপর খুব বড় একটা চিতার থাবার দাগ। ধস্তাধস্তি পরিষ্কার চিহ্ন। টেটরার টায়ার-সোলের ধুলিমলিন চটিটা। পথের পাশের একটা উঁচু পাথরে দাঁড়িয়ে টর্চের আলোটা এদিকে-ওদিকে ফেলতেই হঠাৎ ওদের ডেরারই লাগোয়া ক্ষেতের মধ্যেই একজোড়া লাল চোখ জ্বলে উঠল। টর্চের আলো পড়াতে ছোট বড় মাটির ঢেলা আর পাথরের লম্বা বেঁটে ছায়াগুলো ক্ষেতটাকে রহস্যময় করে তুলল। তখন কোনো ফসল ছিল না ক্ষেতে। রাতের বেলায় ক্ষেতটাকে অনেক বড় বলেও মনে হচ্ছিল।

বললাম, তুমি দৌড়ে বস্তিতে যাও। লোকজন জড়ো করে আনো। কাড়ুয়াকে খবর দিতে বলো ওদের। শিগগির যাও! আমি এখানে আছি।

তিতলির মা দৌড়ে চলে গেল।

বাঁ হাতে টর্চটা শোনচিতোয়াটার চোখে জেলে রেখে, ডান হাতে বর্শাটা বাগিয়ে ধরে আমি উঠোনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালাম। উঠোনটা পেরিয়ে আসার সময় লক্ষ্য করেছিলাম যে, ওদের ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা। ঘরের মধ্যে অন্ধকার। সেখানে জ্বরে বেহুঁশ তিতলি পড়ে আছে। ভালো করে আলো ফেলতেই, এবারে টেটরাকে দেখতে পেলাম। ক্ষেতের একেবারে শেষে একটা বাঁশঝাড়ের গোড়াতে টেটরাকে চিত করে ফেলে শোনচিতোয়াটা খাচ্ছে। ধুতিটা আর ছেঁড়া-খোঁড়া শার্টটা ছিন্নভিন্ন হয়ে ক্ষেতে পড়ে আছে। একটা হাত কেউ যেন করাত দিয়ে কেটে পাশে ফেলে রেখেছে। খয়েরী রক্তে লাল হয়ে আছে পুরো জায়গাটা। কাপড় জামাতেও ছোপ্ ছোপ্ রক্ত। আলোটা শোনচিতোয়াটার চোখের ওপর ফেলে রেখে, বর্শাটা বাগিয়ে ধরে আমি চেঁচালাম। বাংলাতে গালাগালি করতে লাগলাম—যত খারাপ গালাগালি স্কুলের বকা-ছেলেদের কাছ থেকে শিখে-ছিলাম ছোটবেলায়, সেই সমস্ত গালাগালি তীব্রতম ঘৃণা আর অসহায় ক্ষোভের সঙ্গে আমি শোনচিতোয়াটার দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলাম বুলেটের মতো। টর্চের আলোতে লাল চোখ দুটো কাঠ-কয়লার আগুনের মতো জ্বলতে লাগল। মাঝে মাঝে সবুজ রঙও ঠিকরে বেরোচ্ছিল তা থেকে হঠাৎ হঠাৎ। চিতাটা এতো লম্বা ও উঁচু যে, বড় বাঘ বলেই মনে হচ্ছিল। কিছুক্ষণ টর্চের আলোর দিকে সে সোজা চেয়ে রইল। তারপর টেটরাকে ওখানে ফেলে রেখে আমার দিকে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এল কিছুটা। কিন্তু কোনো আওয়াজ করল না। আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। তারপরেই কী মনে করে ফিরে গিয়ে টেটরাকে এক ঝাটকাতে ঘাড় কামড়ে তুলে নিয়ে বাঁশবনের গভীরে চলে গেল। টেটরার কাটা হাতটা ক্ষেতের মধ্যেই পড়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর লাঠি-বল্লম, টাঙ্গি আর মশাল নিয়ে বস্তির অনেক লোককে দৌড়ে আসতে দেখলাম এদিকে। চেঁচামেচি ছাড়াও নানারকম ধাতব আওয়াজ করতে করতে। কেরোসিনের টিন, আছাড়ি পটকা, কাঁসার থালা, যে যা হাতের কাছে পেয়েছিল, তুলে নিয়ে এসেছিল। কাড়ুয়াও এসেছিল ওদের সঙ্গে। আর ওরা এসে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুজন ফরেস্ট গার্ডও এসে পৌঁছল। কাড়ুয়ার যে গাদা বন্দুক আছে সেটা বস্তির সকলেই জানত, মায় ফরেস্ট গার্ডরা পর্যন্ত। কিন্তু কাড়ুয়া যে সেটাকে কোথায় লুকিয়ে রাখে সে কথা জানা ছিল না কারোই। সকলেই বলতে লাগল, কাড়ুয়া, এ কাড়ুয়া, বন্দুক লাও তুমহারা।

ফরেস্ট গার্ডরা বলল, আমরা এখানে সশরীরে উপস্থিত থাকতে এমন বে-আইন কখনই হতে দেব না। বন্দুক আনলেই বন্দুক বাজেয়াপ্ত করব। কাড়ুয়াকেও গ্রেপ্তার করব।

লাইসেন্স্ ছাড়া আবার বন্দুক কিসের? ততক্ষণে রথীদাও এসে পৌঁছেছেন। নান্কু বস্তিতে ছিল না। দিন সাতেক হল ও বেপাত্তা। কাউকে কিছু না বলে সে নিরুদ্দেশ হয়েছে। রথীদা তাঁর রিভলবার নিয়ে এসেছিলেন সংগে করে। ফরেস্ট গার্ডদের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি কয়েকবার আকাশের দিকে নল করে গুলি ছুঁড়লেন। তারপর সকলে মশাল নিয়ে হৈ হে করে এগোলাম আমরা বর্শা, টাঙ্গি আর লাঠি নিয়ে যেদিকে টেট্রাকে নিয়ে গেছিল শোন্চিতোয়াটা, সেইদিকে।

ফরেস্ট গার্ডরা বলল, স্যাংচুয়ারী এরিয়ার মধ্যে গুলির শব্দ হল, এক্ষুনি জীপ নিয়ে প্রোজেকটের লোক চলে আসবে। আমাদের চাকরি যাবে। রথীদা বললেন, গেলে যাবে। একটা মানুষের দাম কি তোমাদের চাকরির চেয়ে বেশী নয়? ওদের মধ্যে একজন লম্বা চওড়া দাড়িওয়ালা গার্ড ছিল। নতুন এসেছে নাকি, গাড়োয়া থেকে বদলি হয়ে। সে তর্ক করে বলল, জীবন আর আছে কোথায়? টেট্রা তো মরে ভূত হয়ে গেছে। এখন আমাদের চাকরি খেয়ে কার কী লাভ?

রথীদা বললেন, আজ টেট্রাকে খেয়েছে, কাল যে অন্য কাউকে খাবে না তার কোনো গ্যারান্টি আছে?

ওরা বলল, ওসব জানি না। খেলে খাবে। বাঘেদের বিস্তর অসুবিধা হবে এই চিৎকার চেঁচামেচি, গুলির আওয়াজে। একটিও বাঘ যদি কোর্-এরীয়া থেকে বেরিয়ে যায়, তবে দিল্লিতে লোকসভায় কোশ্চেন উঠবে। আইন আমরা থাকতে কখনই ভাঙতে দেবো না।

রথীদা রেগে বললেন, তোমরা জাহান্নমে যাও।

ততক্ষণে রিভলবারের গুলির আওয়াজে, মশালের আলোতে, এতলোকের চিৎকার চেঁচামেচিতে শোন্চিতোয়াটা টেট্রাকে ফেলে রেখে জঙ্গলের গভীরে সরে গেছে। ধরাধরি করে ওরা সকলে টেট্রার মৃতদেহ বয়ে আনল। একজন কাটা হাতটাও তুলে নিয়ে এল। আমি তাকাতে পারছিলাম না ঐ বীভৎস দৃশ্যের দিকে। কাটা হাতটার মুঠি বন্ধ ছিল শক্ত করে। মুঠি খুলতেই দেখা গেল, তার মধ্যে আমার দেওয়া ওষুধগুলো। সকলের অলক্ষে আমি ওষুধগুলো বের করে নিয়ে তিতলির ঘরে গিয়ে ঘরের কোণায় রাখা বালতি থেকে ঘটি করে জল নিয়ে তিতলিকে ওষুধ খাওয়ালাম। বেহুঁশ অবস্থায় ওষুধ খাওয়ানো খুবই মুশকিলের কাজ। কাঁদতে কাঁদতেই ওর মা এসে আমাকে সাহায্য করল। এত লোকের সোরগোল, রিভলবারের আওয়াজ, ওর মায়ের এত কান্নাকাটিতেও তিতলির হুঁশ ফিরল না। আমার ভীষণই ভয় করতে লাগল যে, তিতলি বোধহয় আর বাঁচবে না। মশাল হাতে ওরা সকলে টেট্রার ছিন্নভিন্ন আংশিক মৃতদেহ ঘিরে নিজেদের মধ্যে নানা কথা বলতে লাগল। রথীদা বললেন, ডালটনগঞ্জে গিয়ে বড় সায়েবদের বলে এই শোন্চিতোয়াকে মারার বন্দোবস্ত করতে হবে। ফরেস্ট গার্ডরা বলল, যতক্ষণ না এ-বাঘ ম্যান-ইটার ডিক্লেয়ারড্ হচ্ছে এবং সেই পারমিট আমাদের না দেখানো হচ্ছে; ততক্ষণ একজনকেও বন্দুক-রাইফেল হাতে এ তল্লাটে ঢুকতে দেখলেই আমরা বেঁধে নিয়ে যাব।

ঠিক আছে। কাল আমি নিজেই যাব ডালটনগঞ্জে। দেখি, এর কোনো বিহিত হয় কী-না।

গার্ডরা বলল, জঙ্গলে থাকলে, বছরে-দুবছরে এরকম একটা-আধটা মানুষ জংলী জানোয়ারের হাতে মরেই। একটা মানুষ মারলেই যে শোন্চিতোয়াটা ম্যান-ইটার হয়ে গেছে তা বলা যায় না। নিদেনপক্ষে আট-দশটা মানুষ না মারলে ডিপার্ট থেকে ম্যান-ইটার ডিক্লেয়ারই করবে না। তাও করবে কী না সন্দেহ। এই সব জঙ্গলে-পাহাড়ে

বাঘ আর অন্য জানোয়াররাই মেহমান। তাদের ভালোটাই আগে দেখতে হবে, মানুষরা ফালতু। মানুষরা এখান থেকে চলে গেলেই পারে। স্যাংচুয়ারী ত জানোয়ারদের জন্যে। মানুষদের জন্যে থোড়াই!

বস্তির কয়েকজন ছেলে-ছোকরা চটে গেল বেজায় ওদের এই রকম কথাবার্তাতে। কিন্তু জঙ্গলে থেকে ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে ঝগড়া করার দুঃসাহস এদের মধ্যে কারোরই নেই। নান্‌কু থাকলে কী হত বলা যায় না।

রথীদা বললেন, তা হলে তোমাদের মধ্যে দু-একজনকে খাক বাঘটা তারপরই না হয় ম্যান-ইটার ডিক্লেয়ার করানো যাবে।

দাড়িওয়ালা গার্ডটি, এ দুঃসময়ের মধ্যেও হেসে উঠল নির্বিকারে। বলল, আমরা গভরমেন্টের লোক। আমাদের চেনে এরা। আমরাই এদের দেখ্-ভাল করি। বাঘেরা মানুষের মতো বদ্‌তমিজ নয় যে, আমাদের খাবে।

টেট্‌রার মৃত্যু এবং তার পরের ঘটনাপরম্পরার অভাবনীয়তায় স্তম্ভিত হয়ে ছিলাম। মনে হচ্ছিল অনেকদিন এমন স্তম্ভিত হয়েই থাকব।



মহুয়াডাঁর থেকে আসা ট্রাক ধরে আমি আর রথীদা যখন ডালটনগঞ্জে পেঁছিলাম তখন বেলা প্রায় বারটা বাজে। রথীদা গেলেন বনবিভাগের সদর দপ্তরে। আমি গেলাম আমার মালিকের ডেরাতে। মালিকের স্ট্যাণ্ডিং ইনস্ট্রাকশান ছিল যে, কখনও যেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কোনোরকম কন্‌ফ্রনটেশানে না যাই। ঐ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গেই তাঁর কারবার। ঐ বিশেষ ডিপার্টমেন্টের দোলতেই তাঁর রবরবা, তাঁর রইসী। অতএব, যাইই ঘটুক না কেন ঐ ডিপার্টমেন্টের বড় ছোট কাউকেই কোনো মতেই চটানো চলবে না। টেট্‌রার মৃত্যুতে উনি বিশেষ বিচলিত হলেন না। জঙ্গলে উনি এসব অনেক দেখেছেন। তিতলির অসুখের কথা বলে, আমি যখন একটা গাড়ি বা জীপ চাইলাম, ওঁর মুখ হঠাৎই খুব গম্ভীর হয়ে গেল।

শুধোলেন, একজন সামান্য নোক্‌রানির জন্যে আপনার এত দরদ কিসের?

নোক্‌রানি হলে কি হয়, সেও ত মানুষ। ওর প্রতি দরদ মানুষ হিসাবে। সেইটেই ত স্বাভাবিক।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে অন্যদিকে চেয়ে থেকে বললেন, আপনি কি জানেন যে, আপনার এলাকার সব আদিবাসী কুলি ও রেজাদের খেপিয়ে তুলেছে ঐ নান্‌কু ছোকরা? রেট্ না বাড়ালে তারা কাজ করবে না বলে নোটিশ দিয়েছে?

আমি ত জানি না। তাছাড়া, নান্‌কুর সঙ্গে আমার নোক্‌রানির অসুখের সম্বন্ধ কি? বুঝলাম না কিছুই!

আপনার এলাকার খবর আপনি জানেনেই বা না কেন? জেনেও না জানলে, আমার কিছুই বলার নেই।

যদি নান্‌কু ঐ সব করেও থাকে, তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?

সেটা আপনারই ভাববার! আসলে, আপনারা সবাই নেমকহারাম, অকৃতজ্ঞ। এতদিন আমারই নুন খেয়ে এখন আমারই পিছনে লাগছেন। আমি ত কম করি নি আপনাদের জন্যে। আপনার বোনের বিয়ে থেকে আরম্ভ করে, যখন যা বলেছেন, সবই করেছি-- তারপরও আপনাদের এই ব্যবহার আমাকে বড় দুঃখ দেয়। আপনারা মানুষের দাম দিতে জানেন না।

বললাম, আপনি যা করেছেন সে কথা শুধু আমি কেন আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে কেউই তা কখনও অস্বীকার করি নি। বরং আপনার মতো মালিক যে হয় না, এ-কথাই চিরদিন সকলকে বলেছি।

তা বলেছেন, যতদিন আপনি, আপনি ছিলেন। আমাদের একজন ছিলেন। আপনি ত এখন জন-দরদী নেতা হয়ে গেছেন। বঞ্চিত, ভুখা আদিবাসীদের হয়ে কি যেন

বলেন আপনারা, সেই যে কী যেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, শ্রেণী-সংগ্রামে নেমেছেন। সবাইকে সামিল করাচ্ছেন বিপ্লবে। আপনি এখন তা আর আমাদের কেউই নন।

অবাক হলাম নিজেই, নিজের নেতা বনে যাবার খবরে।

বললাম, এসব ভুল কথা। আমি যা ছিলাম, তাই-ই আছি। আপনি কার কথাতে আমাকে বলছেন এসব, জানি না। তবে আপনার কান নিশ্চয়ই খুব পাতলা। এত পাতলা কান দিয়ে এত বড় ব্যবসা এতদিন আপনি যে কী করে চালালেন তা আপনিই জানেন।

আমার ব্যবসা আমি কী করে চালাব, তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না।

ঠিক আছে।

ঠিক নেই। আপনার জবাবদিহি করতে হবে, কেন আপনি কুলি-মেট-মুনশী সকলকে আমার বিরুদ্ধে খেপাচ্ছেন? নানকুকে মদত দিচ্ছেন? কেন?

ভাবলাম যে ওঁকে বলি, দেখুন আপনি ভীষণ ভুল করছেন। একেবারেই ভুল লোককে, অন্য কোনো ইতর অথবা স্বার্থান্বেষী লোকের প্ররোচনায় অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করছেন। কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে ওঁকে এ কথা গুছিয়ে বলব ভেবেও, বলা হলো না। হঠাৎই মাথা গরম হয়ে গেল। বোধহয় মুখ ফসকেই বেরিয়ে গেল, কুলিরা ও রেজারা যা পায়, তাতে তাদের ত সত্যিই চলে না। যা বাজার! আপনার নিজের জীবনযাত্রাতে কিছুই কম্‌তি পড়তো না ওদের আরো কিছু দিলে। আপনি মালিক, রাজা লোক, আপনার মুখ চেয়েই ত ওরা থাকে। পরমুহূর্তেই আমার মধ্যে থেকে অন্য আরেকটা লোক হঠাৎই কথা বলে উঠল; যে-লোকটা, এত বছর শিক্ষা শালীনতা, কুঁড়েমি শান্তি-প্রিয়তার লেপ মুড়ে আমারই বুকের শীতের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল, অথচ সে যে ছিল সে-কথা আমি নিজেও জানি নি।

সেই লোকটা বলল, আপনি ওদের না দেখলে, কে দেখবে? মনুফা কী হয় না হয় তার খোঁজ ত আমরাও একটু আধটু রাখি। তাছাড়া, কুলিদের কথা ছেড়েই দিলাম, আমাদের নিজেদের কথাও বলতে পারি। যদিও আপনি অনেক দিয়েছেন, কিন্তু সে সবই ত দয়ার দান। আপনার কাছে এসে হাত জোড় করে দাঁড়াতে হয়েছে। আপনি দয়া করে বখ্‌শিস দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছেন। বছরের পর বছর শীত—গ্রীষ্ম—বর্ষা এই জঙ্গলে পড়ে থেকে আপনার সেবাই করে এসেছি এতদিন। আমাদের ন্যায্য পাওনা যা, তা আপনি দিতে চান নি কখনও—কারণ হয়তো আপনি ভয় পেয়েছেন এবং পান যে, তা পেলে, আমরা যদি স্বাধীন, স্বাবলম্বী হয়ে গিয়ে আপনার ব্যবসাতে কর্মপিট্ করি? আপনাকে না মানি। সে কারণেই, আপনি দয়া দেখিয়েছেন চিরদিন, নিজে বড় থাকতে চেয়েছেন দয়ার দান দিয়ে। আজকে আপনি ইচ্ছে করলেই আমার চাকরি খেতে পারেন। এবং খেলে, আমি হয়তো পথে দাঁড়াব। কারণ আমার পুঁজি বলতে কিছুই নেই। কিন্তু কোনো আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ কি দয়ার ধন চায়? প্রত্যেকেই তার পরিশ্রমের ন্যায্য পাওনা, ন্যায্য মূল্যটুকুই চায়। যারা তার চেয়েও বেশী চায়, বলব, তাদেরও আত্মসম্মান জ্ঞান নেই।

চুপ করে ভাবছিলাম, আমার মালিকের বিলিতি সিগারেটের খরচই প্রতিমাসে যা, তা আমার সারা বছরের মাইনে নয়। অথচ মালিকের চেয়ে অনেক বেশি পড়াশুনা করেছি আমি। তার চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রমও করি। তফাত এই-ই যে, তাঁর পুঁজি আছে, আর আমার নেই। শুধু এইটুকুই। এবং এটা উনি ভালোভাবে জানেন বলেই, সেই পুঁজি ক্রমাগত আরও বাড়িয়ে যেতে চান! কারো মধ্যে অবাধ্যতা বা অসন্তোষের সামান্য আভাস পেলেই টাকার বান্ডিল ছুঁড়ে মারেন তার মুখে। কিন্তু যারা তাঁর স্বার্থসিদ্ধির

হাতিয়ার; শুধু তাদেরই। যারা তাঁর সমগোত্রীয়, যারা তথাকথিত ভদ্রলোক, শুধু তাদেরই। অন্যদের কথা, উনি কখনও ভাবেন নি। ঐ বদগন্ধশরীর, প্রায়-বিবস্ত্র হাঁড়িয়া-খাওয়া, বিড়ি-ফোঁকা, নোংরা কতগুলো জঙ্গল-পাহাড়ের মানুষদের উনি ও'র টাকা রোজগারের মেসিন ছাড়া কখনও অন্য কিছু বলে স্বীকারই করেন নি। তাদের কারো মুখের দিকেই ভালো করে চেয়ে দেখেন নি কখনও। পেমেন্ট ডে-তে টাকার বাণ্ডিল এনে মুনশীকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন, বাট্ দো শালে লোগোঁকো। মগর আভি নেহী। ম্যায় চল্ দেনেকো বাদ। ঈয়ে বদ্বু গিন্ধর লোগ বড়া হল্লা মাচাতা হ্যায়।

মালিক বললেন, দেখুন মুকার্জিবাবু আপনাকে আমি সাবধান করে দিলাম। যদি আপনার পরিবর্তন না দেখি, তাহলে আমার কিন্তু কোনোই উপায় থাকবে না। আপনি নানকুদের মদত দিচ্ছেন। আমি জানতে পেরেছি। এতদিনে এও নিশ্চয়ই জানেন যে, আমি ইচ্ছে করলে সবই করতে পারি। আপনাকে পুলিস কেসে, ফরেস্টের কেসে ফাঁসাতে পারি যখন তখন। সেসব আমার কাছে কিছুই নয়। তবে, আমি কখনও কারো ক্ষতি করি নি। ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করি নি। আপনি অনেক বছর আমার কাছে আছেন তাই-ই, আপনাকে বুঝিয়ে বলা। তবে, আজ আপনি যত বড় বড় কথা বললেন, তা আপনার মুখে মানায় না। আমি কী করি না করি, তা আপনার দেখার নয়। কর্মচারী কর্মচারীর মতই থাকবেন। ভবিষ্যতে, এমন ভাবে কখনও কথা বলবেন না আমাব সঙ্গে। আমার মুখে কেউ কথা বলুক এটা আমি পছন্দ করি না। আমার বাপ-দাদাদের মুখের ওপর কোনো কর্মচারী কখনও এমনভাবে কথা বলে নি। এসব আমি বরদাস্ত করব না। ব্যবসা বন্ধ করে দেব, সেও ভি আচ্ছা। কাহার ছুঁড়ির সঙ্গে লদ্কা-লদ্কি করছেন, করুন। জঙ্গলে যারা থাকে, তাদের মধ্যে অনেকেই করে। পেটের খিদের মতো এও একরকমেব খিদে। না-মিটলে, শরীর-মন ভালো থাকে না। কাজের ক্ষতি হয়। তা বলে, কোলকাতা থেকে আপনার সাদীর জন্য মেয়ে এল, তাকে ফিরিয়ে দিয়ে এই সব নোংরা মেয়েদের আমাদেব নিজেদের সমাজের মেয়েদের সমান ইজ্জত দেওয়াব কথা ভাবতেও পারি না আমি। এতে আমার কোম্পানীর বদনাম। মানুষ হিসেবে আপনার খুবই অধঃপতন হয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, সায়ন মুকার্জির প্রেম করার কি লোক জুটল না? একজনও? নিজের সমাজের? চার আনা দিলে যারা কাপড় খসায় তাদের সঙ্গে রিস্তেদারী করতে বসছেন দেখছি। আজীব বাত্।

দেখুন আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না।

আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে বুঝি কিছুই থাকতে পারে না? এক আপনারই তা থাকতে পারে?

আমার ত' মনে হয় না যে, আমি যা আপনাকে বলেছি তা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারের মধ্যে পড়ে। আমরা আপনাকে যে-টাকা রোজগার করে দিই, সেই টাকা থেকেই ত এত কিছু করেন আপনি। আপনি কি মনে করেন, যা-কিছু আপনি আয় করেন সবই আপনার ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রাইজ? সবই আপনি একাই করেন এবং করেছেন? অন্য কারো কোনোই অবদান নেই তার পিছনে? ব্যাপারটা মোটেই ব্যক্তিগত নয়। আপনার বিভিন্ন ডিপোতে সীজনের সময় দু নম্বরে যে বাঁশ এবং কাঠ বিক্রি হয়, যা পুরানো টায়ার বিক্রি হয় তার হিসাব মোটামুটি আপনার সব কর্মচারীই রাখে। কম করে, দিনে দশ হাজার টাকা হবে। আপনার অভাব কিসের? আপনিও যদি গরীব কুলিদের দুঃখ না বোঝেন, ত কে বুঝবে? আমাদের কথা না হয় ছেড়েই ছিলাম। আমরা কখনও কিছু বলিও নি। শুনেছি, বড়লোকের ছেলেদের দিল্ বড় হয়। কিন্তু যত দেখছি, ততই বুঝতে পারছি আপনারা দেখানোর জন্যে, শো-অফ্ করার জন্যে; নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মানুষদের

জন্যেই আপনাদের দিল্‌কে বড় করেন। আর যাদের কিছু নেই, যাদের কেউই নেই; তাদের কাছেই যত কার্পণ্য আপনাদের। আপনাদের দিল্‌ বড় ইলাস্‌টিক্‌। দেশে আপনার মতো প্রত্যেক মালিকই যদি প্রথম থেকে তাদের কর্মচারীদের দুঃখ-দুর্দশা হৃদয় দিয়ে একটুও বোঝার চেষ্টা করত তাহলে আপনাদের কম্যুনিস্টদের ভয় করতে হতো না আজকে জুজুর মতো।

রোশনলালবাবু হঠাৎই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, বাঃ বাঃ বুলিটুলি ত বেশ মুখস্থ করেছেন। এবার মাথার ওপর হাত তুলে চেঁচিয়ে বলুন, দুনিয়া কা মজদুর, এক হো।

বলেই, বললেন, আপনি এক্ষুনি বেরিয়ে যান এখান থেকে, আমার সামনে থেকে, ভালো চান ত। নইলে দারোয়ানকে ডেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।

ওঁর গলার স্বর চড়তেই দরজার কাছে ওঁর নবনিযুক্ত মোসাহেব দুজনকে দেখা গেলো। আমার গলার কাছে কী যেন একটা দলা পাকিয়ে উঠল। নিজে অপমানিত হলাম সেজন্যে নয়, সম্পূর্ণ অন্য কারণেই বড় দুঃখ হলো আমার। রোশনলালবাবু মানুষটা সম্বন্ধে আমার যে মস্তবড় ধারণা ছিলো! মানুষটার হৃদয় সম্বন্ধে, উদারতা সম্বন্ধে। কিন্তু স্বার্থে ঘা-লাগাতে তাঁর ভিতরের আসল চেহারাটা বড় কদর্যতার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল আমার সামনে। উনি আসলে একজন অশিক্ষিত মেগালোম্যানিয়াক্‌। নিজের মতো বড় আর কাউকেই দেখেন না। নিজেরটাই শুধু বোঝেন। নিজের সুখ, নিজের স্বাচ্ছন্দ্য, বড়লোক বলে নিজের সুনামটাকে অক্ষুণ্ণ রাখা, নিজের পৃষ্ঠপোষকতা; যেন তেন প্রকারেণ। মোসাহেবদেরই দাম এসব লোকের কাছে। খাঁটি মানুষের দাম কানাকড়িও নয়। বড় দুঃখের সঙ্গেই এই মুহূর্তে আমি জানলাম যে, তিনি শুধু আমার মালিকই নন, তিনি এই হতভাগা দেশের বেশির ভাগ মালিকদেরই প্রতিভূ। এঁদের জন্যেই চিরদিনের অন্ধকার এখানে। শলা-পরামর্শ করে এঁরাই চিরদিন গরীবদের, কর্মচারীদের, পায়ে শিকল পরিয়ে রেখেছেন; যাতে তারা নড়তে-চড়তে না পারে, যাতে তারা উঠে না-দাঁড়াতে পারে, যাতে বুক-ফুলিয়ে টান-টান হয়ে শ্রমের সম্মানী না চাইতে পারে। যা এঁরা মানুষের মতো হয়ে অন্য মানুষকে মর্যাদার সঙ্গে দিতে পারতেন ভালোবাসায়; নিজেদেরও অশেষ সম্মানিত করে; সেইটুকুই তাদের কলার চেপে না ধরলে, মাথায় ডাণ্ডা না-মারলে, মুখে থুথু না-দিলে তাঁরা দেন না। আরও টাকা, আরও ক্ষমতা, আরও আরও আরও সব কিছুকে শুধু-মাত্র নিজেদেরই কুক্ষিগত করে রাখতে চেয়ে এসেছেন এই মুষ্টিমেয় মানুষরা চিরটা কালই। ভগবান এদের চোখ দিয়েও দেন নি। এঁদেরই আনুকূল্যে, টাকা দিয়ে ছুলোয়া করে ভোট শিকার করে গদিতে আসীন হচ্ছে পাঁচ বছর পরপর একদল লোক। ভালোবাসায় নয়, দরদে নয়, কোনো গভীর বিশ্বাসে ভর করে নয়, শুধু ভোট-রঙ্গের ছেনালী করে বছরের পর বছর ভণ্ড, খল, ধূর্ত, বিবেকরহিত কতকগুলো মানুষ, এই দেশকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ভাগ্যকে খুন করেছে গলা টিপে। এমনই সব কৃতীলোক, যাদের মধ্যে অনেকেই এদেশে রাজনীতি না করলে, আমার মতো মাসে তিনশ টাকাও রোজগার করতে পারত না, না-খেয়েই মরত।

পথে বেরিয়েই হঠাৎ খুব হাল্কা, ভারশূন্য লাগতে লাগল। কেন যে এখানে এলাম টেট্‌রার সৎকারের সময় অনুপস্থিত থেকে, সে কথা মনে পড়ে খারাপ লাগতে লাগল। পানের দোকানে গিয়ে পান খেলাম দুটো, জর্দা দিয়ে। গা গরম লাগতে লাগল। একবার মনে হল, ফিরে গিয়ে মানুষটিকে জুতো খুলে মেরে আসি। যে মানুষ, আমার মতো নির্বিবাদী, অল্প-সুখে-সুখী, নিরামিষ মধ্যবিত্ত মানুষকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিপ্লবী করে তুলতে চায়, তার বাহাদুরী আছে বটে। নিরুচ্চারে বললাম, তুমি জাহান্নামে যাও। তুমি

একেবারেই অমানুষ হয়ে গেছ।

ভার্মা ডাক্তারকে পেলাম না। ডাঃ সিন্‌হাকে গিয়ে ধরলাম। ও'র নিজের গাড়ি আছে। অতখানি খারাপ রাস্তা নিজের গাড়িতে গিয়ে আবার শহরে ফিরে আসবেন। ফিরতে ফিরতে অনেক রাতও হয়ে যাবে। তাছাড়া, পথে হাতির ভয় আছে। তবুও তিত্‌লির জীবন নিয়ে ব্যাপার। খরচে কার্পণ্য করলে চলবে না। ঐ অবস্থাতেও হাসি পাচ্ছিল আমার। তিত্‌লিকে ভালো লাগত ঠিকই, হয়তো একরকমের ভালোবাসাও বেসেছিলাম ওকে ; কিন্তু এই মালিক, এবং মালিকের মোসায়েবরাই তিত্‌লিকে আমার জীবনে এক অমোঘ পরিণতির দিকে আস্তে আস্তে ঠেলে দিচ্ছেন। হয়তো টেট্‌রার আকস্মিক মৃত্যুও এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তিত্‌লির ব্যাপারটা এখন আমার ব্যক্তিগত সততার পরীক্ষা হয়ে দাঁড়াল। আ কোশ্চেন্ অফ্ দ্যা কারেজ অফ্ মাই কনভিক্‌শান। আমি যদি মানুষ হই ; তাহলে আমার আর ফেরার উপায় নেই।

কাছারির মোড়ে রথীদার দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল আমার জন্যে। রোশনলালবাবুর কাছ থেকে গাড়ি নিয়ে এসে রথীদাকে তুলে নেবো বলেছিলাম। আমাকে দূর থেকে সাইকেল রিক্সায় আসতে দেখে রথীদা বার বার ঘড়ি দেখতে লাগলেন। দেরি ত হয়েই ছিল। কিন্তু কী করা যাবে?

গাড়ি পেলে না? কি হল? রোশনবাবুর এত গাড়ি!

অনেক গাড়ি যেমন, তেমন নানা কাজে ব্যস্তও ত থাকে সব গাড়ি। ইনকাম্‌ট্যাক্স অফিসার, সেলস্-ট্যাক্স অফিসার তারপর আজকালকার সবচেয়ে জবরদস্ত অফিসার, ব্যাংকের অফিসার! তাদের পিছনে ত' তিন চারখানা গাড়ি সবসময়েই লেগে থাকে ব্যবসাদারদের। ব্যবসা করতে হলে এদেশে এসব যে করতেই হয়।

তবু। একটা লোকের জীবন-মরণের ব্যাপার। মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে তিন-দিন হল। এসব শুনেও গাড়ি দিলেন না?

গাড়ি যোগাড় হয়েছে। এখন রিক্সাতে উঠে পড়ুন। ডাক্তার সাহেবের গাড়িতেই যাবো। এবার আপনার কথা বলুন। মিশান সাকসেস্‌ফুল?

নাঃ। অনেক প্যারাফার্নেলিয়া আছে। অনেকেই রেড্‌টেপিজম। কোর-এরীয়ার মধ্যে ও'দের পক্ষে করার কিছুই নেই। এত সহজে ম্যান-ইটার ডিক্লেয়ার করানোও যাবে না। যা দেখছি, তাতে তোকে-আমাকে খেলে তারপরই যদি ওদের প্রত্যয় হয়।

একটা মাত্র মানুষ মারলেই কোনো বাঘ ম্যান-ইটার হয়েছে যে, তা বলাও যায় না, একথা সত্যি। কিন্তু শোন্‌চিতোয়াটা যেভাবে টেট্‌রাকে ধরেছে, যেভাবে খেয়েছে ; তাতে এটা যে একটা স্ট্রে-ইন্সিডেন্ট, এ কথা আমি অন্তত মেনে নেবো না। এই শোন্‌চিতোয়াটা খুবই ঝামেলা করবে, দেখবেন।

আমরা যখন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাঁর গাড়ি করে ভালুমারের দিকে রওয়ানা হলাম তখন প্রায় দেড়টা বাজে।



হাজারিবাগের পুলিশ ট্রেনিং কলেজটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে। বিহারের অনেক পুরোনো কলেজ এটা। এখান থেকে অনেক বাঘা বাঘা বিহার ক্যাডারের অফ্‌সর পাশ করে বেরিয়েছেন। অনেকানেক ডাকসাইটে অফিসার এখানে ট্রেনিং নিয়েছেন।

হীরু থাকে পাটনাতে। একজন ক্ষত্রী অফ্‌সরের মেয়ের সঙ্গে সে ক্লাবে টেনিস্ খেলে। বিয়ের কথাবার্তা চলছে। তবে, হীরু ডি-আই-জি হবার আগে বিয়ে করতে চায় না। লাখ দশেক ক্যাশ জমিয়ে নেবে ততদিনে। পাটনার উপকণ্ঠে বেশ কিছু ক্ষেতি-জমিন নেবে, ট্রাক্‌টর কিনবে। কুলি ও রেজা নিয়ে আসবে বিভিন্ন জায়গা থেকে। যখন রিটায়ার করবে তখন একজন রাজার মতো থাকবে ও, অনেক মিনিস্টার এম-পিরা যেমন থাকে। বিয়েতেও নেবে লাখ পাঁচেক। নেবে না কেন? ডি-আই-জি জামাই ক'জনের হয়? বড় কষ্টের মধ্যে মানুষ হয়েছে ছোটবেলায়। বাবুগিরি কাকে বলে বামুন-কায়েত-ভূমিহারদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে হীরু ওরাও' ওরফে হীরু সিং।

সরকারী কোয়ার্টার্স দারুণ সাজিয়ে নিয়েছে হীরু। ফ্রিজ, টি-ভি, কার্পেট, এয়ার-কণ্ডিশনার সব দিয়ে। ক্যাসেট্-প্লেয়ার-টেপ-রেকর্ডার, স্টিরিওফোনিক-সাউণ্ড সিস্টেম, মানে, যে-সব না থাকলে শহরে আজকাল স্ট্যাটাস্ হয় না, তেমন সবকিছুই তার আছে। ইদানীং ভাবছে, নেপাল বর্ডার থেকে একটা ভিডিও আনবে। ঘরে বসেই ছবি দেখবে। যে-কোনো ছবি। ব্লু-ফিল্ম্ও দেখবে মাঝে মাঝে।

হীরু প্রথমে ভেবেছিল যে, অফ্‌সর হয়ে সে গ্রামেই ফিরবে। সেখানে কুয়ো বসাবে অনেকগুলো। ফ্রী প্রাইমারী স্কুল করবে। গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে থাকবে। মহাতো আর গোদা শেঠকে চাকর রাখবে।

পাগলা সাহেবের কাছে তার ঋণ অনেক। কিন্তু পাগলা সাহেব যতদিন ভালুমারে আছেন, ততদিন অন্য কেউই আর সেই আসনে বসতে পারবে না। হীরু সেকেণ্ড-ইন-কম্যান্ড হতে চায় না। ভালুমারে গেলে সে সর্বেসর্বা হয়েই থাকতে চায়। তার সুন্দর সহকর্মী বন্ধু, যাকে সঙ্গে করে সে ভালুমারে গেছিল, সে এক বিহারী জমিদারের ছেলে। ছোটবেলা থেকে প্রাচুর্যের মধ্যেই সে মানুষ হয়েছে। ভালো থাকা, ভালো খানা-পিনা, ভালো পোশাক, ভালো মেয়েছেলে। হীরুরা যে বয়সে জীবনের মানে কী তা ভাবতে পর্যন্ত শুরু করে নি, ওর বন্ধু ততদিনে জীবনকে বেমালুম হজম করে ফেলেছে জোয়ানের আরক না-খেয়েই।

ও প্রায়ই হীরুকে বলে, দেশে এখন সরকারী কর্মচারীদেরই দিন। খাও-পিও-মৌজ্ করো। যিত্‌না বানানে চাও; বানাও। কোই বোল্‌নেওয়ালা নেহী।

এও সে বলে যে, দেশ যখন পুরোপুরি কম্যুনিস্ট হয়ে যাবে, (হতে ত বাধ্য) ভুখা

লোকগুলো ত আর চিরদিন এমনি করে ভুখা থেকেও চোখের সামনে আমাদের জলজ্যান্ত দেখে তা বরদাস্ত করবে না। তখন ঔর ভি মজা। টোটল কম্যুনিজ্‌মে সরকারী আমলাদের যা ক্ষমতা, তা ডিক্‌টেটরশিপ, ডেমোক্রেসীর আমলের চেয়েও অনেক বেশী। তখন ত হাতেই মাথা কাটব আমরা! আর যতদিন কম্যুনিজ্‌ম-এর বুলি কপ্‌চে ভোট আদায় হচ্ছে, যতদিন জনগণের দুঃখে দিল্লীর মস্‌নদের মানুষরা চোখের জলের বন্যা বওয়াচ্ছেন ; ভণ্ডামির বিজয়কেতন উড়ছে চতুর্দিকে, ততদিনই বা মজা কম কী? দিল্লী থেকে ফোন আসছে, একে মারো, ওকে ধরো। পুলিশ, ইনকাম-ট্যাক্স, এক্সাইজ, কাস্টমস্‌ কত ডিপার্টমেন্ট রয়েছে দেশে। তাদের বিবেকসম্পন্ন সাহসী, ন্যায়পরায়ণ সব অফ্‌সররা দিল্লীর অঙ্গুলি হেলনেই বিশেষ বিশেষ লোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। হীরুরাই ত এখন বাঘের নখ, কুমিরের দাঁত। তাদের মতো মহাপরাক্রমশালী মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান লোক আর দেশে কারা আছে?

হঠাৎ একদিন বিবেকের চুলকুনিতে হীরু ওর বন্ধুকে বলেছিল, দেশটার কথা ভাবতে হবে না?

হীরুর বন্ধু বলেছিল, শালা! দেশের কথা যাদের ভাবার, যাদের ভোট দিয়ে আম-জনতা পাটনা পাঠাচ্ছে, দিল্লি পাঠাচ্ছে, তারাই ভেবে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে! কোনোরকমে গদীটা ঠিক করে বানিয়ে নাও। যার কাছে যত টাকা সে ততবড় নেতা—অন্য নেতা কেনার ক্ষমতা তার সবচেয়ে বেশী। কম্যুনিজ্‌ম আসতে আসতে আমাদের জীবন পার হয়ে যাবে। আমাদের মওত্‌ অবধি যার কাছে মাল আছে, ক্যাশ আছে; সে-ই সব ক্ষমতার মালিক। মুখে কম্যুনিজ্‌ম-এর বুলি কপচাও আর পাকা ক্যাপিটালিস্ট বানাও নিজেকে। তবেই আখেরে কাজে দেবে। দেশ ত একটা কোম্পানী! কোম্পানীকা মাল্‌ দরিয়ামে ঢাল্‌। ওসব ফাল্‌তু ভাবনা এখানে ভেবে লাভ নেই। তোমাদের রবীন্দরনাথ ঢাগোরের কী একটা গান আছে না, ওরে ভুরু, আই মীন ডরপোক্‌, তুম্‌হারা হাঁতোমে নেহি ভুবনকা ভার—ডরপোক্‌ আদ্‌মীসে কোই কাম নেহী হোতা হ্যায়। আজকাল সব চীজোঁমে হিম্মৎ হোনা চাইয়ে। উসব ফজুল্‌ বাত মে দিমাগ মত্‌ ফাঁসাও—কাম্‌কা কাম্‌ করো—পাইসা বানাও—মউজ করো ছোক্‌রা। লেটো—এ্যাইসা ওয়াক্ত্‌ ঔর কভী নেহী আয়া, করেগা ইয়ার। ইয়ে মহান দেশ কা ...ববাদী হামলোগোঁসেই পুরী হোগা। হাম্‌ তুম, নেহী কর্‌নেসে দুস্‌রেনে কর্‌ চল্‌তা হ্যায়। নেহী করোগে, ত তুম বুদ্ধু হ্যায়—এক নম্বরকা বুদ্ধু।

হীরু ভেবে দেখেছে যে, কথাটা ঠিকই। ব্যাড মানি ড্রাইভস্‌ এওয়ে গুড মানি। গ্রেশামস্‌ ল এখন এই দেশের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ, দৃশ্যমান এবং অপ্রতিরোধ্য আইন। যা শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল; তা এখন জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

হীরুও ঝুলে পড়েছে বনদেওতার নাম করে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ভূমিহার, ক্ষত্রিয়, সমস্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুর সঙ্গে। নাম বদলে ফেলে তার যে প্রাথমিক আড়ষ্টতা ছিল, তাও কাটিয়ে ফেলেছে। কাঁটা-চামচে খানা খাচ্ছে, স্লিপিং-সুট পরে ঘুমোচ্ছে, কমোডে প্রাতঃকৃত্য করছে, অর্থাৎ মানুষ হতে হলে যা যা অবশ্য করণীয় বলে শিখেছে এদেশীয়রা সাহেবের কাছ থেকে তার সব কিছুই শিখে ফেলেছে এবং কায়মনোবাক্যে করছে হীরু। এই মহান দেশের মহান গণতন্ত্রের মহান আম্‌লাশাহীতে সে উচ্চমর্যাদায় সামিল হয়ে গেছে। ওরা এক দল। এবং সবচেয়ে শক্তিশালী দল। ওদের বিরুদ্ধে কারো কথা বলার উপায় নেই। মুখ খোলার উপায় নেই। খুললেই—খেল্‌ খতম্‌।

ভালো রকম কাঁচা টাকা করে নিতে পারলে হীরু ঠিক করেছে পোলিটিকাল লীডার হয়ে যাবে। ব্যস্‌স্‌। তখন তার টিকি ছোঁয় এমন সাধ্য কার আছে? রাজনীতির মতো এত বড় মুনাফার ব্যবসা দেশে আর দুটি নেই।

খবরের কাগজদেরও আর ওরা ভয় পায় না। বেশীর ভাগ কাগজই এখন দিল্লীর কোন্ দল সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই দিকে চেয়ে বসে থাকে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে যে সোরগোল শোনে ওরা; হীরুরা জানে যে, সেটার চেয়ে ফালতু আর কিছুই নেই। নিরানব্বই ভাগ খবরের কাগজই তাদের স্বাধীনতা ব্যবহারই করে না। বি. এ, এম. এ পাশ-এর সার্টিফিকেট সযত্নে আলমারিতে তুলে রেখে যদি কেউ অশিক্ষিতের মতো ব্যবহার করে তাহলে তার ডিগ্রীর দাম রইল কোথায়? যে-সাংবাদিকরা আজকে কোনো পরাভূত নেতাকে গালিগালাজ করে, তার ব্যক্তিগত জীবনের কুৎসা রটিয়ে রম্‌রম্ করে বই বিক্রি করে; তারাই আবার সেই নেতাই ক্ষমতায় ফিরে এলে পরদিনই সাড়ম্বরে, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন কুকুরের মতো তার পদলেহন করে। এরা আবার সাংবাদিক নাকি? ভয় করতে হবে এদের? ফুঃ!

এই দেশে ভয় করার কিছুমাত্রই নেই। যা খুশি তাই-ই করে যাও, যে-কোনো ক্ষেত্রে, যা দিল্ চায়; পকেট-ভর্তি কাঁচা টাকা রেখো—। সব ঠিক হো যায়গা, বে-ফিকর। যা একমাত্র চাই, তা শুধু বুকের পাটা। আর পুলিশ অফিসারেরই যদি বুকের পাটা না থাকবে, তবে থাকবে কার?

হীরু এখন টোটালী কনভার্টেট হয়ে গেছে। আগে কখনও-সখনও বাবা-মা-টুসি, লগন, পাগলা-সাহেব ইত্যাদিদের মুখ মনে পড়ত। এখন আর পড়ে না। শক্ত না হলে, পুরোনো কথা না ভুলতে পারলে জীবনে কখনও বড় হওয়া যায় না, ওপরে ওঠা যায় না। জানে হীরু।

ভালুমার এবং আশেপাশের অঞ্চলে ইদানীং মাঝে মাঝেই গোলমাল হচ্ছে। সিংভূম এবং বোধহয় ওড়িষ্যারও কিছু কিছু জায়গা থেকে একদল সন্ত্রাসবাদী ছেলে এসে আস্তানা গেড়েছে সেখানে। নইলে, অমন নির্বিরোধী, সর্বংসহ, কুকুর-বেড়ালের চেয়েও ঠাণ্ডা মানুষ-গুলো হঠাৎ এমন লম্বা-লম্বা কথা বলতে শুরু করল কী করে? কে তাদের এসব শিখোচ্ছে?

যেসব লোকাল রিপোর্ট ওরা পেয়েছে, তাতে নান্‌কু বলে এক ছোকরার নাম আছে। সে নাকি ভালুমার বস্তির মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোকদের পেছনে লেগেছে। এবং প্রাণের ভয়ও দেখাচ্ছে। এ কোন নান্‌কু? তাদের নান্‌কু? নিশ্চয়ই সে নয়। সেই মুখচোরা ভালোমানুষ ছেলেটি এই নান্‌কু হতেই পারে না। গ্রামের মাহাতো আর গোদা শেঠ হীরুর কাছে দু'হাজার টাকা দিয়ে একটি লোক পাঠিয়েছিল—। ওরা নান্‌কুকে খতম করতে চায়। ব্যাপারটা যেন পুলিশে চাপা পড়ে যায়। পুলিশের আর কিছুই করতে হবে না। টাকাটা হীরুর বন্ধু ফেরত দিয়েছে। প্রথমত দু'হাজার টাকাটা ওদের কাছে কোনো টাকাই নয়। দ্বিতীয়ত হীরু নিজের গ্রামে গিয়ে হুজ্জোতি করতে চায় না। বন্ধুকেই বলেছিল যেতে। বন্ধুর এত টাকা হয়ে গেছে—বাপ-ঠাকুর্দার টাকার ওপরে যে, এখন টাকা রাখার জায়গাই নেই। তার একমাত্র শখ এখন ছোক্‌রী।

যে লোকটি পাটনাতে এসেছিল ওদের সঙ্গে দেখা করতে তাকে হীরুর বন্ধু বলে দিয়েছিল যে, দুসরা রাতে যে ছোক্‌রীটি এসেছিল, তাকে সে আরেকবার চায়। আঃ কা কিম্‌তি চিজ! তা হলেই হবে। আর কিছু চায় না সে। ছোক্‌রাগুলোকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে আসবে সে। শুধু ছোক্‌রীর জোগান থাকলেই হবে।

লোকটি চলে গেলে, হীরু অবাক হয়ে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিল, দুসরা রাত মানে? তুমি কি ওখানে দু রাতে দুজনকে ভোগ করেছো নাকি?

আলবৎ। হর্ রাতমে নঈ চিড়িয়া! নেহি ত, মজা কেয়া?

হীরু তার গ্রামের সব মেয়েরই নাম জানত। তাই বলল, কি নাম তাদের?

বন্ধু বলল, প্রথম দিন ত বাংলোর চৌকিদার টিহুল না কার বউকে নিয়ে এসেছিল

ধরে। তার নাম মনে নেই। মেয়েটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই ঠিকঠাক। গায়ের রঙও চমৎকার। কিন্তু কী যেন নেই। মানে কাল্‌চার।

কালচার?

অবাক হয়ে হীরু তাকিয়েছিল বন্ধুর দিকে। টিহুলের মুখটা মনে পড়ছিল। বাংলোর হাতার গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে-থাকা, তার খেলার সাথী টিহুল! তার বউ!

বন্ধু বলল, হ্যাঁ?

তবে দ্বিতীয় রাতে যে মেয়েটি......তাকে কে নিয়ে এসেছিল?

তাকে কেউ আনে নি, ভগবান পাঠিয়েছিল ইয়ার!

ভগবান পাঠিয়েছিল?

হ্যাঁ ইয়ার। আমি একা বসে ড্রিঙ্ক করছি, মেয়েটি দরজা খুলে সোজা ঘরে এল। আমার মনে হয়, ও বোধহয় কাউকে খুঁজতে এসেছিল। দারুণ মেয়ে। এই থুত্‌নির কাছটায় তোমার সঙ্গে দারুণ মিল ছিল মেয়েটির।

হীরুর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ধ্বক্ ধ্বক্ করছিল হৃৎপিণ্ড।

বলল, নাম মনে আছে?

আছে বইকি! টুসি! টুসিয়া!

হীরু মুখ নীচু করে বলল, সে টাকার জন্যে তোমার কাছে এসেছিল? মানে শরীর বেচতে?

বন্ধু বলল, নেহী ইয়ার! অনেক অনুনয় বিনয়ও করেছিল ছেড়ে দেবার জন্যে! কিন্তু রিভলবার দেখিয়ে নাঙ্গা করলাম। আঃ কেয়া চিজ্। আজও ভাবলে আমার ঘুম আসে না। অবশ্য অনেক কেঁদেছিল মেয়েটা ভাইয়া! ভাইয়া! করে!

হীরু চুপ করে আছে দেখে বন্ধু বলল, কি হল? নিজের গ্রামের মেয়ে শুনে মন খারাপ হয়ে গেল! তোমার প্রেমিকাট্রেমিকা নাকি? তা আগে থাকতে বলে রাখবে ত' আমাকে, মহুয়াডাঁর চলে যাবার আগে।

হীরু তবুও চুপ করেই ছিল।

বলল, গ্রামের কথা মনে হলে মন খারাপ ত একটু হয়ই।

তারপর বলল, তোমার সঙ্গে আমি যাবো না ভেবেছিলাম ভালুমারে। কিন্তু যেমন সব রিপোর্ট আসছে, চল দুদিনের জন্যে দুজনেই ঘুরে আসি। এই হাজারীবাগের স্কুল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময়ও ত হয়ে এল! ঢের হয়েছে! লেখাপড়া আর ভালো লাগে না।

রিফ্রেশার কোর্স শেষ হবে সামনের বুধবার। বৃহস্পতিবারে ফেয়ার ওয়েল। জানোই ত! শুক্রবারে পাটনা পৌঁছে যাব গাড়িতে। ডি আই জি, ডি ডি এবং সি বি আইয়ের ইনস্ট্রাকশানস্ অনুযায়ীই যা করার করব। আমাদের ইচ্ছায় ত আর যাওয়া হবে না ভালুমারে। যখন ওরা পাঠাবেন তখনই যেতে হবে, হীরুর বন্ধু বলল।

হীরু বলল, তা ঠিক।

বলেই বলল, মেয়েটাকে কি তুমি রেপ্ করে মেরে ফেলেছিলে নাকি?

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল বন্ধু। বলল, একবারে বুদ্ধু না হলে, কোনো মেয়েই রেপ্ করলে মরে না। ওদের মধ্যে একটা ইন-বর্ন মেকানিজম্ আছে। ওরা বুঝতে পারে, হয়তো অনেকে বহু পুরোনো প্রবাদে বিশ্বাসও করে যে, হোয়েন রেপ্ ইজ ইনএভিটেবল, হোয়াই নট এনজয় ইট? বলেই হো হো করে হেসে উঠল।

ওঃ। হীরু স্বগতোক্তি করল।

তারপর ট্রেনিং কলেজের কম্পাউণ্ডের বড় বড় গাছগুলোর দিকে চেয়ে থাকল উদাস

হয়ে। রাস্তার বাইরে হাজারীবাগ ক্লাব। উল্টোদিকে হাম্মানের দোকান। তার পিছনে কাচারী। ডাইনে গেলে বর্‌হি রোড—তার আগে বেরিয়ে গেছে বগোদর-সারিয়ার রাস্তা কোনো বিশেষ কিছুই দেখছিল না হীরু। উদ্দেশ্যহীনভাবে যেন অনন্তকাল ধরে বাইরের দিকে চেয়ে বসেছিল সে।

হীরুর মনটা বড় উচাটন হল। অনেক কথা, অনেক আশঙ্কা তার মনে ঝড় তুলল। টুসি বলে দ্বিতীয় কোনো মেয়েকে ত' সে বস্তিতে চিনত না! তবে কি?

অ্যাফিডেভিট্ করে নাম চেঞ্জ করে, নিজেকে ভারতীয় বাদামী সাহেব বানিয়ে, প্রচুর টাকার মালিক হয়ে, ক্লাবে টেনিস খেলে, নারীসঙ্গ করে করে ও ভেবেছিল ওর যাবতীয় সংস্কার এবং ভালুমারের গোঁড়া, দেহাতী হীরুর তাবৎ হীরুত্ব ও মুছে ফেলেছে। ও আর কখনও পিছনে তাকাবে না। হি হ্যাজ বার্নট্ অল দ্যা ব্রিজেস্ বিহাইন্ড। কিন্তু...

সামনে একটা বড় কৃষ্ণচূড়া গাছ। তার শিকড় নেমে ছড়িয়ে গেছে এদিক ওদিক। সেদিক তাকিয়ে থাকতে তার বাবার হাতটার কথা হঠাৎই মনে পড়ল হীরুর। কঠোর-পরিশ্রমী, দীন-দুঃখী, তার জন্যে-গর্বিত, তার বাবার হাতের শিরাগুলো এই গাছের শিকড়েরই মতো ফুলে ফুলে উঠেছে। হঠাৎই কে যেন ওর বুকে আমূল কোনো তীক্ষ্ণ ছোরা বসিয়ে দিল। বাবা! মা! টুসিয়া। লগন। ওর মস্তিষ্কের মধ্যে দ্রুতপক্ষ পরিযায়ী পাখির মতো অনেক বোধ ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ফিরে আসতে লাগল। ওর মনে হল ভালুমারের হীরু নামক একটি ছেলের প্রাণের শিকড় ছড়িয়ে গেছে অনেকই গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে। হয়তো প্রস্তরীভূতও হয়ে গেছে। ওর বোধহয় সাধ্য নেই যে, সেই শিকড়কে......ও......

ওর পরীক্ষা পাস করার পরদিন থেকে হীরু এক চমৎকার স্বার্থপর খুশিতে ছিল, হীরু ওরাও' থেকে হীরু সিং-এ উন্নীত হয়ে। কিন্তু আজ সকালে তার বুকের কোথায় যেন চিড়িক্ চিড়িক্ করে কী একটা তীব্র যন্ত্রণা তাকে বড় পীড়িত করে তুলছে বারে বারে। কি জানি? কেন এমন হলো?

হীরু ড্রয়ার খুলে কাগজ ও খাম বের করে তার বাবা জুনুনু ওরাও'কে চিঠি লিখতে বসল। লম্বা চিঠি। হীরুর মনে হলো এ চিঠি বোধহয় শেষ হবে না কোনোদিনও। এ ত' চিঠি নয় কন্‌ফেশান্, এ এক অশ্রুশুদ্ধ প্রায়শ্চিত্তর দাখিলা, দাগ-নম্বর, খতিয়ান নম্বর শুদ্ধু; চিরদিনের জন্যে তার বাবার বুকের জমিতে জরিপ হয়ে বরাবরের মতো রেজিস্ট্রি হয়ে থাকবে। হীরু আবার পুরোনো ঘরে দুয়োর দিয়ে, ছেঁড়া আসন মেলে বসবে। হঠাৎই বড় বেদনার সঙ্গে হীরু অনুভব করল যে, বাহির পথে যে বিবাগী হিয়া ভ্রষ্ট নষ্ট হয়ে হারিয়ে গেছিল; তাকে যে ভালুমার বস্তির প্রত্যেক নারী পুরুষ এবং শিশু হাতছানি দিয়ে ডাকছে—বলছে, আয় আয় আমাদের হীরু, ফিরে আয়রে তুই আমাদের কাছে, আয়রে আমাদের গর্বের হীরু। আমাদের পুরনো ওম্-ধরা বুকে ফিরে আয়।

চিঠি লেখা থামিয়ে, বাইরের বড় কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে আবারও চাইল হীরু। পুলিশ সাহেব নয়; মানুষ হীরু। ওর দুচোখ জলে ভরে এল। যে জল, গঙ্গাজলের চেয়েও পবিত্র!



সন্ধ্যে হয়ে আসছে। পাহাড়তলির প্রায়ান্ধকার বনস্থলীর আলো-আঁধারির চাঁদোয়া ফুঁড়ে উড়ে যাচ্ছে ধূসর-কালো দীর্ঘগ্রীবা রাজহাঁসের দল দ্রুতপক্ষে, দূরের মৎস্যগন্ধী নদীর নূপুর-নিক্কণিত জলজ নির্জনে। ওরা সব পরিযায়ী পাখি। কত দূর থেকে আসে শীতে, আবার শীত ফুরোলেই খেলা শেষ করে উড়ে যায় নিজেদের জলাভূমিতে। ওরা যখন বনজঙ্গলের মাথা ছুঁয়ে উড়ে যেতে যেতে ওদের হলুদ-কালচে ঠোঁটে কীসব দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণ করে, তখন মনে হয় সেই কোঁয়াক্ কোঁয়াক্ মন্ত্রে প্রকৃতিকে ওরা এই মাত্র গর্ভবতী করে দিয়ে গেল।

টুসি আকাশের দিকে চেয়ে, ওদের সাবলীল স্বচ্ছন্দে উড়ে-যাওয়া দেখছিল উদাস অবাক চোখে। ওর স্নিগ্ধ শরীরের উন্মুখ জমিতে সতেজ নরম চিকন জীবনের বীজ বুনে গেছে এমনি এক শীতের সুন্দর অচেনা পাখি। অথচ ওর চেনা, চির-চেনা অন্য বন্য এক প্রাণবন্ত পাখির পথ চেয়ে টুসি কোনো প্রতীকী নারীর মতো শীষতোলা গা-শিউরানো সুখের আশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে, এই সুন্দর দেশের এক সুন্দরী সরল নারী, যেন যুগযুগান্ত ধরে। পাহাড়ে চূড়ো থেকে হঠাৎ উড়ে-আসা দামাল ভেজা হাওয়ার মতো নান্‌কু পাখিটি বুঝি এখুনি এসে লেবুফুলের গন্ধ-ভরা নূপুর-পরা, দুষ্টু বৃষ্টির মতো পটুর-টুপুর টুপুর-পটুরের দীর্ঘ নাচের দোরাত্ম্য শুরু করে দেবে তার ঝিম্-ধরা যুবতী শরীরের ঝিঁঝিঁ ডাকা গহীন ঝিলে।

এখুনি।

কিন্তু নান্‌কু আসে না; আসে নি। কোথায় কোথায় যে উধাও হয়ে যায় নান্‌কু না বলে-কয়ে; তা নান্‌কুই জানে।

অন্যমনস্ক টুসির চমক ভাঙলো বুল্‌কি আর পরেশনাথের ডাকে। চমকে উঠে টুসি বলল, তোরা এই ভরসন্ধ্যেতে এখানে কি করছিস! এখনও বাড়ি যাস নি? জানিস না, শোন্‌চিতোয়াটা রোজ হামলা করছে।

বুলকি বলল, জানি আবার না? আমাদের বাছুরটাকে এক্ষুনি ধরে নিয়ে গেছে তাই-ই তো দৌড়ে এলাম তোমার কাছে। কাড়ুয়া চাচা কোথায় জানো?

টুসি আতঙ্কিত গলায় বলল, বলিস কিরে? কাড়ুয়া চাচা যেখানেই যাক, তোরা এখুনি দৌড়ে বাড়ি চলে যা! জানিস না, চিতাটা মানুষ ধরছে। একি এমনি শোন্‌চিতোয়া? তোদের সাহস ত' কম নয়?

পরেশনাথ বলল, সাহস নেই আমাদের টুসিদিদি। কিন্তু চিতাটা আমাদেরই বাড়ির পিছনের নালায় বসে সফেদী বাছুরটার হাড় চিবিয়ে খাচ্ছে কড়্‌মড় করে। বাবা কোমরের ব্যথায় হাঁটতে পারে না, জ্বর খুব; সকাল থেকে। কী করব, বুঝতে না-পেরে তোমার কাছেই দৌড়ে এলাম আমরা।

টুসি ওদের ধমক দিয়ে বলে, তোরা আবার দৌড়ে বাড়ি যা। দরজা বন্ধ করে থাকবি। সারা রাত কেউ বেরুবি না। কাল সকালে যা হয় হবে। আমি বাবাকে বলব। বাবা ফিরলে। বাবা গাড়ুতে গেছে। কাল ফিরবে। আজকাল ত' বিকেলের পর কেউ বাড়ির বাইরে বেরোয় না। কারো উপায়ই নেই বেরুবার। দেখছিস না, হাট পর্যন্ত ভেঙে যাচ্ছে বেলাবেলি এই শোন্‌চিতোয়াটারই জন্যে! আর বলিহারি তোদের সাহস! কোনো কথা নয়। এক্ষুনি পালা তোরা। এক্ষুনি কাড়ুয়া চাচাকে কোনোক্রমে খবর দিতে পারলে, দেবো।

চলে যেতে যেতে, বুল্‌কি বলল, নান্‌কু ভাইয়া কোথায়?

টুসি বলল, তোর নান্‌কু ভাইয়াই জানে। ছাতার বিয়ে হল আমার! ছাতার ভাতার। বিয়ের নামে বিয়ে করে, উধাও হল! কখনও আসে হপ্তাহে একবার। কখনও তকাও না। কে বলবে, আমার বিয়ে হয়েছে একমাস! কবে আকেই ধরবে চিতাটা, সেই ভয়েই মরে যাচ্ছি আমি। রাত-বিরেতে বনে-জঙ্গলে কী যে করে বেড়ায়। ভূত একটা! যাচ্ছেতাই।

এবার ভাই-বোন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে চলল বাড়ির দিকে। যখন বাড়ির কাছাকাছি পেঁৗছেছে তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়িতে আবারও ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে শর্ট-কাট করল ওরা। প্রায় বাড়িতে পেঁৗছে গেছে, হঠাৎ দেখে; নালার মধ্যে থেকে উঠে এসে চিতাটা একটা বড় পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দুধ-সাদা বাছুরটার রক্তে চিতাটার মুখ-নাক-বুক-গোঁফ সব লালে লাল হয়ে আছে। ওদের দু' ভাইবোনের পায়ের আওয়াজ শুনে কী ব্যাপার দেখার জন্যেই বোধ হয় উঠে এসেছিল শোন্‌চিতোয়াটা। তাকে দেখতে পেয়েই ওরা দু'ভাইবোন একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠল। হঠাৎ মনে হল, চিতাটা বোধহয় ওদের দিকেই দৌড়ে আসছে।

ঘরের মধ্যে থেকে মানিয়া বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে টাঙ্গি হাতে দরজা অবধি এল অনেক কষ্টে। মুখে চিৎকার করে গালাগালি করে চিতাটাকে ভয় পাওয়াবার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর অনুনয়-বিনয় করে ভগবানের আশীর্বাদ চেয়ে অসহায়, সম্বলহীন বাপ তার সন্তানদের প্রাণ ভিক্ষা করল বারবার চিতাটার কাছে। ওরা দু' ভাইবোন দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকলেই, তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করল মানি। ঘরের ভিতরে মাটির ওপরে কাঁথাতে শুয়ে মুঞ্জরী গালাগালি করতে লাগল মানিকে, ছেলেমেয়ে দুটোকে পাঠাবার জন্যে।

বলল, বে-আক্কেলে লোক! নিজের মুরোদ নেই ঘর থেকে বেরোবার, দুধের ছেলেমেয়ে দুটোকে বাঘ দিয়ে না-খাওয়ালে হচ্ছিল না। বাপ না শত্রু!

মানি বলল, বাজে কথা বলিস না। আমার না-হয় কোমর ভেঙেছে—তাই-ই না এত কথা!

মুঞ্জরী পাশ ফিরে শুতে শুতে বলল, তোমার কোমর আবার কবে ছিল? চিরদিনই ত' কোমরভাঙা মরদ তুমি। কোন সুখটা দিয়েছো তুমি আমাকে জীবনে? এখন এই ছেলে-মেয়ে দুটোকে বাঘে খেলেই তোমার হাড় জুড়োয়!

হঠাৎ ওরা সবাই চুপ করে গেল। মনে হল বন্ধ দরজার ওপরে নখ দিয়ে কেউ আঁচড়াচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকেই ওরা একসঙ্গে আবার চিৎকার করে উঠল। মুঞ্জরীও কাঁথা ছেড়ে উঠে বসে হাতা দিয়ে হাঁড়ি বাজাতে লাগল। ভয়ে, ভীষণ ভয়ে; ওদের উপবাসী পেটের মধ্যে একদল ছাতার পাখি যেন নড়ে-চড়ে বসতে লাগল। ছ্যাঃ ছ্যাঃ করে ডাকতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর শব্দ মরে গেল। ওরাও ঘরের ভিতর মরার মতো পড়ে রইল। একটু

পরে হাড় কামড়ানোর কড়্‌মড়্‌ আওয়াজ আবার শোনা গেল নালা থেকে। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল ওরা। তারপর সারারাত ঘুমিয়ে ও জেগে কোনোক্রমে কাটিয়ে দিল। মুঞ্জরী পথ্য পেলো না কোনো। ওষুধ পেলো না। ছেলেমেয়ে দুটো ও মানি কিছু খেতেও পেলো না সে রাতে।

চিতাটার সাহস দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে। টেট্‌রা চাচাকে ধরার পর কোনো মানুষ ধরে নি ঠিকই। কিন্তু একটা কুকুর, দুটো পাঁঠা, ধাঙ্গড় বস্তির দুটো শুয়োর এবং আজ এই বুল্‌কিদের বাছুরটা তার পেটে গেল।

পুরো ভালুমার অঞ্চলে অলিখিত সান্ধ্য আইন জারী হয়ে গেছে। বিকেল থাকতে থাকতে সকলেই যে যার ঘরে ঢুকে পড়ে। উঠোনেও কেউ থাকে না। যদি কেউ অন্য বস্তিতে যায়, তাহলে সেখানেই থেকে যায়। বিকেলে ভালুমারে ফেরার চেষ্টাও করে না। দিনের বেলাতেও বড় বড় দল করে ওরা জঙ্গলে পাহাড়ে যায়, সশস্ত্র হয়ে। একা একা জঙ্গলে যাওয়ার কথা আর কেউই ভাবে না।

রথীদার বাড়িতে একটা ছোট্ট মীটিং বসেছিল। আমরা ডালটনগঞ্জ থেকে যেদিন ফিরলাম তার পরদিন রাতে। কাড়ুয়াও এসেছিল। আমিও ছিলাম। রথীদা কাড়ুয়াকে বলেছিল কাড়ু, তুই এর জিম্মা নে। পরে যা হওয়ার হবে। কাড়ুয়া বলেছিল, আপনি বলার আগেই নিয়েছি। মাহাতো আর গোদা শেঠ-এর মতো দু' পেয়ে শোন্‌চিতোয়া ত' এমনিতেই কত্ত আছে গ্রামে! তার ওপর এ ব্যাটাকে আর সহ্য করা যায় না।

ইতিমধ্যে গতকাল একটা কান্ড ঘটে গেছে। কয়েকটি অল্পবয়সী অচেনা ছেলে বিকেল তিনটের সময় গোদা শেঠের দোকানে ঢুকে তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে তার কোমরে দড়ি বেঁধে লাঠিপেটা করতে করতে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়। তারা কারা, কোত্থেকে এল ভালুমারে; তার কিছুই জানা যায় নি। ছেলেগুলো গোদা শেঠকে খুন করে রেখে যেতে পারত, কিন্তু তা না-করে শোন্‌চিতোয়াটা যে-পথে প্রায় রোজই যাতায়াত করে সেই পথেই একটা গাছের সঙ্গে তাকে বেঁধে রেখে কোথায় উধাও হয়ে গেছিল। সাবা রাত শোন্‌চিতোয়াটা গোদা শেঠের ধার দিয়ে অন্তত বার চারেক গেছে। গোদা শেঠকে মুখ তুলে দেখেছে। তারপর চলে গেছে ওকে স্পর্শ না করেই। বস্তির লোকে বলছে, গোদা, যমেরও অরুচি।

পরদিন সকালে গোদার লোকজন যখন তাকে উদ্ধার করে দড়ি খুলে, তখন সে ভয়ে মরা। প্রত্যেক মানুষই সত্যি সত্যি মরার আগে অনেকবার মরে। এর চেয়ে মরে-যাওয়াও ঢের ভাল ছিল। পাগলের মতো তার দৃষ্টি। উল্টোপাল্টা কথা বলছে; গায়ে ধুম জ্বর। গোদাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ডালটনগঞ্জে চিকিৎসার জন্যে আর পুলিশে ডায়েরি করার জন্যে।

দিনে দিনে ভালুমার জায়গাটা সত্যিই সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। ছোট্ট বুকের ছোট্ট সুখের দিন বুঝি দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। ছেলেগুলো কোত্থেকে এল, এই মানুষ-খেকো চিতার জঙ্গলে রাতের অন্ধকারে কোথায়ই বা গেল; কেউই তার কিনারা করতে পারে নি। এই বস্তিতে একটার পর একটা উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটছে টেট্‌রার মৃত্যুর পর থেকে প্রায় রোজই।

যেদিন বুল্‌কিদের বাছুর নিল চিতাটা, তার পরদিন আরও এক সাংঘাতিক কান্ড ঘটল। সেই যে দাড়িওয়ালা ফরেস্ট গার্ড—যে বলেছিল, আমরা গভরমেণ্টের অফিসার, বাঘ-চিতা ভয়ে কখনই আমাদের কাছে আসবে না, সে তার কোয়ার্টার্সেরই সামনে ভর দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর চৌপাই পেতে কাঁটাল গাছতলায় ঘুমোচ্ছিল। কোয়ার্টার্সে অন্য গার্ডরাও ছিল। ফরেস্ট বাংলোতে একজন টাইগার প্রোজেক্টের ডি-

এফ-ও ক্যাম্প করেছিলেন। তাঁর জীপ গাড়ির ড্রাইভার, বেয়ারা, লোকজন সকলেই ছিল। তাছাড়া, কোয়ার্টার্সের পাশেই কুয়োতলা। সেখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি ভীড় লেগেই আছে। ঘটি-বালতির আওয়াজ। লাটা-খাম্বার ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর। কিন্তু এত লোকজন, শোরগোলের মাঝেই শোন্‌চিতোয়াটা এসে সেই দাড়িওয়ালা গার্ডকেই ঘুমন্ত অবস্থাতে টুঁটি কামড়ে ধরে তুলে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে খেয়ে সাফ্ করে দিয়েছে। অদৃষ্টের কী পরিহাস। সে অবশ্য সেই সময় লুঙ্গী আর গেঞ্জী পরে শুয়েছিল। তার সরকারী পোশাকটা শরীরে না থাকায় শোন্‌চিতোয়াটা সরকারের প্রতি সম্মান দেখায় কী দেখায় না, তা ঠিক পরখ করে দেখার সুযোগ হয় নি কারো। যাই-ই হোক, সেই গার্ডের শরীরের অংশবিশেষকেও কাল দাহ করা হয়েছে নিদিয়া নদীর পাড়ের শ্মশানে। সেও এখন টেট্‌রার মতই ভালুমারের স্মৃতি হয়ে গেছে।

এখন সকাল এগারোটা বাজে। কাড়ুয়া আর নান্‌কু হুলুক্-এর দিকে একটি ছায়াছন্ন পাহাড়ী নালার পাশে গভীর গুহার মধ্যে বসে আছে। খিচুড়ি চাপিয়েছে নান্‌কু, সঙ্গে আলু ফেলে দিয়েছে দুটো। আর বনমুরগীর তিনটে ডিম। মুরগীটা গুহার পাশে বসেই ডিমে তা দিচ্ছিল। ওদের আসতে দেখেই ক'ক্ ক'ক্ করে উড়ে যেতেই কাড়ুয়ার চোখে পড়েছিল ডিমগুলো। সঙ্গে সঙ্গে নদীর জলে ধুয়ে নিয়ে, খিচুড়ির মধ্যে চালান করে দিয়েছে। বনদেওতার দান। কাড়ুয়া বলেছিল।

নান্‌কুর হাতে একটা দো-নালা দেশী বিদেশী শট্‌গান। কাড়ুয়াকে বুঝিয়ে দিচ্ছে নান্‌কু, সেফ্‌টি ক্যাচ কোথায় আছে, কী করে বন্দুকটা খুলতে ও জোড়া লাগাতে হয়। এ্যালফাম্যাক্স-এর টাটকা এল-জি আর লেথাল্ বল্ জোগাড় করে এনেছে ও। বন্দুকটা কিন্তু চোরাই বন্ধুক নয়। বন্দুকটা আসলে হীরুর। নান্‌কু হাজারীবাগে গেছিল ক'দিন আগে টুসিয়ার কাছে সব শুনে। নাম ভাড়ায় নি। কিন্তু হীরুই তার পরিচয় গোপন করে অন্য পরিচয় দিয়েছিল। ওকে বলেছিল, তুই? তুইই সেই নান্‌কু? তোর দুঃসাহস ত কম নয়? বাঘের মুখে মাথা ঢোকাতে এসেছিস?

টেট্‌রাকে বাঘে নেওয়ার একদিন পরই গেছিল ও।

হীরুকে চিতার কথা সবই বলেছে নান্‌কু। হীরুর সেই রইস্ খুবসুরৎ বন্ধুর সঙ্গে আলাপও হয়েছে নান্‌কুর। হীরুর মাধ্যমেই। নান্‌কু তার সম্বন্ধে কিন্তু আর কিছুই বলে নি হীরুকে। যা করার একদিন নিজেই করবে। এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত। হীরুর চোখমুখ কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ দেখেছিল নান্‌কু। হীরু যেন অনেক বদলেও গেছে বলে মনে হয়েছিল। শোন্‌চিতোয়াটার কথা সব শোনার পর নিজে পুলিশ সাহেব হয়েও, তার বস্তির লোকদের বাঁচাবার জন্যেই এমন বেআইনী কাজ করেছে হীরু। তার লাইসেন্সড্ বন্দুকটা নান্‌কুর হাতে তুলে দিয়েছে।

একটা বড় থলে দিয়েছিল হীরু, বন্দুকটাকে ভেঙে লক্-স্টক্-ব্যারেল আলাদা করে লুকিয়ে নিয়ে আসার জন্যে। নান্‌কুকে বলেছিল কাড়ুয়া চাচাকে দিস্ আর বলিস, যেন সাবড়ে দেয় চিতাটাকে। বন্দুকটা এক্ষনি নিয়ে আসার দরকার নেই। আমি শিগ্‌গিরই যাব অফিসিয়াল ডিউটিতে ভালুমারে। ততদিন যেন কাড়ুয়া চাচা এটাকে লুকিয়ে রাখে কোথাও। আমি গেলে, ফেরত নেওয়ার বন্দোবস্ত করব।

নান্‌কু চিন্তিত হয়ে বলেছিল, কাড়ুয়া চাচা তোমার বন্দুক সমেত ধরা পড়লে?

হীরু হেসেছিল। বলেছিল, ধরা ও পড়বে না কখনও হাতে নাতে। ওর মতো শোন্‌চিতোয়া আমাদের বন-পাহাড়ে আর একটাও নেই। যদি একান্ত ধরা পড়েই, তবে ত পুলিশ কেসই করবে ওরা। আমি আছি। ভয় নেই কোনো। বলিস্ চাচাকে।

জবান্ দিলাম।

কাড়ুয়া বন্দুকটা নিজের হাতে ভালো করে বসিয়ে নিচ্ছিল। নতুন বৌয়েরই মতো, নতুন বন্দুকেও সড়গড় হতে সময় লাগে।

চিরদিন গাদাবন্দুক চালিয়েই অভ্যেস। এরকম বন্দুক যে কাড়ুয়া আগে ব্যবহার করে নি; তা নয়। শহুরে শৌখিন শিকারীরা শিকারে এসে তাকে বলেছে শিকার করে দিতে, তাদের বহুমূল্য বন্দুক হাতে তুলে দিয়ে। অবশ্য তারপর শিকার হয়ে গেলে, শম্বর ও হরিণের চামড়া ও মাংস, বাঘের মাথা ও চামড়া নিয়ে তারা ফিরে গেছে। তাদের ভালো-ভালো বন্দুক রাইফেলগুলো ফিরিয়ে দেবার সময় চিরদিনই বুকের মধ্যে ভীষণ এক কষ্ট হয়েছে কাড়ুয়ার। বাবুরা কাড়ুয়াকে দশ-বিশ টাকা বকশিস দিয়ে, নিজের নিজের শ্বশুর বাড়িতে রোমহর্ষক শিকারের গল্প করার অধীর আগ্রহে তন্ময় হয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে গেছেন যার যার শহরে।

কিন্তু সে-সব অনেক দিনের কথা। শিকাব বন্ধ হয়ে গেছে এ তল্লাটে বহুবছর। বন্দুকটাকে নেড়ে চেড়ে পরখ করে কুঁদোব সঙ্গে গাল লাগিয়ে, ঝক্ঝকে ব্যারেলের শেষে মাছিটাকে ভালো করে দেখে স্বগতোক্তি করল। বেহেতরীন!

হীরু একটা ছোট ক্ল্যাম্প ও দু ব্যাটারীর টর্চও দিয়েছিল নান্কুকে। টর্চটা ক্ল্যাম্পের সঙ্গে ফিট করা থাকবে রাতে। যেখানে আলোর ফোকাস্ পড়বে, সেখানেই গুলি লাগবে গিয়ে ট্রিগার টানা মাত্র। এ বন্দুকটা হাতে করে কাড়ুয়ার মনে হলো মুঙ্গেরী গাদা বন্দুকটা যেন বছর বছর বাচ্চা বিয়োনা রুখু বুড়ি বউ আর এই বন্ধুকটা যেন কুমারী মেমসাহেব। কাড়ুয়ার সঙ্গে প্রথম মিলন তার। কাড়ুয়া অবশ্য নান্কুকে বলেছে, এই বন্দুক হাতে থাকলে যমকেও ভয় করি না আমি!

কাড়ুয়া শুধোল, এটা কোন দিশী বন্দুক রে নান্কু?

ইংলিশ। ডাব্লু-ডাব্লু গ্রীনার কোম্পানীর বন্দুক। বন্দুকের মধ্যে এ রাজা।

কত দাম রে নান্কু?

কম করে দশহাজার হবে! আজকের বাজারে।

দশ হাজার টাকা? কী বলিস রে? হীরুব আমাদের এত টাকা?

বল কী চাচা! ফুঃ। দশ হাজার আবার টাকা নাকি? যাদের টাকা আছে, তাদের কাছে এ কোনো টাকাই নয়। এত হীরুর এক ঘন্টার কামাই।

কাড়ুয়া বারবার বিড়বিড় করে বলতে লাগল; দশ হাজার, দশ হাজার!

তারপরই, চুঃ শব্দ করে; চুমু খেল বন্দুকটাকে একবার।

নান্কু হাসল। বলল, ভাগ্যিস চাচী নেই ধারে কাছে। থাকলে, সতীনের ওপর রেগে যেত।

কাড়ুয়া, আসলে এই শোন্চিতোয়াটার মধ্যে শুধুমাত্র একটা চিতাবাঘকেই দেখে নি। চিতা বাঘ, বড় বাঘ, এবং মানুষখেকোও সে অনেকই মেরেছে জীবনে। কিন্তু বাঘ মেরে আর সে আনন্দ পায় না। সে মাহাতোকে মারতে চায়, গোদা শেঠকে মারতে চায়। সমাজের নর-নারী খাদকগুলোকে এক এক গুলিতে ধরাশায়ী করতে চায় কাড়ুয়া। কিন্তু তার সাধ্য কতটুকু? সাধ্য নেই বলেই এই শোন্চিতোয়াটাকে ও মাহাতোদের আর গোদা শেঠদের প্রতিভূ হিসেবে দেখছে। এই বস্তির যা কিছু অমঙ্গল অশুভ, সবকিছুর প্রতীক এই চিতাটা—মাহাতোদেরই প্রতীক এ। একে না মারতে পারলে কাড়ুয়া রাতে ঘুমোতে পারবে না। বস্তির মঙ্গলও ফিরে আসবে না।

খিচুড়ি ফুটে গেল। ওরা গুহার মধ্যে বন্দুকটাকে রেখে নদীর মধ্যে নেমে, জল দিয়ে পাথর পরিষ্কার করে পাথরের ওপরই মাটির হাঁড়িশুদ্ধ ঢেলে গরম ধোঁয়া-ওঠা

খিচুড়ির মধ্যে নুনী থেকে একটু নোনা মাটি তুলে এনে ছড়িয়ে দিয়ে হাপুস্-হাপুস্ করে খেলো। খাওয়া হয়ে গেল, নান্‌কু বলল, আমি চলি চাচা। জিম্মা, তোমার রইল।

কাড়ুয়া হাসল। ওর কুচ্‌কুচে কালো বলিরেখাময় কপালে খুশি আর চিন্তামেশা অদ্ভুত একটা ঢেউ খেলে গেল। সাদা দাঁতগুলো ঝিক্‌মিক করে উঠল। একটা চুট্টা ধরাল কাড়ুয়া। নান্‌কুকেও একটা দিল। বাঁ হাত দিয়ে টিকিটাকে আদর করল স্নেহভরে।

তারপর বলল, সাবধানে যাস্‌রে! আর দেরি করিস না। সন্ধ্যে হয়ে এল।

নান্‌কু হাতের ফলা-বসানো লাঠি দেখিয়ে বলল, এই ত আছে। তাছাড়া, ফাঁকায় ফাঁকায় যাবো আমি। আমার সঙ্গে এখনও অনেক চিতার মোকাবিলা বাকি আছে চাচা। এই একটা ঘেয়ো, মানুষখেকো বুড়ো শোন্‌চিতোয়াটার হাতে মরলে কি আমার চলে? আমার মওত্ হবে অনেক বড় মওত্। এমন মওত্ কি আমাকে মানায়? তুমিই বল?

কাড়ুয়া আবার হাসল। বলল, ঠিক ঠিক। তবে মওতের কথা কেন? তুই ত এখনও শিশু।

নান্‌কু আর কথা না-বাড়িয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে যেতে বলল, চললাম চাচা।

কাড়ুয়া কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে ওর চলে-যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইল। এক নীরব, নিঃশব্দ আশীর্বাদ আর শুভকামনা কাড়ুয়ার বুকের গভীর থেকে ওঠা এক দীর্ঘশ্বাসে মথিত হয়ে নান্‌কুর পায়েমাড়ানো জঙ্গলের শুকনো পাতার মচ্‌মচানির সঙ্গে মিশে গেল।

কাড়ুয়া কিছুক্ষণ উদাস চোখে উদ্দেশ্যহীনভাবে ওখানে বসে রইল। তারপর উঠে, মাটির হাঁড়িটাকে নিয়ে গিয়ে গুহার ভিতরে লুকিয়ে রাখল। অনেকগুলো বাদুড় আর চাম্‌চিকের গুহার মধ্যে। বিশ্রী একটা গন্ধ। কাড়ুয়া ঠিক করল, ইউক্যালিপটাস্ প্লানটেশানে গিয়ে বেশ কিছু পাতা ছিঁড়ে এনে গুহাটির মধ্যে পোড়াবে। যতদিন না শোন্‌চিতোয়াটাকে মারা যাচ্ছে, ততদিন এই গুহাটাই তার ঘর বাড়ি; সব। নান্‌কু চাল-ডাল দিয়ে গেছে। গোটাকয় আলু, পেঁয়াজ আর কাঁচালংকাও। অনেকদিন এত ভাল স্বাদু খাবার খায় নি কাড়ুয়া। কিন্তু খাবারের স্বাদের চেয়েও অনেক বেশী ভালো লাগছে নতুন টোটাগুলোর গন্ধ। বন্দুকটার নীলচে—কালো ইস্পাতের জোড়া নলের ঠাণ্ডা পরশ! আঃ। জীবনে বেশী ত কিছুই চায় নি কাড়ুয়া। শুধু এমনি একটি মাত্র বন্দুক চেয়েছিল। আর চেয়েছিল, বনপাহাড়ে অবাধ-বিচরণের স্বাধীনতা। চোরের মতো নয়। মানুষের মতো, মাথা উঁচু করে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর, থাকার অবাধ, অকুণ্ঠ, অকুতোভয় অধিকার।

বন-জঙ্গল, বনের হরিণ, পাখি, প্রজাপতি, বাঘকে কাড়ুয়া ত অন্য কারো থেকে কম ভালোবাসেনি। তবে, তার ভালোবাসার রকমটা অন্য। সব ভালোবাসার রকমই অন্য। ভালোবাসা যদি একই রকম হত, হত একই জনের প্রতি; তাহলে ভালোবাসা হয়তো আর ভালোবাসা থাকত না।



এখন কত রাত কে জানে? আকাশে হঠাৎ যেন একটু মেঘের আভাস দেখা দিল। দিগন্তে ধুঁয়ো ভাব। অস্থির একটা হাওয়া জঙ্গলের নিস্তব্ধ বুক থেকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল! লাফিয়ে উঠে, খুব জোরে দৌড়ে এসেই যেন পথ খুঁজে না-পেয়ে থেমে গেল বনের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে। আচমকা নতুন বনে, বুড়ো হাওয়ার ছেলেমানুষী দেখে পাতায়-পাতায় হাসাহাসি-কানাকানি শুরু হল। বুড়ি পাতারা বুড়ো হাওয়ার সামনে ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করে লাফিয়ে পড়তে লাগল লাল-হলুদ শাড়ি উড়িয়ে। তারপর তার সঙ্গে জড়াজড়ি করে, তাকে সুড়সুড়ি দিতে দিতে ও চাপা হাসি হাসতে হাসতে গভীর নালার অন্ধকারে গড়িয়ে গেল।

হাওয়ার যেমন আছে, ঝরা পাতাদেরও কাম আছে।

এসব ভেবে কাড়ুয়া নিজেদের মনে হেসে উঠল নিঃশব্দে।

অনেকক্ষণ ধরে গাছের ওপরে মাচাতে বসে থাকায় কাড়ুয়ার পা ধরে গেছিল। নিঃশব্দে, চুপিসাড়ে যেন অন্ধকারের গায়েও পা না লেগে যায় এমনই সাবধানে, ও পা-টা বদলে বসলো। ওপরে তাকালো একবার। মেঘটা উড়ে গেছে। এখন ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার সময়ও নয়।

কাড়ুয়া ভাবছিল। চারধারে যা অন্যায়, অনাচার, প্রকৃতি বুঝি তার অভ্যেস-টভ্যেস সব গুলিয়ে ফেলেছেন। তার রোজকার রুটিন বলে আর কিছুই নেই। বছরের রুটিন বলেও নেই। কাড়ুয়াকে এই নিয়মভাঙার কথা কেউই বলে দেয় নি। কিন্তু পাহাড়চূড়োর নরম ঘাসে কান পেতে শুনলেই ও আজকাল আসন্ন ভূমিকম্পর শব্দ শুনতে পায়। বনের পাখির ডাক ওর কানে কত কী সাবধানবাণী উড়িয়ে আনে। গভীর জঙ্গলের মধ্যের নিভৃত তালাওর নীচে জল যেখানে খুব গভীর, যেখানে কুমির আর বড় বড় মাছ আর সাপ থাকে; সেখানে গিয়ে চুপ করে বসে থাকলে ও কুমিরদের গলায় আসন্ন বন্যার আগমনী গানও শুনতে পায় যেন। যারা কুমিরদের ডাক আর শিস শুনেছে কখনও, তারাই জানে কী অদ্ভুত গা ছম্‌ছম্‌ করা সে ডাক। কুমিরদের ইদানীং-কার আশ্চর্য গলার স্বর আর জলের স্তব্ধতা কাড়ুয়ার মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল করে তোলে যে, এক দারুণ বন্যা আসছে পৃথিবীতে, আসছে ভূমিকম্প। এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে শিগগিরই। যারা থাকবে, তারা আবার নতুন করে, সুন্দর করে, স্নিগ্ধ সততার সঙ্গে গড়ে নেবে সে পৃথিবীকে।

হঠাৎই কাড়ুয়ার মনে হল, একটা ছায়া যেন সরে গেল অন্ধকার সুঁড়িপথে। তারপর ছায়াটা সোজা এগিয়ে আসতে লাগল অন্ধকারের গাছ-গাছালির তলার ছায়াভরা সুঁড়ি-পথটা দিয়ে। বন্দুকটা কোলের ওপরই রাখা ছিল আড়াআড়ি। ছায়ারই মত নিঃশব্দে

সেটাকে তুলে নিল। তারপর কাঁধে ছোঁওয়াল।

কিন্তু পরক্ষণেই নামিয়ে নিল আবার।

শোন্‌চিতোরা নয়। মানুষ।

মানুষ?

দুটি মানুষ আসছে এই গহন নির্জন বনের অন্ধকারে, আলো না-নিয়ে। নিঃশব্দে। এরা নিশ্চয়ই মানুষখেকো চিতার চেয়েও গোপনে চলে।

এরা কারা?

মানুষ দুটো কাড়ুয়ারই গাছের নীচে এসে থেমে গেল। তারপর ফস্‌-ফস্‌ করে দেশলাই জ্বালল। জেবলে কিছু শুকনো পাতা এক জায়গায় জড়ো করে আগুন করল। একটা হ্যারিকেনও জ্বালল। তারপর হ্যারিকেনটা নিভু-নিভু করে ওখানেই ফেলে রেখে কোথায় যেন চলে গেল পরক্ষণেই।

শোন্‌চিতোয়ার ভাবনা ভুলে এখন কাড়ুয়া ছেলে দুটোর কথা ভাবতে লাগল। একেবারে বাচ্চা ছেলে! বয়স আঠারো কুড়ির বেশী হবে না। সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে একজনের। দুধের শিশু। এরাই কি সেই ছেলেরা? যাদের খোঁজে পুলিশ সাহেবরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন? এতটুকু টুকু সুন্দর সব ছেলে, ওরা কিসের টানে, কিসের লোভে, মা-বাবার কোল, বাড়ি ঘর ভাই বোন ফেলে এই মানুষখেকো বাঘের জঙ্গলে অন্ধকার রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে? কোন আগুনে পুড়ছে সোনার বাছারা? কী ওরা খায়? কে ওদেব শত্রু? ওদের মিত্রই বা কে?

কাড়ুয়া লেখাপড়া করে নি। বেশী জানে টানেও না। বোঝে আরও কম। বোঝার মধ্যে বোঝে জঙ্গল-পাহাড়। তাই ছেলেগুলোকে নিয়ে বেশীক্ষণ ভাবলে ওর চলবে না। শোন্‌চিতোগাটাকে কায়দা করতে হবে। এই গাছের নীচ দিয়েই যে-চিতাটা প্রত্যেকদিন যাতায়াত কবে বনপথে তার ভাঙ্‌ দেখে ও বুঝেছে চিতাটা প্রকাণ্ড বড়। এরই পায়ের দাগ দেখেছিল সে বাঁশবাবুর ডেরার উঠানে। তিত্‌লিদের বাড়ির সামনের পথের ধুলোয়। ধুলোর ওপর তার চার পায়ের ভাঙ্‌এ এমন কিছু অস্বাভাবিকতা নেই যে, ভাবা যায় তার পায়ে কোনো চোট আছে। চিতাটা বোধহয় বয়সের কারণেই হরিণ-শম্বর ধরতে পারে না তাই প্রথমে কুকুর-পাঁঠা দিয়ে শুরু করে মানুষে এসে থেমেছে। মানুষের মতো সহজ শিকার ত আর কিছুই নেই। ছোট-বড় সব জানোয়ারের শিং আছে, খুর আছে, গায়ের কাঁটা আছে, দাঁত, নখ আছে, মানুষের ত এসবের কিছুই নেই। পিছন থেকে বা পাশ থেকে এক লাফে উঠে ঘাড় কামড়ে ধরলেই হল।

চিতাটা যে-পথে আসবার কথা, সেই ছেলে দুটো ফিরে গেল লণ্ঠনটাকে ফেলে রেখে। ওরা নিশ্চয়ই এইখানে আবার ফিরে আসবে।

কিন্তু কেন?

চিতাটার জন্যেই নয়, ছেলে দুটোর জন্যে কাড়ুয়া গাছ থেকে নামতে পারছে না। ছেলে দুটোর জন্যে চিন্তাও আছে। আবার ছেলে দুটো ওকে দেখে কী ভাববে, কী করবে, তা ওর জানা নেই। তার হাতে বন্দুক আছে বটে। কিন্তু অনভিজ্ঞ ছেলেগুলোও নিরস্ত্র নয়।

কাড়ুয়া শিশুবধ করতে চায় না। তাছাড়া এই ছেলেগুলো যখন কিছু একটা করবে বলে, কোনো গভীর বিশ্বাসে ভর করে এত এবং এতরকম বিপদ মাথায় নিয়ে এতদূরে এসেছে! কী খাচ্ছে, কে জানে? কে এদের সাহায্য করছে? ওরা যেখানে আছে সেখান থেকে কোন বস্তি কাছে? কিছুই ঠাহর করতে পারছে না কাড়ুয়া। শুধু আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে বাচ্চা-বাচ্চা ছেলে দুটোর সাহস দেখে।

একটু পরই আবার সুঁড়িপথে ছায়া নড়ে উঠল। আবার শুকনো পাতাতে পায়ের শব্দও পেলো। অত্যন্ত আস্তে আস্তে ওরা এল। এবারে তিনজন। ওদের প্রত্যেকের হাতে বন্দুক। অথবা রাইফেল। এবং গোল-গোল কালো-কালো কী যেন। ওগুলো কি? বোমা? হবে। বোমা কখনও দেখে নি কাড়ুয়া আগে। শুনেছে শুধু!

ছেলেগুলো গাছতলার নালাতে শাবল দিতে গর্ত করতে লাগল। তাড়াতাড়ি গর্ত করে ফেলল হাঁটু সমান। কাড়ুয়া চুপটি করে মাচায় বসে দেখতে লাগল। গর্ত করতে করতে ওরা কাড়ুয়া যে-গাছে বসেছিল, সে-গাছেরই গুঁড়িতে তাকিয়ে দেখল অনেকগুলি বাঘের নখের দাগ সেখানে। ওরা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কাড়ুয়ার ইচ্ছে হল, ওদের বলে যে, যে পথ দিয়ে বাঘ রোজ যাওয়া-আসা করে তার আশেপাশের গাছের গুঁড়িতে নখের দাগ অনেক সময়েই থাকে। এ দেখে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কিন্তু কাড়ুয়া কিছুই বলতে পারবে না। বোবা হয়েই থাকতে হল তাকে। জিনিসগুলো একটা ত্রিপলের টুকরো মুড়ে পুঁততে পুঁততে ছেলে তিনটি বারবার পেছনে তাকাচ্ছিল। ওদের মধ্যে আরো কেউ কি আছে? যার আসার কথা ছিল ওদের পিছনে পিছনে? কিন্তু সে বোধহয় এসে পৌঁছয় নি। ওরা ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছিল। এবং বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল ওদের। এমন সময় ওদের মধ্যে একজন একটা টর্চ বের করল। টর্চ বের করে যে পথে এসেছিল, সে পথেই বন্দুক বাগিয়ে ঐ পথেই ফিরে গেল। বাকি ক'জন ঐখানেই বসে রইল। লণ্ঠনের আলোতে ছেলে দুটির মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, খুব খিদে পেয়েছে ওদের।

একটু পরেই যে ছেলেটি চলে গেছিল, সে দৌড়ে ফিরে এল। তার হাতের বন্দুক ছাড়াও অন্য বন্দুক ও একটি থলে সঙ্গে নিয়ে। ও খুব উত্তেজিত হয়ে বলল, বাঘোয়া! বাঘোয়া!

বাঘোয়া?

ওরা সমস্বরে বলল, বাঘোয়া! বাঘোয়া!

তারপর যে-ছেলেটি দৌড়ে গেছিল, সেই বলল, গিরিধারীকো বাঘোয়া লে গায়া।

ছেলে তিনটে বালির নীচে থেকে বন্দুক, রাইফেলগুলো আবার তুলে নিয়ে জোরালো টর্চ জেবলে ওদিকেই চলে গেল। বোধহয়, তাদের বন্ধুকে বাঘের মুখ থেকে উদ্ধার করতে। কাড়ুয়া মনে মনে বলল, আহাঃ বেচারা! ওদের মধ্যে আরও কাউকে আবার না ধরে। বললই। কিন্তু আর কী করতে পারে কাড়ুয়া? মানুষখেকো চিতা যে কী জিনিস তা ত ছেলেমানুষ ওরা জানে না! কাড়ুয়া এক অসহায় অস্বস্তি নিয়ে গাছের ডালে বসে রইল। হাতে বন্দুক নিয়ে নীচে নামলেই ওদের কিছু বুঝিয়ে বলার আগেই ওরা হয়তো মেরে দেবে কাড়ুয়াকে। ওদের মনেও দারুণ ভয়। বাঘের নয়। পুলিশের। কাড়ুয়া যে তাদের শত্রু নয় এ কথা বলার সুযোগটুকুও পর্যন্ত হয়তো কাড়ুয়া পাবে না।

ছেলেগুলো চলে গেলে, গাছ থেকে নেমে ও তার গুহার দিকে রওয়ানা হল। কালকে দিনের বেলাই মারবে ঠিক করল চিতাটাকে। ওদের মধ্যে একজনকে যদি সত্যিই বাঘে নিয়ে থাকে, তাহলে কাড়ুয়ার পক্ষে চিতাটাকে মারা অনেক সহজ হবে। এই বস্তির লোকও বটেই, এই জঙ্গলের ডেরা-গাড়া ছেলেগুলোর জীবনের জন্যেও এ চিতাকে আর একদিনও বাঁচতে দেওয়া ঠিক নয়।

গুহাতে পৌঁছে কাড়ুয়ার গরম লাগতে লাগল। বাইরে শোওয়ার সাহস করল না ও। গুহার মুখে কতগুলো কাঁটা-ঝোপ টাঙ্গি দিয়ে কেটে ফেলে রেখে নিজে ঢুকে গিয়ে সেগুলোকে টাঙ্গি দিয়ে টেনে এনে মুখটা বন্ধ করল। দরজার মতো হল একটা।

দু'হাত মাথার নীচে জড়ো করে, চিৎ হয়ে ও যখন শুয়েছে, ঠিক তখনই পর পর দুটি গুলির আওয়াজ কানে এলো। কিন্তু এখন কিছুই করার নেই। ছেলেগুলোর কী হল না হল, তাও এখন কিছুই জানার নেই। চিতাটারও যে কী হল তাও নয়। কিন্তু এই গুলির শব্দ ছেলেগুলোর বিপদ ডেকে আনবে। কারণ বস্তির লোক, ফরেস্ট গার্ড এরা সকলেই এই শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে। ছেলেগুলোর বিপদের চেয়ে বেশী বিপদ কাড়ুয়ার নিজের। তবে স্বস্তির কথা একটাই যে, কাড়ুয়ার কাছেও যে ঐরকমেরই বন্দুক রয়েছে সে-কথা কেউই জানে না। কাড়ুয়া যদি এখন বস্তির কোনো লোককে বা কোনো ফরেস্ট গার্ডকে গুলি করে মেরেও ফেলে, তাহলেও কেউ বুঝতে পারবে না যে, কাড়ুয়াই মেরেছে। কারণ, কাড়ুয়ার বন্দুক ত গাদা বন্দুক। প্রত্যেকেই তাইই জানে। তাতে অনেক বারুদ গাদাগাদি করে, সামনে লোহার গুলি দিয়ে, তারপর মারতে হয়। গাদা বন্দুকের আওয়াজ, চোট্; সবই আলাদা। জানোয়ারের আকৃতি ও হিংস্রতা অনুসারে বারুদ গাদাগাদির প্রকারভেদ হয়। আঙুলের হিসেবে দো-আঙ্গুলি, তিন-আঙ্গুলি এই রকম। এ-কথাও এ-বস্তির সকলেই জানে।

কী ব্যাপার ঘটল কে জানে? এই রাতে এখন কিছুই করার নেই। কাড়ুয়া কিছু-ক্ষণ এ-কথা-সে-কথা ভাবার পর ঘুমিয়ে পড়ল। শেষ রাতে একটুক্ষণের জন্যে ঘুম ভেঙে গেছিল। একটা বিরাট বেঁকা দাঁতের দাঁতাল শুয়োর ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে-করতে বালি ছিটোতে-ছিটোতে ভেজা নদীর বুক ধরে এগিয়ে আসছিল। কাড়ুয়ার বড় লোভ হয়ে-ছিল যে, উঠে, গুহা থেকে বেরিয়ে গিয়ে, সাবড়ে দেয় শুয়োরটাকে, তারপরই সংযত করেছিল নিজেকে। যদিও বুনো শুয়োরের মাংস সে ময়ূরের মাংসের চেয়েও ভালোবাসে খেতে।

ভোর হবার একটু আগে এক-জোড়া শজারু কোনো কারণে খুব ভয় পেয়ে কাঁটা ঝম্-ঝম্ করে দৌড়ে গেছিল নদীর বুক বেয়ে।

সূর্য উঠতেই কাঁটা-ঝোপ সরিয়ে, টাঙ্গি দিয়ে টেনে, দূরে একটা গর্তর মধ্যে ফেলে দিলো ও। তাড়াতাড়ি খিচুড়ি বসাল। প্রাতঃকৃত্য সেরে এসেই। কারণ, ফরেস্ট গার্ডরা আজ এদিকে আসবে সদলবলে। কাল গুলির শব্দ শুনেছ তারা। প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, ওদের দাড়িওয়ালা সহকর্মীকে খেয়েছে এই শোন্‌চিতোয়াটাই তাই এর সম্বন্ধে তাদের এক বিশেষ উৎসাহ আছে। এদেশে আইন যারা বানায়, আর আইন যারা মানায়, তারা আইন ভাঙলে দোষ হয় না কোনোই। ওদের বাপের জমিদারির বাঘ ওরা একশবার মারতেই পারে।

তাড়াতাড়ি চান-খাওয়া-দাওয়া সেরে কাড়ুয়া বন্দুকটা নিয়ে বনের গভীরে চার-চারটি বনপথের সংযোগস্থলের একটা ঝাঁকড়া বড় পিপুল গাছের উঁচু ডালে লুকিয়ে রইল। সকালে যতক্ষণ না ফরেস্ট গার্ডরা ফিরে যাচ্ছে এখান থেকে ততক্ষণ নামতে পারবে না। বিশ্বাস কি? রেঞ্জার সাহেবদের আসাও অসম্ভব নয়। কোর-এরীয়ার মধ্যে গুলি চলেছে গভীর রাতে। দু'বার। গাদা বন্দুক নয়, খাস্ বিলিতী বন্দুকের গুলি।

পুলিশ সাহেবরাও আসতে পারেন। অতএব, খুব সাবধান থাকতে হবে। গাছে বসে-বসেই কাড়ুয়া দেখল যে, বেলা এগারোটা নাগাদ দুটি জীপ এলো গড়গড়িয়ে একটি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের। অন্যটি পুলিশের। বড় বড় চোখে কাড়ুয়া দেখল যে, একটাতে ডি-এফ-ও সাহেব এবং তাঁর সঙ্গে রেঞ্জার সাহেব। আর অন্যটিতে পুলিশ সাহেবের পোশাক পরা হীরু আর তার সঙ্গে আরও একজন পুলিশ সাহেব। তার চেহারা ভারী খুবসুরৎ। মনে হল, বড়া খানদান-এর ছেলে, হীরুর মতো সাধারণ

ঘরের ছেলে নয়। এক নজরেই বোঝা যায়।

জীপ দুটো ধুলো উড়িয়ে মারুমারের দিকে চলে গেল। মারুমার যাবে, না মহুয়া-ড়াঁর যাবে; তা ওরাই জানে। বড় রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে সময় বাঁচাচ্ছে ওরা।

জীপের আওয়াজ যখন আর শোনা গেল না এবং পথের ধুলোর মেঘ যখন গাছ-গাছালির কাঁধ ছেড়ে মাটিতে নেমে এল, তখন কাড়ুয়াও মাটিতে নামল গাছ থেকে। আপাতত পুলিশ আর বনবিভাগের ভয় নেই। মাটিতে নেমেই দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে কাল যেখানে গুলির শব্দ শুনেছিল; সেই দিকেই এগিয়ে গেল। চিতল হরিণদেরই মতো, কাড়ুয়া যখন জঙ্গলে জোরে যায়, মনে হয়, ও-ও উড়ে যাচ্ছে। ওর পায়ের পাতা পড়ে না তখন মাটিতে।

মিনিট দশেকের মধ্যে কাল রাতের জায়গাটাতে পৌঁছেই কাড়ুয়া যা দেখল, তাতে তার মন বড়ই খারাপ হয়ে গেল। এইখানে নিশ্চয়ই শোন্‌চিতোয়াটা যে চারনম্বর ছেলেটি—কালকের গাছের তলায় গিয়ে পৌঁছতে পারে নি; তাকে ধরেছিল। ধরে টেনে নিয়ে কতগুলো বড় ছোট কালো পাথরের টিলার আড়ালে গিয়ে খাচ্ছিল। পায়ের দাগ দেখে বুঝল যে, ওর বন্ধুরা টর্চ আর বন্দুক হাতে নিয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছয়। চিতাটা তাদের আক্রমণ করতে যাওয়ার সময়ই তারা গুলি করে পরপর দুবার।

কাড়ুয়া আরও এগিয়ে গেল চিতার পায়ের দাগ ও টেনে নিয়ে যাওয়ার ঘষ্‌টানির দাগ দেখে। দেখল, শোন্‌চিতোয়াটা গুলির শব্দে বিরক্ত হয়ে পরে আবার ফিরে এসে ছেলেটির দেহাবশেষ নিয়ে সরে গেছে জঙ্গলের অনেক গভীরে। খুব সম্ভব একটি গুলিও লাগে নি চিতাটার গায়ে। মানুষ মারা খরগোশ মারার চেয়েও সোজা। কিন্তু বাঘ মারা খরগোশ মারার চেয়ে অনেকই কঠিন।

এইবার কাড়ুয়ার সত্যিই সাবধান হবার সময় হয়েছে। চিতাটার জন্যে সাবধান। ফরেস্টের লোক, পুলিশের লোক, সকলের জন্যেই সাবধান। এখানে তাকে কেউ আবিষ্কার করলে তাকে শুধু কোর্‌-এরীয়ার মধ্যে চিতাবাঘ মারা নয়, মানুষ খুন করার অভিযোগেও অভিযুক্ত হতে হবে। কাড়ুয়ার ওপর ওদের অনেক দিনের রাগ। পেলে একেবারেই ঝুলিয়ে দেবে। খুশী হবে মাহাতো। খুশী হবে গোদা শেঠ। আর মারা পড়বে হীরু, তার বন্দুক কাড়ুয়ার হাতে পাওয়া গেলে।।

ছেলেগুলোর কি হল? ভাবছিল কাড়ুয়া। যাক্‌গে! এখন চিতাটা ছাড়া অন্য কিছু সম্বন্ধেই ভাববার সময় নেই কাড়ুয়ার।

চিতাটা খুব বুড়ো সেগুনের পুরোনো একটা গভীর প্ল্যানটেশানে নিয়ে গেছে ছেলেটাকে টেনে, হেঁচড়ে, হেঁচড়ে, কিছুটা মুখে করে। বেড়ালনি যেমন ছানাকে নেয়। মোটা মোটা সেগুন। প্রকাণ্ড তাদের গুঁড়ি। নীচে নীচে পুটুস, রাহেলাওলা, জিট্‌পিটিয়া এবং নানারকম ঝাঁটি জঙ্গল। এত গভীর বন যে দিনেও ভালো দেখা যায় না। হাতির কানের পাতার মতো বড় বড় সেগুন পাতা জায়গাটাকে সম্পূর্ণ ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। ভর দুপুরের বৈশাখের বনের গা থেকে সুন্দর পবিত্র শুকনো ঝাঁঝালো গন্ধ বেরুচ্ছে একরকম। রুখু হাওয়ায়, শিকাকাই-ঘষা পাতার মাথার চুলের গন্ধ। প্রজাপতি উড়ছে চারধারে।

না।

বুল্‌কি-পরেশনাথকে ভয়-পাওয়ানো লাল-তিত্‌লি নয়। এমনি তিত্‌লি। সাদা-কালো, বেগ্নী হলুদ, খয়েরি। কতরকম যে প্রজাপতি। দূরের বনে বসে কাঠঠোকরা কাঠ ঠুকে চলেছে ক্রমাগত। যেন ঠিকাদারের ক্যাপ্‌-কাটা হপ্তা-পাওয়া কুলি। তিতির ডাকছে মন উদাস করে তিত্‌র—তিত্‌র তির্‌র্‌র্‌— তিত্তর্‌র্‌র্‌। ভারী ভালো লাগছে

কাড়ুয়ার। কতদিন বাঘ কী চিতা মারে নি। হীরু আর নানকু তার পিছনে আছে। আর আছে এই সুন্দর বন্দুকটি। বন্দুকটাকে বড় ভালোবেসে ফেলেছে ও।

এরকম একটা বন্দুক ছাড়া আর ও চেয়েছিল একটাই জিনিস। মাথা উঁচু করে বাঁচাতে। এই লুকিয়ে-বেড়ানো চোরা গোপ্তা খুন করা শোন্‌চিতোয়াটার মতো নয়। বড় বাঘের মতো। যারা পালাতে শেখে নি কখনও,। ভয় কাকে বলে, সে কথা যাদের রক্ত জানে না। যারা সত্যিই স্বাধীন। চিরদিনের স্বাধীন। যাদের স্বাধীনতা ইজারা নিতে লাইন দিয়ে ভোট দিতে হয় না প্রতি পাঁচ-বছর অন্তর। যাদের একবেলা পেট ভরে খাওয়ার জন্যে হাত পাততে হয় না কারো কাছে। ঘাড়-নীচু করে, মাথা-ঝুঁকিয়ে যাদের কখনও একদিনের জন্যও বেঁচে থাকতে হয় না কান্দা-গেঁঠি খুঁড়ে খেয়ে। তেমন স্বাধীন হয়ে বাঁচতে।

কাড়ুয়া ছোটবেলা থেকেই বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মনে মনে নিজেও একটা বাঘই হয়ে গেছে। হ্যাঁ বড় বাঘ! তাই-ই ত এই বন্দীদশা, মিথ্যিমিথ্যি আইন কানুন ওর আদৌ ভালো লাগে না। লেখাপড়া শেখে নি। শেখে নি বলেই কি ও জঙ্গল-পাহাড়কে জানে না? না বোঝে না! যে দেশের মানুষকে বাঘ মারতে দেওয়া না-হয় পায়ে হেঁটে, একা একা সে দেশের মানুষের সাহস জন্মাবে কী করে? কাড়ুয়া ভাবে। কাড়ুয়াকে, এক সাহেব শিকারী অনেক বছর আগে বলেছিলেন যে, আফ্রিকা বলে একটা দেশ আছে, সেখানে মাসাই বলে একরকমের লম্বা-লম্বা মিশকালো মানুষ আছে তারা নাকি একা হাতে বল্লম দিয়ে পায়ে হেঁটে সিংহ শিকার করে। এবং যে-ছেলে একা-হাতে সিংহ শিকার করতে পারে না, তাকে নাকি কোনো মেয়ে বিয়েই করে না।

তবে?

বাঘ মারাটা কি কেবলই বাঘ মারা? মানুষ কি নিজেকে নিজের সাহস ও আত্মবিশ্বাসকে বার বার নতুন করে, নিশ্চিন্ত করে আবিষ্কার করে না মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার এই পুরুষালী খেলা খেলতে এসে? কাড়ুয়া তার জীবনে বন ও বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে যা জেনেছে সেই জানা কারোরই কাজে লাগল না। কারণ ও ইংরিজী শেখে নি হিন্দীও লিখতে পর্যন্ত পারে না। ওর কাছে কেউ জানতেও আসে নি। ও-যে অশিক্ষিত; ছোটলোক। ওর সারা জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ওর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যারা ইংরিজী জানে, তারা কিছু না-জেনেই পন্ডিত হতে পারে; আর কাড়ুয়া অনেক জেনেও মুখই রয়ে গেল।

কাড়ুয়া থমকে দাঁড়াল। হঠাৎই মৃত্যুর গন্ধ পেল ও। হঠাৎ!

যেদিন ওর বন্ধু চিকোরিকে বড় বাঘে ধরেছিল এক জেঠ্-শিকারের দিনে ছুলোয়ার লাইনের মধ্যে থেকে—সেদিনও এরকম একটা গন্ধ নাকে পেয়েছিল কাড়ুয়া। বন্দুকটা স্টেডি-পজিশানে ধরে ও মাথাটাকে ডাইনে-বাঁয়ে একশ আশি ডিগ্রী ঘুরিয়ে নিল নিঃশব্দে। ওর কদমছাট চুলের শেষে এক বিঘৎ টিকিটা একটা কালো উপোসী টিকটিকির মতো দুলতে লাগল কিছুক্ষণ। হাওয়া উঠল জোর, তার পিছন দিক থেকে। যেদিকে সে তাকিয়ে আছে, সেদিকে এক দৌড়ে পৌঁছে গিয়েই হঠাৎ থেমে গেল হাওয়াটা। যেন ধাক্কা খেল অদৃশ্য কোনো বাধায়। হাওয়াটা কাঁচের বাসনেরই মতো ভেঙে ঝুর্ঝুর্ করে গুঁড়ো হয়ে বনের পায়ের কাছে ছড়িয়ে গেল। হাওয়া-তাড়ানো একরাশ শুকনো পাতাও পেছন থেকে উড়ে এসে সেগুন বনের পায়ের কাছের ঝাটিজঙ্গলে আটকে রইল।

কাড়ুয়া আস্তে আস্তে সেগুন বনের অন্ধকারে ঢুকে যেতে লাগল। সেগুনের নীচের পুটুস ঝাড়ের তীব্র কটু গন্ধ নাকে যেতেই কাড়ুয়ার হঠাৎ মনে হল, ও যেন

ওর মৃত মায়ের গভীর অন্ধকারে তীব্র-গন্ধী-গর্ভেই পুনঃপ্রবেশ করছে। এমন কোনো-দিনও মনে হয় নি আগে। এক আশ্চর্য অনুভূতি হল ওর! ঢুকে যেতে লাগল কাড়ুয়া। শোন্‌চিতোয়াটার পায়ের দাগ দেখে, জঙ্গলের ভিতরের গভীরতর নিবিড় সেগুন-গন্ধী সবুজ অন্ধকারে। যেটুকু আলো আসছে, তাও আটকে যাচ্ছে সেগুনের বড় বড় গোলপাতাতে। আলো-ছায়ার গোল-গোল গয়না-বড়ির মতো বুটি-কাটা গালচে তৈরি হয়েছে জঙ্গলের নীচের সমস্তটা জুড়ে।

হঠাৎ কাড়ুয়ার চোখে পড়ল একটা অনাবৃত, কর্তিত নিটোল পা। শুয়ে-থাকা পুরুষের একটা পা বেরিয়ে আছে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে। মনে হল, পা-টা যেন একটু নড়ে উঠল।

বাঁ পা।

কাড়ুয়া জায়গাটাকে ঘুরে দন্ডি কেটে যাবে ঠিক করল। ও দুদিকে চেয়ে দেখল, ডানদিকে একটা প্রকান্ড চারকোণা পাথর। প্রায় একমানুষ উঁচু পাথরটা একেবারে সমান আর মসৃণ। পাথরটার চারপাশে পুটুসের ঝাড়। কী করবে এক মুহূর্ত ভাবল ও। এখানে চড়ার মতো কোনোই গাছ নেই। এত বড় সেগুনে চড়া যাবে না। গুঁড়ির বেড়ই পাওয়া যায় না। চড়তে গেলেও যা শব্দ হবে, তাতে শোন্‌চিতোয়াটা সাবধান হয়ে পালিয়ে যাবে।

এবার হঠাৎই পচা গন্ধ এল নাকে। হাওয়াটা পাক খেয়েছে। দিক বদলেছে। ক্রমান্বয়ে ঝুনঝুনি বাজানোর মতো আওয়াজ করে নীলনীল বড় বড় পোকাগুলো মরা ছেলেটির রক্তাক্ত পচা শরীরের ওপর উড়ছিল আর বসছিল। তার মানে এই যে, শোন্‌চিতোয়াটা মড়ির কাছে নেই। সরে গেছে। অথবা, হয়তো দূরে কোনো নদীর বালিতে কিংবা ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় গিয়ে বিশ্রাম করলে।

কাড়ুয়া আবারও মৃত্যুর গন্ধ পেলো।

নাঃ, ওর মন বলছে যে, শোন্‌চিতোয়াটা ধারে কাছেই আছে। নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে। ওকে দেখছে। যা-ই করুক। এ গন্ধ শোন্‌চিতোয়ারই মৃত্যুর গন্ধ। শোন্‌চিতোয়ার সব হবকৎ আজ শেষ হবে। সততা জিতবে ধূর্তামির ওপর। হার হবে অন্যায়ের, ন্যায়ের কাছে। চরম হার।

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে মুন্ডু ঘুরিয়ে সামনে পেছনে কাড়ুয়া এবার বাঁ থেকে ডান, ডান থেকে বাঁ তিনশ ষাট ডিগ্রী কোণে দেখতে লাগল সব কিছু। তার চোখে একটি ঘাসের নড়াচড়াও অদেখা থাকবে না।

স্তব্ধ হয়ে ফাসিল হয়ে গেল মুহূর্তটি।

কাড়ুয়ার মনে হল, সৃষ্টির আদি থেকে চলতে চলতে বড় ঘর্মাক্ত ক্লান্ত হয়ে, সময় হঠাৎই থেমে গেল। কাড়ুয়ার আগে-পেছনে কিছুই নেই আর। একমাত্র বর্তমান আছে। এই ক্ষণটি। কাড়ুয়া। আর শোন্‌চিতোয়াটা।

বন্দুকটা একেবারে তৈরিই আছে। সেফ্‌টি-ক্যাচ্‌টাও ঠেলে সরানো আছে। সব তৈরি। কেবল হারামীর বাচ্চা একবার চেহারা দেখাক। একবার শুধু। এক মুহূর্তের জন্যে।

কিন্তু কাড়ুয়ার গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠলো। কোনো নাম-না-জানা প্রেত, দারুহা নয়, কাঁচিং নয় : যে-ভুতের নাম সে কখনও শোনে নি এমন কোনো এক অদৃষ্টপূর্ব ভুত তার কটা-হলুদ একজোড়া চোখে যেন তাকে দেখছে আড়াল থেকে। অপলকে। অথচ সে তাকে দেখতে পাচ্ছে না। কটা-হলুদ কুটিল একজোড়া চোখ। কাড়ুয়া তার নিজের চোখের তারায়, মেরুদন্ডে, ঘাড়ে, সব জায়গায় মরা ব্যাঙের শরীরের মতো

ঠাণ্ডা সেই দৃষ্টিকে অনুভব করতে পারছিল। কিন্তু সেই দৃষ্টির উৎসকে দেখতে পাচ্ছিল না।

নাঃ। চারধারে গভীর মৃত্যুর গন্ধ। ছেলেটির মৃতদেহের উপর নীল পোকাগুলো ঝিন্ ঝিন্ করে উড়ছে আর বসছে। শুধুই সেই শব্দ। আর কোনো শব্দ নেই। হাওয়াটা উল্টোলেই নাকে উৎকট গন্ধ আসছে, পচা, ছিন্নভিন্ন মৃতদেহটা থেকে।

খুব সাবধানে কাড়ুয়া বন্দুকটা এইভাবেই ধরে পুরো শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিল একবার। এক চুলও নড়ে নি ও হাওয়াটা ঘোরার পর থেকে। পিছনটা আর একবার ভাল করে দেখল। নাঃ! যে-করে হোক একটু উপরে ওঠা দরকার। নইলে সেগুন-বনের নীচের ঘন ঝাঁটি-জঙ্গলে কিছুই দেখা যাচ্ছে না ভাল করে। কাড়ুয়া ডানদিকের সেই কালো চারকোণা পাথরটার দিকে আস্তে আস্তে সরে এল—এক-চুল এক-চুল করে। তারপর একসময় পাথরটার উপরে সোজা উঠে দাঁড়াল।

ঈস্‌স্। কী সুন্দর ছেলেটা! ওর মুখটা দেখে যেন মনে হয়, ঘুমিয়ে আছে। মাছি উড়ছে, মাছি বসছে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ, আধখানা শরীর। কিন্তু তার চোখ দুটোতে এক দারুণ চিৎকৃত প্রতিবাদ স্তব্ধ, হিম হয়ে আছে। সে জানে না যে, তার বন্ধুরা তাকে খুঁজে পেলে তার মাথাটা কেটে নিয়ে যেত, পাছে পুলিশ শনাক্ত করে ফেলে। কিন্তু সে নিজে সব শনাক্তকরণের বাইরে এখন। কোন ঠিকানা থেকে সে এসেছিল আর কোন ঠিকানাতে যাবে, সবই তার কাছে অবান্তর।

পাতা ঝরে পড়ছে উপর থেকে। সুন্দর মুখটার একপাশে সোনার মোহরের মতো গোল এক টুকরো রোদ এসে পড়েছে। কাড়ুয়া দশ বছর বয়স থেকে নিজে হাতে হাজার হাজার জানোয়ার ধড়কেছে। জানোয়ারেরা জিভ বের করে, মুখ-ব্যাদান করে মরে। করুণা ভিক্ষা করে, মরার সময়। একমাত্র মানুষই এমন নীরব চিৎকারে সমস্ত প্রতিবাদ উৎসারিত করে মরতে পারে। ব নিজস্ব, সাদামাটা; নিরক্ষর ভাষায় এই কথাটাই সেই মুহূর্তে ভাবছিল কাড়ুয়া।

কাড়ুয়া ছেলেটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ভাবছিল শোন্‌চিতোয়াটা ধারে-কাছে না থাকলে ওর মাথা সে নিজেই কেটে নিয়ে গিয়ে কোথাও পুঁতে দেবে। আহাঃ কোন মায়ের বাছা! কতদূরে না জানি? পাটনা, না কলকাতা, কে জানে? কোন গভীর সর্বনাশা বিশ্বাসে ভর করে এসেছিলিরে বাছা তোরা? তোরা কি এই জবরদস্তিতে এটেবসা মাহাতো আর গোদা শেঠদের কিছু করতে পারবি? বোকা রে! তোরা বড় বোকা! কেন মিছিমিছি মরতে এলি এমন করে? তাও যদি মেরে মরতিস্। লড়ে মরার সুযোগ পেতিস্। তোদের ঝগড়া যাদের সঙ্গে, তারা যে সব শোন্‌চিতোয়াদেরই মতো। বাইরে এসে দাঁড়ানোর সাহস নেই তাদের। তারা আড়াল থেকে খুন করে। তারা বড় ছোট রে,, বড় ছোটলোক তারা! তোরা, আহা! বাছারা আমার; তোরা কি জানতিস না?

হঠাৎই কাড়ুয়ার ভাবনা স্তব্ধ হয়ে গেল।

চিতাটা নিশ্চয়ই ঐ কালো পাথরটার নীচেরই ঝাঁটি-জঙ্গলে লুকিয়ে শুয়ে ছিল, কাড়ুয়াকে আসতে দেখেই অথবা তার গন্ধ পেয়েই পিছন থেকে, কোণাকুণি; দম্-দেওয়া অতিকায় স্প্রিং-এর পুতুলের মতো নিঃশব্দে লাফিয়ে উঠেই কাড়ুয়ার গলা আর ডান কাঁধের মধ্যে কামড়ে ধরে কাড়ুয়াকে নিয়ে এক ঝটকাতে আছড়ে পড়ল পাথরের উপর। টুঁটি কামড়ে ধরাতে, কাড়ুয়ার হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে গিয়ে পড়ল ছেলেটির লাশের কাছে। সেফ্‌টি-ক্যাচ্ অন্ থাকাতে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুটি ব্যারেলই একসঙ্গে ফায়ার হয়ে গেল। অতর্কিত শব্দে শোন্‌চিতোয়াটা ভয়

পেয়ে গিয়ে কাড়ুয়াকে ফেলে রেখে এক লাফে সরে গেল একটু। কিন্তু পরক্ষণেই মাটিতে পড়ে-যাওয়া নিরস্ত্র, আহত কাড়ুয়ার কাছে এল। ফিরে এসে, মাহাতোর মতো, গোদা শেঠেরই মতো দাঁতে-দাঁতে কড়মড়ানি তুলে, এ ব্যাটার বড্ড বাড় বেড়েছিল বলে, আবারও ওর ঘাড় কামড়ে পড়ে রইল অনেকক্ষণ। রক্ত চুষে চুষে শরীরটাকে, একেবারে নিস্পন্দ করে ফেলার পর একটা জোর ঝাঁকানি দিয়েই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছেড়ে দিল।

কাড়ুয়া তারপরও কিছুক্ষণ থর্ থর্ করে কাঁপল। মানুষ মরেও মরতে চায় না। মরার পরও পুরোনো অভ্যেসবশে কিছুক্ষণ বেঁচে থাকে। ওর মুখ-নাক দিয়ে ঝলক্ ঝলক্ রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল। তারপর বাঁ হাতটা লম্বা করে পাথরের উপর ছড়িয়ে দিয়ে ডান হাতটা পেটের কাছে চেপে ধরল। যেন বড় নিশ্চিন্তে ঘুমোবে এবার।

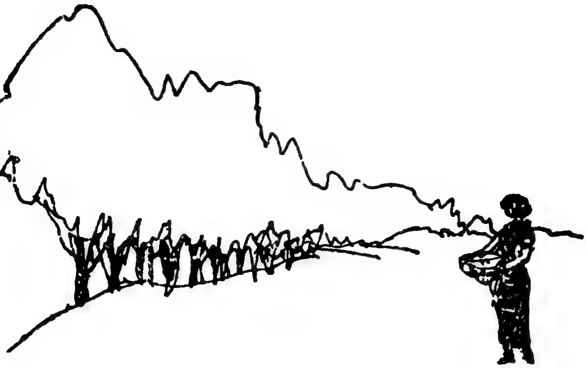
থেমে থাকা সময় আবার হঠাৎ চলতে শুরু করল।

আস্তে আস্তে কাড়ুয়ার মুখে এক গভীর প্রশান্তি ছড়িয়ে গেল। উত্তেজিত, কুঞ্চিত, সারা শরীরের মাংসপেশী শিথিল হয়ে এল। কাড়ুয়া কোনোদিনও ভালুমারের অন্য দশজনের মতো প্রতিদিন একটু একটু করে মান, সম্মান, বিবেক, সবই খুইয়ে ছোট্ট এক শিশি মীটিয়া তেলের জন্যে, দুটো বাজরার রুটি বা একমুঠো শুখা-মহুয়া বা মাটিখোঁড়া কান্দা-গেঁঠির জন্যে কারো দয়া ভিক্ষা করে বেঁচে থাকতে চায় নি। বাঁচে নি। তার কাছে এই জীবনের মানে একেবারেই অন্য ছিল! তার মওত্ও এলো তার জিন্দগীর মতই।

মৃত্যুর ক্ষণে কোনো দরিদ্র ভাবনাই কাড়ুয়াকে ক্লিষ্ট করে নি।

সেদিনই সন্ধ্যের সময় কাড়ুয়ার বন্দুকের গুলির শব্দ শোনার পরই পুলিশ আর ফরেস্ট-ডিপার্টমেন্টের লোকদের মিলিত চেষ্টাতে একটি বড় দল লাশ দুটি উদ্ধার করেছিল। চিতাটি সরে গেছিল গোলমাল শুনে আগেই। যখন কাড়ুয়ার লাশকে বস্তিতে এনে হ্যাজাক জেনলে শুইয়ে রাখা হয়েছিল বন-বাংলার হাতার কাঁকরের উপর তখন বস্তির ছোটবড় সকলেই একটা কথাই বলেছিল কাড়ুয়া সম্বন্ধে।

ওরা বলেছিল, টাইগার প্রোজেক্টের কোর্-এরীয়ার একেবারে বুকের মধ্যে একটা এত বড় বাঘ এমন ভাবে যে মারা যাবে, একথা ওদের কল্পনারও বাইরে ছিল। তাও, একটা সামান্য শোন্চিতোয়ার হাতে!



গোলমালটা বাধল বন্দুকটা নিয়েই। কাড়ুয়া আর সেই অনামা ছেলেটির লাশের কাছে যখন হীরুর বন্দুকটি পাওয়া গেল—তখন ফরেস্টের গার্ডরা আর পুলিশের সেপাইরা সেটিকে নিয়ে এল সটান সাহেবদের কাছে।

সোনা-দানা টাকা পয়সা হারিয়ে গেলে, যার গেল তার আর্থিক ক্ষতিই হয়, কিন্তু বন্দুক হারালে, যে বন্দুকের মালিক, তাকে নিয়ে পুলিশ এমন টানাটানি শুরু করে যে, সে আর বলার নয়। এবং ব্যাপারটা ঘটল তখনই, যখন হীরু বাংলোয় ছিল না, তার মা-বাবা ভাই বোনের সঙ্গে দেখা করতে গেছিল জীপে চড়ে।

ঝকঝকে পালিশ তোলা জীপটা থেমেছিল এসে জুগনু ওরাও-এর জীর্ণ বাড়ির বেড়ার সামনে। সিপাহীরা ফটাফট্ স্যালুট মেরেছিল, হীরু জীপ থেকে নামতেই। ড্রাইভার সিপাহী সকলের সামনে হীরু ছেঁড়া-চৌপাইতে-বসা, খালি-গা, ছেঁড়া-ধুতি পরা তার বাপকে হাঁটু গেড়ে বসে দু হাত বাড়িয়ে দু'পা ছুঁয়ে নমস্কার করেছিল।

জল গড়িয়েছিল তখন জুগনুর চোখ বেয়ে।

জুগনু ওরাও হীরুর চিঠি আগেই পেয়েছিল। নিজে পড়তে পারে না জুগনু তাই টুসিকে দিয়ে পড়িয়েছিলো। টুসির নামেও আলাদা চিঠি এসেছিল একটা। হীরু যখন বাবাকে প্রাণাম করছিল তখন উঠোনে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে হীরুর মা, টুসি আর লগন নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

হীরু বাবাকে ছেড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল। কিছুক্ষণ পর টুসিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কীসব বলল। টুসি মাথা নাড়ল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। ঠোঁট কামড়াল। আবার মাথা নাড়ল।

হীরুর বাপ বলল কী ব্যাপার? তোমরা সব চুপচাপ কেন? হীরুকে আর সিপাহী ড্রাইভারদের সকলকে কিছু খেতে দাও। প্রত্যেককে দাও। যা আছে তাই-ই দাও।

ড্রাইভার সিপাহীদের মুখে এক দারুণ খুশির ভাব ফুটে উঠল। তারা সেই মুহূর্তে বড় একাত্ম বোধ করল হঠাৎই তাদের সাহেবের সঙ্গে। সাহেবকে ওরা যা ভেবেছিল, আসলে সাহেব তা নন্। সাহেবও একজন রক্ত-মাংসের মানুষ। একেবারে তাদেরই মতো। তাদেরও বাবা মা এমনই কোনো জায়গায়, এমনই দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেই থাকেন। সাহেব যে তাঁদেরই একজন, হীরু যে আকাশ থেকে

পুষ্পকরথ বা হেলিকপ্টার থেকে হঠাৎ পড়ে তাদের সাহেব হয়ে যায় নি—তারও যে শিকড় আছে দেহাতেই, এই পাহাড় জঙ্গল ঘেরা বস্তির ভিতরে, একথা জেনে বড় ভাল লাগল ওদের সকলের। হীরু এ ক'বছর ওদের সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক এবং রূঢ় ব্যবহার করে, ওদের ওপর বসিং করে যা ওদের কাছ থেকে কখনও পায় নি, আজ এক মুহূর্তেই সেই স্বতঃস্ফূর্ত বশ্যতা পেয়ে গেল ওদের প্রত্যেকেরই কাছ থেকে। সরল সত্য দিয়ে যা ছোঁওয়া যায় এবং পাওয়া যায়, ভণ্ডামি আর চালাকি দিয়ে তা কখনই পাওয়া হয়ে ওঠে না। বড় দেরি করে এ কথাটা জানল বোধহয় হীরু।

টুসি চোখের জল মুছল আড়ালে, আঁচল দিয়ে। হীরুর চোখ এড়াল না তা। সিপাহী ড্রাইভারের জল-টল খাওয়ার পর হীরু বলল, চললাম। শিগ্গির ছুটি নিয়ে এসে একমাস থাকব বস্তিতে, তোমাদের সঙ্গে, এই বাড়িতেই। বাড়িটা নতুন করে করব। এবারে বিয়েও করব মা। আমার জন্যে একটা ভালো মেয়ে দেখো, তোমার মনোমত।

টুসি, লগন আর টুসির মা, অবিশ্বাসভরা বিস্ময়ে চলে-যাওয়া হীরুর দিকে চেয়ে রইল।

হীরু বাংলোতে ফিরে এসেই কাড়ুয়ার লাশ দেখে আঁৎকে উঠল।

কাড়ুয়া চাচাও হার মানল। কাড়ুয়া চাচাকেও মারতে পারে এমন কোনো বাঘ আছে নাকি দুনিয়াতে? পরক্ষণেই, তার বন্ধু যখন বন্দুকটা হীরুকে দেখিয়ে ওকে যা বলার বলল, হীরু চমকে উঠে মুখ ফস্কে বলে ফেলল, আরে এ যে আমারই বন্দুক!

না বলে উপায়ও ছিল না হীরুর। কারণ সব বন্দুকেই নাম্বার, ম্যানুফ্যাকচারের নাম সব লেখা থাকে—এবং সব লাইসেন্সেও থাকে। বন্দুক হারালে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ডায়েরি করতে হয়।

তোমার বন্দুক?

কুটিল চোখে তাকালো হীরুর বন্ধু তার দিকে।

তারপর বলল, আজীব বাত্। খোদ্ পুলিশ সাহাবকে বন্দুক খো গ্যায়া ঔর উন্হিকা নেহি মালুম থা!

শোওয়ার ঘরের আলমারিতেই রাখা ছিল। কতদিন বন্দুক বের করি না। কবে, কখন, কে চুরি করেছে, তা পাটনা ফিরে না গেলে কিছু বোঝাই যাবে না। চুরি নিশ্চয়ই কেউ করেছে, নইলে এ বন্দুক এখানে এলো কোথা থেকে? আর চুরি করে থাকলে......

এতটুকু বলেই, থেমে গেল ও। তারপর লাশ দুটোর দিকে চেয়ে বলল, চুরি করে থাকলে, এই দু হারামির এক হারামিই করেছে। বন্দুকটা সিপাহীরা পেয়েছিল ছেলেটার লাশের কাছে। এই গ্রামের চোরা-শিকারী কাড়ুয়ার কাছে নয়।

বল কী! বিপ্লবী ছেলে বন্দুক চুরি করল তোমার, আর তুমিই খোঁজ পেলে না। খুবই গোলমেলে ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।

হীরুব বন্ধু হীরুর চোখে চোখ রেখে বলল।

হীরু হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল ব্যাপারটা। কিন্তু ওর বন্ধু টেবল্ থেকে প্যাড টেনে নিয়ে একটা মেসেজ লিখল—গান ক্লেইমড্ বাই এইচ্ সিং, এস. পি. অন ডিউটি। স্টেটেড টু হ্যাভ বীন স্টোলেন ফ্রম হিজ রেসিডেন্স ইন্ পাটনা—। থেফট্ নট রিপোর্টেড। প্লিজ সেন্ড অর্ডার বাই ওয়্যারলেস্—।

মেসেজটা লিখে হীরুর দিকে এগিয়ে দিল হীরুর বন্ধু।

হীরু পড়ল। পড়ে, তার বন্ধুর চোখে তাকাল।

গলা নামিয়ে বন্ধু বলল, এই মেসেজ এক্ষুণি পাটনাতে আই জি'র কাছে পাঠাতে হবে। বেত্লা থেকে টাইগার প্রোজেক্টের ওয়্যারলেসের থ্রুতে ওয়্যারলেস করে দেব। ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস্। এস. পি. সাহেবের বন্দুক নিয়ে বিপ্লব হচ্ছে; কথাটা আই. জি. সাহেবের এক্ষুনি ত জানা উচিত।

হীরু তবুও চুপ করেই রইল।

বন্ধু গলার স্বর পাল্টে কী যেন ভেবে হীরুকে বলল, দেখ্ ইয়ার, ম্যায় কুছ দেখা নেহি; শুনা ভি নেহি। তেরা বন্দুকোয়া তু লে-লে ওয়াপস্। মগর এক সর্ত পর্।

কা?

বলে. হীরু বোকার মতো চেয়ে থাকল বন্ধুর দিকে।

বন্ধু গলা আরো নামিয়ে বলল, ইন্তেজাম করনে হোগা ওহি চিঁড়িয়াকা লিয়ে।

কওন্ সী চিঁড়িয়া?

ওর বন্ধু ফিস্ফিস্ করে কী যেন বলল হীরুকে। বলল, টুসি। খুশবুওয়ালী টুসি। ব্যস্স্ ইত্নাহি মুঝ্কো ইয়াদ হ্যায়। পুরা নাম্-হি ঔর পত্তা ম্যায় বতানে শক্তাথা, তব্ ত উ বানিয়াই উস্কো উঠাকে লেকর্ আতেথে।

হীরুর কানের লতিদুটো দপ্দপ্ করতে লাগল। ও ঘোরের মধ্যে বলল, হোগা।

ডীল্? ওর বন্ধু বলল। উজ্জ্বল চোখে।

ডীল্। বলল্ হীরু। তারপর বলল্ কখন কোথায়?

সাত বাজিমে। সাম্।

হীরু বলল. শোনচিতোয়া আভিতক্ নেহি না পিটা গ্যায়া। রাতমে ঘর ছোড়কে কোন্ আইবে করে গা? ইত্না হিম্মত কেক্রো নেহি হো!

ত?

হীরুর বন্ধু ভাবল একটু। তারপর বলল. কেয়া কিয়া যায়?

পরক্ষণে নিজেই বলল, এক কাম কিয়া যায়। হাম জিপ ঔর রাইফেল লে কর, এক্কেল প'হুছেগা ঠিক্ জাগে পর্। তু, জাগে বাতাদে মুঝ্কো। উস্কো বাদ ম্যায় খুদ্ই সমঝ্ লেঙ্গে।

হীরু চিন্তিত মুখে বলল, কওনসী জাগ?

ওর বন্ধু বলল. সুরজ্ বুড়্নেকে পইলে, ঝারি-তালাওকে পশ্রা কিনারে পর্ যো ইম্লিকা বড়্কা প্যের হ্যায়, উস্সীকে নীচে রহুংগা ম্যায়। তু শালে বন্দোবস্ত কর্ দে। নেহী ত তুঝ্কো ফাঁসায়াগা ইয়ার। তু হাম্সে দো-পজিশন্কে সিনিয়র হো, সলে, বদ্‌বু কাঁহাকা—এক পজিশন্ ত কম্সে কম্ ক্লিয়ার হো জায়গা প্রোমোশন কা হিসাবমে, মেরে লিয়ে।

হীরু হঠাৎ মুখ তুলে তাকালো ওর বন্ধুর দিকে। প্রাণের বন্ধু! খান্দানী, রইস্ আদ্মী কখনও আদিবাসীর বন্ধুর বন্ধু যে হতে চায় না, একথা হীরু এতদিন বুঝেও বোঝে নি। মেনেও মানে নি। অথচ হীরু একটা সময় পর্যন্ত আপ্রাণ চেয়েছিল, ওদেরই একজন হতে, নিজের আপনজনদের ফেলে দিয়ে।

হীরু বলল. ঠিক্কে হ্যায়। ইন্তেজাম্ হো যায়গা। তু বেফিককর্ রহ্।

হীরুর বন্ধু সিপাহীদের ডেকে বলল যে—বিকেল-বিকেল সে নিজে একা জিপ্, রাইফেল, আর আলো নিয়ে জঙ্গলের পথে ঘুরে বেড়াবে। শোন্চিতোয়ার সঙ্গে দেখা হলে ত মারাই পড়বে শোন্চিতোয়া, অার যে ছেলেগুলো এ জঙ্গলে আস্তানা গেড়েছে তাদের সঙ্গেও মোকাবিলা হতে পারে। ভীড় করে শিকার হয় না, সে শোন্চিতোয়াই

হোক, কী বিপ্লবীই হোক।

গোদা শেঠের মোটর ভট্‌ভট্‌ করে লাল ধুলো উড়িয়ে বাংলোয় এসে থামল। পিছনে মাহাতো বসে। বাংলোর বারান্দায় হীরুর বন্ধু ইজিচেয়ারে বসে রিভলবার পরিষ্কার করছিল তখন। তাড়াতাড়ি মোটর সাইকেলটা দাঁড় করিয়েই দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল তারা দুজনে। বলল, সেলাম হুজোর।

সেলাম।

খবর আছে হুজোর। বলল গোদা। তারপর হীরুর বন্ধুকে ইসারায় ঘরের ভিতরে আসতে বলল। খবরটা নির্জনে দিতে চায়।

ঘরে এল ওরা তিনজনেই। গোদা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, নান্‌কু আর দু-তিনটি ছেলেকে দেখা গেছে গাড়ুর ব্রীজের কাছে কোয়েল নদীর পাশে। ওদের কাছে রাইফেল, বন্দুক আছে। আপনার ফেরার সময় আপনাদের উপর হামলা করবার মতলব্‌ করছে ওরা।

জানলে কী করে?

হীরুর বন্ধু নির্লিপ্ত গলায় বলল, রিভলবার পরিষ্কার করতে করতে।

গাড়ুর হাট ছিল কালকে। হাটে নান্‌কু এসেছিল সওদা করতে। অনেক কিছু সওদা করল। তার একার সাইকেলের ক্যারিয়ার, বড় আর হ্যান্ডেলে সে-সওদার থলিয়া সব আঁটানো মুশকিল ছিল। আমাদের চর ছিল হাটে। তারা দুজন জঙ্গলে জঙ্গলে পিছা করে। গাড়ুর ব্রিজ পেরিয়ে পথটা যেই বাঁয়ে ঘুরেছে মুন্ডু আর বেত্‌লার দিকে, সেই রাস্তায় কিছু দূর কোয়েলের পাশে পাশে এসেই ঠিক বাঁদিকে নদীর পারে জঙ্গল-ভরা একটি ভাঙা পোড়া বাড়ি আছে পাহাড়ের উপর। রাস্তা থেকে ভাল দেখা যায় না। জঙ্গল আর আগাছায় ভরে গেছে চারপাশ। বাঘও আস্তানা গাড়ে সময় সময় সেখানে। অনেক-দিন আগে এক সাহেবের আস্তানা ছিল। সেইখানেই আড্ডা গেড়েছে ওরা। আমাদের চর নিজ চোখে দেখে এসেছে। আজই সন্ধ্যেতে যদি ফোর্স নিয়ে যান তাহলে ওদের ঘিরে ফেলতে পারেন। চারদিক ঘিরে ফেললে পালাবার পথ পাবে না।

হীরুর বন্ধু কী ভাবল একটু। তারপর বলল, আজ আমাদের অন্য প্ল্যান আছে। তোমরা চর লাগিয়ে রাখো, কাছাকাছি গাছের উপর থেকে তারা নজর রাখুক। কাল আমরা যা করার করব।

বহত্‌ মেহেরবানী হুজোর।

ওরা সবিনয়ে বলল।

মেহেরবানীর কি আছে। এ ত আমাদের ডিউটি।

তারপরই বলল, আমার কী করলে?

হুজোর, বস্তিতে মেয়ে ত কতই আছে। আপনি বললে আমরা লাইন লাগিয়ে দেব। সবই ত আমাদেরই সম্পত্তি। কিছু নাম পাত্তা না বলতে পারলে সেই বিশেষ মেয়েটিকে কি করে খুঁজে বের করি?

হীরুর রহিস্‌ বন্ধু মাহাতো আর গোদা শেঠের পশ্চাৎদেশের প্রতি কিছু অ-রহিস্‌-সুলভ মন্তব্য করে ওদের চলে যেতে বলল। হীরুই যখন জিম্মা নিয়েছে, তখন ওদের জড়াতে চাইল না। শুধু বলল, ওয়ার্থলেস্‌।

ইংরিজী না-জানতে ঐ শেষ গালাগালিটাই গোদা আর মাহাতো সবচেয়ে খারাপ গালাগাল ভেবে মন-মরা হয়ে মোটর সাইকেল ভট্‌ভটিয়ে চলে গেল।

হীরু ফিরে এল। ফিরতেই ওর বন্ধু গোদা শেঠ আর মাহাতোদের কথা বলল হীরুকে। হীরুর মাথার মধ্যে ঝম্‌ঝম্‌ করতে লাগল। কোথায় পেঁৗছেছে এই

মাহাতো আর গোদা? হারামজাদারা। সারা বস্তির মেয়েদের ইজ্জৎ এখন ওদের হাতে!

হীর, মুখ নামিয়ে সংযত গলায় বলল, তোমার ইন্তেজাম পাকা করে এসেছি।

হীরুর বন্ধু বলল, যা প্রোগ্রাম আছে তাইই থাকবে? ঝাঁর তালাও-এর পশ্চিম পাড়ের বড়্কা ইম্লি গাছের নীচে?

হ্যাঁ। তবে মেয়েটি কিন্তু একা দাঁড়িয়ে থাকবে। দেরি করো না। শোন্চিতোয়া মেয়েটিকে নিয়ে গেলে তার মা-বাবা আমাকে পুঁতে ফেলবে। হীরু বলল।

খরচ কত হবে?—হীরুর বন্ধু বলল।

হীরু বলল, যা তুমি দেবে খুশী হয়ে।

বন্ধু আগ্রহাতিশয্যে বলল, এই একশ টাকা এখনই রেখে দাও। রান্ডীকা বাচ্চী একশ টাকার নোট কি কখনও চোখে দেখেছে? খুশী হবে নিশ্চয়!

হীরুর চোখে দুটো জ্বলে উঠল। গম্ভীর মুখে বলল হওয়া তো উচিত!

তারপর বলল, তুমি কিন্তু মেয়েটিকে পেঁাছে দেবে, ফেরার সময় তার বাড়ির কাছাকাছি রাস্তাতেই সে নেবে যাবে। জ্যোৎস্না থাকবে আজ। আজ তাকে পেঁাছে দিয়েই আমার ছুটি। আমি শোন্চিতোয়াটার জন্যে ভলুমারের দিকে যাব—যদি পথের উপর হঠাৎ পেয়ে যাই শটগানটা নিয়ে যাব। কাছ থেকে শটগানের মারই ভালো। তুমি ঠিক সাতটাতেই পেঁাছবে। একেবারে একা আসবে। আজকাল সন্ধ্যে হয় ঠিক সাতটায় এখানে। মেয়েটিকে যেন চিতায় না খায় দায়িত্ব সব তোমার। মেয়েটিকে অন্য কেউ দেখে ফেললে, বস্তিতে সে এজন্মে আর মুখ দেখাতে পারবে না।

তারপর আবার বলল, একা এসো কিন্তু। আর দেরি কোরো না।

তাকে বাঘে খাবে।

হাসতে হাসতে হীরুর বন্ধু বলল, বাঘে খেলে, আমি খাব কী করে? আজীব বাত্!

গরমের দিন। খাওয়ার পর দরজা-জানলা বন্ধ করে দুটো নাগাদ একটু শুয়ে নিল ওরা দুজনেই। সন্ধ্যের ঘণ্টাখানেক আগে হীরু উঠে বলল, এবার আমি যাই।

ঠিক আছে।

হীরু চলে গেল, বারান্দায় ইজিচেয়ারে পা-ছড়িয়ে বসে আরাম করে চা খেল হীরুর বন্ধু। তারপর ঘটা করে চান করতে গেল। খান্দানি ঘরের ছেলে, পাছে জংলী মেয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে গায়ে জঙ্গলের গন্ধ মাখামাখি হয়ে যায়, তাই তার নিজের শরীরে এক অতিরিক্ত সুগন্ধের প্রলেপের প্রয়োজনও আছে আজ সন্ধ্যেতে।

হীরু একদম একা, জিপ চালিয়ে তাদের বাড়িতে গেল। টুসিকে ডাকল, আলাদা করে। ফিস্ফিস্ করে কী বলল। তারপরই চলে গেল। লগন আর তার মা-বাবা কিছু বলার আগেই।

টুসি তার মাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিস্ফিস্ করে বলল মা, নান্কুর খুব বিপদ। আমাকে এক্ষুণি একবার বেরোতে হবে। আর কিছু জিগগেস কোরো না। দাদার পক্ষে এ খবর জানানো খুবই অসুবিধে ছিল। তবু জানিয়েছে। এ কথাটা বাবাকে জানিয়ে রেখো। লগনকেও বোলো। কিন্তু অন্য কিছু বোলো না।

টুসি বেরিয়ে পড়ল পনেরো মিনিটের মধ্যে। আজকাল শরীর খুবই ক্লান্ত লাগে। শরীরে নানারকম অসুবিধে। মনটাও সবসময় খারাপ থাকে। তার পেটে সেই মানুষটার বাচ্চা। যে, রিভলবার দেখিয়ে তাকে নাঙ্গা করেছিল। আর সেই বাচ্চার

বাপ হবে নান্‌কু। ছিঃ ছিঃ।

ছেলে অথবা মেয়ে কি হবে ভগবানই জানেন। যাই-ই হোক, হয়ত সে খুউব সুন্দর হবে। কিন্তু শরীরের সৌন্দর্যই কি সব? টিহুলদাদার বৌ ত' কত সুন্দরী। কিন্তু তার কি ইজ্জত আছে? সেই লোকটা, তাকে এমন অসহায় অপমানের মধ্যে রাখল। শুধু আজই নয়; যতদিন তার এই পেটের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর বেঁচে থাকবে ততদিনই রাখবে। এটা যে কী করল নান্‌কু, কেন করতে গেল; কিছুতেই ভেবে পায় না টুসি।

এদিকটাতে বহুদিন আসে নি টুসি। আজকাল এমনিতেই কেউ আসে না ঝারিতালাওর দিকে শোন্‌চিতোয়ার ভয়ে। অন্যান্য বস্তি ছাড়াও শুধু ভালুমার বস্তিতেই এ পর্যন্ত পাঁচজন মানুষ গেছে চিতাটার পেটে গত তিনমাস-এ। টুসি নান্‌কুর কাছ থেকে শুনেছে যে, বাঘটাকে ম্যান-ইটার্ ডিক্লেয়ার করবার চেষ্টা হচ্ছে খুব। হলে, ভালো শিকারীরা এসে মেরে দিতে পারবে বাঘটাকে। নান্‌কুর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর থেকে ও কত কী জেনেছে, শুনেছে, ওর জগৎ যে কত বড় হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, তা ওই-ই জানে। দশ-দিনে, পনেরো দিনে নান্‌কু একবার এলে, থাকলে রাতে; কী করে তাকে আদর করবে ভেবে পায় না টুসি। টুসিকে অনাবৃত করে তার তলপেটে কান ছুঁইয়ে নান্‌কু বলে, দেখি দেখি; রহিস্ আদ্‌মির ব্যাটার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই কি না!

এত লজ্জা করে টুসির!

নান্‌কু বলে, কেন ভাবিস এত? মনে করবি, আমরা একে কুড়িয়ে পেয়েছি। আমরা ওকে যেমন করে মানুষ করব ও তেমনই হবে—আমাদেরই একজন হয়ে উঠবে। ওর রক্ত কিছু ভাল জিনিসও বয়ে নিয়ে আসবে—যা আমার মধ্যে নেই; তোর মধ্যে নেই। তোর বুকের দুধ খাবে, আমার সঙ্গে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে বড় হয়ে। ও দেখবি একেবারে আমাদেরই মতো হয়ে যাবে। নান্‌কু ওরাওঁ-এর ব্যাটা...।

তারপর বলে, নাঃ। মন এখন দেবো না। ব্যাটার চেহারা দেখে তারপর দেব।

টুসি হাসে। কিন্তু বড় লজ্জা করে! বড়ই লজ্জা করে টুসির। গর্ভাধান, প্রেমেই হোক কী ঘৃণাতেই হোক; যেসব বিবাহিত মেয়ে পরপুরুষের ঔরসজাত সন্তান গর্ভে বয়ে বেড়ায় একমাত্র তারাই জানে যে, স্বামীর মুখের দিকে চাইতে তাদের কতখানি লজ্জা করে। কতখানি কষ্ট হয় বেচারী স্বামীর জন্যে। সে স্বামী যতই নির্গুণ, নিরূপ হোক না কেন!

এই পথে কেউই হাঁটে না আজকাল। আগাছা গজিয়ে গেছে পথের মধ্যে। গরমের দিনে সাপেরও ভয়। খুব ভয়ে ভয়ে হাঁটছে টুসি।

একটু এগিয়েই জীপটা দেখতে পেল। ভাইয়া বসে আছে। ভাইয়ার হাতে দোনলা বন্দুক। কোমরে রিভলবার। যে-রকম রিভলবার দেখিয়ে সেই মানুষটা তাকে লুটেছিল।

দীর্ঘশ্বাস পড়ল টুসির। মানুষটার কথা মনে পড়ল। বড় সুন্দর মানুষটা। সে যদি ভয় দেখিয়ে, গায়ের জোরে তাকে না পেত! মেয়েরা ত এমন নয় যে, প্রিয় ছাড়া, স্বামী ছাড়া, তারা আর দ্বিতীয়জনকে ভালোবেসে কিছু দেয় না কখনও। ভালোবেসে মেয়েদের কাছ থেকে সবই পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ লোকটা—প্রথম অভিজ্ঞতাতেই লোকটা সমস্ত পুরুষজাত সম্বন্ধে টুসির মনে বড় ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছিল।

হীরু ওকে জিপে উঠে আসতে বলল।

টুসি জিপে উঠে বসলে, হীরু বলল, বাড়িতে কী বলেছিস?

তুমি যা বলতে বলেছিলে।

বেশ করেছিস!

তারপর বলল, তোর সঙ্গে শেষ দেখা করে ক্ষমা চায় আমার বন্ধু। ও জেনেছে যে, তুই আমাকে সব বলেছিস। সব শুনে ও বলেছে যে নানকুর কোনো ক্ষতি ওর দ্বারা হবে না। সেকথাও ও আমাকে দিয়েছে। তুই যে আমার বোন ও তা জানতো না।

টুসি বলল না, জানলেই বা। কেউ কি এমন করে করতে পারে? জোর করে?

হীরু চুপ করে রইল। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল ওর।

জিপ চলতে লাগল। কিছুটা গিয়েই ঝারিতালাও-এ এসে পড়ল ওরা। ঝারিতালাও পেরিয়ে গিয়ে জিপটাকে লুকিয়ে রাখল হীরু, পথের বাঁদিকে। তার পর জিপ থেকে নেমে বলল, চল্।

তখন সাড়ে ছ'টা বেজেছে; চারধারে সাবধানে তাকাতে তাকাতে চলতে লাগল হীরু! পুলিশ সাহেবের দামী পোশাকে টুপিতে বেল্টে, জুতোতে আর ভাইয়াকে দেখে গর্বিত হচ্ছিল টুসি। ভাইয়ার কেবল একটাই খুঁৎ। সে লম্বা নয়।

পশ্চিম পাড়ের তেঁতুল গাছতলাতে এসে হীরু বলল, তুই এই ইমলি গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকবি। ও আসবে ওর জিপ নিয়ে। জিপেই কথাবার্তা বলবে। তারপর চলে যাবে। এখানে আমার থাকার কথা নয়। কিন্তু শোন্‌চিতোয়াটার জন্যে তোকে আমি একা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দিতে পারি না। আমি পাশের কেলাউন্দা ঝোপ-গুলোর আড়ালে বন্দুক নিয়ে তোকে পাহারা দেব। ও এলে, তুই বলবি না যে আমি আছি। ভুলেও না।

টুসি এবারে একটু ভয় পেল। বলল, ক্ষমা চাইতে তোমার সঙ্গে ওতো বাড়িতেও আসতে পারত। এত কাণ্ডর কি ছিল? নানকু জানলে আমার উপর খুব রাগ করবে। এখনকার নানকুকে চেনো না দাদা। সে আর আগের লোক নেই।

হীরু একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, নানকু রাগ করলে বলিস, প্রথমত আমার কথাতেই তুই এরকম করেছিস, দ্বিতীয়ত নানকুর ভালোর জন্যেই করেছিস।

টুসি অধৈর্য গলায় বলল, ও কখনই শান্তি কিনতে চায় না পেছনের দরজা দিয়ে। ও সেই ধাতের মানুষই নয়। ও শুনলে বড় রাগ করবে দাদা। আমি জানি না, কী হবে। ওকে বলতে আমার হবেই।

হীরু তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ে বলল, আমার বন্ধু এক্ষুণি এসে পড়বে। আমি লুকোই।

আমার বন্ধু, কথাটা হীরু কি করে বলল, তা কথাটা বলে ফেলেই হীরু ভাবছিল।

টুসি বলল, আবারও যদি আমার সঙ্গে অসভ্যতা করে?

যাতে না করে তাই-ই তো আমি এলাম। তুই নিশ্চিত থাক। হীরু ওরাওঁ-এর শরীরে ওরাওঁ-এর রক্তই বইছে। ইজ্জৎ, সে নিজের ইজ্জৎ, বোনের ইজ্জৎ, গুষ্টির ইজ্জৎ, জাতের ইজ্জৎ, সবই সে বাঁচাতে জানে! তোর ভাইয়া আর সিং নেইরে। আবার ওরাওঁ হয়ে গেছে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই পেট্রোল জিপের ইঞ্জিনের মিষ্টি ঘুমপাড়ানী শব্দ একটি রানী ভোমরার ডানার শব্দর মতো জঙ্গলের মধ্যে ক্রমশ জোর হতে হতে এগিয়ে আসতে লাগল। তারপর একসময় পথের বাঁকে জিপটাকে দেখা গেল। জিপটা এগিয়ে আসতে লাগল সোজা এদিকে। জিপটা যখন একেবারে কাছে এসে গেছে, তখন হঠাৎই হীরু আবিষ্কার করল যে বাংলোর চৌকিদার সামনেই সীটে বসে আছে; তার বন্ধুর পাশে।

হঠাৎ হীরু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ক্ষিপ্ত ও একটুও হতে চায় নি। ও ভেবেছিল খুব ঠাণ্ডা মাথায়, নিষ্কম্প হাতে, জিপ থেকে নামলেই বন্দুক তুলে গুলি করবে তার রাহিস, উঁচু জাতের বন্ধুর বুক লক্ষ্য করে। তাই ওকে বারবার বলেছিল হীরু, একা একা আসতে।

এই চৌকিদারটা ভারী পাজী। এইই টিহুলের বৌকে খারাপ করেছে, করেছে বস্তির আরও অনেক মেয়েদের। আর এখন সেই চৌকিদারকেই সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হল রাহিস আদমী। এতবার একা আসতে বলা সত্ত্বেও! হীরু দাঁতে দাঁত চেপে নিরুচ্চারে বলল, যাঃ শালা! চৌকিদার তোরও মওত্ ছিল। তাই এলি। আমার হাতে মরতে এলি। বনদেওতার মনে এইই ছিল, কে জানত!

হীরু ত' খারাপই। হীরু নিজে খারাপ হতে পারেঃ সে লজ্জা তার একার। কিন্তু হীরুর মা-বাবা ভাই-বোনকে কেউ খারাপ বলুক, খারাপ বলার সুযোগ পাক; তা হীরু বরদাস্ত করতে পারবে না।

হীরু ত' আর সিং নেই। হীরু যে আবার ওরাও° হয়ে গেছে।

জিপে, সেই মানুষটাকে দেখে টুসি অবাক হয়ে গেলো। যে মানুষের সন্তান বইছে সে অনুক্ষণ, যার পরশ তার স্তনবৃন্তে, তার জরায়ুতে, তার নাভিমূলে, তাকে ভুলবে কি করে? মানুষটা সত্যিই বড় ভালো দেখতে। সৌন্দর্যর একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। সব কিছুকে, ভালো মন্দ, অতীত ভবিষ্যৎ সব কিছুকেই ভুলিয়ে দেয় এমন চোখ-ধাঁধানো সৌন্দর্য।

মুহূর্তের জন্য টুসি সর্বনাশী, নানকুর প্রতিও বুঝি এক পরম অকৃতজ্ঞতায় তার ধর্ষণকারীর প্রতি এক নতুন অবিশ্বাস্য ভালোলাগায় ভরে উঠল! মেয়েরা বড় বিচিত্র। নারীর চরিত্র-রহস্য বিধাতারও অজানা। কিন্তু পরক্ষণেই ঘৃণাটা, চকিতে পোষা পাখির মতো, ওর বুকে ফিরে এলো; গর্ভধারণের পর তার বমির মতো, তার বিরক্তির মতো, তার মাথাব্যথার মতো, তার অরুচিরই মতো। টুসির ইচ্ছা হল মানুষটাকে দু হাত দিয়ে গলা টিপে মারে।

মানুষটা জিপের ড্রাইভিং সীট থেকে নামল। খুউব লম্বা, সুপুরুষ, ভাইয়ার মতোই পোশাক পরা। দারুণ মানিয়েছে পোশাকটা। তার আগুনরঙা মুখে, দিনের শেষে রোদের ছটা পড়ে আরও লাল দেখাচ্ছে।

মানুষটা হাসল, হেসে, টুসির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

ঠিক সেই সময়ই বন্দুকের আওয়াজটা হল। টুসির থেকে সাত-আট হাত দূরে দাঁড়ানো মানুষটার মুখ, মাথা, কান সব ঝাঁঝরা হয়ে ধড় থেকে আলাদাই হয়ে গেল বলে যেন মনে হল। ধুপ করে মানুষটা পড়ে গেল টাঙ্গির বাড়ি-খাওয়া পলাশ গাছের মতো। পড়তে পড়তে অবচেতনে তার ডান হাতটা রিভলবারের খাপের দিকে এগিয়ে গিয়েই থেমে গেল।

ব্যাপারটা কী ঘটল, তা টুসি বোঝবার আগেই চৌকিদার জিপ থেকে নেমে উল্টোদিকে দৌড় লাগালো। ততক্ষণে হীরু উঠে দাঁড়িয়েছে কোলাউন্দা ঝোপের আড়াল ছেড়ে। উঠে দাঁড়িয়ে, বন্দুক তুলে ভাল করে নিশানা নিয়েই আবার গুলি করল। দৌড়তে থাকা চৌকিদার যেন একটা ধাক্কা খেল। সামান্য একটু লাফিয়ে উঠল; সামনে এগিয়ে আরও দু'পা দৌড়ে গিয়েই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল কতকগুলো তেতোগন্ধ পুটুসের ঝাড়ে। শরীরট ডুবে গেল ঝোপের মধ্যে। তার একটা নাগরাপরা পা উঁচু হয়ে থর্‌থর্ করে কাঁপল কিছুক্ষণ।

আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে টুসি একবার তার ভাইয়ার দিকে আর একবার ঐ

রহিস্ মানুষটি আর চৌকিদারের দিকে তাকাতে লাগল। ঘাড় এপাশ ওপাশ করতে করতে তার ঘাড় ব্যথা করছিল। ঘটনার আকস্মিকতাতে ও একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছিল।

ততক্ষণে প্রায় অন্ধকারও হয়ে এসেছে। টুসির মাথাটা একেবারে ভারশূন্য হয়ে গেছে। কোনো কিছু বোঝা বা ভাবার ক্ষমতা আর ওর নেই। টুসি ডাকল, ভাইয়া, ভাইয়া!

হীরু ওকে ইশারায় চুপ করতে বলে, বন্দুকে আরও গুলি ভরে এগিয়ে গিয়ে পড়ে থাকা লাশ দুটোর মাথা লক্ষ্য করে আরও দুটি গুলি চালালো। তারপর রহিস বন্ধুর রিভলবারের হোলস্টার খুলে রিভলবারটি এবং জিপ থেকে রাইফেলটি তুলে নিয়ে টুসকে বলল, অব্ চলা যায়।

ভূতগ্রস্ত, দারুহাতে-পাওয়া, অন্তঃসত্ত্বা টুসি অদৃশ্য মানুষখেকো শোন্‌চিতোয়ার আতঙ্কভরা অন্ধকার জঙ্গলের দিকে একবার, আর তার খুনী ভাইয়ার দিকে আরেকবার চাইতে চাইতে জিপের সামনের সীটে এসে বসল হীরুর পাশে।

হীরু জিপটা স্টার্ট করল। হেডলাইট জ্বালালো। তারপর সোজা হুলুক্ পাহাড়ের দিকে চলতে লাগল।

টুসি বলল, ভাইয়া, এ কী করলে তুমি! দু দুটো খুন করলে! আমার ভয় করছে। শিগগির আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও। শরীর খারাপ লাগছে আমার ভীষণ।

হীরু চুপ করে থাকল।

একটুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে, অথচ যেন অনেক দূর থেকে বলছে এমন ভাবে বলল একটু পরে আর ভয় করবে না। ভালো লাগবে। দেখিস্।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে টুসি বলল, ভয়ার্ত গলায়, কোথায় চললে? বাড়ির উল্টোদিকে?

এক্ষুনি ফিরলে, লোকে আমাকে যে সন্দেহ করবে, বাংলোতে সিপাহী কনস্টেবল্ ত কম নেই। দারোগাও আছে একজন।

ওঃ। টুসি বলল। ঈস্‌স্‌স্…।

হুলুক্ পাহাড়ের খাড়া উঁচু ঘাটির পথটা অনেকখানি খাড়া উঠে যেখানে বাঁক নিয়েছে, তার নীচেই ঘন জঙ্গলে ভরা গভীর খাদ। নীচ দিয়ে একটা ঝর্না বয়ে গেছে। জঙ্গলাকীর্ণ এখন। মিশেছে গিয়ে মীরুচাইয়াতে। অনেকখানি চড়াইয়ে উঠে আসার পর জিপ থামালো হীরু।

টুসি বলল, থামলে কেন?

এখানে থেকে আমাদের বস্তিটা খুব সুন্দর দেখায়। মনে হয়, নেতারহাটে এসেছি। আজ কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে, দ্যাখ্ টুসি। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। নীচের জঙ্গল, টাঁড়, আর ভালুমার বস্তি কী দারুণ দেখাচ্ছে দূরে! আয়, নেমে দ্যাখ্।

তারপর বলল, কতদিন পর এলাম বস্তিতে। তোর সঙ্গে কতদিন পর. .।

টুসি ভয় পাওয়া গলায় বলল, ভাইয়া, শোন্‌চিতোয়া আছে না? এখানে নামা কী ঠিক হবে?

টুসির শরীরটা বড়ই খারাপ লাগছিল। পেটের ভিতরে যে প্রাণটা নড়ে চড়ে বলে মনে হয় আজকাল; সে যেন একটু আগেই জেনে গেছে যে, যে-তার জনক; সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। যেন বুঝতে পেরেছে তার বীভৎস মৃত্যুর কথা। সমস্ত শরীরটা গুলিয়ে উঠেছে টুসির। তবুও ভাইয়ার কথাতে ও নেমেই দাঁড়াল। সন্ধ্যের বনের স্নিগ্ধতা ভালো লাগলো। এত উঁচুতে বেশ একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব আছে।

আবার মনে পড়ল—ঈস্‌স্‌স্—স্-স্

হীরু, বোনের কোমর জড়িয়ে ধরে ছোটবেলার মতো আদরে, বড় উষ্ণতার সঙ্গে, কিন্তু

যেন অনেক দূর থেকে বলল, তোর জন্যে আমার বড় কষ্ট হয় রে টুসি!

তুমি কী করবে বল? সবই আমার কপাল!

চন্দ্রালোকিত উপত্যকার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে টুসির দু চোখ জলে ভরে এল।

হীরু টুসির একটু পিছনে দাঁড়িয়ে তার রিভলবারটা বোতাম খুলে-রাখা হোলস্টার থেকে বের করল আস্তে। বের করে, নিঃশব্দে হাতে নিল। তারপর টুসির ঘাড়ের পিছনে নলটা নিয়ে ট্রিগার টানল। একটুও কাঁপলো না হাত। কোনো আওয়াজ না করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল টুসি। চুল ছড়িয়ে, দু হাত দুদিকে মেলে দিয়ে একটা পাথরের উপর এমনভাবে পড়ল যে, আর একটু হলেই খাদে চলে যেত ও। প্রায় দু'হাজার ফিট নীচে। রিভলবারের গুলির আওয়াজ, দৌড়ে গড়িয়ে গেল জ্যোৎস্নালোকিত খাদের দিকেই। পরক্ষণেই ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল পাহাড়ের দিক থেকে অনেকগুলো আওয়াজ হয়ে।

হীরু, টুসির পিঠের বাঁদিকে, যেখানে তার একমাত্র আদরের বোনের ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত, বড় ক্লান্ত হৃদয়, ঠিক সেইখানে আরেকবার গুলি করল খুব কাছ থেকে। ঝটিতে ওকে চিৎ করে, টর্চ জেবলে, একবার ছোটবোনের মুখটা দেখে নিল শেষবারের মতো। তারপর গলগল করে গরম তাজা রক্ত বেরোনো শরীরটাকে পা দিয়ে জোরে ঠেলে ফেলে দিল নীচের খাদে।

অত নীচে পড়ায়, কোনো আওয়াজ শোনা গেল না। একটা কালো উড়ন্ত পিণ্ডের মতে তালগোল পাকিয়ে হাত, পা চুল বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে তার সুন্দরী বোন টুসি অদৃশ্য হয়ে গেলো খাদের অন্ধকারে। আচমকা কতকগুলো টিঁ-টিঁ পাখি চারপাশ থেকে ডেকে উঠল একসঙ্গে। তারপর হীরুর মাথার ঠিক ওপরে, চক্রাকারে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

জঙ্গলের পাখিদের চোখেও কিছু অদেখা থাকে না। গাছেরই মতো।

হীরু তার বন্ধুর রাইফেলটা আর রিভলবারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নীচের খাদে। চটাং চটাং শব্দ করতে করতে, পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে; লাফাতে লাফাতে ওগুলোও গিয়ে পড়ল নীচে।

তারপর জিপ ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে ঘাটিটা নামতে লাগল হীরু। কিছুটা নামতেই, একটা বড় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে দেখা হল। রাস্তার একেবারে মাঝখানে। বাঘটা, চড়াইটা উঠে আসছিল। সরু রাস্তা। জিপ ও বাঘ দুজনের যাওয়ার পথ নেই। কিন্তু বড় বাঘ কখনও রাস্তা ছাড়ে না কাউকে। হীরু একটু ব্যাক করে, যেখানে রাস্তাটা দু-ভাগ হয়েছে, সেখানে এসে দাঁড়াল। বাঘটা সোজা উঠে এসে এক-লাফে ডান দিকের পথে নেমে চলে যেতেই, হীরু জিপটাকে সেকেন্ড গিয়ারে দিয়ে আবার নামতে লাগল।

হীরু ওরাওঁ ভাবছিল, এ সংসারে বিদ্যা, শিক্ষা, অর্থ, জাতের কৌলিন্য এসবই ফালতু। সবচেয়ে যা বড়; তা হচ্ছে ইজ্জৎ। হীরু ওরাওঁ-এর বোন সেই ইজ্জৎ দিয়ে দিয়েছিল তার বন্ধুকে। স্বেচ্ছায় হোক, কি অনিচ্ছায় হোক।

আরও ভাবছিল যে, নানকু হারামজাদা খুব বড়। বড় বেশী বড়। কিন্তু কী করে পরের ছেলে পেটে নিয়ে টুসি তাকে বিয়ে করল? নানকু যদি এত বড় হতে পারল, তবে তার বোনও কেন একটু বড় হতে পারল না? ভালুমার বস্তিতে কি গাছ ছিল না গলায় দড়ি দেওয়ার?

হীরু যদি হীরু সিং থাকত, তবে হয়তো অনেক কিছুই মেনে নিতে পারত। লক্ষ

লক্ষ নিজ নিজ স্বার্থ বাঁচানো শহরের-সুখ-সর্বস্ব বড় জাতের বাবু অনেক কিছুই মেনে নেয়। বামন, কায়েত, ভূমিহার, ক্ষত্রিয়দের বিবেক হচ্ছে কনভীনিয়েন্সের বিবেক। কিন্তু ওরাওঁ-এর বিবেক তা নয়। ওরা ওদের পুরোনো মূল্যবোধ নিয়েই বাঁচতে চায়।

কে জানে? হয়তো হীরু ভুল। হয়তো, ও প্রাকৃত। প্রাকৃত ত হবেই ; ও যে আদিবাসী। অপাংক্তেয়, হরিজনদেরই মতো। ওদের সংস্কৃতি অনেকই পুরোনো। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা পেরিয়ে এসেছে ওদের এই মূল্যবোধ। শিক্ষিত হয়ে, ভারত সরকারের বড় অফসর হয়েছে বলেই হীরু তার রক্তের কথা ভুলতে পারে না। হীরুর মতো একজন আদি-বাসী মানুষের কাছে কী মূল্যবান; তা কেবল সেইই জানে। এবং সেই মূল্যবোধের মূল্য কী করে দিতে হয়; তাও।

গভীর বনের মধ্যে একা জিপ চালাতে চালাতে হীরু ভাবছিল যে, ওদের যদি কেউ সত্যি সত্যিই ভালোবাসত, যদি ওদের সঙ্গে অন্তরের একাত্মতা বোধ করত, তবে তেমন কেউই শুধু কেবল বুঝতে পারত এই মুহূর্তে হীরু ওরাওঁ-এর আনন্দ এবং দুঃখের গভীরতার স্বরূপ। যুক্তি বা তর্ক দিয়ে নয়; শুধু চোখের জলেই এই মুহূর্তে হীরু ওরাওঁ-এর প্রকৃত মানসিকতা প্রতিবিম্বিত হত। শুধু মাত্র, চোখেরই জলে।



গরমটা এবার বেশ ভালই পড়েছে। দুপুরে ঘণ্টাদুয়েক বড়ই কষ্ট হয়। পোস্তর তরকারি আর বিউলির ডাল, এইই এখন স্ট্যান্ডার্ড দ্বিপ্রাহরিক খাবার।। বিকেলে রোদ পড়লে, আমপোড়া সরবৎ অথবা বাড়িতে-পাতা টক-দইয়ের ঘোল বানিয়ে তাতে আদা, কাঁচা লংকা ও কারিপাতা কুচো করে ফেলে দিয়ে একটু নুন দিয়ে খাওয়া। কারি-পাতার কোনো অভাব নেই। উঠোনের মধ্যেই তিতলি একটা কারিপাতার গাছ লাগিয়েছিল। মুঠো মুঠো পাতা ছিঁড়ে নিলেই হল।

সন্ধ্যের পর অবশ্য বেশ প্লেজেন্ট। তবে সন্ধ্যে উপভোগ করোর জো নেই আর শোন্‌চিতোয়াটার জন্যে।

কাড়ুয়া মরে গেছে। হারিয়ে গেছে টুসি। কেউ বলেছে, ওকে শোন্‌চিতোয়াতে খেয়েছে! কেউ বলেছে, ও আত্মহত্যা করেছে। কেউ বলেছে ঝারিতালাও-এর পাশে হীরুর বন্ধু পুলিশ সাহেব তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার ওপর অত্যাচার করার পর তাকে খুন করে তার লাশ গুম করে দিয়েছে। কিন্তু সেই পুলিশ সাহেবকে এবং বাংলোর চৌকিদারকেও কে বা কারা খুন করেছে গুলি করে ঐখানেই। সকলেই সেই নবাগন্তুক ছেলেগুলোকেই সন্দেহ করেছে। টুসির লাশটা কোথাও পাওয়া যায় নি। তাই মেয়েটা যে মরেইছে এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। মেয়েটা কোথায় যে নিখোঁজ হয়ে গেল। অনেকে মনে করছে টুসির নিখোঁজ হওয়ার পিছনে গোদা শেঠ এবং মাহাতোর হাত আছে। তবে টুসি, পুলিশ সাহেব হীরু সিং-এর. বোন। তার মৃত্যুর কিনারা হবেই, আজ আর কাল। ও ত আর সাধারণ মানুষ নয়। ছোট্ট জায়গা। একসঙ্গে এতগুলো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটাতে খুবই শোরগোল পড়ে গেছে। সকলের মুখে একই কথা।

হীরু পরদিন চলে গেছিল ভালুমার ছেড়ে দলবল সমেত। তারপর ডি. আই. জি. সাহেবের নেতৃত্বে খুব বড় পুলিশ ফোর্স এসে বাংলো এবং তার চারপাশে তাঁবু ফেলে থেকে, প্রায় সাতদিন ধরে পুরো এলাকাতে তল্লাসী চালিয়েছিলো, কিন্তু সবই নিষ্ফল। তাও প্রায় দিন পনেরো হয়ে গেল।

নান্‌কুর বিরুদ্ধে ওরা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে এসেছিল, কিন্তু নান্‌কুকে ধরা যায় নি। নান্‌কু কোথায়, তাও কেউ জানে না, টুসি থাকতে মাঝে মাঝে সে এসে উদয় হত। গত পনেরো দিন থেকে কেউ তাকে এ তল্লাটে দেখে নি। নান্‌কু আজকাল কখনও বড় রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে না। সব সময় বনে-বনে পাহাড়-ডিঙিয়ে নদী পেরিয়ে যায় আসে। তার যাওয়া-আসার খবর ভালুমার এবং অন্যান্য বস্তির লোকদের কাছেও অজানা থাকে। কে জানে? শোন্‌চিতোয়ার শিকার হয়েছে কী না। মাহাতো আর গোদা শেঠ শোন্‌চিতোয়াটার সঙ্গে দোস্তির হাত মিলিয়ে আবার ও তল্লাটে মালিক

হয়ে গেছে। কালকে একটা সাংঘাতিক খবর এসেছে এই গ্রামে ডালটনগঞ্জ থেকে, পাটনা হয়ে, একজন বিড়িপাতার ঠিকাদারের মাধ্যমে। হীরুকে নাকি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিপ্লবী ছেলেটির লাশের কাছে যে বন্দুক পাওয়া গেছিল সেটি যে তারই বন্দুক, এ কথা নাকি প্রমাণ হয়েছে। পুলিশের ওপর মহল সন্দেহ করছেন যে, পুলিশ সাহেব ও চৌকিদারের খুনের সঙ্গেও হীরুর যোগ আছে, যেহেতু বিপ্লবীদের সঙ্গে ও আছে বলে ওদের সন্দেহ। হীরুকে জামিনও দেওয়া হয় নি।

ইদানীং মানে এই বাঁশবাবুর জীবনেও অনেক খবরের উন্মেষ ঘটেছে। প্রথম খবর, আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। এই মাস, শেষ মাস। দ্বিতীয় খবর, তিতলিকে বিয়ে করার কথা আমি খুব সিরিয়াসলি ভাবছি। এই ভালুমার গ্রামেই বাকি জীবন পাকা-পাকি ভাবে থাকার বন্দোবস্ত করছি। মালিকের যে ডেরাতে আমি এখন আছি তা এবং তার সংলগ্ন সামান্য জমি ন্যায্য মূল্যের বিনিময়ে মালিকের কাছ থেকেই কিনে নেব। হাজারখানেক টাকা হয়তো হবে দাম। এতদিন ধরে ব্যাঙ্কে যা সামান্য জমেছে তা-ই মূলধন করে কিছু একটা শুরু করব ভাবছি। নইলে, জমি কিনে চাষবাস করে এদেরই একজন হয়ে থেকে যাবো। ঠিক, কী যে করব, তা কিছুই পাকাপাকি স্থির করি নি। ভাবা-ভাবিই চলছে এখনও।

টেটরার মৃত্যু ও ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া এই দুই হঠাৎ-অভিশাপে তিতলি অনেকই বদলে গেছিল। প্রথম প্রথম বোবার মতো থাকত। কাজেকর্মে অবশ্য কোনো গাফিলতি ছিলো না।

যদি সত্যিই বিয়ে করি ওকে, তবে ওর মাকেও এখানে নিয়ে আসব। ওদের বাড়ি ও জমি বেচে দিয়ে যা টাকা পাওয়া যাবে তা পোস্টাপিসে রেখে দেব তিতলির মায়ের নামে। সুদ নামমাত্রই পাবে। তবে, আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন সেও তিতলির সঙ্গেই থাকবে। তিতলিকে বিয়ে কবার সিদ্ধান্ততে পৌঁছবার আগেই তার প্রস্তাবনা-মাত্রই আমাকে আমার সমস্ত পারিপার্শ্বিক, আমাদের তথাকথিত ভদ্র শিক্ষিত সমাজ এবং আমাদের ভদ্রলোকী মুখোশের চটে-যাওয়া রঙ আমাকে এমনই গভীর ও মর্মান্তিক-ভাবে সচেতন করেছে যে, আমি নিজেই তাতে অবিশ্বাস্য রকম চমকে গেছি। এখন পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটার অভাবনীয়তা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। ঘটনা পরম্পরার অবিসংবাদিতা আমাকে একেবারেই বোবা করে দিয়েছে।

কাল ছোটমামা-মামীর একখানা চিঠি পেয়েছি। সে চিঠির ভাষার পুনরাবৃত্তি না করেই বলছি যে মামা-মামী আমার মতো কুলাঙ্গার, ব্রাহ্মণ পরিবারের মুখে কালি-দেওয়া এই মানুষটিকে নিয়ে যে আর কোনোদিনও মাথা ঘামাবেন না, এ-কথা প্রাঞ্জল ভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন। আমার সহকর্মীরা গজেনবাবু, নিতাইবাবু, নান্টুবাবু সকলেই আমার এই সিদ্ধান্তে রীতিমত শকড্। আমার বাহ্যত শক্ত এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে যে এত বড় অধঃপতনের বীজ লুকোনো ছিল, এ কথা তাঁরা নাকি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। অথচ পতন যে চিরকাল অধঃলোকেই হয়, ঊর্ধ্বলোকে কেউ যে কখনও পড়ে নি, আজ পর্যন্ত এ-কথা তাঁরা যে মেনে নিতে পারছেন না আমার বেলাতে, তা জানি না। জিন্-এর সঙ্গে যে আমার বিয়ে হয় নি, এ নাকি জিন্-এর পরম সৌভাগ্য ও ভগবানের অশেষ আশীর্বাদ।

এর চেয়েও অবাক হবার মতো আরো কিছু ঘটেছে। সে-ঘটনা যে আদৌ ঘটতে পারে তা আমার ভাবনার অগম্য ছিল। তা হল উদার, উচ্চশিক্ষিত মহাপণ্ডিত, আমাদের প্রত্যেকের লোকাল গার্জিয়ান্ এবং আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ রথীদার প্রতিক্রিয়া। কথাটা যেদিন ওঁকে প্রথম বলি, উনি পাথর হয়ে গেছিলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, গলা পরি-ষ্কার করে নিয়ে বলেছিলেন, সায়ন, সমাজসেবা করা এক আর নিজেকে তার মধ্যে এমন

ভাবে ইনভল্‌ভ করে ফেলা আর এক জিনিস। ও'র কথা শুনে আমি যত-না শকড্‌ হয়েছিলেন, উনি আমার সিদ্ধান্তের কথা শুনে তার চেয়ে অনেকেই বেশী শক পেয়েছিলেন। উঠে চলে আসবার আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ভেবে দ্যাখ্‌ সায়ন। এমন সাংঘাতিক ভুল করার আগে ভাল করে ভেবে দ্যাখ্‌। কুষ্ঠ রোগীদের জন্যে লেপারস্‌-হোম্‌ করা বা তাদের জন্যে চাঁদা-তোলা এক ব্যাপার ; আর নিজেই কুষ্ঠ-রোগী হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ আর এক ব্যাপার। প্রথমটা গৌরবের। শিক্ষিত এনলাইটেন্‌ড লোকের গর্বময় কাজ। আর দ্বিতীয়টা, নিজেকে ঘৃণ্য করে তোলার ব্যাপার।

মুখে কথা সরে নি। আমার সবচেয়ে বড় বল ভরসা ছিলেন রথীদাই। আমার চোখে উনি ছিলেন মেসায়াহ্‌। অসাধারণ মানুষ। সমস্ত সংকীর্ণতা, অন্ধত্ব, কূপ-মন্ডূকতার অনেক ওপরে। চিরদিন। এই গরীব-গুর্বো, হতভাগা আদিবাসী ও দেহাতী মানুষগুলোকে তিনি ভালোবাসতেন বলেই জানতাম। হীরুকে, নান্‌কুকে মানুষ করার পিছনে, এই বস্তির শুভাশুভর পিছনে, তাঁর অবদান কতখানি, তা এখানেব সকলেই জানে। তিনি যে মহামান্য পোপের মতো এক দারুণ উঁচু আসনে বসে আছেন তা ও'র নিজেরই মতো আমরা সকলেই শুধু জানতাম যে, তাই-ই নয়, জেনে ধন্যও হতাম। দুঃখ এইটুকু যে, তাঁর সমস্ত শিক্ষার গর্ব, পান্ডিত্যর ভ্রান্তিবিলাস, ঔদার্যর আত্মতুষ্টি যে জাতপাতের গোড়ার সংস্কারেই এখনও আটকে আছে এমন করে, একথ দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। অথচ তিনি সহজেই ভাগীরথী হতে পারতেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত মহানুভবতাব গঙ্গা, ভগীরথের জটারই মতো তাঁর দৃঢ়বদ্ধ সংস্কারেই আটকে রইল। এ-জীবনে গঙ্গা হয়ে নেমে এসে এই দুঃখী মানুষগুলোব জীবনে স্নিগ্ধতা এবং উর্বরতা আনতে পারলো না।

এ ক'দিন হল যতই ভাবছি, এ-ব্যাপারটা নিয়ে, ততই আমার মনে এই ধারণাই বদ্ধ-মূল হচ্ছে যে, এই দেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এবং আমাদের সংবিধানে যাই-ই বলুক না কেন, এ-দেশের সংখ্যালঘু উচ্চবিত্ত, উচ্চশিক্ষিত, উচ্চজাত সমাজ বাকি সমস্ত দেশটাকে চিরদিন তাদেরই পদতলগত কার রাখতে বদ্ধপরিকর। তারাই আবহ-মানকাল ধরে সমস্ত ভোগ করে এসে আজও সব ভোগ করতে চায়, সর্বেসর্বা থাকতে চায় ; তারা তাদের উচ্চাসনে বসেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতি করুণা এবং দয়াধর্ম দেখাতে চায়, বকশিস দিতে চায়, মাঝে মাঝে টাকার বান্ডিল ছুঁড়ে দিয়ে। আমার মালিক রোশনলালবাবুর মতই প্রমাণ করতে চায় চিরদিন যে, তারাই বড়। অন্যরা তাদের দয়াবই ভিখারী, করুণার সংবেদনশীলতার কচিৎ পাত্র বৈ আর কিছু নয়। কোনো-ক্রমেই তাঁদের সমকক্ষ নয ; কোনোদিনও হতে পারে না, তাঁদের সমাজের সঙ্গে এই বুভুক্ষু যুগ-যুগান্ত ধরে বঞ্চিত, চমৎকার সৎ, মানুষগুলোর সমাজের কখনও সত্যিকারের মিল ঘটুক ; এ তাঁরা চান না।

এইসব পন্ডিত মানুষই আমেরিকার, ইংল্যান্ডের এবং সাউথ-আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নিযে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। আর স্বদেশ, স্ব-বর্ণের, স্বজাতিদের আপন করে নিতে, আপনার বলে বুকে ঠাঁই দিতে তাঁদের ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। এখনও তাঁদের ড্রাইভার বেয়ারাকে তাঁদের সঙ্গে কোনো অনুষ্ঠানে একাসনে বসতে দিলে তাঁদের মর্যাদা ক্লিষ্ট হয়। যে-দেশ, মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেয় না, সে দেশের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক, বৈদ্যুতিক, পারমাণবিক অগ্রগতি সম্পূর্ণই যে অর্থহীন, একথা তাঁদের একবারও মনে হয় না।

রথীদার এই প্রতিক্রিয়া অনেক বছর আগে দেশ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় পড়া হিরণকুমার সান্যাল মশায়ের একটি লেখার কথা মনে করিয়ে দিল। কোলকাতায় এক

ছুটিতে গিয়ে পড়ায় দৈবাৎ পত্রিকাটি হাতে এসেছিল। লেখাটি ছিল প্রিয় কবি, সুদর্শন, দেবদুর্লভ, জীবদ্দশায়ই অমরত্বর অধিকারী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মশায় সম্বন্ধে। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে এক সারিতে তাঁর গাড়ির ড্রাইভারকে খেতে বসতে দেওয়ায় তিনি নাকি প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করে না খেয়েই উঠে গেছিলেন।

ঐ ঘটনাটির কথা পড়ার পর, ছোটবেলা থেকে সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিল তিল করে গড়ে তোলা আমার সব সম্মান রাতারাতি ধূলিসাৎ হয়ে গেছিল। কবি তিনি যেমনই হন না কেন, পৈতৃকধন তাঁর যতই থেকে থাকুক না কেন; সেদিন থেকে তাঁকে আমি অমানুষ বলেই মনে করে এসেছি। অনেকেই এরকম তাও আমি জানতাম। কিন্তু রথীদা! অফ্ অল পার্সনস্!

যখনই একা থাকি আজকাল, তখনই অনেক কথা মনে পড়ে। অনেকদিন আগে এক আন্ইউজুয়াল, এক্সেপ্শানাল, জমিদার তনয়, লিখে গেছিলেনঃ

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।

সবারে না যদি ডাক
এখনো সরিয়া থাক,

অপানারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যু মাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।

কিন্তু কি হল?

অনেক বছর ত হয়ে গেল। এ দুর্ভাগা দেশ যখন পরাধীন ছিল, তখনও তৎকালীন নেতা-সুলভ নেতারা এবং দায়িত্ববান কবি-সাহিত্যিকরা যা বলে গেলেন বার বার করে, আজ পঁয়ত্রিশ বছরের স্বাধীনতার পরও তার কতটুকু আমাদের কানে পেঁছিল? কানে যদি-বা পেঁছিল হৃদয়ে পেঁছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐকতান কবিতাতে শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলানোকেও তিরস্কার করে গেছিলেন। কিন্তু আজ এতদিন পরও এই মানি-মুঞ্জরী, টুসি-লগন, বুলকি-পরেশনাথ, টেট্রা-তিতলি রামধানীয়া চাচা, এদের কাছে রথীদার মতো বড় মানুষ ত শুধু ভঙ্গি দিয়েই চোখ ভুলোতে এসেছিলেন। তাঁর ড্রেসিং-গাউনেরই মতো, আম-জনতার প্রতি দরদও তাঁর একটা পোশাক। শুধু পোশাকই। ভিতরের মানুষটা এখন মুখার্জী বামুনের সঙ্গে কাহারের মেয়ের বিয়ের কথাতে ভিরমি খান। ছিঃ ছিঃ। বড় লজ্জা। বড় দুঃখ। রথীদা!

তিতলিকে যেদিন প্রথম ওকে বিয়ে করবার কথাটা বলি, তিতলি অবাক হয়ে গেছিল। ওরা ত চিরদিন ধর্ষিতাই হয়েছে। ওদের মন ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হয়ে, শূকরীর মতো হয়ে গেছে। সে মনে কোনো ভালোবাসার ডাক যেমন আর সাড়া তোলে না; ঘৃণার ধিক্কারও না। ওদের চোখে পৃথিবীর অবিশ্বাস। বিশ্বাসকে, কোনোরকম শুভবিশ্বাসকেই বিশ্বাস করার মতো মনের জোর আর ওদের অবশিষ্ট নেই। তাই, তিতলি কথাটা প্রথমে বিশ্বাসই করে নি।

সেদিন সকালবেলা। এগারোটা হবে। ওকে বললাম, একটু চা খাওয়া ত তিতলি।

উত্তর না দিয়ে, ও চা করে নিয়ে এল। আমি বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে ছিলাম। অদ্ভুত কায়দায় ও চা এগিয়ে দিল। যেমন বরাবর দেয়। বাঁ হাতটা এনে ডান হাতের কনুইয়ের কাছে ছুঁয়ে দু'হাতে এগিয়ে চা-এর গ্লাসটা বাড়িয়ে দেয়। প্রণাম করতে হলে, উবু হয়ে বসে, আঁচলটা নিয়ে দু'পায়ের পাতা ঢেকে দেয়; তারপর দু'হাত একসঙ্গে বাড়িয়ে দিয়ে প্রণাম করে। যুগ-যুগান্ত ধরে কত শালীনতা, কত গভীর বিনয় সহজাত

হয়ে রয়েছে এদের মধ্যে। কত কী শেখার ছিল আমাদের মতো ফাল্‌তু শহুরে উঁচু-ঘরের বাবুদের এদের প্রত্যেকের কাছ থেকে। এত বছর, যতই এদের সঙ্গে গভীরভাবে মিশেছি, ততই মাথা নীচু হয়ে এসেছে আমাদের মিথ্যা উচ্চমন্যতার, অহংকারের, অসারতার কথা ভেবে।

তিত্‌লি, মোড়াটা এনে আমার পাসে একটু বোস্‌॥ তোর সঙ্গে কথা আছে।

ও এসে মাটিতে বসল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে।

বলল, কী কথা? তাড়াতাড়ি বল। আমি ডাল বসিয়ে এসেছি। পুড়ে যাবে।

না মাটিতে নয়। তুই মোড়াটা এনে আমার পাশে বোস্‌।

এ আবার কী?

বলে, বিরক্ত হয়ে তিত্‌লি মোড়াটা এনে বসল।

আমার দিকে তাকা ভালো করে।

ও আমার দিকে তাকালো।

তিত্‌লির ঠোঁটে একটা কালো তিল আছে। ওর চিবুকের কাছটা, চোখের গভীর আনত দৃষ্টি ওকে এমন এক দৃপ্ত মহিমা দিয়েছে তা বলার নয়। হয়তো আমিও এই রকম একেবারে ভিন্ন চোখে পূর্ণদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে কখনও চাই নি এর আগে তাই লক্ষ্যও করি নি।

আমার এই নতুন দৃষ্টিতে চম্‌কে উঠে, ও চোখ নামিয়ে নিল।

হঠাৎ ওকে ভীষণ চুমু খেতে ইচ্ছে করল আমার। ও যে আমার বিবাহিতা স্ত্রী হবে। পরক্ষণেই ভাবলাম, নাঃ। থাক। প্রাক্‌-বিবাহের পরশ থেকে না-হয় এ-জন্মে বঞ্চিতই হয়ে রইলাম।

তিত্‌লি, আমাকে তোর কেমন লাগে? তোর পছন্দ আমাকে? মনিব হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে?

ও মুখ তুলে বলল, আবার পানের দাগ লাগিয়েছ পাঞ্জাবিটাতে? তোমাকে নিয়ে আমি সত্যি আর পারি না।

কথা ঘোরাস না। আমার কথার জবাব দে।

মানুষ টানুষ ত অনেক বড় ব্যাপার। মনিবকে মনিব বলে জেনেই ত খুব খুশী ছিলাম এতদিন। অত সব বড় বড় কথা আমার মাথায় আসে না।

তোকে আমি বিয়ে করতে চাই তিত্‌লি। তুই আমাকে বিয়ে করবি তো?

তিত্‌লির মুখ লাল হয়ে গেল। কানের লতিও। নাকের পাটা ফুলে উঠল।

ও বলল, দ্যাখো, বাবা মরে যাওয়ায়, আর এই অসুখে আমার এমনিতেই মাথার ঠিক নেই। এমন রসিকতা আমার সঙ্গে করা তোমার ঠিক হচ্ছে না।

আমি এক ঝট্‌কায় বাঁ হাত দিয়ে ওর হাতটা তুলে নিলাম আমার কোলে। ওর হাতের ওপর হাত রেখে বললাম, রসিকতা নয়। খুব জরুরী কথা এ। বল্‌ আমাকে বর হিসেবে তোর পছন্দ কী-না।

অসুখ হল আমার আর মাথাটা দেখছি খারাপ হল তোমার! পাগল না-হলে, এমন কথা কেউ বলে! আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে?

বুঝতে পারছিলাম ও কিন্তু ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠছিল ভিতরে ভিতরে।

গম্ভীর গলায় বললাম, তাহলে আমাকে তোর পছন্দ নয়!

ও অসহায় এবং বিভ্রান্ত চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ। ওর হাতটা আমার হাতের মধ্যে হঠাৎই নরম হয়ে এলো। ঘেমে উঠল ওর হাতের পাতাটা। ও তাকিয়েই ছিল আমার চোখে, একদৃষ্টে। হঠাৎই মুখ নামিয়ে নিল। মাটির দিকে

চেয়ে রইল।

বললাম, দ্যাখ, আমার নিজের মা ছাড়া তোর মতো এত ভালো আমায় আর কেউ বাসেনি রে তিত্‌লি। তুই বড় ভালো মেয়ে। তোর বাবা মরে গেল। এখন তোর ভার অন্য কেউ না নিলে তোর আর তোর মায়েরই বা চলবে কী করে?

একটু চুপ করে থেকে ও উদাস গলায় কুয়োতলির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, দয়ার কথা বলছ মালিক? তুমি খুব দয়ালু। ওর দু চোখ জলে ভরে উঠল।

আমি বললাম,, ছিঃ! ছিঃ!

মালিক ত নোক্‌রানিকে দয়া এমনিই দেখাতে পারে। আমার কাছ থেকে তোমার যদি কিছু চাওয়ার থাকে, তাহলে তা এমনিই দেব আমি। তুমিই তো অন্যরকম। অনেকেই তো জওয়ান্ নোক্‌রানির সব কিছু না-নিয়ে মাইনেই দেয় না! গোদা শেঠ-এর হয়ে আমলকী কুড়োতে গেলেও ত তা দিতে হবে। তুমি ত কত ভালো ব্যবহার কর। কত ভালো মালিক তুমি। এমনিতেই তো আমি তোমারই। খুশী হয়েই তোমার। আমার জন্যে নিজেকে এত ছোট করবে কেন? নীচে নামবে কেন?

ছোট করব?

আমি রেগে গেলাম।

হঠাৎ মনে হল, নান্‌কু বোধহয় ঠিকই বলে। ওরা যে অত্যাচারিত হয়েছে এবং বঞ্চিত হয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে, এর পেছনে ওদেরও একটা নিশ্চিত নেতিবাচক ভূমিকা আছে। ওরা নিজেদের আসন সম্বন্ধে এখনও একেবারেই সচেতন নয়! সেই অস্পষ্টতা কাটিয়ে ওঠার কোনো সুযোগই হয়তো ওরা পায় নি। তবুও, এটা খারাপ। ভীষণই খারাপ। নান্‌কুটা একদম খাঁটি কথা বলে। পুরোপুরি খাঁটি!

বললাম, ছোট করব কেন? আমি তোর চেয়ে কিসে বড়?

তিত্‌লি গম্ভীর মুখে বলল, ওসব কথা ছাড়ো। সে কথা তুমি জানো ভালো করেই। আমিও জানি।

আমি বললাম, বাজে কথা রাখ্‌তো। কাজের কথা বল্, বিয়ে করবি কী-ন বল্ নইলে আমি অন্য মেয়ে দেখব। আমার বিয়ের বয়স হয়েছে অনেকদিন। একা একা আর ভালো লাগে না। আমার একটা সুন্দর মেয়ের খুব শখ।

তিত্‌লি এবার মুখ নামিয়ে বলল, আমি ত আর সুন্দরী নই!

তোর কথা হচ্ছে না। বাচ্চা, বাচ্চার কথা বলছি আমি। বিয়ে হলে বাচ্চা হবে তো? একটা মেয়ের শখ আমার!

তিত্‌লি এক ঝট্‌কায় হাতটা সরিয়ে নিয়ে, ধেৎ বলে এক দৌড়ে পায়ের মল আর হাতের বালাতে রিন্ ঠিন্ শব্দ তুলে রান্নাঘরে চলে গেল। যেতে যেতে উষ্মার সঙ্গে বলে গেল, তুমি ভারী অসভ্য!

আমি চেঁচিয়ে বললাম, তাহলে তুই রাজী! যাই তোর মায়ের মতটা চাই গিয়ে। তারপর নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন করতে যাব। সময় বেশী নেই। যত তাড়াতাড়ি হয় ব্যাপারটা সেরে ফেলব।

ও উত্তরে বলল, দেখেছো। ডালটা পুড়িয়ে দিলে ত!

বললাম, সবে ত ডাল দিয়ে শুরু হল। এবার দেখবি, তোর অনেক কিছুই পুড়বে।

এরপর স্বাভাবিক গতিতেই ব্যাপারটা এগিয়ে গেছিল। কিন্তু মুশকিল হল এই-ই যে, তিত্‌লি আর আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকায়ই না, কাছেও আসে না। বিয়ের আগেই, নতুন বউ হয়ে গেল। অন্য দিকে মুখ করে খেতে দেয়। ইনডাইরেক্‌ট ন্যারেশানে কথা বলে। কোথায় যাওয়া হচ্ছে? কখন ফেরা হবে? কী খাওয়া হবে?

জামাটা খুললেই তো হয়? চানটা করে নিলেই ত খাবার দেওয়া যায়। এইভাবেই চালাতে লাগল। দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল, আমার ততই মজা লাগতে লাগল। আর তিতলি ততই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যেতে লাগল।

একদিন খেতে বসে হঠাৎ ওকে বললাম, মেয়ে যদি না-হয় আমার, ত' তোকে দেখাব আমি!

পরিবেশন ছেড়ে এক দৌড়ে ও পাশের ঘরে চলে গিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিল। বলল, আমি চাকরি ছেড়ে দেব কিন্তু এমন করলে।

আমি খেতে খেতে বললাম, আমি মরলেই যাবে এ চাকরি। চাকরি যেন তোর ইচ্ছেয় যাবে। দাঁড়া না! তোকে কী করি আমি দেখবি! বিয়েটা হয়ে যাক। তোকে মজাটা টের পাওয়াব।

ঐ ঘর থেকেই ও চেঁচিয়ে বলল, আমি তোমাকে বিয়ে করব না।

আমি বললাম, তুই-ই নাই-ই বা করলি। আমি ত তোকে করব।

ও বলল, বাঃ রে! গায়ের জোর?

একশবার গায়ের জোর।

এবার হাসতে হাসতে ও আবার এ-ঘরে এল। বলল, ভাত ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দয়া করে খাওয়া হোক।

এমনি করে একটা একটা দিন এগোচ্ছে বিয়ের দিকে।

আমার আর তিতলির মানসিক এ্যাডজাস্টমেন্ট একেবারে পুরোপুরি হয়ে গেছে এ ক'বছরে। আমরা দুজনেই কে কখন রাগ করলাম, কে কখন খুশী হলাম, বুঝতে পারি। কী করে রাগ ভাঙতে হয়, তাও জানি। দুজনেই। একে দুঃখী থাকলে বা অখুশী থাকলে কী করে অপরকে সুখী বা খুশী করতে হয় তাও। তবে, শরীরটাও ত বড় কম কথা নয়। আমার এই ভালুমারের দিগন্ত-বিস্তৃত বন পাহাড় অরণ্যানী নদী ঝর্ণ টাঁড় তালাও-এর সামগ্রিক ঠাসবুনোন রহস্যের জগতের মতো সেও ত এক দারুণ জগৎ। অনাস্বাদিত, অনাঘ্রাত, অদেখা। মনে মনে, শরীরের ভালোবাসার কল্পনায় বুঁদ হয়ে আছি এখন আমি সব সময়।

নিজে লাইফবয় সাবান মাখি। তিতলির জন্যে সুগন্ধ সাবানের বন্দোবস্ত করতে হবে। আমার যতটুকু সাধ্য, আমি ওকে মাথায় করে, যত্ন করে রাখব। মেয়েরা আমার চোখে চিরদিনই একটা আলাদা জাত, সুন্দর পাখির মতো, প্রজাপতির মতো। পুরুষের কর্তব্য, তাদের আতর-মাখানো তুলোর মধ্যে রাখা, যাতে ধুলো না লাগে, রোদ না লাগে, তাদের শরীরে। আর সেই কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করার মধ্যেই ত' পুরুষের সমস্ত সার্থকতা!

মানি, মুঞ্জরী, পরেশনাথ, বুলকিকে নেমন্তন্ন করতে গেছিলাম। বিয়ে হবে ওদেরই বাড়ির সামনের টাঁড়ে। অনেকখানি জায়গা আছে। তাছাড়া ওদের বাড়ির গা দিয়ে বয়ে গেছে একটা পাহাড়ী নালা। জলের সুবিধে আছে হাত-পা-ধোবার। সব সময়ই জল থাকে। বস্তি-শুদ্ধু লোক হাঁড়িয়া, শুয়োরের মাংস আর ভাত খাবে সেদিন। মাদল বাজবে, নাচ-গান হবে সারারাত। এ হল বিয়ের খাওয়া। মালিকের চাকরি করি আর নাই-ই করি, এতবছরে সহকর্মীদের সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা ত' রাতারাতি চলে যাবার নয়! ভদ্রলোক সহকর্মীরা যত অভদ্র ব্যবহারই করুন না কেন, যারা তথাকথিত ভদ্রলোক নয়, তাদের সকলের কাছে থেকেই আজ থেকে বহুদিন পর্যন্ত যথেষ্ট ভদ্রজনোচিত ব্যবহার পাবো বলেই আমার বিশ্বাস। অনেক কাজ এখন। বিয়ের বাজার করতে যেতে হবে তিতলিকে নিয়ে ডালটনগঞ্জে। ওর ত কিছুই নেই। নতুন বউ বলে ব্যাপার।

মেয়েদের কত কী লাগে। কিছুই ত জানি না। এতদিন যা জানতাম তিতলি সম্বন্ধে, এখন তার চেয়ে অনেক বেশী জানতে হবে। বরপক্ষ কন্যাপক্ষ সবই ত আমি একা। এ বড় অভাবনীয় অবস্থায় পড়লাম। ভেবেছিলাম, রথীদাই দাঁড়িয়ে থেকে বিয়েটা দেওয়াবেন—আমার পিঠ চাপড়ে বললেন সাব্বাস্ সায়ন। গজেনবাবু নন্টুবাবু নিতাই-বাবু, গণেশ মাস্টার এঁরা সকলেই এসে উৎসাহ-সহকারে পাশে দাঁড়াবেন এই আশাও ছিল। তা নয়, চিপাদোহর, ডালটনগঞ্জ, লাতেহার, টোরী, চাতরা, জোরী, গাড়োয়া, বানারী, মহুয়াডাঁর সমস্ত জায়গায় ঢি-ঢি পড়ে গেছে। ভদ্রলোকদের প্রেস্টিজ আমি একেবারেই পাংচার করে দিয়েছি না কি! এখন থেকে ওঁদেরও যদি কুলি-কামিনরা দামাদ্ বা জিজাজী বলে ডাকতে আরম্ভ করে, এই ভয়ে তাবৎ ভদ্রলোকমন্ডলী কুঁকড়ে আছেন। বাঙালী সহকর্মীদের চেয়েও বেশী চটেছেন স্থানীয় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। দু-একজন ত মারবেন বলেও শাসিয়েছেন শুনতে পাচ্ছি। মারলে, মারবেন। এখন অনেক দূর এগিয়ে গেছি। পেছনে ফেরার আর উপায় নেই।

বিকেলে গিয়ে মানিয়ার বাড়িতে অনেকক্ষণ গল্প করলাম মুঞ্জরী আর ওর সঙ্গে। ব্যবস্থা-টাবস্থা সব ওরাই সকলে মিলে করে রাখবে। বিয়ে আর একটা কী বড় ব্যাপার! আমাকে কোনোরকম ভাবনা করতে মানা করল ওরা দুজনেই। বললো, তিতলিটার খুব ভাল বরাত। তারপরই বলল, মেয়েটাও বড় ভাল। মানিয়ার কোমরটা ঠিক হয়েও হচ্ছে না। অথচ ঐ ভাঙা কোমর নিয়েই করতে হচ্ছে সব কিছুই। ওর জীবিকা ফরেস্ট ডিপার্টের কেস, মাহাতো এবং গোদা শেঠের হয়রানি এ সবই সমান একঘেয়েমির সঙ্গে চলেছে। মানির কোনো তাপ উত্তাপ নেই। কেবলই বলে, পরেশ-নাথটা ত বড় হয়েই এসেছে প্রায়। আর চার-পাঁচটা বছর কোনোক্রমে চালিয়ে দিতে পারলেই এবার বসে বসে খাবো। পায়ের ওপর পা তুলে।

মানি বলল, চলো মালিক, এগিয়ে দিই তোমাকে একটু। বেলা পড়ে আসছে। যাবে? শোনচিতোয়ার কথা কি ভুলে গেলে?

অনেকদিন ত এ বস্তিতে তার খবর নেই। কোন দিকে চলে গেছে কে জানে? মাসখানেক হতে চলল, তাই না? দ্যাখো, এতদিন কোন বস্তিতে বিষ-তীর মেরে খতম করে দিয়েছে ব্যাটাকে। তীর ছুঁড়লে ত' আর শব্দ হয় না। কতদিন আর মুখ বুঁজে সহ্য করবে মানুষ?

একমাস কোনো খবর নেই ঠিকই। সেইজন্যেই ত বেশী সাবধানে থাকা উচিত।

মানি বলল, ঠিক্কে হ্যায়। চলো ত'! অনেক বেলা আছে এখনও।

বলে, লাঠিটা হাতে করে বেরোল আমার সংগে কোমর বাঁকিয়ে। ওদের বাড়ি থেকে দুশো গজও আসি নি, আমি আগে যাচ্ছি ; মানি পেছন পেছন, হঠাৎ আমার একে-বারে পাশেই কী যেন হিস্‌স্‌স্ করে উঠল।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলে উঠল, বিষম বিপদ। সাবধান! স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে দেখি, একটা প্রকান্ড বড় কালো কুচকুচে গোখরো সাপ সুঁড়ি-পথের ওপরে লেজে ভর দিয়ে প্রায় কোমর সমান উঁচু হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রকান্ড ফণাটা হেলছে-দুলছে। ছোবলটা মারলেই হয়। মারা না-মারা তারই দয়া।

মাথাটা ফাঁকা হয়ে গেল। বোধশক্তি রহিত হয়ে গেল। তিতলির মিষ্টি মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। উজ্জ্বল কালো দুটি চোখ, গভীর কালো আনত দৃষ্টি ; তার পাতলা ঠোঁটের ওপর ছোট্ট তিলটি। সে যেন নীরবে বলছে তুমিও? আমাদের যে আর কেউই নেই!

পরক্ষণেই মনে হল, পিছন থেকে একটা ছায়া দ্রুত এগিয়ে আসছে। একটুও না নড়ে ঐখানে দাঁড়িয়েই আমি ভাবছিলাম, সাপটাকে কে পাঠালো আমাকে খতম করার জন্যে? শ্রেণীশত্রু নিপাত করবে? ব্রাহ্মণ, না ক্ষত্রিয়, না কায়স্থ, না ভূমিহার?

এমন সময়, ঐ ভয়াবহ সাপকে এবং সেই সাপের অনুপস্থিত মেয়েকে একটা অত্যন্ত অশালীন সম্পর্কে জড়িয়ে ফেলে, অশ্রাব্য ভাষায় বিভিন্ন মৌখিক বিভূষণে বিভূষিত করতে করতে ঝপাঝপ্ করে লাঠি চালাতে লাগল মানিয়া। ওকে দেখে বিশ্বাস হলো না যে, ওর কোমরের অবস্থা শোচনীয় ছিল ক'দিন আগেও।

প্রথম লাঠি সাপের পিঠে পড়তেই, আমি একলাফে সরে গেলাম সেখান থেকে। কোমরের ও ফণার ওপর লাঠির পর লাঠি পড়তে সাপটি মাটিতে শুয়ে পড়ল। কিন্তু তখনও নড়ছিল। সাপেরা মরে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ নড়ে। মানুষের বিবেকের মতো।

কোমরভাঙা মানির কোমরে হঠাৎ এত জোর এল কোথা থেকে তা ওই-ই জানে। সাপটা মারার পরই যেন ওর কোমরের ব্যথাটা ফিরে এল। ব্যথাও যেন সাপের ভয়ে ওকে ছেড়ে দূরে সরে গেছিল। মানি, লাঠিতে ভর দিয়ে কোমর সোজা করে দাঁড়িয়ে বলল, যা মালিক্! আজ তোরা যাত্রা বন্ গেল্।

বললাম, এই নাকি তোর কোমরভাঙা?

মানি খুশী হয়ে, ফোক্‌লা দাঁতে হেসে, পিচিক্ করে থুথু ফেলল পথের পাশের ওকটা ঝোপ লক্ষ্য করে।

এটা কী সাপ রে?

কালো গহুমন। কাট্‌লে আর দেখতে হতো না। স্বর্গে গিয়ে বিয়ে করতে হতো।

এই সাপের চামড়াটা আমাকে ছাড়িয়ে দিবি? কী দারুণ চামড়াটারে।

মানি গররাজী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এই কালো গহুমনের চামড়া যদি কেউ ছাড়ায় ত তার বংশ নাশ হয় মালিক।

হেসে বললাম, তোদের যতরকম কুসংস্কার!

মানি হাসল বোকার মতো। কী যেন ভাবছিল ও।

তারপর বলল, আচ্ছা, আচ্ছা দেব। আমি গরীব মানুষ! তোমার বিয়েতে আর কিছু ত দিতে পারব না! ঠিক আছে। এইটাই ভাল করে ছাড়িয়ে, সুন্দর করে শুকিয়ে দেব। এখুনি উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছি সাপটাকে।

একটু দম নিয়ে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে বলল, আমি আর যাচ্ছি না তাহলে। তুমি এগোও। অন্ধকারও হয়ে এল।

আচ্ছা! বলে, আমি ডেরার পথ ধরলাম।



সেদিন মানিয়া যখন সাপটাকে মারছিল এবং আমি দাঁড়িয়েছিলাম পথে, ঠিক তখনই আমাদের দেড়শ গজ দক্ষিণে লোহার চাচার মেয়ে গোরী একটা দু মানুষ সমান কুন্ডার গাছে উঠে একা একা কুন্ডার পাতা পাড়ছিল।

কুন্ডার গাছগুলো ছোট ছোট হয়। গুঁড়িটা সোজা এক কোমর সমান উঠে বিভিন্ন ডাল ছড়িয়ে দেয় ওপরে। ডালগুলো সমান্তরাল নয়। দেড় দু মিটার ব্যাসের মধ্যে সব ডালগুলো থাকে। বড়রা ঐ ডালে চড়লে ডাল ভেঙে যেতে পারে বলে বাচ্চারাই সাধারণত উঠে কুন্ডার পাতা পাড়ে। কুন্ডার পাতার তরকারি বানিয়ে খায় আমাদের বন-পাহাড়ের লোকেরা। গোল, গোল, পাত্‌লা পাত্‌লা দেখতে হয় পাতাগুলো। আরও কিছুদিন পরে কুন্ডার গাছে ফলও আসবে। তখন ফলও খাবে সকলে।

বাড়িতে খাওয়ার মতো কিছুই ছিল না বলে গোরীর মা গোরীকে পাঠিয়েছিল। ন' বছরের মেয়ে গোরী, কুন্ডার পাতা পেড়ে নিয়ে যখন গাছ থেকে নামছিল ঠিক তখনই পিছন থেকে শোন্‌চিতোয়াটা দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে ওর ঘাড়-কামড়ে ধরে নিচে নামায়। বেচারী শিশু তার হাতে যত জোরে পারে ডাল আঁকড়ে ধরে। গাছের কর্কশ ডালে তার নরম হাতের পাতার ভিতর দিককার মাংস ছিঁড়ে রয়ে যায় সেখানেই। শোন্‌-চিতোয়াটা দিনের বেলা এই প্রথম ভালুমার গ্রামের প্রায় মধ্যে থেকে মানুষ নিল।

এখানে বিপদ এক রকমের নয়। অনেক রকমের। কিন্তু দিনের পর দিন শুধু মকাই বা বাজ্‌রার রুটি বা গত বছরের শুখা-মহুয়া কারই বা মুখে রোচে? তাছাড়া, ভাত বা রুটিও বা ক'দিন খেতে পায় ওরা? বেঁচে থাকতে হলে এইসব বিপদ নিয়েই বাঁচতে হয় সকলকে। আমাকেও হবে। এতে কোনো বীরত্ব বা বাহাদুরি নেই। বরং এই জীবনের কাছে নিজেদের সঁপে দেওয়ার মধ্যে কেমন এক নির্লিপ্ত নিরুপায় প্রশান্তি আছে। যে প্রশান্তির কথা ভাবলে, মাঝে মাঝে আমার গা-জ্বালা করে। নান্‌কুর নিশ্চয়ই আমার চেয়ে অনেকই বেশি করে।

ভগবানে বিশ্বাস করতে দোষ দেখি না। কিন্তু এই ভালুমারের মানুষজন তাদের এই অসহায়, সম্বলহীন, প্রতিকারহীন জীবনের সব দায় ওদের অদৃশ্য কিন্তু সাকার ভগবানের ওপরই চাপিয়ে দিয়ে বংশপরম্পরায় বেঁচে এসেছে ভাবলে বড়ই রাগ ধরে। ওরা বোধহয় মনে করে যে, যে দায় যে দেনা ওদের, তা বুঝি ভগবানের কাঁধে চাপিয়ে দিতে পারলেই তা পালন বা শোধ করা হয়ে যাবে।

আমার ব্যাঙ্কে যে টাকা ছিল, তা থেকে মালিকের কাছ থেকে ডেরাটি এগারো শ' টাকাতে কিনে নিতে হলেও আরো কিছু থাকবে। এটা সোজা অঙ্কের হিসাব। বড়

শহরের মূল্যমানে এ টাকা কোনো টাকাই নয়। কিন্তু ভালুমারের পটভূমিতে এ টাকা যার আছে, সে বিড়লার মতই বড়লোক। এই জায়গায়, এই পরিপ্রেক্ষিতে এক নতুন জীবন আরম্ভ করতে আমার মতো লোকের পক্ষে এই টাকাই যথেষ্ট টাকা! মানি-মুঞ্জরী, কি তিতলি, কি রামধানীয়া চাচা বা লোহার চাচার বাড়ি তল্লাসী করলেও একসঙ্গে হয়তো কুড়ি টাকাও বেরোবে না। অথচ তবু ওরা বেঁচে আছে, সারাদিন কাজ করছে, হাসছেও। কষ্টে হলেও, বেঁচে আছে। টাকা যেমন ওদের নেই, তেমন শহরের কেরানি-বাবু থেকে বিরাট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের মতো টাকার পিছনে পাগলের মতো দৌড়ে বেড়ানোর মতো অন্ধ মত্ততাও নেই। ওরা অল্পেতেই খুশী। সুখ যে ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স-এর ওপর নির্ভরশীল নয়, তা প্রত্যেক গড়পড়তা গ্রামীণ ভারতবাসীই জানে। জানে না, কেবল শহরের লোক। কিন্তু এই দুরারোগ্য আতি-ছোঁয়াচে ব্যাধি শহুরেরা ক্রমাগত গ্রামীণ ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রতিদিন। এ রোগের কোনো প্রতিষেধক নেই। চিকিৎসাও নেই। এই অপ্রয়োজনের প্রয়োজনের ব্যাধি মারাত্মক আকার ধারণ করছে প্রতি মুহূর্তে।

কাল রাতে যখন আমি খেতে বসেছিলাম ঠিক তখনই কে যেন দৌড়ে এসে বারান্দায় উঠল। তারপর ভেজান দরজা ঠেলে ভিতরে এলো। এসেই, আমার পাশে বসে পড়ে, তিতলিকে অর্ডার করলো, বড়ী ভুখ্ লাগলথু, রে তিতলি। খানা দে।

নানকুকে এতদিন পর দেখে খুব ভাল লাগল। ও বলল, সবই শুনেছি। বড় খুশীর কথা বাঁশবাবু। তুমি সত্যিই আমাদের একজন হলে।

আমার বিয়ের দিন আসবে তো নানকু?

আলবৎ। তিতলির সঙ্গে তোমার বিয়ে, আর আমি না এসে পারি? তবে, বোলো না কাউকে।

রথীদা তো আসবেন না, শুনেছো?

সব শুনেছি। নানকু বলল। কিছুই বলার নেই আমার। অন্য কথা বলো।

ছেলেগুলোর কি খবর? তোমার সঙ্গে যোগাযোগ কি সত্যিই ছিল?

মরদোর বাচ্চা ওরা। ওদের কাজ আমার চেয়েও অনেক বড় কোনো কাজ। আর বেশী কিছু জিগগেস কোরো না। আমি জানিও না ওদের সম্বন্ধে বেশী কিছু। আমি তো ফালতু একজন মানুষ। আমার ভালুমার আর তার আশেপাশের লোকেরা তাদের নিজেদের নিজেরা আবিষ্কার করলেই আমার ছুটি। কিন্তু এত ছোট কাজ যে এতখানি কঠিন, আগে ঠিক বুঝতে পারি নি।

তোমার নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট তুলে নিয়েছে পুলিশ?

তুলে নিয়েছে? পাগল! কে কত ভাল লোক এ দেশে তা বুঝতে হয় কার কত শত্রু আছে এবং কার নামে কত মামলা ঝুলছে দেখে। যত বেশী শত্রু আর যত বেশী মামলা ততই ভালো লোক সে। আমার নামে তিন তিনটে খুনের মামলা। তার মানে, লোক আমি এমনি ভালোর চেয়ে তিনগুণ ভাল। অথচ যারা খুন হল......

জানি।

আমি তো কাউকে খুন করিই নি, মধ্যে দিয়ে টুসিয় পর্যন্ত গুম হয়ে গেল। তার খুনের দায়ও চেপেছে আমার ঘাড়ে। বলতে বলতে মনে হল ওর গলা ভারি হয়ে এল। আমার মনের ভুলও হতে পারে। বলল, বিয়ে তো আমিও করেছিলাম বাঁশবাবু! কপালে সইল না।

তিতলি রান্নাঘরে গেল আটা মাখতে। হয়তো চোখের জলও লুকোতে।

টুসি বড় মিষ্টি মেয়ে ছিল। আমি বললাম।

মিষ্টি মেয়ে অনেকই আছে। সেটা বড় কথা নয়। ওর খুব সাহস ছিল। কথা কি জানো? আসল সাহস হচ্ছে মনের সাহস।

ওর কথাতে মনে পড়ে গেল আমার এক বন্ধু, যে আর্মিতে আছে। একদিন আমাকে বলেছিল ফিজিকাল কারেজ ইজ দ্যা লিস্ট্ ফর্ম অফ কারেজ। যে কোনো মিলিটারী অফিসারকে জিজ্ঞেস কোরো, শুনবে, ওঁদের যখন ট্রেনিং দেওয়া হয়, এই কথাটাই বড় করে শেখানো হয়। আর্মড-ফোর্সেস-এর প্রত্যেক ভালো অফিসার জানেন, যুদ্ধ করার সাহসের চেয়েও আরও অনেক বড় সাহসের পরিচয় তাঁদের দিতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে। আর সেই সাহস তাঁদের আছে বলেই, তাঁরা বড় অফিসার।

নান্কু এইসব আলোচনায় চলে গেলেই বড় উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ওয়ার্মডআপ্ হয়ে ওঠে। আমি তাই কথা ঘুরিয়ে বললাম, তুমি যে, এই রাতে এলে, শোন্‌চিতোয়াটা থাকা সত্ত্বেও; এটাও তো কম সাহসের কথা নয়! অবশ্য তোমার সাহস নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলবে না কখনও।

লোহার চাচার ন' বছরের ছোট্ট মেয়ে গোরী, যে শোন্‌চিতোয়া যখন খুশী তাকে ধরতে পারে তা ভাল করে জেনেও কুন্ডার পাতা ছিঁড়তে জঙ্গলে আসতে পারে, তার সাহসের কাছে আমার সাহস কিছুই নয়। একজন জওয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে যে সাহসের পরিচয় দেয় অটোমেটিক্ ওয়েপন হাতে নিয়ে, সেই শারীরিক সাহসের চেয়ে ন' বছরের গোরীর এই মনের সাহস কি কোনো অংশে কম? দুঃখ সইবার সাহস, বইবার সাহস, বিপদের মধ্যে মাথা উঁচু করে নিরস্ত্র অবস্থায় বিপকে অগ্রাহ্য করবার সাহসও একটা দারুণ সাহস! ক'জন পারে?

তিত্‌লি এল এ ঘরে। বলল, তুমি কি পালিয়েই বেড়াবে এমন করে? নান্‌কু ভাইয়া?

কী করব? এই ব্যক্তির মালিক তো গোদা শেঠ আর মাহাতো। তারা যা ইচ্ছে তাই-ই করতে পারে। নইলে, খুন না করেও তিন তিনটে খুনের মামলা ঝোলে আমার ঘাড়ে। তুই-ই বল, তিত্‌লি? তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, ধরা দিলেই, ঝুলিয়ে দেবে। মাঝে মাঝে মনে হয় একই দিনে দিই দুটোকে শেষ করে। সেটা একটুও কঠিন কাজ নয়। তারপরই ভাবি, সেইটে কি ঠিক রাস্তা? সে তো আমার হার। যেদিন এই টিহুল-লগন-পরেশনাথ, এমনকি আমার মানিয়া চাচাও বুঝতে শিখবে, তাদের সত্যি-কারের জায়গা কোথায়, যেদিন আমাদের এই বন পাহাড়ের প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজের ভূমিকা আর আত্মসম্মান নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে: সেদিনই আমার সত্যিকারের জিৎ হবে। যখন এদেশের নেতারা নতুন জিপগাড়ির প্রশেসান করে, ফুলের মালা গলায় দিয়ে, শহর থেকে হেলিকপ্টার চড়ে আর আসবে না, যেদিন নেতা আসবে এই মানী, লোহার-চাচা, টিহুল, পরেশনাথদের মধ্যে থেকে, যাদের গায়ে মাটির গন্ধ, ঘামের গন্ধ; সেদিনই নান্‌কু ওরাওঁ-এর কাজ শেষ হবে। যতদিন সে নেতারা না-আসে, ততদিন আমাকে পালিয়েই বেড়াতে হবে। বুঝলে বাঁশবাবু, মনের সাহসে এদের সবাইকে সাহসী করে তুলতে পারলে শুধু ভালুমার বস্তি কেন, আমার এই মস্ত সুন্দর দেশটা একটা দেশের মতো দেশ হয়ে দাঁড়াবে। সারা পৃথিবী তাকে মাথা নীচু করে প্রণাম করবে।

তোমার কয়লাখাদের চাকরিটা নিশ্চয়ই চলে গেছে? থাকলেও তো যেতে আর পারো না সেখানে নিশ্চয়ই!

চাকরি? তুমি জানো না? কবে ছেড়ে দিয়েছি। সম্মানে লাগে। ওরা কাজ না করেই ট্রেড-ইউনিয়নিজম্ করতে চায়। দায়িত্বটা কর্তব্যটা অস্বীকার করে, খালি

পাওনাটা নিয়েই মাথা ঘামায়। আমি ওদের কেউ নই। তুমি কিন্তু একথাটা ছেলে-গুলোকে শিখিও তোমার স্কুলে। কাজ করতে হবে। সকলের অনেক কাজ করতে হবে। কাজ ছাড়া কোনো দেশ বড় হয় না। কাজের কথা শিখিও। আর যে মনের সাহসের কথা বললাম, ওদের সেই সাহসের কথাও শিখিও, তাহলেই হবে।

রথীদার কাছে গেছিলে নাকি? কথা ঘুরিয়ে বললাম আমি।

ও মাথা নাড়ল। বলল, অন্য কথা বলো।

হীরুর কোনো খবর জানো? জুগনু বেচারার বড়ই খারাপ অবস্থা। টুসিয়া যে কোথায় হারিয়ে গেল। তারপর হীরু। জামিনও পায় নি শুনলাম।

হীরুদাদার ফাঁসি হবে। নান্‌কু বলল, গলা নামিয়ে। কাউকে বোলো না। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে।

কোন ব্যাপারটা?

হীরুদাদাই যে চৌকিদার আর পুলিশ সাহেবকে মেরেছিল।

বল কি? শুনেছিলাম এমন একটা গুজব, কিন্তু বিশ্বাস করি নি। হীরু!

হীরুদাদার বন্ধু খুব রহিস্ ঘরের ছেলে। খুবই প্রতাপ-প্রতিপত্তি। অনেক এম. এল. এ., এম. পি., মিনিস্টারের জানাশোনা তার বাপ-কাকাদের সংগে। অথচ হীরু-দাদার কেই বা আছে? তাছাড়া খুন তো আলবাৎ করেছে। সাক্ষী কেউ নেই। তবে পয়সা থাকলে সাক্ষীর অভাব কি? তোমার গোদা শেঠ বা মাহাতো বা তাদেরই কোনো চাম্‌চা সাক্ষী দাঁড়িয়ে যাবে। মদত দেওয়ার লোক থাকলে লোককে বাঁচাতেই বা কী, আর ফাঁসাতেই বা কী? দশটা খুন করেও কত লোক বেকসুর খালাস হয়ে যাচ্ছে। একটু চুপ করে থেকে নান্‌কু বলল, সারা দেশটা ক্রমশ বর্‌বাদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বুঝলে বাঁশবাবু। বেশরম্, বেয়াকুফ, বে-নজীর বর্‌বাদীর দিকে।

খাবার দিয়ে ডাকল তিত্‌লি।

নান্‌কু ভোর হবার অনেক আগেই উঠে পড়েছিল। তিত্‌লি তাড়াতাড়ি স্টোভ ধরিয়ে নান্‌কুকে মাঠ্‌রী দিয়ে চা দিয়েছিল। চা খেতে খেতে হঠাৎ নান্‌কু বলেছিল, তোর বিদাইয়া করন্‌পুরা ; মোর ছাতি বিহরে—একদিন এই গানটা গাইছিলাম, এমন সময় টুসিয়ার সঙ্গে দেখা। মীরচা-বেটীতে। বুঝলি তিত্‌লি। টুসিটার বিদাইয়ার জায়গাটাও যদি বা জানতাম তাহলেও মনটা একটু শান্ত হতো। কোথায় যে হারিয়ে গেল। পেটে আমারই বাচ্চা নিয়ে।

তিত্‌লি ওকে কি বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই, চলি রে! বলেই উঠে চলে গেল ও।

আজকাল নান্‌কু এমনই ফস্‌লি-বটেরের মতো হঠাৎ হঠাৎ আসে, হঠাৎ হঠাৎ চলে যায়। মাঝে মাঝে জুগনু চাচার বাড়িতেও যায়। তার শ্বশুরবাড়ি।

ওকে দেখে অবাক লাগে আমার। ও যে ফেরারী, ওকে যে পুলিশ অথবা গোদা শেঠ কিংবা মাহাতোরা খোঁজ করে বেড়াচ্ছে এ নিয়ে ওর কোনোই দুশ্চিন্তা নেই। ওর চলা-ফেরার মধ্যে বড় বাঘের চলা ফেরার এক অদ্ভুত মিল আছে। যারাই জংগলে বড় বাঘকে কখনও দেখেছেন, তাঁরাই জানেন যে ভয় বা বিপদাশঙ্কা নিয়ে বড় বাঘের কখনও কোনো মাথা-ব্যথা নেই। মাথা উঁচু করে, ডোন্ট-কেয়ার তার চলা-ফেরা। বাঘ যে বনের রাজা, তা মিটিং করে জানান্ দিতে হয় না। সম্মান কেউই কখনও ভিক্ষা করে পায় নি সংসারে। বাঘকে দেখে এমনিতেই মাথা নুয়ে আসে শ্রদ্ধায়। নান্‌কুকে দেখলেও তাই।

সকাল হতেই চা খেয়ে রোজ আমি আমার স্কুল খুলি। পোড়ুয়ারা সব আসে। ছেলেই বেশি। মেয়ে কম। সকাল সাতটা থেকে ন'টা, দুঘন্টা পড়াই ওদের। আমিই শ্লেট-

পেন্সিল কিনে দিয়েছি। জনা-দশেক সবশুদ্ধ। তিতলিকে নিয়ে। ওদের সঙ্গে ও-ও শেখে। অক্ষর পরিচয় করানো এবং বাচ্চাদের পড়ানো যে কত কঠিন এবং কত ধৈর্যের কাজ তা এই পাঠশালা শুরু না করলে কখনও জানতেও পেতাম না। সমস্ত কিন্ডার-গার্টেন স্কুলের শিক্ষিকাদের প্রতি শ্রদ্ধা গভীর হয়েছে আমার এ ক'দিনেই। মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চেয়েও বোধহয় এ কাজ অনেক কঠিন।

মানিয়া একদিন সত্যি সত্যিই সেই কালো গহুমন্ সাপের চামড়াটা নিয়ে এল। বলল, ভালো করে রোদে শুকিয়ে ঠিকঠাক করে দিয়েছি। তুমি অনেক বছর রাখতে পারো। তোমার জন্যে ভারী গালাগালি খেতে হল মুঞ্জরীর কাছে।

কেন? আমি শুধোলাম।

বলেছিলাম না তোমাকে! ঐ যে! লোকে বলে, এই সাপের চামড়া ছাড়ালে নাকি বংশনাশ হয়।

তিতলি বলল, হয়ই তে! তুমি কেন ও সাপের চামড়া ছাড়াতে গেলে?

বকলাম তিতলিকে। যত্ত বাজে কুসংস্কার!

মানি বলল, আমি তো মুঞ্জরীকে তাই-ই বললাম। বললাম মালিক বলেছে।

মানির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ভাবখানা, মালিক আর ভগবানে কোনো তফাত নেই। তাও যদি ওর মালিকও হতাম! বললাম, আমাকে অনেকদিন তোরা সকলে মালিক, আর হুজৌর, করে রেখেছিস। এখন তো তোদের গাঁয়ের দামাদ হতে যাচ্ছি। এবার তোদের একজন করে নে। আপন করে নে আমাকে।

কি বলে ডাকব তোমাকে? মানি মুশকিলে পড়ে বলল।

তিতলি খিলখিল্ করে হেসে উঠল।

বললাম, না-হেসে আমার একটা নাম ঠিক করে দে না বুঝি।

তিতলি আচানক্ বলল, গাও-দামাদ।

বাঃ ফারস্ট্ ক্লাস্। আমি বললাম! ঘর-জামাই-এর চেয়ে অনেকই ভাল।

মানির মুখ দেখে মনে হল, প্রচণ্ড এক সমস্যার নিরসন হল ওর।

মানি চলে যাবার সময় লক্ষ করলাম, কুঁজো হয়ে হাঁটছে তা বটেই। একটু যেন খোঁড়াচ্ছেও।

বললাম, আবার কী হল রে মানি!

বোলো না মালিক, পড়ে গেছিলাম আবারও এক গর্তে। এই ফরেস্ট ডিপার্ট্‌মেন্ট মীরচা-বেটী নদীর শুকনো খোলে ইয়া বিরাট বিরাট সব গর্ত করেছে। বর্ষায় নাকি তাতে জল জমিয়ে নেবে, তারপর শীতে প্ল্যানটেশানে জল দেবে সেখান থেকে। গরমে জানোয়ারেরা জলও খেতে পারবে। তা খুঁড়বে তো খোঁড়, গ্রামটা ছেড়েই খোঁড়। তা না, লোকের চলাচলের পথের ওপরই প্রায় এইসব কাণ্ড। এই ফরেস্ট ডিপার্ট্‌ই আমাকে মারবে দেখছি। ধনে প্রাণে।

তোর কেসের তারিখ আবার কবে পড়বে রে মানিয়া? টাকা-পয়সার দরকার থাকলে বলিস কিন্তু। লজ্জা করিস না।

মানি দু-হাত ওপরে তুলে বলল, সে হয়ে যাবে। সবই ভগবানের দয়া। আর চালিয়ে তো এলাম এতবছর এমনি করেই।...

ও চলে গেলে আমি আমার স্বাধীন জীবনযাত্রার গতিপ্রকৃতি, আয়-ব্যয় ভবিষ্যতের একটা বাজেট নিয়ে বসলাম। ভাবছি, বিড়িপাতার ছোট একটা জঙ্গল ইজারা নিয়ে সকলে মিলে কাজ করব। যা মুনাফা হবে, তা সকলে মিলে সমান ভাগে ভাগ করে

নেব। সকলকেই নেব এই কাজে। যারাই খাটতে চাইবে। মানিয়া, জগ্‌ন্‌, টিহ্‌ল, পরেশনাথ, লগন, ব্‌ল্‌কি, যে কেউ, যে ভাবে সাহায্য করতে পারে। সকলের সমান হিস্‌সা। কিন্তু সকলকে মেহনত করতে হবে সমান। কেউ যে পরগাছার মতো বসে বসে অন্যের ঘাড়ের রক্ত চ্‌ষবে, সেটি হবে না। আমিও শারীরিক পরিশ্রম করব ওদেরই মতো। আমার হয়ে শ্‌ধ্‌ আমার ক্যাপিটালই খাটবে; সেটিও হবে না। অনেক কিছ্‌ই তো করতে সাধ যায়। দেখি, কী পারি? কতট্‌কু পারি? তবে যাই-ই করি না কেন, এবার গোদা শেঠ আর মাহাতোর নজর পড়বে আমারই ওপর। এতদিন রোশনলালবাব্‌র কর্মচারী, বহিরাগত বাঁশবাব্‌ ছিলাম। এখন গাঁও-দামাদ হয়ে গিয়ে ওদের শত্র্‌তার ম্‌খোম্‌খি হতেই হবে। তিত্‌লি যে এমনভাবে গোদা শেঠের হাত-ফস্‌কে পড়ে-লিখে শহ্‌রে বাব্‌র একেবারে বিয়ে-করা বউ হয়ে উঠবে, এ কি গোদা শেঠ দ্‌ঃস্বপ্নেও ভেবেছিলো?

মানি চলে গেলে আমি তিত্‌লিকে ডাকলাম। ও ওর মার কাছে বসেছিলো, শেষের ঘরে। তিত্‌লির মা স্‌রাতীয়ার বয়স বড় জোর চল্লিশ হবে। কিন্তু দেখলে মনে হয় ষাট। তিত্‌লির আগে আরও নাকি দ্‌ ভাই ছিল। তারা কেউই বেঁচে নেই। একজনকে সাপে কামড়েছিল পাঁচ বছর বয়সে। অন্যজন বসন্তে মারা যায়। ভারী চ্‌পচাপ মহিলা। টেট্‌রার শোকটা একেবারেই ভুলতে পারে নি। তিত্‌লির কাছ থেকে আমার ঘরকন্নার রকম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার রীতি-নীতি, এসব একট্‌ একট্‌ শিখে নিচ্ছে। শিখে নিচ্ছে যত্ন করে রান্নাবান্নাও। আমার কাছে যে থাকবে, তার প্রতি-দানে যে কী এবং কতট্‌কু সে করতে পারবে আমার জন্যে, এই চিন্তাই মনে হয় তাকে পেয়ে বসেছে। বড় আত্মসম্মানজ্ঞান মান্‌ষটার। রাসেল বলেছিলেন, সেল্ফরেস্‌পেক্ট ইজ দ্য বেটার হাফ্‌ অফ্‌ প্রাইড।

তিত্‌লি এলে বললাম, কাল সকালের বাসে ডালটনগঞ্জ যাব, বিয়ের কেনাকাটা করতে। তোর জন্যে কী কী কিনতে হবে তার একটা লিস্টি বানা। তোর যা কিছ্‌ দরকার। আর আমি যা দেবো, তাতো দেবোই। তোকেও সঙ্গে যেতে হবে।

ও বলল, ধ্যেৎ! আমি যাবো না। কী করতে যাবো আমি?

না-গেলে আমি মেয়েদের জিনিস কিনব কী করে? আমি কি এর আগে বিয়ে করেছি?

ও আবার বলল, ধ্যেৎ? তারপর বলল, আনতে হবে না কিছ্‌ই। একটা নতুন শাড়ি হলেই হবে। বিয়ের দিন পরবো।

পাগ্‌লি! তোর কি গোদা শেঠের দোকানের মাল সাফাই করা গরীব মজ্‌রের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে? তোর বর যে বেজায় বড়লোক! তবে যে বর গোদা তোর জন্যে ঠিক করে রেখেছিল, সে কিন্তু দেখতে ভালোই ছিল। এখনও বল্‌ ইচ্ছে করলে তাকেও বিয়ে করতে পারিস।

ভালো হচ্ছে না কিন্তু।

ওর মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে এসে বলল, এখনও তো বিয়ে হয় নি। একসঙ্গে শহরে গেলে বস্তির নানা লোকে নানা কথা বলবে। তাছাড়া, ওরা গরীব লোক। যেমন করে এখানের আর সকলের বিয়ে হয়; তেমনি করে হলেই খ্‌শী হবে ওরা। তিত্‌লির কিছ্‌ই চাই না।

তা বললে কী হয়? আমার পাঁচটা নয়, দশটা নয়, একটা মাত্র বউ, তাকে কিছ্‌ই না দিয়ে, না সাজিয়ে-গ্‌জিয়ে বিয়ে করি কী করে?

আমি জানি না; তোমার যা খ্‌শী তাই-ই করো মালিক।

তুই কি চিরদিনই মালিক বলবি?

তিতলি মাথা নুইয়ে বলল, হ্যাঁ।

গলা নামিয়ে লজ্জামাখা গলায় বলল, তুমিই তো আমার আসল মালিক। তোমাকে মালিক বলব না, তো কাকে বলব?

তিতলি না গেলেও আমাকে যেতেই হবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে হবে। বাজারও করতে হবে। তাই কালই যাবো ঠিক করলাম। ওকে বললাম, একটা দিন সাবধানে থাকিস। মা বেটিতে। আমি না হয় লগনকে থাকতে বলব তোদের সঙ্গে। অথবা পরেশনাথকে।

আহা! আমি আর মা একা একা অত দূরের ঐ জঙ্গলের গভীরের বাড়িতে থাকি নি দিনের পর দিন, বাবা চলে যাওয়ার পরও? তোমার এখানে তো সেদিনই এলাম আমরা। তোমার ভাবনা নেই কোনো। তবে, পারলে দিনেদিনেই চলে এসো।

তাই-ই তো আসতাম। কিন্তু শোন্‌চিতোয়া? বাস থেকে নেমে তো হাঁটতে হবে এতটা। রাত হয়ে যাবে যে।

ওরে বাব্বা। ভুলেই গেছিলাম। না না, পরদিন সকালের বাসেই এসো তুমি। রাতে এসে একদম দরকার নেই।

পরেশনাথ আর বুলকি কোথা থেকে হুড়োহুড়ি করে, চিঠ্‌ঠি হ্যায়, চিঠ্‌ঠি হ্যায় করতে করতে এসে উঠোনে ঢুকলো।

তিতলি ওদের গলার আওয়াজ শুনে দৌড়ে এল বাইরে।

বলল, কী রে? তোদের যে পাত্তাই নেই অনেকদিন?

আমরা দুলহান্ দেখতে এলাম। আর ক'দিন বাকি গো তিতলি দিদি?

চুপ্। ফাজিল। তিতলি বলল। কী খাবি বল্ তোরা?

দুজনেই সমস্বরে বলল, শেওই-ভাজা।

দু ভাইবোনেই শেওই-ভাজ আর প্যাঁড়ার যম। খুব ভালোবাসে খেতে। তাই যখন চিপাদোহর কি ডালটনগঞ্জ যাই, এনে রেখে দিই। গরমের দিন প্যাঁড়া থাকে না। নষ্ট হয়ে যায়। তিতলি প্লেটে করে ওদের শেওই-ভাজা এনে দিল। বারান্দাতে বসে তিতলির সঙ্গে হাসি-গল্প করতে করতে খাচ্ছিল ওরা। বুলকির হঠাৎ মনে পড়ায় বলল, এই চিঠিটা দিল আমাকে টিহুল চাচা। চিঠিটা হাতে নিয়ে দেখলাম। খামের ওপরের হাতের লেখা সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমাকে লেখার লোকও আজ আর কেউ নেই-ই বলতে গেলে। ছোটমামা ও ছোটমামী লিখতেন মাঝে মধ্যে, তিতলির কারণে সে পাটও চুকে গেছে। খামটা খুলেই দেখলাম দার্জিলিং-এর ঠিকানা।

দার্জিলিং? আমার পরিচিত কেউই দার্জিলিং-এ থাকে না। তাড়াতাড়ি চিঠির শেষে চলে গেলাম। চমকে উঠলাম খামটি দেখে, সুন্দর মেয়েলী হস্তাক্ষর; শেষে লেখা আছে আপনার স্ত্রী ও আপনাকে নমস্কার, শুভেচ্ছাও অনেক অভিনন্দন জানিয়ে এ চিঠি শেষ করছি—ইতি জিন্।

জিন্?

তিতলি, বুলকি, পরেশনাথ হাসাহাসি করছিল, উঁচু স্বরে কথা বলছিল, আমার কানে সব শব্দ মরে গেল। তাড়াতাড়ি প্রথম পাতায় ফিরে গেলাম।

দার্জিলিং
২৫।৫

প্রীতিভাজনেষু,

আপনি এ চিঠি পেয়ে যতখানি না অবাক হবেন, এ চিঠি লিখতে বসে আমিও

তার চেয়ে কম অবাক হই নি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, খুব ভালো লাগছে চিঠিটা শুরু করতে পেরে।

আপনার মনে আমার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহভাবে যে ভুল ধারণাটি আজ পর্যন্ত রয়ে গেছে তা একদিন ভেঙে দেব বলে ঠিক করেই রেখেছিলাম। আজ তা ভাঙতে পেরে আনন্দিত বোধ করছি! তিতলিকে আপনি বিয়ে করছেন এ খবর আমি বৌদি ও দাদার কাছ থেকে পাই গতকাল তাঁদের লেখা চিঠিতে। তবেব এ ব্যাপারে কী প্রতিক্রিয়া, সে খবরে আপনার অথবা আমার কারোই কোনো প্রয়োজন নেই। দামী তো নয়ই। এখন আমি ঘোরতর গৃহিণী। ভীষণরকম বিবাহিতা।

আমার স্বামী দেখতে আপনার চেয়ে অনেক খারাপ। হয়ত আরও অনেক ব্যাপারে আপনার চেয়ে নিকৃষ্ট। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগে চাকরি করেন। আমার বন-জঙ্গলের প্রতি প্রেম চিরদিনই খুব গভীর। যদিও আমার বৌদির মতো তার বহিঃ-প্রকাশ কখনোই ছিলো না। এক একজন মানুষ, এক-এক রকম হন। বিশেষ করে অনুভূতি এবং তার প্রকাশের ব্যাপারে। এত কথা বলছি এই জন্যেই যে, আপনাকে আমি হেনস্থা বা অপমান করতে ভালুমারে যাই নি যে, এ কথাটা আজ অন্তত আপনার বিশ্বাস করতেই হবে। না যদি করেন, তাহলে আমি নিজের কাছে অপরাধীই থেকে যাব আজীবন। ঠিক যে-সময়টিতে আমরা ভালুমারে আপনার ডেরায় গিয়ে পৌঁছই তখন আপনি বাড়ি ছিলেন না। আপনারই বিছানাতে শুয়ে, গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে জীপের ঝাঁকুনির অনভ্যস্ত ধকল পুষিয়ে নিচ্ছিলাম। এমন সময় আপনি এলেন। আপনার গলার স্বর শুনে আমার মনে হল, ঠিক এমনই গলার স্বরের কারো জন্যে আমার এত-দিনের অপেক্ষা ছিল। সত্যি বলতে কি, আমি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম শুধু আপনার কণ্ঠস্বর শুনেই যে হঠাৎ বাইরে আসতে আড়ষ্টবোধ করছিলাম। বাইরে যখন এলাম, তখন আপনার চেহারাও আমার ছোটবেলা থেকে কল্পনা করা স্বামীর চেহারার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। আজও স্পষ্ট মনে আছে...ধূলি ধূসরিত আপনার পা। পাজামা আর সবুজ-রঙা খদ্দরের পাঞ্জাবি গায়ে। পাঞ্জাবিতে তিনটের জায়গায় দুটো বোতাম লাগানো ছিল। তাও একটি চন্দনের। অন্যটি প্লাসটিকের। এক নজরেই ভোলাভালা অথচ, বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটিকে ভালো লেগে গেছিল আমার। আজ আপনাকে বলতে কুণ্ঠা নেই, লজ্জারও কোনো কারণ দেখি না যে, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হলে তখন আমার মতো খুশী আর কেউই হতো না।

চিঠিটা এই অবধি পড়ে আপনার সন্দেহ নিশ্চয়ই দৃঢ়তর হচ্ছে যে, আমার মাথার গোলমাল আছে।

মাথা আমার অত্যন্ত সুস্থ এবং বুদ্ধি অনেকের চেয়েই তীক্ষ্ণ। এইবার বলি, কেন আমি আপনার সঙ্গে অমন ঠান্ডা ব্যবহার এবং হয়ত কিঞ্চিৎ অভদ্রতাও করেছিলাম। না, অভদ্র বলব না। কারণ অভদ্রতা আমার ক্ষমতার বাইরে। বরং বলব, দুর্বোধ্য। ঠিক কি না? অমন ব্যবহার করেছিলাম শুধুমাত্র এই কারণেই যে ওখানে পৌঁছনোর এক-ঘণ্টার মধ্যেই তিতলিকে আমি আবিষ্কার করেছিলাম। তিতলির মধ্যে আমি এমন কিছু দেখেছিলাম, যাতে আমার বুঝতে একটুও ভুল হয় নি, যে ও আপনাকে ভীষণ ভালোবাসে। অথচ এও বুঝেছিলাম যে, আপনি সে-ভালোবাসা সম্বন্ধে অবগত বা অবহিত নন। আপনি জানতেন না, তিতলির চোখ থাকত সবসময় আপনার ওপরে, ওর সমস্ত অস্তিত্ব আবর্তিত হতো আপনাকেই ঘিরে। সে কারণে, প্রথম রাত কাটানোর পর, পরদিন ভোরেই আমি মনস্থির করে ফেলি।

তিতলি আমার প্রতিপক্ষ হিসাবে অতি সহজেই হেরে যেত, হয়ত সব দিক দিয়েই।

কিন্তু আমি এও বুঝেছিলাম যে, আমার হয়ত আপনাকে না হলেও চলে যাবে, কিন্তু আপনি নইলে তিতলি অচল। ওর কাছে এটা জীবনমরণের প্রশ্ন ছিল। অন্য একটা দিকও ভেবেছিলাম। তিতলি আপনাকে যে ধরনের গভীর, একতরফা ভালোবাসা বাসে বলে আমার মনে হয়েছিল, তাতে আপনাকে আমার বিয়ে করার পর ওর পক্ষে আত্মহত্যা করা অথবা আমাকে বিষ খাইয়ে বা অন্যভাবে মেরে ফেলাও আশ্চর্য ছিল না। মেয়েরা ভালোবেসে করতে না-পারে, এমন কিছুই নেই। এই পারা না-পারার ক্ষমতা সম্বন্ধে আপনারা চিরদিনই অজ্ঞ। তাছাড়া, ভেবেছিলাম ; গভীর বনের বাসিন্দা আপনি। বন্যকেই পছন্দ করবেন বেশী। তিতলির ভালোবাসা যদি কখনও আপনার গোচরে আসত, যেমন এখন এসেছে ; তখন আমাকে নিয়ে আপনি বিপদে পড়তেন। এবং আমিও, আপনাকে নিয়ে। সত্যিকারের ভালোবাসা অত সহজে ফেরানো যায় না ; ফেলেও দেওয়া যায় না। সে ভালোবাসা প্রাক্‌বিবাহিত জীবনেরই হোক কী বিবাহোত্তর জীবনেরই হোক। ভালোবাসা, সে যারই ভালোবাসা হোক না কেন হৃদয়ের যত গভীর থেকে তা ওঠে, ভালোবাসার জনের হৃদয়ের ঠিক ততখানি গভীরে গিয়েই তা পৌঁছয়। ব্যতিক্রম যে নেই, তা বলব না। কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটাতে একপক্ষকে অশেষ জোরের সঙ্গে নিজেকে গুটিয়ে নিতে হয়। তাতেও কষ্ট কম নয়। কেউ কাউকে খুবই ভালোবাসে জেনেও, তাকে ভালো-না-বাসা অত্যন্ত নিষ্ঠুরের পক্ষেই সম্ভব। কেউ কেউ নিষ্ঠুর হয়। হতে পারে। সবাই পারে না। হতে পারলেও কষ্ট ; না-হতে পারলেও কষ্ট।

আপনি হয়ত ভাবছেন, যে-মেয়ে আপনার সঙ্গে এতখানি খারাপ ব্যবহার করে অপমান করে চলে গেছিল একদিন সে হঠাৎ এতদিন পর ভালোবাসার ওপর থিসিস্‌ লিখে আপনাকেই বা পাঠাতে গেল কেন? কারণ কোনোই নেই। চিঠি লিখতে বসে কথা প্রসঙ্গে কথা এসে গেল তাইই......। তিতলিকে আমার কথা বলবেন। আমার মনে আছে ও আমাকে জিন্‌ দিদি বলে ডাকত। জঙ্গলে-পাহাড়ে জিন্‌-পরীরাও থাকে। কোনো সন্দেহ নেই আমার এবং সেদিনও ছিলো না যে তিতলি আমাকে সেই জিন্‌ বলেই জানত। মেয়েরা যা দেখে, যা বোঝে ; যা হৃদয় দিয়ে অনুভব করে তা আপনাদের সমস্ত বুদ্ধি জড়ো করেও আপনারা কখনও বুঝতে পারবেন না। সেইরকম কোনো পুরোপুরি মেয়েলীবোধ ভর করেই আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আজ এতদিন পর তা যে নির্ভুল তা জেনে স্বাভাবিক কারণেই খুবই ভালো লাগছে। নিজের বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না, অত্যন্ত নির্লজ্জের মতো হলেও। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনারা সুখী হোন।

তিতলিকে বিয়ে করার সৎ-সিদ্ধান্তে পৌঁছে, আপনি মানুষ হিসেবেও যে কত-খানি খাঁটি, তা প্রমাণ করেছেন। আপনাকে সেই স্বল্প দেখাতেও চিনতে আমার ভুল হয় নি। এ কারণেও আমি স্বভাবতই গর্বিত।

আমরা একটি ছোট্ট বাংলোতে থাকি। চারধারে কনিফারাস্‌ বন। চমৎকার পরি-বেশ। এক্‌সট্রা বেডরুমও আছে। আপনি যদি সস্ত্রীক আমাদের এখানে কখনও বেড়াতে আসেন তাহলে খুব খুশী হব। হানিমুনেও আসতে পারেন। তিতলিও জানবে যে, তার জিন্‌দিদি তার মঙ্গলই চেয়েছিল। এবং এই জিন্‌, সেই জিন্‌ নয়। আমরা খুব সম্ভব আরো বছর দুই এখানে থাকব। আমার স্বামীর তার আগে ট্রান্সফার হবার সম্ভাবনা নেই। যে-কোনো সময়েই আসার নেমন্তন্ন রইল। একটি পোস্টকার্ড ফেলে দেবেন। এসে পৌঁছবার একদিন আগে পেলেই হল। এই নিমন্ত্রণে, আন্তরিকতার কোনো অভাব আছে বলে ভুলেও ভাববেন না। আমি এরকমই, অন্তরে যা থাকে, কখনই তাকে ঠিকমত বাইরে আনতে পারি না। তাই হয়ত যে ভাবে ইনিয়ে-বিনিয়ে

লেখা উচিত ছিল সে-ভাবে লেখা হয়ে উঠলো না। আপনার স্ত্রী ও আপনাকে নমস্কার, শুভেচ্ছা ও অনেক অভিনন্দন জানিয়ে এ চিঠি শেষ করছি—

ইতি
শুভার্থী জিন্

চিঠিটা পড়া শেষ করে তিত্লিকে ডাকলাম। ততক্ষণে বুল্কি আর পরেশনাথ চলে গেছিল। তিত্লি দৌড়ে এল। বললাম, সেই জিন্দিদিকে মনে আছে? জিন্-দিদিই চিঠি লিখেছে। আমাকে বিয়ে করতে চায়!

ভালোই তো! তিত্লি ঢোঁক গিয়ে বলল। মুখ কালো হয়ে গেল একেবারে। কিন্তু বলল খুবই ভালো কথা। কী সুন্দর দিদি! তোমার যোগ্য বউ তো সেই-ই। বলতে বলতে তিত্লির গলা প্রায় ধরে এলো।

বললাম, তা ত হল। এখন কী করি বলত? তোকেও কথা দিয়ে ফেলেছি। এদিকে বিয়ের বন্দোবস্তও পাকা। কী যে ঝামেলা বাবা!

মালিকের সঙ্গে আবার নোক্রানির বিয়ে হয় কখনও। বিয়ের কথাতেই এতরকম বাধা, পাগলা সাহেব, তোমার কোম্পানীর সব বাবুরা সকলেই তোমাকে ছাড়ল। আমার জন্যে এত হয়রান করবেই বা কেন তুমি নিজেকে? এ বিয়ে কি হতে পারে? আমি জানতাম। তোমাকে তো প্রথম থেকেই বলছি......

এবারে তিত্লির দু চোখ জলে ভরে এলো।

বললাম, নাঃ! তাকে লিখে দেবো যে তার চেয়ে আমার তোকেই অনেক বেশী পছন্দ। আমাকে তোর জিন্দিদির পছন্দ হলেই যে, আমারও তাকে পছন্দ হবে এমন কথা কিছু আছে?

তিত্লি মুখ নামিয়ে নিচু গলায় বলল, তাকে তো তোমার পছন্দ ছিল তখন। খুব পছন্দ ছিল।

কখ্খোনো না। আমার চিরদিন তোকেই পছন্দ। এখনও তোকে। তোকে যে আমি খুব ভালো বাসিরে তিত্লি। তুই কি কিছুই বুঝতে পারিস না? কখনও পারিস নি? ভীষণ বোকা মেয়ে তুই।

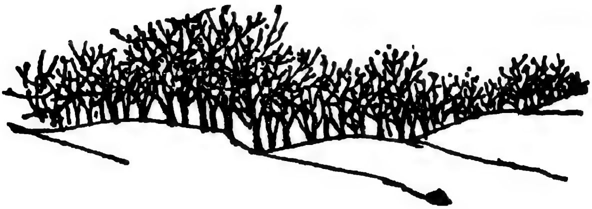
তিত্লির গলা দিয়ে ফোঁপানির মতো একটা আওয়াজ বেরিয়ে থেমে গেল। দু চোখের জলের ধারা নামল। তিত্লি ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মনে মনে, চলে-যাওয়া তিত্লিকে বললাম, এখন তোকে যত কাঁদাচ্ছি, বিয়েটা হয়ে যাক, আদরে আদরে তোর সব কান্নাকে মুক্তো করে তুলব। দেখিস্ তখন। আমার পাগলী, মিষ্টি, সোনা বউ।

খামটা থেকে আরও একটা ছোট্ট চিঠি বেরিয়ে মাটিতে পড়ল। চিরকুটেরই মতো। ডিয়ার স্যার,

আমার স্ত্রীর নিকট আপনার কথা এতই শুনিয়াছি যে, আপনাকে না-চিনিয়াও চিনি। আমাদের এখানে আপনার নিমন্ত্রণ রহিল। সস্ত্রীক আসিলে অত্যন্ত খুশী হইব। পত্রের সহিত একশত টাকাও পাঠাইলাম। মিসেস্ মুখার্জীকে একটি শাড়ি কিনিয়া দিলে আমরা দুজনেই ভেরী প্লিসড্ হইব।

থ্যাংক ইউ। ইওরস্ ফেইথফুলি,
বি. ব্যানার্জী



গোরীকে নেওয়ার পর শোন্‌চিতোয়াটার আর কোনো খবর নেই মাসখানেক। হয়তো দূরের অন্য কোনো বস্তিতে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। লাতেহার আর কুরুর মাঝামাঝি টোড়ি বস্তিতে জোর এন্‌কেফেলাইটিস্‌ শুরু হয়েছে শোনা যাচ্ছে। লোক মরছে প্লেগের মতো। রীতিমত মড়ক। কাক-উড়ান্‌-এ গেলে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে এসব অঞ্চল ভালুমার থেকে একেবারেই দূরে নয়। চিতার ত' মাত্র এক দেড়-দিনের পথ। হয়তো সেখানেই পোঁছে ডোমদের কাজে সাহায্য করছে। গিয়ে থাকলেই ভাল। এখন ভালুমার বস্তিতে শান্তি। লোকে একটু একটু সাহসীও হয়ে উঠেছে।

এইটেই ভয়ের কথা। যতক্ষণ না চিতাটা মারা পড়েছে বলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ এক মুহূর্তের জন্যেও অসাবধান হবার উপায় নেই এ তল্লাটের কোনো গ্রামেই। হলেই অসাবধানতার মূল্য দিতে হবে জীবন দিয়ে। এখানে অনেকদিন লোক নেয় নি বলেই আমার কেমন গা ছম্‌ছম্‌ করে। কেবলই মনে হয়, কারো দিন ঘনিয়ে এসেছে। কার?

বর্ষা নেমে গেছে বলেই যেদিন বর্ষা থাকে না, সেদিন বড় গুমোট থাকে ঘরে। নতুন বউ নিরাবরণ শরীরে পাশে শুয়ে থাকলে স্বাভাবিক কারণে গরম আরও বেশী লাগে। মাঝে মাঝে তিতলি বলে, দরজা খুলে চলো গিয়ে বাইরে বারান্দাতে বসি। চলো, জঙ্গলের পথে জ্যোৎস্নায় হাত-ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াই। ময়ূর উড়াই, তিতির বটের; আসকল্‌দে ভয় পাওয়াই। আমার সাহস হয় না। নিজের জন্যে নয় তিতলির জন্যে। তিতলির কারণেও নিজের জন্যে। আমার কিছু হলে, মেয়েটা ভেসে যাবে চিরদিনের জন্যে। বিয়ের পর একটা জিনিস লক্ষ করে চমকিত হচ্ছি। যে-তিতলিকে আমি এত বছর এত কাছ থেকে দেখেছি, তাকে শারীরিকভাবে জেনে, তার সঙ্গে মিলিত হয়ে, এক মুহূর্তেই যেন একেবারে কাছে চলে এসেছি। বিয়ের আগের জানা, আর এই জানাতে কত তফাত। তার বাম ঊরুর ঠিক মধ্যিখানের কালো তিলটি, তলপেটের হালকা-নীল জন্ম-দাগ, ডান স্তনের বাঁদিকে লাল-রঙা একগুচ্ছ তিল। সবশুদ্ধ ছ'টি। গুনেছিলাম একদিন। এসব যে মুখস্থ হয়ে গেছে শুধু তাই-ই নয়, কেবলই যেন মনে হচ্ছে, ওর আর আমার মধ্যে আড়ালের কিছুমাত্র নেই; পৃথকীকরণের উপায় পর্যন্ত নেই। আমরা অঙ্গাঙ্গীভাবে এক। মনে এবং শরীরে।

তিতলিকে অনেক আদর করার পর, তিতলি যখন পরম পুলকের শ্রান্তিতে, নিরাপত্তার আনন্দে, ওর এককালীন অনিশ্চিতিতে ভরা শ্লথ, গন্তব্য-হীন জীবনের নদীর ঘাটে চিরদিনের মতো নিরুপদ্রব নিশ্চিন্তিতে বাঁধা-থাকার গভীর আশ্বাসে ওর মুখের উপর একটা হাত ভাঁজ করে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমোয়, জানালা দিয়ে দুধলি চাঁদের আলো এসে যখন ওর স্তনের বৃন্তে পড়ে তাকে কনকচাঁপা করে তোলে যখন আলো ও কালোর আঙুলে বুলোয় জানালার কাছের বোগোনভিলিয়া লতার দোলায়মান ছায়াটা, তখন অন্ধকার ঘরে ওর অলক্ষ্যে ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার বুকের মধ্যে বড়

কষ্ট হয়। তখন এক গভীর ভয়ের অন্ধকার সুগন্ধি স্নিগ্ধ চাঁদের আলোকে ঢেকে ফেলে। হুতোম পেঁচা বুকের মধ্যে চমক তুলে দুরগুম্ দুরগুম্ দুরগুম্ করে ডেকে ওঠে হঠাৎ। মনে হয়, এই-ই কি শেষ? এই-ই কি সব? তিতলি আর আমার সম্পর্কটা এখানেই কি এসে থেমে যাবে? সব দাম্পত্যসম্পর্ক কি এমনি করেই শেষ হয়? এর চেয়েও গভীরতর, আরো অনেক বেশি অর্থবাহী, ব্যাপ্তিসম্পন্ন; এর চেয়েও মূল্যবান এবং তীব্র অন্য কোনো বোধ কি আসবে না?

বাথরুমে যেতে যেতে শুনতে পাই বাইরে উঠোনে মাঝরাতের তক্ষক কথা কয়। উদাস হাওয়ায় বলে ঠিক, ঠিক, ঠিক। আমি যেন বুঝতে পাই যে, বিবাহিত জীবনের এইটেই প্রথম অধ্যায়। তবুও অবুঝ মন অস্ফুটে বলে ওঠে, এমন সুখ জীবনে আর কী-ই বা থাকতে পারে?

তিতলি গর্ভবতী হবার পরই কেবলমাত্র আমি অবচেতনে বুঝতে পারি, টুসিয়ার হারিয়ে যাওয়ায় তার বাবা জুগনু ওরাও-এর দুঃখের প্রকৃত গভীরতা। হীরুর ফাঁসি হওয়ার আশঙ্কায় যে ছায়া নামে জুগনু চাচার চোখের দৃষ্টিতে, তেমন ছায়া শ্রাবণের কালো উড়াল মেঘের আকাশও হুলুক্ পাহাড়কে দেয় নি কখনও। এমনই সজল, এমনই শান্ত, গভীর বিষাদমগ্ন সে ছায়া। এখন যেন একটু একটু করে বুঝতে পারি, মানিয়া, আর মুঞ্জুরী যখন খেতে কাজ-করা বুলকি আর পরেশনাথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, তখন তাদের সেই অনিমেষ দৃষ্টির তাৎপর্য।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে তিতলিকে ডান বাহু দিয়ে জড়িয়ে শুয়ে থাকি। ও পাশ ফিরে আমার বুকের মধ্যে মুখ গোঁজে। মেয়েরা যতই উইমেনস্ লিব্ নিয়ে বিশ্বময় চেঁচামেচি করুক না কেন, বিধাতা কোথায় যেন পুরুষ-নির্ভর করে রেখেছেন প্রত্যেক নারীকে। নারীকে গ্রহীতা করে রেখেছেন, দাতা করেন নি। পরিপূর্ণতা দেন নি, পুরুষের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া। তাই-ই বোধ হয় তিতলির আমার বুকে মুখ রেখে শুয়ে থাকার শান্ত ভঙ্গিটির মধ্যে এমন এক নির্ভরতা, শান্তি ও নিশ্চিন্তি প্রতীয়মান হয় যে, আমার মনে হয়, এই বোধ ওকে অশেষ বিদ্যা, অঢেল টাকা, অথবা বিপুল ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং অন্য কোনো কিছুই কখনোই হয়তো দিতে পারত না।

সেদিন ভোরবেলাতে ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি নামল। এখানে যখন বৃষ্টি আসে তখন তার কিছুক্ষণ আগে থেকে দূরাগত একস্‌প্রেস ট্রেনের মতো শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। বন-পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে দুরন্ত হওয়ার সঙ্গে দ্রুতগামী বৃষ্টি এগিয়ে আসতে থাকে। রোদ ঢেকে যায় মেঘে, মেঘ ঢেকে যায় বৃষ্টির রুপোলী চাদরে। দূরে থেকে ময়ূর-ময়ূরী কেঁয়া, কেঁয়া, কেঁয়া রবে এই বনের স্নিগ্ধ, মুগ্ধ মর্মবাণী ছড়িয়ে দেয় তাদের হৃদয়-মথিত শব্দে। জঙ্গলে কোথাও কোথাও বুনো চাঁপা আর কেয়া ফোটে। দমক্ দমক্ হাওয়ায় হা-হা করে তাদের গন্ধ ছুটে আসে। ফুলেরই মতো রাশ রাশ গন্ধ ঝরে পড়ে নিঃশব্দে অলক্ষ্যে।

একটা জিপের শব্দ পেলাম। জিপের শব্দটা আমার ডেরার সামনে এসেই থামল। দেখলাম, রোশনলালবাবু আর গজেনবাবু এসেছেন। সঙ্গে মালিকের সেই দুই মোসাহেব। ওঁরা একটা ছোট্ট বাকস্‌মত কী বয়ে আনলেন।

অবাক হয়ে বললাম, কি ব্যাপার? আপনারা?

রোশনলালবাবু বললেন, আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

কিসের ক্ষমা?

ক্ষমা করবেন ত? আগে বলুন।

হেসেই বললাম, না শুনেই, বলি কী করে?

তিতলিকে ডেকে বললাম, ওঁদের কিছু খেতে দিতে, চা করতে।

তিতলি চায়ের বন্দোবস্ত করতে লাগল।

রোশনলালবাবু বললেন, নান্‌কু ত ফেরার। শুনেছেন ত? তার ওপরে তিন তিনটে খুনের মামলা ঝুলছে।

শুনেছি। একটা খুনও যদিও সে করে নি।

তা আমি জানি না। উনি বললেন। আমি ত আপনার বিয়েতে আসতে পারি নি। পাটনাতে ছিলাম।

জানি—তাতে কি হয়েছে?

ভাবছিলাম, পাটনাতে কী দেড়মাসই ছিলেন? আসেন নি ত আসেন নি!—এত বাহানা, একসকিউজ কিসের? আমি ত এক্‌স্‌প্লানেশান্‌ চাই নি ওঁর কাছে!

আপনার স্ত্রীর জন্যে একটা প্রেজেন্ট এনেছি। আর আপনি নতুন জীবন আরম্ভ করছেন, স্বাধীন জীবন, সে জন্যে সামান্য কিছু টাকাও। আপনি আমার জন্যে অনেকেই করেছেন। আমাদের ত' প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি কিছুই নেই। এই পাঁচ হাজার টাকা আপনি রাখুন। আর এই সোনার হারটি আপনার স্ত্রীর জন্যে।

গজেনবাবু ভিতরে গেলেন তিতলির কাছে। গজেনবাবুরা কিন্তু সকলেই বিয়েতে এসেছিলেন একসঙ্গে। ট্রাকে করে, পুরো দল। মায় লাল্‌টু পাণ্ডে পর্যন্ত। লাল্‌টু সেদিন অনেক শায়ের শুনিয়েছিলো। নিতাইবাবু আর গণেশমাস্টার মহুয়া খেয়ে একেবারে আউট। সবচেয়ে মজা করেছিলেন গজেনবাবু। খুব নেশা করে এসে তিতলির পা জড়িয়ে ধরে, নমস্কার বৌদি বলে একেবারে মাটিতে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। তিতলির পাও ছাড়েন না, ওঠেনও না। শেষকালে, তাকে ওঠাতে না পেরে তিতলিকেই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

বস্তির লোকেরা সারারাত হাঁড়িয়া খেয়ে গেয়েছিল আর নেচেছিল। চার-চারটে বড়্‌কা শুয়োর শেষ। ভাত লেগেছিল দু মণ চালের। সে রাতে যে হল্লাগুল্লা হয়েছিল তাতেই বোধহয় শোন্‌চিতোয়া এ বস্তি ছেড়ে ভাগল্‌বা। আসলে, তিতলিকে আমি বিয়ে করবার সাহস রাখি কি রাখি না এই নিয়ে ওঁদের ওয়ান ইজ-টু ফোর বাজী লেগেছিল। গজেনবাবু, বৃষ্টি হবে কি হবে না, ট্রাকের টায়ার ফাটবে কি ফাটবে না, এসব নিয়েও আকছার বাজী ধরে ফেলতেন। আমাকে তাতিয়ে দিয়ে কোনোক্রমে বিয়েটা করাতে পারলে, বড় লাভ ছিল গজেনবাবুর। ওদের মধ্যে চুক্তি এই হয়েছিল যে, ঐ বাজীর টাকা দিয়ে বিরাট ফিস্টি হবে মীর্‌চাইয়া ফল্‌সে। গজেনবাবুর আসার উদ্দেশ্য, আমাদের সেই ফিস্টিতে নেমন্তন্ন করতে। আমার সহকর্মীরা খারাপ মানুষ নন কেউই, কেবল সামান্য গোলমেলে। তবু, তিতলিকে সচ্চরিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শান্ত-স্বভাবের মেয়ে হিসেবে এদেরই সকলেরই পছন্দ ছিল। তবে এদের মধ্যে গণেশ মাস্টার যে একদিন আমার অনুপস্থিতিতে এসে পাঁচটাকার নোট দেখিয়ে তিতলিকে কুপ্রস্তাব দিয়েছিল, এ কথাটা তিতলি বিয়ের পর হাসতে হাসতে আমাকে একদিন বলে দিয়েছিল। বেচারী গণেশ! বহুদিন লজ্জায় এদিকে আর আসবে না।

আমার মালিক কিন্তু এসেছিলেন সম্পূর্ণ অন্য ধান্দাতে। এ কথা সে কথার পর বললেন নান্‌কু নেই। আপনিই ত এখন ভাস্‌মুরেরর লিডার। সকলেই বলে। আপনার কথাতেই এখানকার এবং আশপাশের গাঁয়ের সকলে ওঠে-বসে। আপনি ওদের একটু-বুঝিয়ে-শুনিয়ে পুরোনো রেটেই কাজ করতে বলুন না। রোহ্‌টাস্‌ ইন্ডাস্ট্রিজ-এর গুদামের সামনে কুলিরা বসে রয়েছে। অন্য কোম্পানীগুলোরও তাই-ই হাল হবে। সব কাজ-কারবারই বন্ধ। পুরোনো রেট্‌-এর ওপর, চার চার আনা করে দিনে বাড়িয়ে দিন

কুলিদের। আর রেজাদের দশ পয়সা করে। সত্যিই এদের বড় পোভার্টি। এ পোভার্টি চোখে দেখা যায় না।

বললাম, আমি নেতা-ফেতা কিছুই নই। আপনি বাজে কথা শুনেছেন। এখানেই কিছু লোক ইচ্ছে করে এসব রটাচ্ছে। বোধহয় আমার ঘাড়েও কিছু কিছু মিথ্যে মামলা চাপিয়ে দিয়ে যাতে সহজে জেলে পুরতে পারে সেই জন্যে।

রোশনলালবাবু বললেন, সে কী কথা। আমি কি নেই? মরে গেছি? আপনাকে জেলে পুরলেই হল?

আপনার সঙ্গে যতক্ষণ মতে মিলছে, ততক্ষণ পারবে না। মতে না-মিললে আপনিই পুরিয়ে দেবেন। জেল আর খোঁয়াড়ে তফাত কী? পুরে দিলেই ত হল!

রোশনলালবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। হাসি হাসি মুখে।

বললাম, ওরা কত বাড়াতে বলছে?

একটাকা কুলিদের। আটআনা কামীনদের।

খুব বেশী বলছে কি? এই বাজারে?

তা নয়। তবে, আপনি ত জানেন, আমার সব সেন্টার মিলিয়ে উইক্‌লি পেমেন্ট হয় দশলাখ টাকা। সেই অঙ্কটা কতখানি বাড়বে বলুন। ব্যবসা চালানোই ত মুশকিল হবে।

তারপর একটু থেমে বললেন, আমার উইক্‌লি পেমেন্ট-এ যে টাকা বাঁচবে আপনার লিডারগিরিতে তার পাঁচ পার্সেন্ট, পার-উইক আপনার। আমার লোক এসে পেঁছে দিয়ে যাবে হর্-হপ্তায়। সোজা হিসাব। আপনার কিছুই করতে হবে না। বসে খান। একটা ভাল মোকাম্ বানান। জমিন নিয়ে নিন। পাওয়ার টিলার কিনুন। ডিপ্-টিউবওয়েল লাগান। চারধারে একেবারে সোনা ফলিয়ে দিন। দুলহীন্‌কে রানীর মতো করে রাখুন। নোক্‌র-নোক্‌রানি কাঁড়া-ভঁইস গাই-বয়েল। মাহাতোর থেকেও আপনি বেশী বড়লোক হয়ে যাবেন এক বছরের মধ্যে সায়নবাবু।

আমার চোখের সামনে একটা দারুণ সুন্দর ছবি ফুটে উঠল। সুন্দব দামী পোশাকে আমার ছিপছিপে বউ তিত্‌লি, পায়ে রুপোর পায়জোর পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে; পেছনে দুজন নোক্‌রানি। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে মায়ের পিছন পিছন আদিগন্ত ফসল-ফলা ক্ষেতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। মান্, জুগ্‌নু, লগন, পরেশনাথ, লোহার-চাচা রামধানীয়া চাচা, টিহুল, ছেঁড়া-জামা আর লালমাটিতে-কাচা গামছার মতো ধুতি কোমরের কাছে গুটিয়ে নিয়ে কাজ করছে আমার সামনে—। আর কথায় কথায় বলছে, হাঁ মালিক, জী মালিক। ভট্‌ভট্ শব্দ করে ডিজেল পাম্প চলছে। কুয়ো থেকে জল উঠে চারিদিকেব ক্ষেতে ক্ষেতে গড়িয়ে যাচ্ছে; নালা বেয়ে, দৌড়ে। বাড়িতেও জেনারেটর চলছে। পাখা, ফ্যান। খুব গরম হলে ডেজার্টকুলার। পাঞ্জাব হরিয়ানার বড় বড় চাষীদের মতো আমারও রব্‌রবা। একটা সাদারঙা এয়ারকন্ডিশানড্ গাড়ি—। আমার মালিকেরই মতো। কালো কাচ বসানো।

পরক্ষণেই স্বপ্ন ভেঙে গেল।

রোশনলালবাবু বললেন, কী ঠিক করলেন?

বললাম, আপনি ভুল শুনেছেন। নেতা-ফেতা আমি নই। আমি কেউই নই। তবে কাজ বন্ধ হয়ে থাকলে আপনার আর কতটুকু অসুবিধা। অসুবিধা ত ওদেরই। যারা দিন আনে দিন খায় তাদের।

সেকথা ওরা বুঝছে কোথায়? ওই নান্‌কু হারামজাদাই সব বরবাদ করে দিল। বর্-বাদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেশটা প্রতিদিন।

চুপ করে রইলাম। ভাবছিলাম, নানকুও সেদিন ঠিক এই কথাই বলেছিল।

রোশনলালবাবু বললেন, আপনার হিস্তার টাকাটা কত হবে সেই কথা ভাবছেন কি? তা, কম করে দু হাজার থেকে পাঁচ হাজার। সব আপনারই ওপর। পাঁচে যদি রাজী না থাকেন, ত দশ হাজার করুন। শুক্‌রা দশ।

কথা ঘুরিয়ে বললাম, এই শোন্‌চিতোয়াটাকে ম্যান-ইটার ডিক্লেয়ার করছে না কেন? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট?

খাচ্ছে ত এই জংলীগুলোকেই! পপুলেশান্ প্রব্‌লেম সলভ্ হচ্ছে। আমাকে খেতো, আপনাকে খেতো, দেখতেন সঙ্গে সঙ্গে পারমিট বেরোত। এ শালারা বেঁচে থাকলেই বা কী, মরে গেলেই বা কী? চালু ত আছে দেশে একটাই ইন্ডাস্ট্রি। বাচ্চা পয়দা করার ইন্ডাস্ট্রি। কী বলেন?

তারপর বললেন, আপনি যদি আমার কথায় রাজী থাকেন, তা হলে আমি সাত-দিনের মধ্যেই চিতা মারিয়ে দিচ্ছি। এই রাম-রাজত্বে কোন আইনটা কে মানছে মোশয়? আজই গিয়ে রঘুবীরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার রাইফেল দিয়ে। যিস্‌কা বাঁদ্‌রী ওহি নাচায়। রাংকা থেকে আনিয়ে নিচ্ছি ওকে। দেখবেন, শোন্‌চিতোয়া পিটা যায় গাহি যায় গা! আমার লোক যদি সকলের সামনেও মারে, তবুও দেখবেন কোনও শালার বুকের পাটা হবে না যে আমাকে কিছু বলে।

পারমিট? পারমিট ইস্যু না করলে, মারবে কেমন করে?

গুলি মারুন। বলেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমূহের গুহ্যদেশ সম্বন্ধে অত্যন্ত একটা খারাপ কথা উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন, কী করব? বলুন রঘুবীরকে পাঠিয়ে দেব?

দিন না। এর সঙ্গে আমার কাজের সম্পর্ক কি? কতলোক আশীর্বাদ করবে আপনাকে। কত বাবা-মায়ের চোখের জল যে বইছে এই গ্রামে, কত স্ত্রীর, তা বলার নয়।

উসব্ বাত ছাড়ুন। সে ত কোয়েল-ঔরঙ্গা-আমানত্ দিয়েও ভি অনেকাহি জল বইছে আমার বচ্‌পন থেকে। জল দিয়ে আমি কী করব? আমি তো ফায়ার-বীগ্রেডের এজেন্সি নিইনি।

তাহলে, কী ঠিক করলেন?

আবার উনি বললেন।

বললাম, বসুন, চা-ই খান। এত তাড়া কিসের?

একবার ভাবলামু, পাঁচ হাজার টাকাটা ফেরত দিই। এটা আসলে উনি এনেছেন ঘুষ হিসেবে। গ্র্যাচুইটি হিসেবে দিলে তো প্রত্যেককেই দিতেন। অমার বিয়ের দিন শুনলাম, লাল্‌টু পান্ডেকে ছাড়িয়ে দেবেন মালিক। পাটনা থেকে বাবুর্চি আনবেন। চিপাদোহরে এয়ারকন্ডিশনাড্ গেস্ট হাউস হবে। এয়ারকন্ডিশানড্ গাড়ি করে গেস্টরা এসে জঙ্গলে মৌজ ওড়াবে। লাল্‌টু পান্ডেকে কি উনি গ্র্যাচুয়িটি দেবেন? এক পয়সাও দেবেন না। প্রভিডেন্ট ফান্ড? তাও কারো নেই। অথচ, এতজন কর্মচারী ওঁর। সবই একা খেয়ে-ছেন। উড়িয়েছেন। লোকদের দেখিয়েছেন যে, উনি কত বড় দিল্‌দার লোক; কিন্তু নিজের কর্মচারীদের কথা ভাবার সময় হয় নি।

আপনি কি গ্র্যাচুয়িটি দেওয়া চালু করলেন? সকলকেই দিচ্ছেন? লাল্‌টুকেও দেবেন? ও চলে যাচ্ছে শুনলাম, চাকরি ছেড়ে।

মালিকের ভুরু দুটি কুঁচ্‌কে গেল। বললেন, এসব কথা বলার এক্তিয়ার আপনার

নেই। আপনি আর আমার কোম্পানীতে নেই। চাকরি তো ছেড়েই দিয়েছেন। আপনার জন্যে এনেছিলাম নিতে হলে নিন্, নইলে নেবেন না।

জবাব না দিয়ে একটু ভাবলাম। গজেনবাবু ঠিক এই সময়ই ভিতর থেকে এলেন। এসেই চোখ টিপলেন আমাকে। কেন, বুঝলাম না।

ঠিক আছে। রেখেই দিচ্ছি। গজেনবাবুর পিছন পিছনই তিতলিও ঢুকল চা ও জলখাবার নিয়ে।

রোশনলাল হেসে, তিতলির গলায় বাক্স থেকে খুলে হারটা নিজেই পরিয়ে দিলেন। সত্যি সোনার হার! প্রায় পাঁচ ভরি হবে। এখন সোনার ভরি কত টাকা করে কে জানে? যে বাঁশের কারবারী, সোনার খবর সে কখনও রাখে নি। তিতলির একটাই মাত্র সোনার গয়না ছিলো। আমার মায়ের, গলার বিছে-হার। সেই বাঙালী ডিজাইন ওর যে বিশেষ পছন্দ হয় নি তা ওর মুখ দেখেই বুঝেছিলাম। কিন্তু এই হারটিতে পাটনার নামী এক দোকানের ছাপ। বিহারী ডিজাইন। চমক্দার। খুব খুশী হল তিতলি। হাসল। হেসে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল রোশনলালবাবুকে।

আমার গা ঘিন্-ঘিন্ করতে লাগল।

রোশনালবাবু কিন্তু কিছুই খেলেন না।

বললেন, শরীর ভাল নেই।

বুঝলাম, তিতলি কাহারের মেয়ে তাই-ই খেলেন না কিছুই ওর হাতে।

মোসোয়েবরা জীপেই ছিল। তাদের ডেকে নামিয়ে গজেনবাবু চা-টা খাওয়ালেন। অন্যদের চা-টা খাওয়া হয়ে গেলে রোশনলালবাবু উঠলেন তাঁর প্রকাণ্ড ভুঁড়ি নিয়ে! বললেন, খ্যায়ের! আপনি ভাল করে আমি যা বললাম, তা ভেবে দেখুন সায়নবাবু, আর কোসীস্ করুন। কতদিন সময় চান? ভাবতে?

অন্তত মাসখানেক সময় দিন।

আমার মুখ ফস্কে, অজান্তেই কথাটা বেরিয়ে গেল। কথাটা বলেই লজ্জিত বোধ করলাম।

দুমাসও করতে পারেন। এ বছর তিরিশে জুনের ত আর দুদিন বাকি। দরভাও ঠিক হলে পরের বছর থেকে কাজ চালু হবে। তবে, আমি তাড়াতাড়ি করছি এই যে, কসট্ সম্বন্ধে না জানলে, জঙ্গল ডাকতে অসুবিধা হবে। তাছাড়া, চারধারে গণ্ডগোল শুরু হল। নানা ধরনের গোলমাল। আপনারা ত দিব্যি এই স্বর্গে বাস করেন, কত জমিতে কত গোল্দ্নি তার কোনোই হিসেব রাখেন না। শেষ-মেষ ডিজেলের ঝামেলা না হয়। কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে বলতে পারে? চলো গজেনবাবু! রোশন-লালবাবু ডাকলেন।

গজেনবাবু বললেন, অনেকদিন পর এলাম। তিতলির হাতের খাওয়ার একটু খেয়ে যাই। আমি ট্রাক ধরে, কী বাসে ফিরে যাব কাল।

রোশনলালবাবু ভুরু কুঁচকে উঠলেন হঠাৎ সন্দেহে। পরক্ষণেই বগলিত বিনয়ের হাসি হাসলেন। যত বড় বানিয়া যে, সে তত বড় বিনয়ী। বিনয় হচ্ছে বানিয়াদের সবচেয়ে খতর্নাগ অস্ত্র।

বললেন, বহত্ আচ্ছা বাত্। মজেমে রহিয়ে।

তারপর জীপে উঠতে উঠতে বললেন, মগর্ শোন্চিতোয়াকা বারে মে জারা ইয়াদ রাখিযে গা জী। উস্কো ভোজন মত্ বন্না।

রঘুবীরকে পাঠাবেন নাকি? আপনার রাইফেল দিয়ে?

খানে দিজিয়ে শালে লোগে কো। খানে দিজিয়ে জী ভয়্কর্ বিচারী জানোয়ারকো।

উওভি ত ভগাওয়ান্‌কাই প্যয়দা কিয়া হিয়া জাঁব্‌ হ্যায়?

জীপটা চলে গেল। রোশনলালবাবু, সামনের সীটে বিরাট কালো গোল একটা চরের তরমুজের মতো ভুঁড়ি নিয়ে, ভুঁড়ি ঝাঁকাতে-ঝাঁকাকে এব্‌রো-খেব্‌ড়ো পথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রোশনলালবাবুর জীপ চলে যেতেই গজেনবাবু ওরিজিনাল ফর্ম-এ ফিরে এলেন। বললেন, অব্‌ বোলিয়ে বাঁশবাবু, শাদীওয়ালা আদ্‌মী ঔর বেগ্‌র শাদীওয়ালা পহ্‌চানেকা তরীকা ক্যা হোতা হ্যায়?

আমি আর তিত্‌লি দুজনেই হেসে উঠলাম।

কিন্তু শঙ্কিতও হয়ে উঠলাম। গজেনবাবুর মুখ। কী বলতে কি বলে ফেলবেন। অটোমোটিক্‌ স্টেনগানের গুলির মতো বেরোতে আরম্ভ করলে, আর থামতেই চায় না।

ভাবছিলাম, রাতে কোথায় থাকতে দেওয়া যায় ওঁকে। ঘর তো মোটে রান্নাঘর নিয়ে তিনখানা। এখন তিনখানারই দাবীদার আছে।

উনি যেন মনের কথাটা বুঝলেন। বললেন, দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পরই আমি চলে যাব অন্য কারো বাড়ি নয়ত রথীদার কাছে।

বললাম, রথীদা যে এখানে নেই।

নেই? কোথায় গেলেন? আপনার বিয়ের দিনও তো গিয়ে কত হাতে পায়ে ধরলাম ওঁকে। তারপরই উধাও হলেন নাকি? যাই বলুন আর তাই বলুন, আপনার বিয়েতে পর্যন্ত না থেকে উনি কিন্তু খুবই অন্যায় করেছেন।

একটা বড় শ্বাস ফেলে বললাম, ওঁর ন্যায় অন্যায় ওঁর। বিয়ের পরদিন মিষ্টি নিয়ে ওঁর বাড়িতে গেছি তিত্‌লিকে নিয়ে। উনি আমার প্রণাম নিয়েছিলেন। তিত্‌লিকে প্রণাম করতে দেন নি।

একটু বলেই, আমি তিত্‌লিকে ডাকলাম।

তিত্‌লি আসতেই খুব রেগে গেলাম আমি। আমার মুখ লাল হয়ে উঠল।

গজেনবাবু আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

বললাম, তোকে রথীদার বাড়ি থেকে ফেরার পথে কী বলেছিলাম আমি?

তিত্‌লিও ভয় পেয়ে গেছিল আমার রণচণ্ডী মূর্তি দেখে।

তিত্‌লি বলল, ভুলে গেছি মালিক।

তোকে বলি নি যে, যার-তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবি না। নিজে যাকে মন থেকে গভীর ভাবে ভক্তি না করিস কখনও লোক-দেখিয়ে তেমন কারো পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবি না। বলেছিলাম, কিনা?

হ্যাঁ মালিক। তিত্‌লি খুব ভয় পেয়েছিলো!

তাহলে তুই রোশনলালবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলি কেন?

তিত্‌লি অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বাঃ উনি যে তোমার মালিক! ওঁকে প্রণাম করব না? অজীব আদমী তুমি। কোনদিন বলবে, তোমাকে আমি প্রণাম করব না?

বজেনবাবু হেসে ফেললেন।

আমি রেগেই ছিলাম তখনও। বললাম, হাসবেন না। ওকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে দিন।

তিত্‌লি উল্টে রেগে চলে গেল। বলল, কী যে হয় তোমার থেকে থেকে। মালিককে নাকি প্রণাম করলে দোষ!

আমি হতাশ হয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। বেচারী নান্‌কু। কাদের ও স্বাধীনচেতা, মাথা-উঁচু বুক টান-টান করতে চাইছে? এই হৃদয় আর সংস্কারসর্বস্ব মানুষগুলোর কাছে মস্তিষ্কের দাম যে ছিটেফোঁটা নয়। যা তারা চিরদিন করে এসেছে, সয়ে এসেছে,

বয়ে এসেছে, তাই-ই তারা করে যাবে।

গজেনবাবু বললেন, সায়নবাবু, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

কী কথা?

রোশনলালবাবুর কথাটা ভাল করে ভাববেন।

চমকে উঠলাম। রোশনলালবাবু কি গজেনবাবুকে আমার পিছনে লাগিয়ে রেখে গেলেন নাকি?

তাতে আপনার লাভ?

বললেন, আমিও চাকরি ছেড়ে দেব। ভাবছি। অনেকদিন থেকেই ভাবছি। ভালুমার আর গাড়ুর মধ্যে একটা ডালভাঙ্গা কল আর আটার চাকী বসাবো। বিস্কিটের ব্যবসার পর স্বাধীন ব্যবসা। আপনিও এই গ্র্যাচুইটির টাকাতে চাষ-বাস করুন। তারপর ঐ টাকা পেলে তো মার মার কাট্ কাট্।

ঐ দালালির টাকা! এদের ঠকিয়ে মালিকের কাছ থেকে কমিশন্?

ঠকাবেন কেন? নেগোসিয়েট্ করে যাতে রাজী হয় তেমনই রফা করবেন। একটা ওয়ার্কেবল্ সলিউশান্। তারপর যে কমিশন্ পাবেন, তা দিয়ে এদেরই ভাল করবেন। নিজের ভোগে নাই বা লাগাবেন।

কী রকম ভালো?

আপনার স্কুলটাকে ভালো করুন। একটা ছোট ডিস্পেনসারী করুন, যেখানে যেখানে দরকার কুয়ো বসান, ক্ষেতে ডিপ-টিউবওয়েল বসান, কতকগুলো বলদ কিনে একটা পুল-সিস্টেমে সেগুলো চাষের কাজে বিনি পয়সাতে ওদের দিন। সার দিন, বীজ দিন। কাজ করলে কি কম কাজ করার আছে না কি? জংলী জানোয়ারেরা যাতে ক্ষেতের ফসল তছনছ না করতে পারে তার এফেক্টিভ্ ব্যবস্থা নিন। এ সব আমি অনেকদিন থেকে ভাবছি। কিন্তু আমার দ্বারা এ সব ভাল কাজ-টাজ, শিকড় গেড়ে বসা কোথাওই হবে না। বিয়ে করার মতো একটা কাজ, যা এদেশে সব চেয়েই সোজা কাজ, তাই-ই করতে পারলাম না। আমাকে দিয়ে কি এত সব হবে? আমি হচ্ছি বরুন্ ফিল-সফাব। আপনাদের আইডিয়া জুগিয়েই খালাস।

অনেকক্ষণ গজেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

গজেনবাবুও উল্টে তাকালেন অনেকক্ষণ।

হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, নান্কুকে তো আপনি চেনেন।

আমি সাবধান হয়ে গিয়ে বললাম, নান্কুকে, কে না চেনে?

তেমন চেনা নয়। নান্কু, কী নিয়ে দিনরাত স্বপ্ন দেখে তা তো আপনি জানেন।

জানি।

বলেই বললাম, তা তো সকলেই জানে।

গজেনবাবু বললেন, আপনিতো মশাই পুলিশের টিক্টিকির মতো কথা বলছেন। সকলে সব জানলেও, সব বোঝে না। মা কালী সব বোঝার ক্ষমতা সকলকে দেন নি। দিলে আর দুঃখ কি ছিল? তারপর বললেন, নান্কু আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। চিপাদোহরে। বলেছিল, গজেনবাবু আপনারা অল্প-স্বল্প পড়ালিখা শিখেও এই রোশন-লালের টাকা-বানানোর তেলকলের বলদ হয়ে রইলেন সারাটা জীবন। আমাদের জন্যে কিছুই করলেন না। নিজেদের জন্যেও না। অথচ আমাদের মধ্যেই কাটিয়ে দিলেন পঁচিশ-তিরিশ বছর।

গজেনবাবু একটু চুপ করে থেকে দূরে তাকিয়ে বললেন, তারপর কী বলল জানেন? সেই নান্কু ছোকরা আমাকে?

কি?

বলল, শ্বাস ফেলা আর প্রশ্বাস নেওয়ার নামই কি বেঁচে থাকা গজেনবাবু? বেঁচে থাকার মানে কি শুধু তাই-ই? কী বলব মশাই। ঠিক এমন করে আমার সঙ্গে কেউ কখনও কথা বলে নি। আমিও ইমপর্ট্যান্ট মানুষ! আমাকেও কেউ সিরিয়াস্‌লি নিতে পারে? জানেন, আমাদের ছোটবেলায় নর্থ ক্যালকাটার গরাণহাটার মাস্তান ছিল পোটেদা। আমাদের হীরো। তখনকার দিনেও সবসময় দু কোমরে দুটো আন্‌-লাইসেন্সড্‌ রিভলবার গোঁজা থাকত। দু হাতের গুলি ছিল শালগাছের গুঁড়ির মতো শক্ত। বলত, দ্যাখ্‌ গজা, কারো কাছে মাথা নোয়াবি নি—যদি বাপের ব্যাটা হোস, তবে কারো কাছেই মাথা নোয়াবি নি। কিন্তু কথাটা কি জানেন? সেই পোটেদার শিক্ষার মধ্যে একটা গায়ের জোরের ব্যাপার ছিল। প্রতিপক্ষকে শরীরের জোর দিয়েই হারাতে বলত পোটেদা। কিন্তু নান্‌কুর কাছে কোনো অস্ত্র ছিলো না। একটা ছুরি পর্যন্ত না। ওর দুটো চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল আমার সঙ্গে কথা বলবার সময়। ছোকরাটি কী যে করে দিয়ে গেল মশাই আমাকে। হঠাৎই মনে হল, সমস্ত জীবনটাই রোশন্‌লাল-বাবুর বাঁশের হিসেবে করে, তাস খেলে, মাল খেয়ে, আর ফালতু গেঁজিয়ে নষ্ট করে দিলুম। করার মতো কিছুই ত করলাম না। আজ কোলকাতায় ফিরলে আমায় কেউ নেবে না। চিনবেও না। আমি না ঘরকা না ঘাট্‌কা। আমি ইদিশীই হয়ে গেছি। এই-টাই এখন আমাদের দেশ। যেখানে বাস করলাম এতদিন তাকে নিজের দেশ বলে মেনে নিতে বাধা কোথায়? কোলকাতাই পরদেশ। তাই ঠিক করেছি, মাঝবয়সে এসে নান্‌কু মহারাজের চেলা হয়ে যতটুকু পারি এদের জন্যেই করব বাকি জীবন। এটা আমার নিজের জন্যেই করা হবে। যে-মানুষ শুধু নিজের ও নিজের পরিবারের পেটের ভাত ও পরনের কাপড়ের সংস্থান করা ছাড়াও নিজের কাছে নিজে অন্য কিছু মানে বিশেষ কিছু একটা হয়ে উঠতে না পারে, সে বোধহয় মানুষ নয়। বড় দেরী করে বুঝলাম কথাটা।

আমি অবাক হয়ে গজেনবাবুর দিকে চেয়ে ছিলাম। ভাবছিলাম নান্‌কুর কথা। কী আছে ওর মধ্যে তা কে জানে? গজেনবাবুকেও ও এমন বদলে দিতে পারে? আশ্চর্য!

বললাম, সত্যি ছেলেটা একটা অসাধারণ ছেলে। রোগা-পটকা, নিরস্ত্র, কিন্তু ওর নাম করলে পাঁচটা বস্তির লোক সম্মানে মাথা নোয়ায়। দেখবেন, ও একদিন দেশের খুব বড় নেতা হবে, দেশের কত উপকার করবে ও।

গজেনবাবু খ্যাঁক্‌ খ্যাঁক্‌ করে হাসলেন। বললেন, এটা গজেন বোসের পাণ্ডিত্যের হাসি। আপনি বড় বোকা সায়নবাবু। ওর মতো ভালো ছেলেকে কি এই পার্টি-সিসটেম কোলে করে আদর করবে? ব্যক্তির দাম দেয় না দল। কোনো দলই ব্যক্তিত্বরও দাম দেয় না; যদি না সেই ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব বিকোতে রাজী থাকে দলের বা গোষ্ঠীর মতের কাছে! জানি না, নান্‌কুর মতো ছেলেরা হয়তো কোনো নতুন দল গড়বে, যে দলের হাতে গড়ে উঠবে এক নতুন ভারতবর্ষ। কিন্তু এখন কোনো আশা দেখছি না। যা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তা ওর ভবিষ্যৎ। দেখতে পাবেন, হয় ওর মৃতদেহ, নয় ওর সব স্বপ্ন-সাধ ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে এই বিরাট সদাচলন্ত কনভেয়র্‌ বেল্টের পাশে। যা-কিছু ভালো, যা কিছু সৎ, সবকিছুকে অটোমেটিক্যালী ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে এই অটোমেটিক্‌ নিঃশব্দ কনভেয়র্‌ বেল্ট। সায়নবাবু, নান্‌কুর কোনো ভবিষ্যৎ নেই এই কালে, এই হতভাগা দেশে। বড় অভিশপ্ত কাল-এ।

তারপরই বললেন, গজেন বোস-এর মুখে বোধহয় এত বড় বড় কথা মানায় না। দূর শালা! গরমে গরমে বলে দিলাম আর কি! কিন্তু আমি সিরিয়াস্‌লী ভাবছি,

চাকরি ছেড়েই দেব। চলুন একসঙ্গে কিছু একটা করি। শুধু নিজেদের পেট ভরানোর জন্য নয় ; কিছু একটা করার মতো করি। যা করে, মনে করতে পারি আমরা জাস্ট্ নিজেদের জন্যেই বাঁচি নি। কী পারি, না পারি সে-কথা আলাদা, কিন্তু পারার চেষ্টা করা ; সেটাই বা কম কি?

বলেই, কিছুক্ষণ চুপ মেরে গেলেন। কামান থেকে গোলা বেরিয়ে যাবার অব্যবহিত পর কামান যেমন নিস্তব্ধ, শান্ত হয়ে যায় ; গজেনবাবু তেমনই শান্ত।

আমি দূরে চেয়ে ছিলাম।

হুলুক্ পাহাড়ের মাথার ওপর মেঘ জমেছিলো, স্তরের পরে স্তর। দিগন্তর ওপরে ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব। মনে হয়, বেকেলের দিকে খুব বৃষ্টি হবে। চারধার থম্থমে। টাঁড়-টাঁড়ের দিকের ঝাঁটি জঙ্গল থেকে কালি-তিতির ডাকছে। ঝারিতালাও-এর দিক থেকে এক ঝাঁক হুইস্‌লিং ইংরিজী হরফ ভি-এর মতো ফরমেশানে উড়ে যাচ্ছে পশ্চিমে। একটা পাখি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুরো ঝাঁকটিকে। ভি হরফের সামনে সে একটা তীরের মতো এগিয়ে যাচ্ছে আত্মবিশ্বাসভরা দ্বিধাহীন দ্রুত পাখায়। ঝাঁকের অন্য পাখিরা শুধু তাদের নেতাকেই অনুসরণ করে যাচ্ছে ডানা নাড়িয়ে, নির্ভাবনায়, নিশ্চিন্তে ..নিশ্চিন্তে আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘের স্তব্ধ কালো ধমকানিকে উপহাসের সঙ্গে উপেক্ষা করে।



রথীদার সঙ্গে কাল হঠাৎ একবার দেখা হয়েছিল পথে। আমাকে দেখেই, মুখ ঘুরিয়ে নিলেন অথচ আমি কথা বলব বলেই ওঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

এমন যে হবে, হতে পারে, তা দুঃস্বপ্নেও ভাবি নি। রথীদা এর আগে ভালুমারের কয়েকজনকে এবং গজেনবাবুকেও বলেছেন, আর কী হবে? তোদের বাঁশবাবুকে আত্মীয় বলে মনে করতাম, সে এমন একটা কাণ্ড করে বসল যে, কোথাও দেখা হলে, গাঁয়ের বিয়েচুড়ো এবং অন্য জমায়েতেও মুখ ঘুরিয়ে নিতে হবে।

মানুষ রাগের মাথায় অনেক কথাই বলে। তবে, রথীদার মতো একজন মানুষ, যাঁকে হৃদয়ের সব শ্রদ্ধা, সব সম্মান উজাড় করে দিয়ে ভালোবেসেছিলাম, তিনি এমন যে সত্যি সত্যি করতে পারেন, তা আমার ভাবনারও বাইরে ছিল। ব্যাপারটাকে সহজে স্বীকার করে নিতে পারি নি। তাই আমার ডেরাতে ফিরেই কাগজ কলম নিয়ে বসেছিলাম। তিতলি আমাকে গম্ভীর দেখে শুধিয়েছিল, শরীর খারাপ হয়েছে কি না? জবাব না দিয়েই রথীদাকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু শ্রদ্ধাভাজনীয়েষু লেখার পর শ্রদ্ধা-ভাজনীয়েষু কথাটা কেটে দিয়ে চুপ করে বসে বসে রইলাম অনেকক্ষণ।

যাকে আর মন থেকে শ্রদ্ধা করতে পারি না, তাকে শ্রদ্ধাভাজনীয়েষু বলে সম্বোধন করার মধ্যে এক ধরনের ভণ্ডামি আছে বলে মনে হল আমার। মন থেকে যা আসে না তা নিজের পরম প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলেও আসে না। লিখলাম:

রথীদা,

আজ সকালে বাস স্ট্যাণ্ডের সামনে যখন আপনার সঙ্গে দেখা হল তখন আপনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন আমাকে দেখে। বড়ই কষ্ট হল আমার। আমার নিজের কারণে নয়। আপনারই কারণে। আপনার বাখ্-বীটোভেন-মোৎজার্ট, আপনার দেশী-বিদেশী সাহিত্য ও দর্শনের ওপর দখল, আপনার অগাধ পাণ্ডিত্যের আর কোনো দাম অন্তত আমার কাছে রইল না। আমি আপনার তুলনায় নিতান্তই অশিক্ষিত। সত্যিই সত্যিই বাঁশবাবু। কিন্তু আমার মনে হয় মানুষকে সবচেয়ে আগে মনুষ্যত্বর পরীক্ষাতে কৃত-কার্য হতে হয়। হওয়া উচিত অন্তত। সে পরীক্ষায় ফেল যদি কেউ করেন, তাহলে তাঁর কত পাণ্ডিত্য, কত জ্ঞান তা নিয়ে আমার অন্তত মাথাব্যথা নেই কোনো।

মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকলেই সব মানুষ মানুষ হয় না। আমি এমন রূঢ় কথা আপনাকে কখনও বলতে পারব বলে ভাবি নি। কিন্তু আজকে আপনার ব্যবহার দেখে আমার মনে হল যে, আপনাদের মতো তথাকথিত শিক্ষিত মানুষরা এই মস্ত দেশটার নেতা ও নিয়ন্তা হয়ে রয়েছেন বলেই আজও এই দেশের এমন দুর্দৈব। আপনাদের অন্তরের গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ভণ্ডামির জোরেই আপনারা নানকুর মতো ছেলেকে

বাইরে থেকে বাহবা দেন, বাড়িতে ডেকে হুইস্কী খাইয়ে তার কাছে ভগবান সাজতে চান, আমাদের মতো স্বজাত ও স্বসমাজের মানুষকে পিঠ চাপড়ে বলেন, 'সাবাস হে ছোকরা, এই ছোটলোকগুলোকে টেনে তোলো, জ্ঞানের আলো দেখাও।' কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মিশনারী সাহেবদের অধিকাংশর মতো আপনিও তেমনই ভালো করতে চান এই তিতলিদের। বাইরের ভালো শুধুই দেখানো ভালো। অ্যানিম্যাল লাভার্স সোসাইটির সভ্যরা পশুদের ভালোবাসেন। তাঁদের মতোই আপনারাও বিলিতি কুকুরদের যতখানি ভালোবাসেন তাদের যত সোহাগ করে ফোমের গদীর ওপর সযত্নে পাতা বিছানাতে শোয়ান তার একশ ভাগের একভাগ ভালোবাসা ও সোহাগও আপনাদের বুকের কোণায় জমিয়ে তোলেন নি এই মানুষগুলের জন্যে। আপনি এবং হয়ত আমিও যাদের মধ্যে যৌবন ও জীবন প্রায় কাটিয়ে দিলাম,—সেই হতভাগা মানুষগুলোর জন্যে কিছুমাত্র বোধই বোধহয় রাখি না আর। তিতলি যদি মানুষী না হয়ে উঁচু-পেডিগ্রীর বিলিতি কুক্করী হত, তাহলে আপনার কাছে ওর সম্মান হয়ত অনেকেই বেশি হত। বিলিতি ডগ্ সোপ দিয়ে ওকে চান করাতেন, ক্যালেন্ডার দেখে ওকে ডি-ওর্মিং করতে নিয়ে যেতেন ভেট্ এর কাছে। সে ঋতুমতী হলে, কোন পাড়ায়, কার কাছে, তার জাতের যোগ্য পেডিগ্রীর কুকুর আছে তার খোঁজ করে সেই কুকুর দিয়ে নিজের সাধের কুকুরীকে রমণ করাতেন, যাতে পরের প্রজন্মে আবারও তেমনি সুন্দর উঁচু জাতের সোনু-মনু কুকুরবাচ্চা পান। কিন্তু রথীদা, তিতলি যে মানুষ! আমি যে তার মধ্যে আপনার চোখ দিয়ে পেডিগ্রী খুঁজে নি' একজন সাধারণ মানুষের চোখ দিয়ে একজন মানুষীকে খুঁজেছি। একজন পুরোপুর ভারতীয় মানুষকে। যে জাতে বামুন নয়, যে বাঙালী নয়, যে এনিড ব্লাইটন বা মিলস এন্ড বুন্ পড়ে নি কখনও, আপনার মতো প্রুস্ট, ডস্টয়ভর্য়স্কি, এবং বাখ্ বেটোভেন মোৎজার্ট-এর নাম পর্যন্ত শোনেনি যে। যে শুধু এই সুন্দর মস্ত দেশের রামায়ণ মহাভারতের শিক্ষায় শিক্ষিত আনকালচারড্, আনইন্টেলেক্চুয়াল একজন মাটির গন্ধ গায়ের ভারতীয়।

আপনাকে বলতে পারতাম আরও অনেক কথা, সরী, লিখতে পারতাম। আমার মনে পড়ে না আজ অবধি এত ক্রুদ্ধ আমি কখনও হয়েছি। আমি জানি না কী করে নিজেকে সামলাব; নিজেকে বোঝাব, মানব যে, আপনাকে শ্রদ্ধা করার মতো এত বড় ভুল......।

ইতি
সায়ন মুখার্জী

চিঠিটা খাম-বন্ধ করে তিতলিকে বললাম, মানিয়া বা বুলকি কী পরেশনাথ এলে তাদের কারো হাত দিয়ে এ চিঠিটি রথীদার কাছে পাঠিয়ে দিতে। তিতলি অনেকক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। বলল, পাঠাবে? পাগলা সাহেবকে? তারপর কিছু বলতে গিয়েও বলল না। মুখ নামিয়ে বলল, আচ্ছা।

রামধানীয়া চাচার বাড়ি যেতে যেতে অনেক কথাই ভাবছিলাম। জঙ্গলের পথে একা হাঁটলেই আমাকে ভাবনাতে পায়। আসলে, রথীদার এই আশ্চর্য ব্যবহারে আমি পাগলের মতো হয়ে গেছি কয়েকদিন হল। আমার মাথার কিছুই ঠিক নেই। যে মানুষকে মনে মনে এত বড় করে দেখে এসেছি, শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হয়ে আমি যাকে মা-বাবা-গুরু সকলের স্থানে বসিয়েছি, এত বছর ধরে যাকে নিজের আদর্শ বলে জেনেছি, সেই মানুষটি এক মুহূর্তে এত নীচে নামিয়ে ফেললেন নিজেকে। ধুয়োর মেঘে চোখ জ্বালা করেছে বলে তার নীচে আগুন আদৌ আছে কী নেই, সে কথা এক-

বারও মনে হয় নি। মানুষ এমন ভুলও করে? আর এই মানুষটিকেই ভালুমার ও আশেপাশের বস্তির মানুষরা দেবতা জেনে তার পায়ে পুজো চড়িয়ে এসেছে এতদিন।

আসলে, আমরা প্রত্যেকেই কী দারুণ স্বার্থপর! তিতলিকে বিয়ে না করলে, আমার ব্যক্তিস্বার্থ, পারিবারিক স্বার্থ, আমার বিবাহিত স্ত্রীর অপমান না ঘটলে, আমি কি এত উত্তেজিত হতে পারতাম? শুধুই আমার নোকরানি তিতলির জন্য? হয়ত পারতাম না। এবং পারতাম না বলেই 'মানুষ' এই পরিচয়ের সম্মানে নিজেকে সম্মানিতও করতে পারতাম না।

হাটবার আজ। হাটে যাব। তিতলি বলছিল, কী কী আনতে হবে। আমি কাগজের ফালিতে লিস্ট বানিয়ে নিচ্ছিলাম। পরেশনাথের জন্যে একটি প্যান্ট ও জামা আর বুলকির জন্যে একটি শাড়ির কথা বলেছিল ও।

বেরোবার সময় শুধোলাম, বুলকি আর পরেশনাথের মাপ ত আমার কাছে নেই।

তিতলি হাসল। বলল, ও শাড়ি পরা আরম্ভ করেছে। ওর জন্যে একটা ডুরে শাড়ি এনো, যত সস্তাতে পাও। পারলে, একটা সায়া আর জামাও। মেয়েটা বড় হচ্ছে।

মেয়েটা বড় হচ্ছে!

এমন বিপদ আর নেই। বুদ্ধদেব বসুর একটি কবিতা পড়েছিলাম 'যৌবন করে না ক্ষমা'। বিত্তশালিনী কন্যাদের কাছে যৌবন আসে আশীর্বাদের মতো। আর বুলকির মতো হতভাগিনীদের কাছে যৌবন বড়ই অভিশাপ হয়ে আসে।

হাটবারে জঙ্গলের পথে পথে রঙের মেলা বসে যেন। মেয়েরা সকলেই যাব যার ভাল রঙিন শাড়ি পরে, ভালো করে নিম বা করৌঞ্জ বা সরগুজা বা কাড়ুয়া যা হাতের কছে জোটে সেই তেল দিয়ে জাবজবে করে চুল আঁচড়ায়। কেউ বা কাঠের কাঁকুই গোঁজে মাথায়। ফুল গোঁজে প্রায় সকলেই। কেউ হাটে চলে বিকোতে। কেউ চাল কিনতে। কেউ বা দুয়েরই জন্যে। ছেলেরাও তালিমারা জামা-কাপড়ের মধ্যে যা সবচেয়ে ভাল সেইটেই বের করে পরে। যার ছাতা আছে সে-যতই বিবর্ণ হোক না কেন, সে স্ট্যাটাস্ সীম্বল্ হিসেবে সেটাকেও হাতে নেয় গরমে এবং বর্ষায়। পথ চলতে চলতে কথা কয়। বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে যায় রঙের চমক। তেল, সিন্দুর, খৈনীর গন্ধ মিশে যায় পুটুসের গন্ধের সঙ্গে। পথটা যতই হাটের কাছাকাছি পৌঁছতে থাকে, ততই নানারকম গন্ধ এসে নাক ভরে দিতে থাকে। বয়েল গাড়ির বয়েলদের গায়ের গন্ধ, খড়ের গন্ধ, খোলের গন্ধ, তেলের গন্ধ, বাজে-তেলে পকৌড়া আর বড়া ভাজার গন্ধ। চিনির সিরাতে ফেলা গজার মজা গন্ধ। ছাগল, মুরগীর গায়ের গন্ধ, হাঁস-মুরগীর ডিমের আলাদা আলাদা গন্ধ। আর সমবেত বনপাহাড়ের মেয়েপুরুষদের ঘামের গন্ধে ম-ম করে হাটের আকাশ-বাতাস।

হাটই হচ্ছে আমাদের এখানের ক্লাব। শহুরে বাবুদের বড় বড় ক্লাবের মতন। সেসব ক্লাবে শুনতে পাই এখনও গলায় রঙিন দড়ি ঝুলিয়ে, টেইলকে ট না পরে গেলে দেশ স্বাধীন হওয়ার চল্লিশ বছর পরও কোনো কোনো ঘরে বা খানাঘরে ঢোকা মানা। তবে ওসব তফাৎ ছাড়া আর সবই এক। পরনিন্দা, পরচর্চা, একে অন্যের বউ ভাগিয়ে নেওয়া, ছেলেমেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ, নতুন বানানো গয়না দেখানো, এসব মানসিকতায় সব ভারত-বাসীই এক। শুধু তাদের ভাষা আলাদা, চাল-চলন আলাদা, অর্থনৈতিক অবস্থা আলাদা এইই যা।

ধীরে সুস্থে কেনা-কাটা করে, বৈদ্যর কাছ থেকে রামধানীয়া চাচার জন্যে একটু দাওয়াই নিলাম।

মানিয়ার সঙ্গে দেখা হল। ও চা খাবে কিনা জিজ্ঞেস করলাম। তাতেও বিশেষ

উৎসাহ দেখালো না। সপ্তাহে একদিন হাটে এসে চা জিনিসটাও বিশেষ পছন্দ করে না। নানা ধাবে-কাছে না থাকলেই হাটের দিনে মানিয়া কয়েকপাত্র চড়াবেই। শাল পাতার দোনায়। এই-ই-ত আনন্দ। শুধু এইটুকুই।

ফরেস্ট গার্ডদের কাছে মানিয়ার কেসের খোঁজ নিলাম। ওরা মানিয়ার কাছ থেকেই খৈনী চেয়ে নিয়ে হাত ডলতে ডলতে ঠোঁটের তলায় চালান করে দিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল, "শালেকো পাঁচ-সালকো দামাদ বানাকে ছোড়েগা। আইসেহি ছোড়েগা থোরী!"

মানি ইতিমধ্যেই কিঞ্চিৎ টেনেছিল ভাটিখানা থেকে। মুঞ্জরীও ধারে কাছে নেই। সুতরাং ভারত স্বাধীন। গার্ডদের দিকে চেয়ে দার্শনিকদেব মতো ও নির্লিপ্ত হাসি হাসল। বলল, আইনে যদি তাইই হয় তবে তাইই যাব। আইন আমি অমান্য করি না।

তবে কাঠ কাটলি কেন? এতই যদি তোর জ্ঞান? ধমকে উঠল একজন গার্ড!

মানি হঠাৎ তড়পে উঠে বলল, জঙ্গলের কাঠ কি শালা তোর বাবার! জঙ্গলের লোক আমরা। বনদেওতা কোনোদিন অভিশাপ দিল না, জঙ্গলের কাঠের মালিক হয়ে গিলি আজ তোরা। ফুঃ। আম চার গাছা গাছ কাটালে দোষ। আর তোরা যে টাকা খেয়ে ট্রাককে ট্রাক গাছ পাচার করে দিচ্ছিস এই সব কোর-এরীয়ার ভিতর থেকেই ; তখন কি বাঘিনীকে পেয়ার করা বাঘ বাঘিনীর ঘাড় থেকে বিরক্তিতে নেমে পড়ছে না? বাঘের বংশবৃদ্ধি করছিস শালার আমাদের বংশনাশ করে। তাও সত্যি সত্যি বাঘ বাড়লেও কথা ছিল। যত বাতেল্লা। যত রাগ, কি এই গরিব মানিরই ওপর? আমাকে কুড়ুল হাতে জঙ্গলে দেখতে পেলেই কি তাদের বংশবৃদ্ধি করার ইচ্ছে উবে যাচ্ছে?

কথাটা অবশ্য যেমন ভদ্রভাষায় লিখলাম, মানি আদৌ সে ভাষায় বলল না। তার ভাষা লেখার যোগ্য নয় বলেই মোলায়েম করে লিখছি।

গার্ড মানির দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, তুই ভেবেছিসটা কি? দেশের আইন বলে কি কিছুই নেই? চল্ শালা! তোকে পাঁচবছর কেন, দশবছরের জন্যে দামাদ করব। গাঁড়পর দো-দো হান্টার লাগালে ভালুমার বস্তির লোকেরা তোর বিরুদ্ধে সাক্ষীদেবার জন্যে লাইন লাগিয়ে দেবে। আইন ত তামাসা হ্যায়! যিসকা পাস্ পইসা, উনহিকা জেবমে কানুন। জয় বজরঙ্গবলীকা জয়।

দূর থেকে রথীদাকে দেখলাম। লাল হলুদ ডোরাকাটা টেরীকটের হাওয়াই শার্ট আর সাদা টেরীকটের ট্রাউজার পরনে। মাথার ওপর লাল-নীল-সবুজ হলুদ ছাতা। পেছনে বেয়ারা, থলে হাতে।

আশ্চর্য! এত বছর রথীদাকে এমনভাবেই দেখে আসছি। হাট শুদ্ধু লোক গড় হয়ে প্রণাম করছে পাগলা সাহেবকে। কিন্তু এর আগে একবারও আমার মনে হয় নি যে, রথীদা যদি আমারই মতো, রোশনলালবাবুর একজন অতি নগণ্য কর্মচারী হতেন এবং ছ্যাঁচা বাঁশ ও খড়ের ডেরায় থাকতেন, রথীদার যদি এত পয়সা না থাকত, জমি-জমা না থাকত তাহলে কি এত খাতির-প্রতিপত্তি হত তাঁর।

কথাটা ভেবে নিজেকেই ছোট লাগল। আমার মনটাই কি নোংরা? ছোট? আজ রথীদার সঙ্গে আমার গভীর মতবিরোধ হয়েছে বলেই কি আমার এ কথা মনে হচ্ছে? না, এই কথাটি সত্যি এতদিন আমারই চোখে পড়ে নি এই সত্যর স্বরূপ।

তিতলির প্রণাম গ্রহণ না-করা, তিতলির কারণে আমাকে শুদ্ধু অস্বীকার করায়, যারা তিতলির আপনজন, আমার চেয়েও অনেক বেশি আপনজন, তাদের মধ্যে খুব কম লোকের মনেই রথীদা সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা দেখলাম। অবাক বিস্ময়ে আমি মানুষগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। এই আসল ভারতবর্ষ। এর মুক্তি নেই। ভবিষ্যৎ নেই। এখানে রথীদার মতো ভণ্ড মানুষরা, গোদা শেঠ, মাহাতোর মতো খল ধূর্ত

অত্যাচারীরা আর রোশনলালবাবুর মতো টাকার কুমিররাই চিরদিন রাজত্ব করে যাবে। যারা নিজেরা না জানতে চায়, কুম্ভকর্ণর প্রেত যাদের মানসিকতাকে অসাড় করে রেখেছে যুগযুগান্ত ধরে, তাদের বাঁচাবে কে? এ অজগর চিরদিন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়েই থাকবে, ঘুম ভেঙে সমস্ত দেশের শরীরের আনাচ-কানাচের অসাড়তা ভেঙে, এ নিজের গতিতে কি কখনও গতিমান হবে? হয়ত হবে না। আমার জীবদ্দশায় হয়ত হবে না।

রথীদা যেমন সকালে করেছিলেন, তেমনই এখনও আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

আমার কেনকাটা শেষ হয়ে এসেছিল। এক কাপ চা ও দুখিলি পান খেয়ে উঠলাম। একটা লাঠি নিয়ে এসেছিলাম তাতে, থলে-টলে ঝুলিয়ে ডেরার দিকে পা বাড়ালাম। তিতলিকে বিয়ে করার পর থেকে এবং রোশনলালবাবুর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে আমি আচারে ব্যবহারে মানি-মুঞ্জরীদের মতোই হয়ে গেছি। হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ। আমার নামের পেছনে যে বাবু লেজটি ছিল তার থেকে মুক্ত হতে চাইছি অনবধানে। দু পাতা ইংরিজী পড়লে বা শহুরে বামন কায়েত ভূমিহার হলেই যে হাটে গেলে, পেছনে মাল বইবার জন্যে কাউকে নিয়ে যেতে হয়, না-নিয়ে গেলে দেহাতের লোক সম্মান করে না, এ কথা আর মানি না। মানার মতো মানসিক অবস্থাও নেই। এরা যদি আমাকে তাদের একজন বলে ভালোবাসে তাহলেই খুশী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাসবে কি?

ব্যাপারটা বড় হঠাৎ ঘটে গেল। একেবারে অভাবনীয় ভাবে। হাটের এলাকার মাঝা-মাঝি পৌঁছে গিছি। চোখ তুলেই দেখলাম, সামনে মাহাতো দাঁড়িয়ে আছে। ও বোধহয় মাংসের দোকানে দাঁড়িয়ে দুজন অনুচর নিয়ে মাংস কিনছিলো। হঠাৎ দৌড়ে এল আমার দিকে। চমকে উঠলাম আমি ব্যাপারটার অভাবনীয়তায়। মারবে না কি আমাকে? কিন্তু কেন? রোশনলালবাবুর প্ররোচনায়? কিন্তু ও কাছে আসতেই বুঝলাম ওর লক্ষ আমি নই। আমার হাত দুয়েক পিছনে পিছনে হেঁটে আসা মুঞ্জরী। মুঞ্জরীকে একে-বারেই লক্ষ্য করি নি।

মুঞ্জরীর পরনে একটা শাড়ি। শুধুমাত্র শাড়িই। শায়া নেই। জামা নেই। পেঁচিয়ে, আঁটসাঁট করে পরেছে। মুঞ্জরীর বয়স এখন হবে পঁয়ত্রিশ। দারিদ্র্য আর অত্যাচারে অনেক বড় দেখায় ওকে। কিন্তু নারী সে ত নারীই। নারীর লজ্জাবোধ, সম্ভ্রম শুধু চিতাতেই ছাই হয়। মাহাতোকে দেখেই, বাজকে দেখে বটের তিতির যেমন আড়াল খোঁজে তেমনই আমার পেছনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল ও। শাড়িটাকে যতখানি পারে টেনে-টুনে ঠিক করে নিল। তবু শাড়ির ওপরে অনেকখানি জায়গা অনাবৃত রইল। ওর উজ্জ্বল তামা-রঙা শরীরের আভাসে মাহাতোর দু' চোখ লুব্ধ হয়ে উঠল। মাহাতোরা সৌন্দর্য জানে না। মাংস চেনে।

মাহাতো বলল, তোকে আগেই বলেছিলাম। আগে টাকা দিবি কি না বল। না দিলে যা করব বলেছিলাম, আজ তাই-ই করব।

মানিয়া ত এসেছে হাটে। মুঞ্জরী মিনমিন করে ভয়ে কাঠ হওয়া গলায় বলল।

তা ত এসেছে, কিন্তু বসে গেছে, শুঁড়িখানায়। তের কিরকম মরদ?

মুঞ্জরী অসহায়ের মতো বলল, টাকা ত আমাদেরই পাওনা তোমার কাছে। বয়েল ভাড়ার সব টাকা ত শোধ হয় নি এখনও।

হবে। এক্ষুনি হবে। আমি যা বলি, তাইই করি। আজ তোকে দেখাব। তোর মরদকে দেখাব, আর দেখাব তোর সব পেয়ারের লোককে, মাহাতো কী করতে পারে, আর না পারে।

মুঞ্জরী হঠাৎ বাঁশবাবু-উ-উ-উ বলে এক চিৎকার দিয়ে দৌড়ে সামনে—হাটের

শালভূমি ছেড়ে ঝোপঝাড় জঙ্গলের দিকে, যেদিকে ওদের বাড়ি ফেরার পথ। লোহার নাল-লাগানো নাগড়া পায়ে মাহাতোও ওকে ধাওয়া করে গেল। মঞ্জুরীর হাতে একটি ছোট্ট থলি, রসদ তাতে সামান্যই ছিল, সে অনেক জোরে দৌড়োচ্ছিল। আর মাহাতোর পেছনে আমি। কিছুই না ভেবে। যন্ত্রচালিতর মতো! চোখের কোণে দেখলাম, ছাতা মাথায় রথীদা সিগার ফুঁকতে ফুঁকতে পাঁঠার পেছনের বাং থেকে মাংস নেবেন, না সামনের রাং থেকে, তাতেই মনোনিবেশ করলেন, মাহাতো আর মঞ্জুরীর দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিলেন।

রাতারাতি এমন বদলে যেতে পারে কোনো মানুষ! আশ্চর্য! বেশীদূর যেতে হল না। হাটের কেন্দ্রবিন্দু পার হয়ে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে পৌঁছতেই মাহাতোর অনুচররা মঞ্জুরীকে ধরে ফেলল। ভয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল মঞ্জুরী। হাট-ভরতি লোক একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে গেল। পরক্ষণেই মাহাতো, গোদা শেঠ এবং মাহাতোর অনুচরদের দিকে তাকিয়ে আবার কেনা-বেচায় মন দিল। ততক্ষণে আমিও পৌঁছে গেছি মঞ্জুরীর কাছে। আমার আগেই পৌঁছেছে মাহাতো। মাহাতো মঞ্জুরীর শাড়ির আঁচলটা ধরে জোরে টান লাগলো। দু'পা জোড়া করে বুকের কাছে দু'হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে ছিল মঞ্জুরী। কিন্তু প্রচণ্ড বলশালী মাহাতোর হাতের এক ঝটকায় মঞ্জুরীর শাড়িটা খুলে গেল। সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল ও। প্রথমে হাতদুটো বুকের কাছে জড়ো করা ছিল। এখন বুক নিবারণ করে হাত দুটোকে জড়ো করে উরুসন্ধিতে এনে রেখে হাউ-হাউ করে উঠল ও।

আজ সকাল থেকে আমার রাগ ঈশানকোণের মেঘের মতো জমা হচ্ছিল। রথীদার মতো তথাকথিত শিক্ষিতদের ভণ্ডামি, হাট-শুদ্ধু এই অশিক্ষিত মানুষগুলোর নপুংসকতা আমার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিল। আমার বোধ তাৎক্ষণিক ভগ্নমুহূর্তে মাথার মধ্যে অ্যাম্পলিফায়ারের মতো গমগমিয়ে বলল, আজ মাহাতো, মঞ্জুরীর বেইজ্জৎ করছে হাটের মাঝে, কাল তিতলিকেও করবে। সবকিছুরই একটা কোথাও শেষ হওয়া উচিত, থাকা উচিত সমস্ত জাগতিক অসীমতারই। কী করলাম, তা জানবার আগেই, আমার কাঁধের লাঠি থেকে সমস্ত মালপত্র ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মাথার ওপর লাঠিটা তুলে নিয়ে সজোরে এক বাড়ি লাগালাম মাহাতোর মাথায়। বিকট একটা শব্দ হল। মাইরে-এ-এ বলে চিৎকার করে মাহাতো মাটিতে ধপাস্ করে পড়ে গেল কাটা কলাগাছের মতো।

মরে গেল না কি? গেল তো গেল।

মঞ্জুরী মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে পড়ে থাকা শাড়িটাকে তুলে নিয়ে জড়িয়ে নিল আবার গায়ে। এতক্ষণ পর মানিয়া দৌড়তে দৌড়তে কাঁদতে কাঁদতে এসে মঞ্জুরীর পা জড়িয়ে ধরে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল। মঞ্জুরী সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণায় লাথি মারল ওর মুখে। মানিয়া বসানো ঘটের মতো উল্টে পড়ে গিয়ে পেছনে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়েই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ততক্ষণে মাহাতোর অনুচরেরা আমাকে ঘিরে ফেলেছে। পাঁচ-ছ' জন হবে। কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে বর্শা, তারা আমাকে টেনে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। দু তিনজন মাহাতোর পরিচর্যায় লাগল। আমা-হেন নির্বিরোধী গা-বাচালে বাবু শ্রেণীর লোক ছোটলোকদের মধ্যে পড়ে যে মাহাতোকে লাঠি মেরে ধরাশায়ী করতে পারে, এ কথাটা হাটের একটা লোকেরও বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু শলথবুদ্ধি লোকেরা যখন কোনো বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে, দেব অথবা ভূতের বিশ্বাসেরই মতো, তখন মরে গেলেও তা আর ছাড়তে চায় না। চেনা অচেনা লোকগুলো হঠাৎ ছায়ামূর্তির মতো এক-এক করে এ গায়ে

আসতে লাগল এদিকে। দোকানীরা দোকান ছেড়ে এল। যাদের হাট শেষ হয়ে গেছে, তারা রসদ মাটিতে নামিয়ে। পাকৌড়ীর দোকানে উনুনের ওপর কড়াইতে চিড়বিড় করে তেল পুড়ে যেতে লাগল।

আমাকে ওরা আরও গভীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। লোহার মতো ওদের হাতের বাঁধন। আমি যে ডাইরি-লেখা, মনে মনে কবিতা-লেখা মানুষ। আমি যে ছবি আঁকতে ভালোবাসি, আমি যে গান গাই। শরীরচর্চা ত করি নি কখনও। আমার মতো কেরানি, কলমপেষা, কবিতা-লেখা শিক্ষিত বাবুরা যে চিরদিন শরীরচর্চাকে ছোটলোকী বলেই মনে করে এসেছি। শরীরে বল থাকা ভদ্রজনোচিত ব্যাপার বলে কখনও মানি নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম যে শরীরচর্চা নিশ্চয়ই করা উচিত ছিল। শরীরটাও হেলাফেলার নয়। কারণ পৃথিবীতে শরীরসর্বস্ব লোকই সংখ্যায় বেশি। তাদের কাছে শারীরিক ভাষাটাই একমাত্র ভাষা, কলমের ভাষা নয়, তুলির ভাষা নয়, গলার স্বর নয়।

আশ্চর্য! হাটের সেই সমস্ত মানুষ পায়ে পায়ে আসছিল। কিন্তু হাত পনেরো-কুড়ি ব্যবধান রেখে। মাহাতোর লোকদের মধ্যে দু'জন হুংকার ছাড়তেই ওরা হুড়মুড় করে পাঁচ-পা পেছিয়ে গেল। কিন্তু আবারও এগিয়ে আসতে লাগল। ক্রমে ক্রমে ব্যবধান কমিয়ে ফেলতে লাগল। আমার খুব লাগছিল। একজন মাথার চুলের মুঠি জোরে ধরে ছিল। মাথাটা পেছনদিকে টেনে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসা হাটের অগণিত মানুষ গুলির দিকে চেয়ে আমার মনে হচ্ছিল যে আমার চতুর্দিকে স্তূপের পর স্তূপ বারুদ। বারুদের বলয় আমাকে ঘিরে রয়েছে। যে বারুদে আগুন লাগলে একটি প্রকাণ্ড দুর্গ পর্যন্ত উড়ে যাবে, মাহাতোর ক'জন অনুচর ত ছার। কিন্তু কারো কাছেই আগুন নেই। স্ফুলিঙ্গ নেই একটিও। একটা মানুষ চাই। মাত্র একটা মানুষ! মানুষের মতো মানুষ। মশাল হাতে একটা মানুষ, যে শুধু আগুন লাগাতেই নয়, পথ দেখাতেও পারে। পথিকৃৎ নেই। তেমন মানুষ নেই। শুধু ভালুমারেই নয়, এই গাড়ুভালুর হাটেই নয়, বোধ হয় সারা দেশেই নেই।

একটা মোটা পিয়াশাল গাছের গোড়াতে নিয়ে গিয়ে মাহাতোর অনুচরদের মধ্যে থেকে একজন কোমর থেকে একটা লম্বা ধারালো ছুরি বের করল। কসাইয়ের ছুরির মতন। তিতলির মুখটা মনে পড়ল আমার। বুলকি আর পরেশনাথের মুখও। ওদের জন্য নতুন শাড়ি জামা কিনেছিলাম। বড় খুশী হত ওরা দেখতে পেলে। আর পরমুহূর্তেই মনে পড়ল আমার মৃত মায়ের মুখখানি। আর মায়ের মুখের কথা, অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ওই পিয়াশাল গাছের চারপাশের জঙ্গল থেকেই চারজন অল্প-বয়সী ছেলে হঠাৎ ডালটনগঞ্জে দেখা হিন্দি ছবির চরিত্রের মতোই যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হল। তাদের প্রত্যেকের হাতে ঝকঝকে দোনলা বন্দুক। তারা মুখে কিছু বলল না, বন্দুকের নলগুলো শুধু মাহাতোর লোকেদের দিকে তাক করে থাকল।

ঠিক সেই মুহূর্তে হাট-ভর্তি নারী-পুরুষ-শিশু একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল। মারো উস্‌লোঁগোকো' জানসে মার দেও। মারো মাহাতো শালেকো। মা-বহিনকো ইজ্জৎ ভি ছোড়্‌তা নেহি ঈ জানোয়ার লোঁগ।

বলেই তারা কিন্তু আর বন্দুকওয়ালাদের অপেক্ষাতে বা সাহায্যে রইল না। যে জোর, যে একতার দৃঢ়বদ্ধ গভীর অসীমশক্তিসম্পন্ন জোর তাদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, এতদিন, এত বছর, তার অদৃশ্য উৎস মুখ খুলে যেতেই তারা হৈ-হৈ করে এসে পড়ল।

মাহাতোর লোকেদের ওপর। ধরাশায়ী হল মাহাতোর লোকজন। হাটের কোন দোকানী যেন মঞ্জুরীকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে তাকে নতুন শাড়ি সায়া জামাতে সেজে নিতে বলল জঙ্গলের আড়ালে গিয়ে!

কিছুক্ষণ হাটের লোকদের স্বাধীনতা থাকলে মাহাতো অথবা তার দলবদলের একজনও, সেদিন প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারত না। জনতা যে মরা ব্যাঙের মতো ঠান্ডা অথচ ডিনামাইটের মতই শক্তিধর সেই কথা প্রথম উপলব্ধি করলাম আমি সেদিন। শুধু ডিটোনেটর চাই।

কিছুক্ষণ কিল চড়-লাথি, লাঠি টাঙ্গির উল্টোদিকের ঘা মারবার পরই সকলে হঠাৎ একসঙ্গেই থেমে গেল। আমি ঘটনা পরম্পরার অভাবনীয়তাতে অবশ হয়ে সেই বড় পিয়াশালের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে ছিলাম। বুঝলাম কাউকে অথবা কয়েকজনকে আসতে দেখে সবাই চুপ করে গেছে। সকলেই পশ্চিমদিকে চেয়ে ছিল। কারা আসছে?

পুলিশ? না ত! কোনো আওয়াজ নেই।

হ্যাঁ। এবার কানে এল, দূর থেকে টায়ারসোলের ছেঁড়া চটি ফটাস্ ফটাস্ করে দুবলা-পাতলা, একটামাত্র লোক আসছে। তার ধুতি ও দেহাতী খদ্দরের পাঞ্জাবির অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে, দাড়ি কামায় নি, শীর্ণ চেহারা। কাছে আসতেই গুঞ্জন উঠল নান্‌কু। নান্‌কু। নান্‌কুয়া হো!

ছেলেগুলো যে নান্‌কুকে চেনে এমনও মনে হলো না। কিন্তু নান্‌কু আসার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ভোজবাজীর মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। নান্‌কু, মাহাতোর চেলাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মাহাতোর কাছে গেল। কাকে যেন বলল, পানি পিলাও উস্‌কো। সে জল খেয়ে একটু সুস্থ হলে তাকে বলল, তোরা ওয়াক্ত আজ খতম্ মাহাতো। ম্যায় আজ তুহর্ জান্ দেলি। তোরা জান্‌কা বদলা কওন্ চিজ্ দেবি? বহত শওচ্ সম্‌ঝকে বল্।...

যো মাঙ্গিস্ তু নান্‌কুয়া।

কোনোরকমে উঠে বসে মাহাতো বলল, পাঞ্জাবির হাতায় মুখের জল ও রক্ত মুছতে মুছতে।

জান্ ত' বড়া মোঙ্গাই হোতা হ্যায়॥ বলে, নান্‌কু হাসতে লাগল। দারুণ সেই হাসি।

মনে হল, এই নান্‌কুকে আমি চিনি না। নান্‌কু বলল, আজসে তু হামলোগোঁকা, ঈয়ে ভুখে-হুয়ে ভোলে-ভালা ঝুণ্ডকা এক টুকরা বন্‌যা মাহাতো। কৈচ্‌কী মে কোয়েল যাাইসা ঔরঙ্গামে মিলি, ঐসেহি হামলোগোঁকো সাথ্ মিল্ যা। জী খোল্‌কে তু ক্যা হামলোগোঁকো পায়ের সে দাব্ কর্ বাঁচ্‌নে শেকোগী? নেহী, কভ্‌ভি নেহী। নেহী ত, পেয়্যারসে যো-কুছ্ তোরা হ্যায়, সব মিল্‌জুলকে বাঁট বাঁটকে খা আজ্‌সে মাহাতো। তোরা একেহেল্‌হিকা তোঁদ্‌মে কিত্‌না গেন্দুনী ঔর গেঁহু? সব্‌সে মিল্‌কর, বাঁটকে খা, খাকে দেখ্, খানা কিত্‌না মিঠা লাগতো। কিত্‌না জল্‌দি পচ্‌তা। আঃ। উঠ্।

মাহাতো কাঁদতে কাঁদতে উঠল। আমার লাঠি খেয়ে ওর মাথার পেছন-ফেটে রক্ত বেরুচ্ছিল।

নান্‌কু আমার দিকে ফিরে বলল, আমি চললাম। আমাকে আর তোমাদের দরকার নেই।

প্রত্যেকটি মানুষ নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে রইল।

আমার কাছে এসে একটু বসল নান্‌কু। আমার মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে কৌতুকময় চোখে বলল, কামাল কর দিয়া! বাঁশবাবু।

তারপর ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, এরা এতদিনে এদের আবিষ্কার করেছে। ঐ অল্প-বয়সী ছেলেগুলোকে, যারা দেখা দিয়েই লুকোলো, তাদের এখন বোঝাতে হবে যে, আসল জোর বন্দুকের নলে নেই। বন্দুক তো মানুষের চাকর মাত্র। বোমাও তাই। যে মানুষ বন্দুক হাতে পেয়ে নিজেদের বড় মনে করে তাদের মনের বয়স হয় নি এখনও। মানুষের মনের জোর আবার যেদিন মানুষ পুনরাবিষ্কার করবে সেদিন বোধ হয় অল্পক'টা খারাপ লোক, অগণ্য ভালো লোকের ওপর খবরদারী করতে পারবে না। বাঁশবাবু, আমাদের সকলের জীয়নকাঠি মরণকাঠি এখন আমাদেরই হাতে। একমাত্র আমাদেরই হাতে। এই ভালুমার একটি ছোট্ট উদাহরণ। আমরা নিজেদের অনেক বছর বড় অসম্মান করেছি। এখন সময় এসেছে বাঁশবাবু, নিজেদের ফিরে পাবার। ভালুমারে সকলে সত্যিই বোধ হয় এত-দিনে নিজেদের জোরের কথা বুঝতে শিখেছে। সবে শিখেছে। বড়ই আনন্দের কথা। আর ভয় নেই।

রথীদা একা এগিয়ে এলেন। এতক্ষণ মাংসের দোকানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফিল্মের ফ্রিজ শটের মতো। নান্‌কুর দিকে চেয়ে বললেন, কি রে? তোর পাগলা সাহেবকে চিনতে পর্যন্ত পারছিস না দেখছি। এত বড় নেতা হয়ে গেছিস?

নান্‌কু পাগলা সাহেবের দিকে তাকাল একবার। তারপর, রহস্যজনক হাসি হেসে বলল, কে আপনি? সত্যিই কিন্তু আপনাকে চিনতে পারলাম না।

রথীদা হাটশুদ্ধ লোকের সামনে অপমানিত হয়ে চলে যাওয়া নান্‌কুর দিকে চেয়ে হঠাৎ শব্দ করে...হঠাৎই থুথু ফেললেন ওর দিকেই।

হাটশুদ্ধু লোক দম বন্ধ করে রইল। নান্‌কু ঘুরে দাঁড়াল। যেখানে হাটের লাল ধুলোয় থুথুটা পড়েছিল, সেই অবধি ফিরে এল। তারপর থুথুটা মাটিতে পড়ে থাকা একটি শালপাতার দোনায় করে দু'হাতে নিয়ে রথীদার কাছে ফিরে এল।

আমার ভীষণ ভয় করতে লাগল, এবার কী করবে নান্‌কু তা ভেবে। ভাবলাম, রথীদার থুথু রথীদাকে দিয়েই হয়ত গেলাবে। নান্‌কু ছেলেটা গত অল্প ক'দিনে অনেকটাই বদলে গেছে। নিকট আত্মীয় কেউ পাগল হয়ে গেলে অন্য নিকট আত্মীয় চোখে তাকে দেখে যেমন ভাব হয়, রথীদার চোখেও তেমন ভাব ফুটে উঠল।

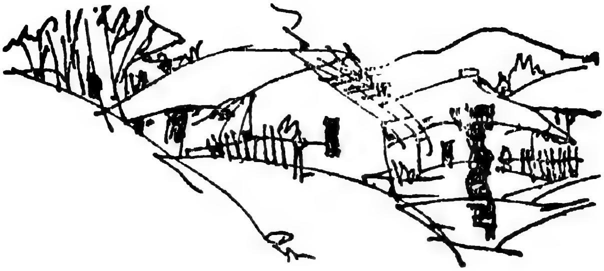
তবু রথীদা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, নিমকহারাম।

নান্‌কু হাসল। সে কথার কোনো জবাব দিল না।

বলল, হাত পাতুন।

রথীদা দু'হাত ভিক্ষা চাওয়ার মতো করে সামনে মেলে ধরলেন। নান্‌কু সেই প্রসারিত হাতে দোনা ভরা থুথু তুলে দিয়ে ফিরে গেল। দু'পা গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, থুকিয়ে মত্‌ পাগ্‌লা সাহাব। থুক্‌নেওয়ালেকো সিরফ্‌ থুক্‌ই মিলতা আখের মে। অপনা ইজ্জৎ সাম্‌হালকে অপনা জেব্‌ মে রাখিয়ে।

বলেই, আর একবারও পিছনে না তাকিয়ে নান্‌কু মিলিয়ে গেল গামছা আর চুড়ির দোকানগুলোর পাশ দিয়ে, থোকা-থোকা ফুল ভরা পলাশ গাছগুলোর নিচ দিয়ে, গড়ানো পথ বেয়ে জঙ্গলের ধুলিধূসরিত গভীরে, শেষ বিকেলের কমলা আলোয়



একদিনের পক্ষে অনেকেই ঘটনা ঘটে গেল। এখন রাত অনেক। জানালা খুলে, তার সামনে ইজিচেয়ার পেতে বসে আছি। প্রথমে রাতে তিতলিকে আদর করেছিলাম। মধ্যে যে অশেষ উত্তেজনা গড়ে উঠেছিল বিকেলে, তা এখন প্রশমিত। নারীকে বিধাতা গড়েছেন পুরুষের ঢেউ-ভাঙার তটভূমি করে। ঢেউ গর্জায়, ঢেউ ওঠে, ঢেউ পড়ে। কিন্তু সৃষ্টির প্রথম থেকে তটভূমি তার নীরব পেলব শান্তি দিয়ে পৃথিবীর সব সমুদ্রের ঢেউয়ের উচ্ছ্বাসকে শুষে নিয়েছে। শুষে নিজে নিজে আরও পেলব, কোমল হয়েছে ভাগিস্ নারীকে গড়েছিলেন বিধাতা! নইলে পুরুষকে যে আদিগন্ত কূলহীন, ডাইনী-কান্নার সমুদ্র হয়েই অনন্তকাল ধরে নিজের আর মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করে আছড়ে মরতে হত!

তিতলি শেষ রাতে আদর খেতে খুব ভালবাসে। যদিও মুখে কখনও বলে না কিছু। কিন্তু আমি বুঝতে পারি ঠিকই। বিশুদ্ধ ভারতীয় গ্রামীণ লজ্জায় রাঙিয়ে থাকে ও। আমি জানি না ওই-ই আমাদের বন-পাহাড়ের সব নারীদের প্রতিভূ কী না। অবশ্য একজনকে দেখেই অন্য সকলের সম্বন্ধে ধারণা করি কী করে। ব্যক্তিমাত্রই যে আলাদা

হাওয়া ছেড়েছে একটা! গরমের রুক্ষ দিনকে শীতল করে রাতচরা পাখি, জানোয়ার, সরীসৃপ আর কীট-পতঙ্গের গায়ের গন্ধ মেখে কত জানা ও অজানা ফুলের লতার, তৃণের শান্ত ধুলোর গন্ধ, গায়ে তার বালাপোষের মতো জড়িয়ে নিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে সে হাওয়ায়। চিতলের হরিণের ডাক ভেসে আসছে থেকে থেকে। চমকে চমকে হরিণ আর হরিণীদের ডাক পৃথকভাবে উৎসারিত হচ্ছে রাতের জঙ্গলের প্রায়ান্ধকার গর্ভ থেকে।

মাহাতোর ক্রূর, নিষ্ঠুর হৃদয়হীন মুখ আর আমার হতভম্ব, লজ্জিত চোখের সামনে জড়োসড়ো, নিরুপায়, বিবস্ত্রা মুঞ্জরীর করুণ মুখচ্ছবি বারবারই ফুটে উঠেছে। ঐ লজ্জাকর অভিজ্ঞতার কথা মনে হতেই এও মনে হচ্ছে যে, বিধাতা নারীদের বড় সুন্দর করে, যত্ন করে গড়েছেন। আবৃত অবস্থাতে যে নারী অতি সাধারণ, অনাবৃত হলে সেই-ই কত মোহময় সুন্দরী! মুঞ্জরীর চুল ছড়িয়ে পড়েছিল তার বাঁ বুকের ওপর দিয়ে নাভি অবধি। রুক্ষ স্তনযুগলে ভীতত্রস্ত ঢেউয়ের দুলুনী লেগেছিল। প্রথম আকস্মিকতায় বুক দুহাত দিয়ে আড়াল করে রেখেই পরক্ষণেই বুক উন্মুক্ত করে দিয়ে দুহাত দিয়ে উরুসন্ধি আড়াল করেছিল মুঞ্জরী স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিফ্লেক্স অ্যাকশনে।

আমাদের দেশের গ্রামীণ নারীদের শালীনতাবোধ, লজ্জাবোধ নিয়ে ঠাট্টা করার অবকাশ নেই কোনো। শহরের বিত্তশালিনী, শিক্ষিতারা তাঁদের অর্ধনগ্নতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন আজকাল। বিজ্ঞাপনে নারীদেহ প্রধান ব্যবহার্য জিনিস। কিন্তু সেই নগরকেন্দ্রিক ভারতবর্ষের নারীদের সঙ্গে আসল ভারতবর্ষের নারীদের মিল

থাকলেও, তা সামান্যই। আসল ভারতবর্ষ যে এখনও ভালুমারেই ঘুমিয়ে পড়ে, থেমে আছে।

চমৎকার দেখাচ্ছে এখন, গভীর রাতের বাইরের প্রকৃতিকে। গরমের সময় জঙ্গলের নীচের আগাছা পরিষ্কার হয়ে যায়। তাই বহুদূর অবধি নজর চলে। পত্রশূন্য গাছেদের ডালে ডালে কাঁপন জাগিয়ে পত্রময় গাছ-গাছালির ডালে-ডালে উদাসী হাওয়াটা হঠাৎ কাঁপন জাগিয়ে নিজেকে মিলিয়ে দিচ্ছে। এই দিগন্তের গর্ভে অনেকই দিগন্ত লীন হয়ে থাকে ; দেখা যায় না। আলাদা অস্তিত্ব থাকে না তখন হাওয়ার আর পরিবেশের ; কাছের আর দূরের। বিশেষ করে রাতে। সব জড়িয়ে-মড়িয়ে মিলেমেশে এক হয়ে আছে। পরিপূর্ণতা, নিটোল সম্পৃক্ততা হাসছে যেন চতুর্দিকে। নিঃশব্দে।

ভাবছিলাম, মাহাতোকে কি নান্কু সত্যিই বদলে দিয়ে গেল? ঠেলে তুলে জাগিয়ে দিয়ে গেল কি ভালুমারের মানুষগুলোকেও যুগযুগান্তের ঘুম থেকে? নান্কু যখন এমন দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বিশ্বাস করে চলে গেল তখন তা সত্যি না হয়ে যায় না। গোদা শেঠ আর মাহাতোরা যদি নিজেদের লোভ আর মুনাফা একটু কমিয়ে সকলের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সত্যি সত্যিই দাঁড়ায় তাহলে ভালুমারের চেহারাই পাল্টে যাবে। এই মুহূর্তে, আজ রাতে, যত মানুষ শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে এই দীর্ঘ, তাপময় রাত ভোর হওয়ার অপেক্ষা করছে আর ভাবছে কী করে কালকের অন্ন জোটাবে, তাদের সমস্যার সুরাহা হতে পারে গোদা শেঠ আর মাহাতো পাশে এসে দাঁড়ালেই।

এখন সকলেই ঘুমচ্ছে। হীরু আর টিসি ওরাওঁ-এর মা-বাবা, আর ভাই লগন, রাম্ধনীয়া চাচা, মানি-মুঞ্জরী, বুলকি-পরেশনাথ, লোহার চাচা, রথীদা, মাহাতো, গোদা শেঠ। একজন মানুষের ঘুম এক একরকমের। চামার দুখী, গাড়ু বস্তির কসাই আকবর মিঞা, ট্রাক-ড্রাইভার টুসু, খালাসী রামনাথ ও চেতন, অশ্বত্থতলার পান বিড়ির দোকানী ভিখু, ডাইনীর মতো গর্ভপাত-বিশেষজ্ঞা শনিচারোয়া আর তার বোন বিস্পাতিয়া, তিতলির মা, কত মানুষ! বিভিন্ন তাদের অবস্থা, বিভিন্ন তাদের জগৎ বিভিন্ন মানসিকতা, এই বস্তিতে থেকেও জটিলতায় এ অন্ধকারে কত বিভিন্ন তাদের পরিবেশ!

চিপাদোহরে ঘুমোচ্ছেন নিতাইবাবু, গজেনবাবু, আর গণেশ মাস্টার, ঘুমচ্ছে অনেক দূরের গহীন রাতের গ্রাম বউপালানো লাল্টু পান্ডে। ঘুমচ্ছেন আমার প্রাক্তন মালিক রোশনলালবাবু। প্রত্যেক মানুষই এখন ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরছে, শ্বাস ফেলছে, তার নিজ-নিজ সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা ন্যায়-অন্যায়ের ভাবনা, পরদিনের ভাবনা, পরের মাসের ভাবনা, পরের বছরের ভাবনা ঘুমের মধ্যেই জলছবি হয়ে ঘুমন্ত মুখে ফুটে উঠছে প্রত্যেকের।

কেউ কেউ ভাবছে, পরের জীবনের ভাবনা। কেউ বা ভাবছে অন্যের ভালো করার যথা ; কেউ ভাবছে, অন্যের ক্ষতি করার কথা, অন্যকে দুঃখী করার কথা।

আবার কেউ ভাবছে, কিছুমাত্র করে কীই বা লাভ? -

কেউ বা ভাবছে, একাকী রাতের এই মুহূর্তে : মানুষ হয়ে মানুষ কেন জন্মায়? শুধু কি দু'বেলা খাবারই জন্যে? স্ত্রীকে রমণ করার জন্যে? সংসার প্রতিপালন করে বিশুদ্ধ সাদা পাঁঠা অথবা দুধেল, সুলক্ষণা লাল গাই-এর মতো নিরুপদ্রব অন্যনির্ধারিত নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করার জন্যেই কি? লাল্টু পান্ডের মতো কবিরা হয়তো ভাবছে কবিতা মানুষ কেন লেখে? অন্যকে আনন্দ দেবার জন্যে? নিজেকে আনন্দিত করার

জন্যে? টাকা রোজগার করার জন্যে? যশঃপ্রার্থী ভিখারি হবার জন্যে? না, অন্যতর এবং মহৎ কোনো কারণে?

এই মৃদুশব্দ, নিবিড় আলোছায়ার হাওয়ার-বওয়া রাতে ভালুমারেরই মতো, বিরাট আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের বন-পাহাড়. আর গ্রামগঞ্জের ছোট ছোট অসংখ্য ঘুমন্ত গ্রামগুলি ঘুমে. আধোঘুমো, কোটি কোটি মানুষই ভাবছে।

আর নানকু

সেই অল্পবয়সী ছেলেগুলো

ওরাও কি ভাবছে?

প্রকৃত ক্ষমতা সত্যিই কি বন্দুকের নলে নেই? আছে, মানুষের মনের জোরের মধ্যে? সত্যি! একই বিশ্বাসের ছায়ায় একত্রিত মানুষেরই মনের জোরের কাছে অন্য সব জোরই কি পরাভূত হয়? নানকু কি ঠিক জানে? সব সময়ই ঠিক?

বাইরে দূরে প্রস্তরাকীর্ণ শুকনো নালার মধ্যে দিয়ে বাঘের তাড়াখাওয়া শম্বরের দলের মতো রুখু হাওয়া ধেয়ে যাচ্ছে দামাল কলরবে। বৌ-কথা-কও ডাকছে। এই গভীর রাতে চাঁদের বনে চমক তুলে কোন অদেখা বৌএর মান ভাঙাতে নানা জাতের কাঠ-ঠোকরা কাঠ ঠুকছে। কত যুগযুগান্ত ধরে না জানি এই বন আমার জন্যে তার সর্বস্বতা নিয়ে অপেক্ষা করে ছিল! কবে আমি আসব। এসে মিলিত হব তার সঙ্গে, আমার পরমার সঙ্গে সেই অভিলাষে। আমার গর্ভবতী, মানুষী ঘুমন্ত স্ত্রীকে পাশে নিয়ে শুয়ে এই গভীর গা-ছমছম রাতে আমার যেন হঠাৎ মনে হল সাংসারিক সুখ আমার জন্যে নয়। আমি সংসারের নই। তার চেয়ে বড় কী না জানি না, তবে তার চেয়ে-অনেক গভীরতর কোনো কিছুর সঙ্গে আমার জন্ম-জন্মান্তরের যোগ ছিল। সেই যোগ-সূত্র আবার স্থাপিত হতে চলেছে। এক অমোঘ বোধের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে বুঝতে পারছিলাম যে মনে মনে চিরদিনের জন্যে আমি বনেরই হয়ে গেলাম। এই জন্মের মতো, চিরজন্মের মতো। চাঁদের রাতে, সমস্ত পাহাড় বন যখন বন-জ্যোৎস্নায় এক আশ্চর্য রহস্যময় মায়ার ওড়নায় নিজেকে মুড়ে রাখে, তখন পাহাড়তলির গভীর রহস্যময় ঘনান্ধকার থেকে কপারস্মিথ্ পাখি ডাকতে থাকে টাকু-টাকু-টাকু...। হাওযার দোলা লেগে বাঁশবন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাঁশে বাঁশে ঘষাঘষি লেগে কট্‌কাট আওয়াজ ওঠে। সেই আওয়াজটাও কেমন যেন অপার্থিব। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কাকজ্যোৎস্নায় বন ভাসে। বনভাসি সাদা চাঁদে মসৃণ চিল্‌বিল্ গাছের আন্দোলিত সারিগুলিকে নিচের উপত্যকায় মনে হয় একদল নগ্না শ্বেতাঙ্গিনী স্থির শরীরে হাত নেড়ে নেড়ে কোনো ফিস্‌ফিসে সমবেত গান গাইছে। তাদের কামনার, তাদের বিরহের শ্বাস এই রাতের বনের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে।

এমন সব রাতে, শিলাসনে বসে একা একা অনেক কথা মনে করতে ইচ্ছে করে আমার, না। পাশে আর কাউকে নিয়েই নয়। তিতলিকেও নয়। এমনকি জিন্ যদি আমাকে বিয়ে করতেন, তবু তাঁকে নিযেও নয়। পরমাব কাছে থাকলে কোনো দ্বিতীয়ারই ঠাঁই হয় না তখন।

আজকাল আমার প্রায়ই অ্যাল্‌গারনন্ ব্লাকউডের নানা লেখার কথা মনে পড়ে। ওঁর কিছু কিছু লেখার মধ্যেও বিভূতিভূষণের লেখার মতো গা-ছম্‌ছম্ ব্যাপার আছে। মনের মধ্যে সে সব লেখা নানারকম প্রশ্ন জাগায়। ভৌতিক, আধিভৌতিক। যারা এমন পরিবেশে একা একা কখনও না থেকেছেন বা ঘুরেছেন বছরের পর বছর তারা আমার অশিক্ষা এবং কুসংস্কার নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে পারেন। আমার পুরানো আমিও সেই

আমিকে নিয়ে অনেক হাসি-ঠাট্টা করেছি একসময়। আজকাল কেন যেন পারি না। মনে হয়, নিজের মনের গভীরে যা বোধ করি, যা বিশ্বাস করি, তা প্রকাশ করতে লজ্জা কিসের? আমি তো শিরোপা চাই না কারো কাছ থেকেই। চাই না কারো পুরস্কার। যিনি আমার সৃষ্টিকর্তা তাঁর পুরস্কারই আমার কাছে যথেষ্ট। শহুরে, ইংরিজীকেতায় উচ্চশিক্ষিত, সর্বজ্ঞদের আমার কথা বোঝানোর কোনো ইচ্ছা বা দায় আমার নেই।



গরমের শেষে এসে পৌঁছনো গেল। এবার বর্ষা নামবে। ডালটনগঞ্জের গুজরাটে বিড়ি-পাতার ব্যবসায়ীদের বাড়ি বাড়ি বৃষ্টি না-নামার জন্য পুজো চড়েছে আবার! আর ভালুমারের ঘরে ঘরে প্রার্থনা, বৃষ্টি নামার জন্য।

তিতলি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শিখছে। হিন্দি, ইংরেজী এমন কি বাংলাও। আমার আর ওর নাম এখন ও বাংলায় লিখতে পারে। অবশ্য, শুধুই নাম। মুখার্জীকে এখন লিখছে মুকাজ্জী।

আমি মুখোপাধ্যায়। মুখার্জী নই। মুকাজ্জী ত নই-ই আগে ও মুখার্জীই লিখতে শিখুক তারপর মুখোপাধ্যায়ের ঝামেলাতে যাব। ডালটনগঞ্জে একজন বাঙালী এস-ডি-ও ছিলেন। তাঁরই সুপারিশে আমার চাকরিটি হয়েছিল রোশনলালবাবুর কোম্পানীতে। ওঁকে বায়োডাটা পাঠিয়েছিলাম টাইপ করে। তার সঙ্গে একটা দরখাস্তও টাইপ করে নিয়ে নিজেই আমার নাম সই করে দিয়েছিলেন সায়ন মুখার্জী বলে। যদিও বায়োডাটাতে মুখোপাধ্যায়ই ছিল। সেই থেকে মুখোপাধ্যায়, মুখার্জী।

ইংরিজী বাংলা দুই-ই শিখে নিতে পারলে হিন্দির সঙ্গে, তিতলি আমার সত্যিকারের বন্ধু হবে। ওকে রবীন্দ্রনাথ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ সব পড়াব। আধুনিক কবি ও লেখকদের লেখাও পড়াব। কত কী করব ওকে নিয়ে। শিক্ষা ত আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ত শুধু বিদ্যা শিক্ষার ইচ্ছাটাকেই জাগরূক করে দিতে পারে কারো মনে। তার বেশি কিছু নয়। কে শিক্ষিত হবে আর কে হবে না, তা ত ঠিক হবে সেই স্নাতকোত্তর মানসিকতায় পৌঁছেই। এবং পরবর্তী জীবনে।

এই দুপুরের অবসরের মুহূর্তে আমার অন্যতম প্রিয় বই ওয়ালট্ হুইটম্যানের লীভস্ অফ্ গ্রাস পড়েছি বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে, খুঁটির ওপর দুই পা তুলে দিয়ে। যে লাইন কটি আমার চোখের সামনে আছে তার মানে যদি বুঝতে পারত তিতলি! আমার সঙ্গে যদি আলোচনা করতে পারত এই কবিতার কবিত্বগুণ নিয়ে! পারবে। আমি ঠিক জানি, আমাদের ছেলে অথবা মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে ও-ও সবই শিখে নেবে। একটু দেরি হবে এই-ই যার বুদ্ধির কোনো অভাব নেই ওর, সুযোগের অভাব ছিল শুধু।

বড় ভাল লাগে আমার এই বইখানি। কত বার যে পড়ি, বারে বারে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, কখন পুরনো মনে হয় না! প্রতিবারই নতুন থেকে নতুনতর মানে ঠিকরোতে থাকে, রবীন্দ্রনাথের লেখারই মতো। এঁরাই হলেন লেখকের মতো লেখক, কবির মতো কবি, যাঁদের লেখা যত পুরনো হয় ততই বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে।

তিতলিকে ইকোলজি বা পরিবেশতত্ত্ব সম্বন্ধে শেখাব পরে। ওর মধ্যে এমনিতেই

এক গভীর ভগবৎ-বিশ্বাস আছে। কিন্তু সে বিশ্বাস, বজরঙবলী, বা হনুমান-ঝাণ্ডা বা বনদেওতা থেকে সরিয়ে এনে নিরাকার অথচ সমস্ত আকার যেখানে দিগন্তে দিগন্তে অবলুপ্ত, পরিপ্লুত, সেই প্রকৃতি অথবা পরমাপ্রকৃতির মধ্যে স্থানান্তরিত করব। আজ-কাল ভগবান মানেন না কোনো কোনো শিক্ষিত মানুষ। তথাকথিত শিক্ষা আর চটকদার আধুনিকতা মানুষকে উগ্র দুর্বিনয়ের শিকার করেছে। ভগবৎ-বিশ্বাসটা আজকাল আউট-অফ-ফ্যাশান, প্রিমিটিভ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অ্যাগ্‌নস্টিক্, মডার্ন, সায়েন্টিফিক হয়েছে মানুষ। তাদের বোঝাব কী করে? এই জঙ্গলের গর্তে পড়ে-থাকা অশিক্ষিত বাঁশবাবু আমি, কীই বা আমার সাধ্য বা উপায়? এবং জ্ঞান? প্রশান্ত মহাসাগরের কোরাল রীফস্ এ একরকমের কীট হয়। তাদের নাম পাওলোলো। চাঁদের সঙ্গে তাদের যৌনজীবন এবং বংশবৃদ্ধি বাঁধা। এই কীটদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ তাদের জননেন্দ্রিয় জননক্ষম হয়ে ওঠে প্রতি বছর চাঁদের শেষ পক্ষে। এক বিশেষ দিনে, বিশেষ সময়ে, প্রত্যেক বছর এই আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। ঘটে আসছে, হয়ত সৃষ্টির আদি থেকেই। মানুষ এ কথা জানল মাত্র এই সেদিন। আর জেনেই ভাবল, সবই জেনে ফেলেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার কাছের প্রশান্ত মহাসাগরে এক রকমের ছোট্ট ছোট্ট মাছ দেখা যায়। তাদের নাম গ্রুনিয়ন। এই মাছেরা প্রতি বছর নাটকীয় ভাবে প্রজনন ক্রিয়া শেষ করে। মার্চ থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে সমুদ্রের ভরাতম জোয়ারে তার ডিম ছাড়ে। জোয়ার, ভাঁটার সঙ্গে ত চাঁদের সম্পর্ক নিবিড়ই। ভরা-জোয়ারের পর যখন ভাঁটি দিতে থাকে সমুদ্র, তখন মেয়ে গ্রুনিয়ন্‌রা তটভূমিতে আছড়ে পড়ে। বালিতে লেজ ঢুকিয়ে দিয়ে ডিম ছাড়ে বালির মধ্যে আর পুরুষ গ্রুনিয়ন্‌রা সেই ডিমগুলোকে ফার্টিলাইজ করে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। ভাঁটার টানে টানে বালির পরতের পর পরত তাদের ডিম্বকে যাতে আড়াল করে ঢেকে রাখতে পারে সেই জন্যেই তারা ভরা-জোয়ারের অব্যবহিত পরই ভাঁটা দেওয়ার সময়ই এমন করে। যতদিন না সমুদ্র আবার ভরা জোয়ারে অতখানিই উপরে উঠছে, ততদিন, মানে দু' সপ্তাহ সময় পায় ডিমগুলো বালির নিচে তাপে থাকার। দু-সপ্তাহ পরে যখন আবার ভরা জোয়ারের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে বালি-চাপা ডিমগুলোর উপর, ততদিন ভিতরের ভিতরে প্রকৃতি তার কাজ শেষ করে রেখেছেন। ঢেউয়ের আঘাতে উল্টি-পাল্টি খেয়ে মাছের পূর্ণাবয়ব বাচ্চা মেমব্রেন ছিঁড়ে বেরিয়ে সমুদ্রে সাঁতারে যায় অবলীলায়।

কে এই সব কোটি কোটি পোকা, মাকড়, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি, প্রত্যেকের হিসেব রাখেন চুল-চেরা? তাদের জন্ম, বাড়, মিলন, প্রজনন, মৃত্যুর? তাদের খাবার সংস্থান করেন কে? কে চন্দ্র সূর্য গ্রহ, তারাকে নিজের নিজের জায়গায় ঘূর্ণায়মাণ রেখে এত বড় বিশ্বসংসারকে ধারণ এবং পালন করেন? তিনি কি কেউ নন? আজকে তাঁর সামান্য ক্রিয়াকাণ্ড আবিষ্কার করতে পেরেছে বলে মানুষ ভাবে, আবিষ্কারকই নিয়ন্তা।

আমার মা একটি গান গাইতেন। খাম্বাজ রাগে বাধা। ব্রহ্ম সঙ্গীত। "কেন ভোলো, মনে করো তাঁরে। যে সৃজন পালন করে এ সংসারে। সর্বত্র আছে গমন, অথচ নাহি চরণ কর নাহি করে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল হেরে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার, দ্বিতীয় নাহিক আর, নির্বিকার বিশ্বাধার, কে পারে বর্ণিতে তাঁরে?" গানটি খুব সম্ভব নিমাইচরণ মিত্রের লেখা। ব্রহ্ম সঙ্গীতের বইয়েতেও আছে বোধহয় গানটি। আমার ভুলও হতে পারে। ছোটবেলার কথা।

এতদিনে মানুষের টনক নড়েছে। মরুভূমিতে, সমুদ্রের তলায়, মহাকাশে সব জায়গায় তার নোংরা হাতে তৈরী পারমাণবিক, মহাপারমাণবিক ধ্বংসবীজ বানিয়ে, ফাটিয়ে খোদার ওপর খোদ্‌কারী প্রতিনিয়ত করতে করতে আজ হঠাৎ এতদিন পরে বুঝতে পারছে সে, যে তার নিজেরই হাতে নিজের ছোট সবুজ বাগান, শোবার ঘর, নিজের গোপনীয়তা,

নির্জনতা আড়াল, শান্তি সবকিছুই নষ্ট করে ফেলতে বসেছে।

কিন্তু বড় দেরি হয়ে যায় কি? উপায় কি আর আছে? আজকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আর শুধু রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বা অর্থনৈতিক ব্যাপারেই একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল নয়, আজ তারা সকলে মিলে অন্তত আংশিকভাবে একে অন্যের ভাগ্য নির্ধারণ করছে, করছে ভবিষ্যৎ। প্রকৃতিকে নষ্ট করার জন্যে, পরিবেশকে নষ্ট করার জন্যে, যা কিছু যে কোনো দেশ আজ করছে তাদের লোভে, তাদের অদূরদর্শিতায় তাদের আকাট মূর্খামিতে, সেই সব কিছুই নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করছে অন্যদের সকলের অদৃষ্ট। আজকে ভালুমারের আকাশ, বাতাস, হাওয়া দূষিত হলে, জঙ্গল কেটে ফেললে, তার প্রভাব পড়বে হয়ত থাইল্যান্ডে অথবা চীনে অথবা রাশিয়াতে। ইউনাইটেড স্টেট্স-এর অথবা ইয়োরোপের আবহাওয়া দূষিত অথবা বন-জঙ্গলে নষ্ট হয়ে গেলে সেখানকার বাসিন্দারদের যতখানি ক্ষতি হবে ঠিক ততখানিই ক্ষতি হয়ত হবে আইসল্যান্ড অথবা সলোমান দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাদের। প্রকৃতির সুন্দর সব পশু-পাখি, ফুল, গাছ, প্রজাপতি, মাছ যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তবে তা হাজারীবাগের চায়ের দোকানীকে যেমন প্রভাবান্বিত করবে, তেমনি করবে আহমেদাবাদের কাপড়ের কলের মজদুরদের যেমন করবে বালী-গঞ্জের রেস্তোরার খদ্দেরদের অথবা লানডান্ শহরের একজন বাস ড্রাইভারকে কিংবা সেসেলস দ্বীপপুঞ্জের ছোট-আইল্যান্ড প্লেন-চালানো পাইলটদেরও।

আমি জানি, উচ্চশিক্ষিত আধুনিক-মানুষরা এমনকি আমার ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েরাও আমাকে নিয়ে হাসবে, আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রা বা নির্দেশক বা পালক আছেন যে, একথা এই বিংশ একবিংশ শতাব্দীতে গভীরভাবে বিশ্বাস করার কারণে। কিন্তু একদিন তথাকথিত গর্বিত, শিক্ষিত, বিজ্ঞান-বিশ্বাসী মানুষ চোখের জলে অথবা পূর্ণ-অন্ধত্বে আমার বিশ্বাসে তাদের বিশ্বাস মেলাবে বিজ্ঞান মহৎ। কিন্তু ভগবৎ-বোধ মহত্তর। চরণ ছাড়াই যিনি সর্বত্র গমন করেন, নয়ন ছাড়ই যিনি সব দেখেন, কর করে গ্রহণ না করেও যিনি উষ্ণতা ছড়িয়ে দিতে জানেন পালিতদের হৃদয়ে, তাঁর সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো বিরোধিতা নেই। তিনি প্রচন্ড, আদিগন্ত, অনন্ত, অন্ধকার রাত। আর বিজ্ঞান প্রদীপ। বিজ্ঞান তাকে অতিক্রম করতে পারে না, কখনও পারবে না, বিজ্ঞান শুধু তাকে আবিষ্কার করবে তার সামান্যতায়। বিজ্ঞানের দম্ভ, শিক্ষার গর্ব, সর্বজ্ঞতার মূর্খামি যতদিন না মানুষ ত্যাগ করতে পারছে, ততদিন তাকে তার সর্বনাশের পথ থেকে কেউই ফেরাতে পারবে না।



বর্ষা এসে গেছে।

মহাসমারোহে। প্রথম প্রবেশেই সে তার দীর্ঘ অনুপস্থিতি পুষিয়ে দিয়েছে। সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে পরশু। কাল এবং আজও হয়েছে, তবে কম। গাছে গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে। অসংখ্য। রাতারাতি। প্রকৃতি, ধুলোর মধ্যে, রুক্ষতার মধ্যে, জ্বালার মধ্যে, এত প্রাণ কী করে যে লুকিয়ে রাখেন, তা প্রকৃতিই জানেন। গ্রীষ্মশেষে বর্ষা আসার প্রথম দিনটিতে যদি কেউ জঙ্গলের বুকের কোরকে না থেকে থাকেন কখনও, তাহলে এই অনুভূতির সত্য ও যথার্থ্য তাঁকে লিখে বোঝানো যাবে না। এ ফুলশয্যার রাতের পরের সকাল যেন। ঝরা-ফুল, ঝরা-পাতা, খোয়াইয়ে প্রকৃতির কোলে বছরের প্রথম কর্ষণ, ঘর্ষণ এবং বর্ষণের জল বয়ে যাওয়ার চিহ্ন, এ সবই যেন তার কুমারী জীবন পিছনে ফেলে আসার মিষ্টি কষ্টের সাক্ষী হয়ে রয়েছে! রাতারাতি কত কীই-ই না বদলে গেছে! আমাদের ডেরার পেয়ারা গাছের প্রতি ডালে ডালে কচি-কলাপাতা সবুজ রঙা পাতার অংকুর এসেছে। গাছে গাছে পাখিরা আনন্দে ওড়াউড়ি করছে। এখন রোদ পড়ে এসেছে। কচিকলাপাতা সবুজ রঙা পাতার অংকুর এসেছে গাছে গাছে সবে। কিশলয়ও নয়, কিশলয়ের আভাসমাত্র যেন।

পরশু রাতে হুলুক্ পাহাড়ের নিচের গভীর জঙ্গলাকীর্ণ অন্ধকার খাদে শম্বরের দল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ঘবক্ ঘাক্ আওয়াজে ডাকাডাকি করে তাদের বর্ষাবিরণের আন্দাজ জানান দিয়েছে দিকে দিকে। তৃষিত, সোঁদামাটির গন্ধ, ওদের গায়ের গন্ধের সঙ্গে মিশে বৃষ্টির ছাঁটের সঙ্গে চারিদিকে ছিটিয়ে গেছে। জলের সঙ্গে, গন্ধও ভিজেছে বন বনান্তরে। গুড়ু গুড়ু গুড়ু বাজের শব্দ মাদল বাজিয়ে বর্ষার আগমন ঘোষণা করছে আর ঘন ঘন বিদ্যুৎ পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

কোটরা হরিণ ডাকছে। ভয়-পাওয়া ডাক নয় এ। আনন্দের ডাক। একবার করে ডাকছে, আবার বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে দৌড়ে যাচ্ছে। তাদের ব্বাক্ ব্বাক্ আওয়াজ প্রথম জল-পাওয়া পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে প্রজাপতি আর পাখিদের জল-ভেজা মসৃণ ডানায় পিছলে গিয়ে সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে চারিয়ে যাচ্ছে আজ বিকেলে। দীর্ঘ তপস্যার পর কুমারী প্রকৃতি বর্ষাপুরুষের সহস্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জলসিক্ত আদরে গর্বিতা, গর্ভিণী হয়ে গেছে রাতারাতি, ভালুমারের মানুষদের স্বস্তির নিঃশ্বাস বইছে ঠান্ডা, স্নিগ্ধ হাওয়ায়।

তিতলি একটা মস্ত হাই তুলল। শেষে বিকেলে বারান্দায় বসে চায়ের পেয়ালা হাতে আমি ওকে দেখছিলাম। তিতলিকে কাছে ডাকলাম। রঙ্গনের ডালে পুরুষ বুলবুলি তার সঙ্গিনীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ফিস্ করে কত কী বলছে। কথা,

তার আর শেষ হচ্ছে না।

বনবাংলোতে হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের ভ্যান এসেছে কাল সকালে। সঙ্গে ডাক্তার কমপাউন্ডারও এসেছেন। ভ্যাসেক্‌টমি ও টিউবোক্‌টমি করবেন বলে। যারাই করাতে চায়, তাদেরই অপারেশন করবেন। টাকাও দেবেন। তবু কেউই করাতে চাইছে না। কুসংস্কার, অজ্ঞতা, আর যা কিছুই নতুন তাঁর প্রতি এক গভীর অনীহা আর অসূয়া এদের মজ্জার গভীরে প্রোথিত হয়ে রয়েছে।

কাল প্রথমে বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে আমি গিয়ে পড়েছিলাম বাংলোর দিকে। সেখানে পৌঁছে এক কৌতুকাবহ অথচ শোকাবহ ঘটনার সম্মুখীন হলাম। দেখি টিহুল কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড তোড়ে ডাক্তারবাবুকে গালাগালি করছে। চারপাশে কিছু নিষ্কর্মা লোকও জমে গেছে। টিহুল দারুণই উত্তেজিত। সুন্দরী বউকে তাড়িয়ে দেবার পর গাড়ুর মেয়েটির সঙ্গে নতুন করে ঘর পাতে ও তখন নাকি মেয়েটি শর্ত করিয়ে নিয়েছিল যে, টিহুল অপারেশন্‌ করিয়ে নেবে, যাতে ওদের আর ছেলেমেয়ে না হয়। আগের পক্ষের দুটিই যথেষ্ট। বাধ্য ছেলের মতো, চিপাদোহরে মাস ছয়েক আগে তখন গিয়ে অপরেশন্‌ করিয়েও আসে ও। কিন্তু টিহুলের নতুন স্ত্রী নাকি মাস দুই হল অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। টিহুল ডাক্তারবাবুর মুণ্ডপাত করে বলছে, যো নেহি কাটায়া উওভি পস্তায়া, ঔর যো কাটোয়া লিয়া উওভি। ঈ ক্যা বাত।

ডাক্তারবাবু, দেখলাম অনেকই বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে। টিহুলের বর্তমান স্ত্রীর নাম সহেলী। বেশ ভাল দেখতে সে। মনে হয়, সব সুন্দরী মেয়েরা টিহুলের জন্যেই এ জন্মে নির্দিষ্ট ছিল। প্রথম ডানা-কাটা বউকে না হয় সম্বন্ধ করেই বিয়ে করেছিল, কিন্তু এ মেয়েটি ত স্বেচ্ছায়ই টিহুলকে বিয়ে করেছে। জানি না সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতীরা টিহুলের মতো বোকা-সোকা ভালোমানুষকেই বোধহয় পছন্দ করে স্বামী হিসেবে। সহেলী ভাল দড়ি বানায়। জঙ্গল থেকে ঘাস ও মোরব্বা কেটে এনে তা থেকেই বানায় দড়ি। বড় ছেলেটির বয়স বছর সাতেক। সেও মাকে সাহায্য করে। সেই দড়ি নিয়ে গিয়ে বেচে হাটে। লাটাখাম্বার সঙ্গে বেঁধে কুয়ো থেকে বাল্টি করে জল তোলার জন্যে, কেউ কেউ কেনে গরু মোষ বাঁধার জন্যে। অন্য প্রয়োজনেও কেনে। ভালই রোজগার। টিহুলও একটা চাকরি পেয়েছে কাছের হুলুদু ফরেস্ট বাংলোতে। রোজ ভোরে কাজে যায় পাঁচ মাইল হেঁটে জঙ্গলের পাকদণ্ডী দিয়ে, সঙ্গে খাবার নিয়ে। আবার ফিরে আসে বেলা পড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গেই। বেশী সন্তান মানেই যে দুঃখ, তা টিহুল এবং তার নতুন বৌ বোঝে বলেই নিজের ঔরসজাত একটি সন্তান না থাকলেও টিহুল ঐ বন্দোবস্তে বোধহয় রাজী হয়েছিল। দুজনে মিলে যা রোজগার করে তাতে বেশ ভাল মতোই দিন কেটে-যাচ্ছিল ওদের। হঠাৎ এই উট্‌কো বিপত্তি।

টিহুলের চেঁচামেচি ও গালিগালাজে ভালুমারের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। ডাক্তারবাবু রীতিমতো নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে ভীড়ের মধ্যে দেখে, ছোট-লোকদের মধ্যে একমাত্র ভদ্রলোককে পেয়ে অকূলে যেন কূল পেলেন। ভদ্রলোকদের মতো গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ বোধহয় কমই হয়। এক কোণায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, কী করি এখন বলুন ত মশায়! অপারেশন ঠিকই করেছিলাম, এখন ব্যাটা-ছেলের বউ যদি অন্য কারো সঙ্গে শুয়ে প্রেগন্যান্ট হয় তাহলে আমি কী করতে পারি? একথা লোকটাকে বলতেও পারছি না অথচ যা নয় তা বলে গালাগালি করছে আমাকে। অন্য লোকদের খেপাচ্ছে। ডালটনগঞ্জ থেকে সিভিল সার্জন-এর খপ্পরে পড়ার ভয় সত্ত্বেও

ভাল করতে এলাম, এখন দেখুন তা কী ঝামেলা! এ গ্রামে নাকি নানারকম পোলিটিক্যাল ডিসটার্বেন্স হচ্ছে। তাই পাটনা থেকে নির্দেশ এসেছে ভালুমারকে প্রায়রিটি বেসিস-এ দেখার সমস্ত ব্যাপার। আর প্রায়রিটি! এখন দেখছি মার খেতে হবে। বউরা যদি অন্য মরদের সঙ্গে শুয়ে বেড়ায় তাহলে খামোখা কাটাকাটি করে লাভই বা কি বলুন?

হঠাৎই ভীড়ের মধ্যে গোদা শেঠকে দেখতে পেলাম। অনেকদিন পর। চেহারা তার আরও তেল-চুকচুকে হয়েছে। চোখে মুখে কৌতুক। একবার টিহুলের দিকে তাকাচ্ছে, আরেকবার ডাক্তারের দিকে। আর মাঝে মাঝে মুখে বলছে, তাজ্জব কী বাত্। বড়া তাজ্জব কী বাত্।

টিহুলের দিকে তাকিয়ে খুব কষ্ট হল আমার। ও এমনই সরল, ভালোমানুষ প্রকৃতির লোক এবং প্রথম বউয়ের ব্যাপারে ও এমনই দুঃখিত ও মর্মাহত হয়ে আছে এখনও যে, ওকে আসল ঘটনাটা বলতে আমারও মন সরল না। তাছাড়া, ব্যাপারটা এতই ডেলিকেট্ যে বলব কী করে তাও ভেবে পেলাম না। 'ইগ্নোরেন্স ইজ ব্লিস্' কথাটা যে কত দামী তা আমার নতুন করে মনে হয়েছিল কাল। টিহুলকে আমি আড়ালে ডেকে বললাম, তোর বউ কোথায়?

বাড়িতে।

তাকে একটু আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবি? কালকে?

এর মধ্যে বউ-এর কী করার আছে? ডাক্তার কি ছেলেখেলা পেয়েছে?

চোখের কোণে দেখলাম, গোদা শেঠ নিঃশব্দে পরিহাসের হাসি হাসছে আমার আর টিহুলের দিকে চেয়ে।

আমি গলা-খাঁকরে বললাম, ব্যাপারটা হচ্ছে টিহুল...

কোনোই ব্যাপার নেই। এই সব বুজরুগী এখানে চলতে দেব না আমরা।

ডাক্তারবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। বিরক্ত মুখে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা কালই এখান থেকে চলে যাব! মহুয়াডাঁরে। দরকার নেই আমাদের।

টিহুল রেগে বলল, আমাদেরও দরকার নেই আপনাদের। মানে মানে সরে পড়ুন।

টিহুলের মতো শান্ত, নির্বিরোধী, অসহায় অত্যাচারিত মানুষ যে এমন ফুঁসে গর্জে কথা বলতে পারে এ আমার জানা ছিল না। টিহুলের রাগা দরকার ছিল। কিন্তু যদি বা ঘুম ভেঙে জাগলোও ত ভুল কারণে, ভুল কোপে, ভুল লোকের ওপর মারমুখী হল।

ভীড়ের মধ্যে এবার বনবাংলোর নতুন চৌকিদারকেও চোখে পড়ল। লোকটা আগের চৌকিদারের মতোই শয়তান। এই বাংলোটার যেন বিশেষ গুণ আছে। কিন্তু শয়তানদের শয়তানি যাদের ওপর, তারাই শয়তানদের ভগবান বানিয়ে রেখেছে। এদের বাঁচাবে কে?

আমি ফিরে এলাম। গোদা শেঠের ভয়ে নয়, চৌকিদারের ইতরামির জন্যেও নয়, অথবা ডাক্তারের অসহায়তায় তার সহায় হতে পারলাম না বলেও নয়; শুধু টিহুলেরই মুখ চেয়ে। একজন সর্বস্বান্ত মানুষ এক মারাত্মক মিথ্যাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করে আঁকড়ে ধরে, বেঁচে থাকতে চাইছে। যেন-তেন প্রকারেণ তার মনের শান্তি, তার নীড় যাতে না ভাঙে তার চেষ্টা করছে। যা ঘটে গেছে, তার প্রতিকার আমার হাতে নেই। টিহুলের ক্ষতিপূরণ করার ক্ষমতাও আমার নেই। তা-ই।

ডাক্তারবাবুকে হয়তো বোঝানো যাবে না যে, আমি গ্রামের বাসিন্দা হয়েও ও'র চেয়েও বেশী অসহায়। শুধু এই ব্যাপারেই নয়, অনেকই ব্যাপার।

মুঞ্জুরীর ব্যাপারটাও আমাকে একেবারে গোড়াশুদ্ধ উপরে ফেলার উপক্রম করলে। যতই দিন যাচ্ছে, ততই এ ধারণা আমার বদ্ধমূল হচ্ছে যে, মেয়েদের আমি আদৌ বুঝি

না। অবশ্য যখন কথাই আছে দেবাঃ ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ তখন আমি আর বিশেষ কী!

মঞ্জুরী তখন সেদিন ফিরে যায়নি মাহাতোর সঙ্গে। তবে, শুনছি, ফিরে যাবে। ওর পুরনো সংসারের হিসেব নিকেশ বিলি বন্দোবস্ত করে, তবে যাবে। সময় চেয়েছে এক মাসের, মাহাতোর কাছে। মাহাতোর সঙ্গে যে এক রাত দিব্যি থেকে এল তার জন্যে মাহাতোকে কারো কাছেই জবাবদিহি করতে হয়নি। যব মিঞা বিবি রাজী, তব্ কেয়া করে কাজী?



মাঝে একদিন চিপাদোহর-এ গেছিলাম। ওখানে বড় হাট বসে। কিছু কেনাকাটার ছিল। হাটে অন্যান্যদের সঙ্গে যেমন হল; লালটু পাণ্ডের সঙ্গেও দেখা হল। লালটু রান্নাঘরেও যেমন, রান্নাঘরের বাইরেও তেমন। সিদ্ধ অবস্থাতেও যা, অসিদ্ধ অবস্থাতেও তাইই। সবসময়ই একই মেজাজে আছে। তার যুবতী স্ত্রীর স্বপ্নে সে সদাই মশগুল। সবসময় তারই কথা, তারই উদ্দেশ্যে শের্ বানানো, এবং দিনে রাতে রাজ্যের লোকের জন্যে রেঁধে এবং তাদের খাইয়ে আনন্দে থাকা।

কি লালটু? আছ কেমন?

ফাইন।

এই ফাইন কথাটা নিতাইবাবু ওকে শিখিয়েছেন। আজকাল মাঝে মাঝেই লালটু ফাইন, ভেরী গুড, থ্যাঙ্কউ্য ইত্যাদি বলে। আমাদের শহরগুলির মতই গ্রামে-গঞ্জে, পাহাড়ে-জঙ্গলেও ধীরে ধীরে ইংরেজী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সংস্কৃতি ঠিক নয়, অপসংস্কৃতি। ওদেরই বা দোষ কী করে দিই! শহরের বড় বড় মানুষেরই এখন স্বদেশী ভাষা, স্বদেশী সংস্কৃতি, স্বদেশী আচার-ব্যবহার, স্বদেশী পোশাককে ছোট চোখে দেখেন। যখন আমরা ইংরেজের পরাধীন ছিলাম তখনও আমরা এতখানি হীনম্মন্যতায় ভুগতাম না। আমাদের পূর্বপুরুষরা খদ্দর পরে, মাদক বর্জন করে, চরকা কেটে বোমা বানিয়ে ইংরেজ তাড়ালেন দেশ থেকে। গান গাইলেন, "বিনা স্বদেশী ভাষা মিটি কি আশা?" আর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধীরে ধীরে আমরা ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতির দিকে শ্লাঘার সঙ্গে ঝুঁকছি।

সেদিন ডালটনগঞ্জের একজন এস-ডি-ও সাহেবের বাড়িতে গিয়ে দেখি তাঁর ছেলে ইংরিজি-মাধ্যম স্কুলের নীল রঙা পোশাক পরে গলায় লাল নেংটি ইঁদুরের মতো এক বিঘৎ একটি ক্ষুদে টাই ঝুলিয়ে এনিড ব্লাইটন্-এর বই পড়েছে দু'পা ছড়িয়ে বাইরের বারান্দাতে বসে। সাহেব গর্ব-গর্ব চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, স্কুলে যাও বেটা। গাড়ি বের করছে ড্রাইভার।

ছেলেটি হঠাৎ বিরক্ত গলায় বই নামিয়ে দু'পা আছড়ে বলল, ফাক্-ইট-ওল।

ছেলের বাবা আমার দিকে গর্ব-গর্ব চোখে তাকালেন। তাঁর বারো বছরের ছেলে যে সাহেবদের চেয়েও বেশী সাহেব হয়ে উঠেছে এ কথা হৃদয়ঙ্গম করে বাবার মনে শ্লাঘা এবং স্নেহ-মিশ্রিত এক তুরীর ভাব জাগরূক হল। মুখ দিয়ে দুপুরবেলার ফাঁকামাঠে দাঁড়-বাঁধা বোকা পাঁঠারা যেমন অদ্ভুত এক ধরনের গদ-গদ জবজবে অস্ফুট আওয়াজ করে, তেমন আওয়াজ করলেন একটা।

আমি ছেলের বাবার দিকে চেয়ে মনে মনে বললাম, সত্যই সেলুকাস! কী বিচিত্র এই দেশ।

আমি তো জঙ্গলের গভীরের একজন আধা-শিক্ষিত মানুষ। আমার দেখাদেখি বোঝাবুঝি আর কতটুকু! কিন্তু আজকাল কেবলি মনে হয়, সরকারী আমলা এবং বিত্তবান তথাকথিত শিক্ষিত ভারতীয়দের দেখে, এমন কী লালটু পাণ্ডেদেরও দেখে, তাইই হয়, তবে এই শুধুমাত্র ইংরিজী বিশারদ এবং বিত্তমান ভারতীয়দের দ্বারা এ দেশের বিন্দুমাত্রই উপকার হবে না বরং ভবিষ্যৎ কবরস্থই হবে। আজ এমন এক সারা দেশেই বোধ হয় এই সর্বনাশী নিঃশব্দ অবক্ষয় কায়েম হয়ে বসেছে। যদি সত্যিই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা প্রত্যেকে এসে দাঁড়িয়েছি যে, আমাদের প্রত্যেককে ভারতীয়ত্বে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে গর্বিত ও সম্পৃক্ত থাকতে হবে। নইলে, ভারত নামের এই বিরাট, একক, স্বরাট দেশ-এর অস্তিত্ব অচিরেই লোপ পাবে। গড়ে উঠবে ছোট ছোট স্বার্থপর, আত্মমগ্ন, খণ্ডরাজ্য। মাথা চাড়া দেবে বিচ্ছিন্নতাবাদ। টুকরো হয়ে যাবে, দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে যুগযুগান্ত ধরে যে স্বপ্ন আমাদের পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ এবং আমরাও দেখে এসেছি তা।

বলেছিলাম লালটু পাণ্ডের কথা, তা থেকে কত কথাতেই এসে গেলাম। আসলে আমার এই ডাইরি কেউ কখনও দেখবে না, তা নিশ্চিত করে জানি। এই গোঁড়া, অশিক্ষিত, জংগী, অলেখক মানুষের লেখা কোনো নামী-দামী পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশের যোগ্য বলে কখনও বিবেচনাও করবেন না। তাছাড়া এই ব্যক্তিগত ডাইরি প্রকাশের কথাই বা উঠবে কেন? ডাইরি তো ডাইরিই! এ আমার মনেরই ছবি, অন্যমনের আয়নায়। এ' তো অন্যকে দেখানোর জন্যে নয়। তাইই যা মনে আসে, যা ঘটে, যা ঘটতে পারে বলে মনে হয়, পরম্পরাহীন ভাবে যাই ভাবি যা শুনি তার সবই লিখে রাখি। এ'তে আমারই একার পড়বার জন্যে। তাই এ ভাল হল, কী মন্দ হল, তাতে কীই বা যায় আসে?

লালটু অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল। ওর বৌয়ের জন্য এক গোছ কাঁচের চুড়ি কিনে দিলাম। খুব খুশী হল ও। বলল, এ সপ্তাহের শেষেই দেশে যাবে। রোশনলালবাবু ছুটি দিয়েছে। জঙ্গল থেকে আমলকী জোগাড় করেছে দু' বস্তা। আমলকী নিয়ে যাবে। বৌ তার আমলার আচার খেতে বড় ভালোবাসে। প্যাঁড়া আর গুজিয়া নিয়ে যাবে চিপাদোহর থেকে। আর যাবার আগে লাতেহার থেকে আনিয়ে নেবে পণ্ডিতের দোকানের খাঁটি ঘিয়ে ভাজা কালাজাম। লালটুর চোখ-মুখ খুশিতে ঝলমল করছিল।

হাট সেরে আমরা লংকার গুঁড়া দেওয়া ঝাল-বিস্কুট দিয়ে শালগাছতলায় বসে চা খেলাম। গজেনবাবুর অবস্থা দেখলাম কিঞ্চিৎ বেসালাম।

হাট থেকেই সরাসরি বাস ধরব ভেবেছিলাম। কিন্তু নিতাইবাবুর সঙ্গে দেখা হতে ছাড়লেন না। গজেনবাবুরা কেউই নেই। ডালটনগঞ্জে গেছেন। আজকে মালিকের ডেরা প্রায় ফাঁকা।

নিতাইবাবু বললেন, মালিকের চাকরি ছেড়েছেন তো কি? আমরা তো আপনাকে ছাড়ি নি। চলুন চলুন, চা খেয়ে যাবেন। বাসের দেরী আছে এখনও অনেক। ডেরাতে গিয়ে বসলাম উঠোনে। তখনও রোদ ছিল। তাই আমগাছের ছায়াতে চেয়ারে টেনে বসলাম। আদা দিয়ে দারচিনি দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস চা করতে বললেন নিতাইবাবু। সঙ্গে কুচো নিমকী। নিতাইবাবুর মস্ত শখ নানারকম রান্নার এক্সপেরিমেন্ট করা। দিশী ব্যাঙের ছাতার

সঙ্গে আনারস কুচি এবং দাহিলী-র পেট মোটা লঙ্কা কুচি মিশিয়ে উনি ওমলেট্ ভাজেন। একদিন, চিনা বাদাম, কোলকাতা থেকে আনা কাউঠার পিঠের সুস্বাদু মোটা কচ্‌কচে্ চামড়া, (টুকরো করে কাটা) এবং তার মধ্যে কাঁচা আম এবং ডুমো ডুমো করে কাটা বাঘা ওল ফেলে খিচুড়ি রেঁধে খাইয়েছিলেন খেসারির ডাল দিয়ে। খেসারির ডালের যে খিচুড়ি হয়, তা আগে কখনও জানতাম না। বললেন, খান, আমার বানানো নিমকি খেয়ে দেখুন। নতুন একস্‌পেরিমেন্ট্।

খেয়ে মরে যাব, না শুধুই অজ্ঞান হব? আগে বলবেন ত তা!

আরে! খেলে বার বার চেয়ে খেতে হবে। খান্‌তো আগে।

খেয়ে দেখি, শুকনো লংকার গুঁড়ো, জোয়ান, কালোজিরে এবং তার মধ্যে কারিপাতা ফেলে ময়দা মেখে, অল্প ময়ান দিয়ে নিমকি হয়েছে। একেবারে লাজোয়াব!

আমার চোখ-মুখের ভাব লক্ষ করে খুব খুশী হয়ে বললেন; কেমন? কেমন? বলেছিলাম না।?

চা-ও এল।

আপনি খাবেন না?

দুস্‌স্। দেখছেন না সূর্য পশ্চিমে হেলে গেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সান্-ডাউন হয়ে যাবে। সান-ডাউনের পর কোনো অখাদ্য-কুখাদ্য খাই না আমি। লিভার খারাপ হয়ে যাবে।

আমরা বারান্দায় বসে আছি, এমন সময় দেখি একটি লোক হাতে একটি টেলিগ্রাম নিয়ে দৌড়ে এল।

সেরেছে!

স্বগতোক্তি করলেন নিতাইবাবু। এই বন-পাহাড়ের গভীরে টেলিগ্রাম সবসময়ই কোনো-না কোনো শোকের খবর বয়ে আনে। এই পর্যন্ত কাউকে শুনি নি যে, লটারীর টিকিট পেয়ে লাখপতি হয়েছে বা কোনো বড়লোকের মেয়ে কাউকে বিয়ে করতে চেয়েছে এমন খবর নিয়ে কারোই তার এলো।

কেক্‌রো হো? নিতাইবাবু শুধোলেন।

লাল্‌টু পান্ডেকো!

লাল্‌টু ত হাটেই আছে। কাল দেশ যাবে, বউয়ের জন্যে সওদা করছে। তা তারটা আমাকে দে, আমি পড়ে রাখি। আর লাল্‌টুকে ডেকেও পাঠাচ্ছি।

টেলিগ্রামটা খুলেই নিতাইবাবুর মুখ কালো হয়ে এল।

কি হয়েছে?

নিতাইবাবু কথা না বলে টেলিগ্রামটা আমার হাতে তুলে দিলেন। দেখি, লেখা আছে—ওয়াইফ ফ্লেড উইথ নাটা পান্ডে। কাম শার্প।

কী জানি, গাঁয়ের কোনো ইংরিজী জানা লোককে ধরে তার মা বা ছোট ভাই বা গাঁয়ের কোনো লোক এই তার পাঠিয়েছে। কাগজটা হাত থেকে নামাতে না-নামাতে দেখি লালটু দৌড়ে আসছে উঠানের অন্য প্রান্ত থেকে। তার ঘাড়ে কাঁধে অনেক বাজার। বাজারের ভারে বেচারী নুয়ে আছে। সামনে এসে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, কি খবর বাবু? তার? কিসের?

আমি চুপ করে রইলাম।

নিতাইবাবুও চুপ।

কী করে খবরটা দেবেন বোধহয় বুঝে উঠতে পারছেন না। লালটু সরল এবং

আতঙ্কিত মুখে শুধোল, মা?

নিতাইবাবু দুপাশে মাথা নাড়লেন।

ভাই?

আবারও মাথা নাড়লেন।

বোন?

আবারও তাই।

তরপরই বহু-উ-উ-উ-উ বলে এক অতর্কিত আর্তচিৎকার করে উঠে উঠোনের ধুলোতে পড়ে সে গড়াগড়ি করতে লাগল।

নিতাইবাবু আমাকে ইসারায় ডেকে উঠে গেলেন, চেয়ার ছেড়ে। লালটুর অন্য সহকর্মীরা সব দৌড়ে এল। লালটুর মুখে কথা নেই। কাটাপাঁঠার মতো সে ছট্‌ফট্‌ করছে যন্ত্রণায়।

নিতাইবাবু একটি ট্রাকের বন্দোবস্ত করলেন যাতে লালটু আজ রাতেই চলে যেতে পারে ডালটনগঞ্জ। তারপর সেখান থেকে ট্রেন বা বাস ধরবে। আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমার গলার কাছে কী একটা জিনিস দলা পাকিয়ে উঠেছিল। নিতাই-বাবু অস্তগামী সূর্যের লাল আলোয় রাঙা গভীর জঙ্গল আর ধূলিধূসরিত লাল মাটির পথের দিকে চেয়ে স্বগতোক্তি করলেন, বউ মরে গেছে জেনেই ও যাক। কারণ, যে বউকে এত ভালোবাসে, বৌকে নিয়ে যার এত কাব্যি; সে নিজে এ কথা সইতেই পারবে না যে, তার বউ ভেগে গেছে তার পাশের বাড়ির বোবা কিন্তু শক্ত সমর্থ হাট্টা কাট্টা সাইকেলের টায়ার সারানো মিস্ত্রীর সঙ্গে।

আপনি চেনেন না কি?

চিনি না? নিতাইবাবু বললেন। আমি যে লালটুর বাড়িতে গেছি ওর সঙ্গে। থেকেছি। ওর মা কত আদর যত্ন করেছিল। তখনই বৌটাকে দেখে আমার কেমন মনে হয়েছিল। কেমন যেন, বুঝলেন, শরীরসর্বস্ব। মাথায় কোনো মাল নেই, কবিত্বটবিত্ব ত দূরের কথা। আসলে মেয়ে জাতটাই অমন মশায়। মুখ-সর্বস্ব আর শরীর-সর্বস্ব। আর কিছু বোঝে না ওরা; চিজ্‌ এক এক খানা।

অত দুঃখেও মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, কী যে বলেন!

ঠিকই বলি। এখন লালটুর যন্ত্রপাতিতে কোনো গোলমাল ছিলো কী না তা বলতে পারব না। না-থাকলে, ঐ বউকে নিয়ে শের-শায়েরী ওড়াবার মতো ইডিয়ট্‌ লালটু ছাড়া আর কে হবে? আসলে মশাই, কোনো মেয়েছেলেকে নিয়েই কবিতা-টবিতা লেখার মানে হয় না। কবিগুলো আকাট্‌ ইডিয়ট্‌ সব। মেয়েছেলেরা যা বোঝে, তা আর যাইই হোক কবিতা নয়।

আমি চুপ করে রইলাম। ব্যাপারটার অভাবনীয়তা এবং লালটুর শোক আমাকে এতই অভিভূত করে ফেলেছিল যে কিছু বলার মতো অবস্থা ছিলো না।

লালটু তখন আমার নাম ধরে ডেকে, আমাকে দেখিয়ে ওর বৌ-এর জন্যে কিনে-দেওয়া কাঁচের চুড়িগুলো আছড়ে আছড়ে ভাঙছিল। রুক্‌মানিয়া, যে মেয়েটি কুয়ো থেকে জল তুলে ড্রামে আর ক্যানেস্তারায় ভরে সকাল-বিকেল, সে ছেঁড়া শাড়ি পরে লুব্ধ চোখে সুন্দর চুড়িগুলোর দিকে চেয়েছিল গাছতলায় দাঁড়িয়ে। প্রথমে চুড়ি-গুলোর জন্যে লোভ ছিল তার। কিন্তু এখন আর নেই। এক গভীর সমবেদনাতে আবিষ্ট হয়ে চেয়ে আছে সে। মনে হল, এখন চুড়ি ভাঙার শব্দ পৌঁছচ্ছে না পর্যন্ত ওর কানে!

প্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ করে হঠাৎ কানফাটানো আওয়াজ করে সান্ধ্য প্রকৃতির এবং লালটুর শোকমগ্নতা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে বাসটা এসে দাঁড়ালো নাকের কাছে ধুলো উড়িয়ে।

বললাম, থেকেই যাই আজ। ড্রাইভারকে দিয়ে একটা খবর পাঠিয়ে দিই বরং ভালুমারে। আজ বাসটা দেরীও করল খুব। অন্ধকার হয়ে গেলে তো মুশকিলে পড়ব। চিতা।

নিতাইবাবু বললেন, আমরা চিপাদোহরের খোঁদলে আছি, তাই। গাড়ুর রাস্তাতে পড়লে দেখবেন চারপাশ উজ্‌লা। বেলা এখনও অনেক আছে। রাতের আগেই টিকিয়া-উড়ান্ চালিয়ে পৌঁছিয়ে দেবে আপনাকে হালিম মিঞা। আর লালটুর জন্যে থাকবেন কোন দুঃখে। ওর বৌ সত্যি মরলেই ভাল হত। বেটী, শরীরের সুখের জন্য মজবুত বোবা লোকের সাথে ভেগেছে। আপদ গেছে। তার জন্য লালটু ইডিয়ট্‌টা শোক করে করুক, কিন্তু আমার আপনার কি? আমার বউ মরলে কী পালালে আমি তো দাওয়াত্‌ই দিতাম।

আপনার বউ নেই, তাই-ই, এ সব বলা সাজে।

বিয়ে করে বোকারা। আমার বিয়ে হয়েছে রাম্‌-এর সঙ্গে। স্ত্রীলিঙ্গ। RUM। রোজ রাতে তার সঙ্গে আমার মিলন। পালাবেও না, মরবেও না। RUM আছে, আর আছে দেওয়ালে সুন্দরীদের ক্যালেন্ডার। বিয়ে করে মরুন গে আপনারা, আপনাদের দিমাগ্ বিলকুল খারাপ।

তাড়াতাড়ি আমি লালটুর কাছে গিয়ে ওকে প্রবোধ দিয়ে এলাম। বললাম, নিতাই-বাবু ট্রাক-এর বন্দোবস্ত করেছেন। লালটু কেঁদে কেঁদে বলল, আর কী হবে? গিয়ে তো দেখব হাদুয়া নদীর পাশে সে ছাই হয়ে গেছে।

বাসটা ছেড়ে দিল। হালিম ড্রাইভার খাতির করে পাশে বসালো, পান খাওয়ালো কালা-পিলা-পাত্তি জর্দা দিয়ে। কিন্তু মনটা ঠিক গল্প করার মতো ছিল না। ভাব-ছিলাম, একদিক দিয়ে ভালই হল। অমন খবরটা নিতাইবাবু চেপে যাওয়ায়, এখানে লালটু অসম্মান ও টিট্‌কিরির হাত থেকে তো বাঁচল। আর বৌ-এর মৃত্যু জেনে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গেলে পালিয়ে যাওয়া বৌ-এর জন্য তত কষ্ট আর হবে না। হয়তো সয়ে যাবে। নিতাইবাবু বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন।

ভালুমারে যখন এসে নামলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। হালিম সকলকেই যতখানি পারে যার যার বাড়ির কাছে নামিয়ে দিল। বাস-স্ট্যান্ড জনশূন্য। আজ বাসের টায়ার বেতলার কাছে ফেটে যাওয়ায় এবং স্টেপ্‌নিতে মস্ত গ্যাটিস্ লাগানো থাকায় আসতে দেরী হয়ে গেল। বাস থেকে নেমে তাড়াতাড়ি ডেরার দিকে চললাম। প্রায় দরজা অবধি পৌঁছে গেছি হঠাৎ হুলুক্ পাহাড়ের নিচের ঘন বনে হনুমানের দল হুপ্-হুপ্-হুপ্ করে প্রচণ্ড চিৎকার আর গাছে ঝাঁকাঝাঁকি শুরু করে দিল। টর্চ জেলে দৌড়ে আমি ডেরার গেট পেরোলাম। তিত্‌লি আমার শব্দ পেয়েই দরজা খুলে আমাকে টেনে নিল। খুব আতঙ্কিত হয়েছিল মা ও মেয়ে।

তিত্‌লি দরজায় খিল দিয়ে রান্নাঘরে গেল। আমি বারান্দাতেই হাত মুখ ধুয়ে ঘরে গিয়ে খিল তুললাম। পাহাড়তলিতে এখন নানারকম আওয়াজ! পাখির ডাক। কোট্‌রা হরিণের সাবধানবাণী। পুরুষ শিঙাল চিতল হরিণ ডাকছে তার যুবতীর দলকে। ময়ূর কঁকিয়ে কেঁদে উঠল। গরমের সন্ধ্যার এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে বনে-জঙ্গলে। তার গায়ের গন্ধও সম্পূর্ণ আলাদা। গরম অবশ্য শেষ হতে চলল। এই সময়টাতেই ঝাঁঝে একবার ঝাঁঝাঁ করে সমস্ত প্রকৃতি। মনে হয়, কোনো কামার্তা মধ্য-

বয়সী নারী পরিতৃপ্ত না-হয়ে, প্রচণ্ড চাপা আক্রোশ নিয়ে, কবে বৃষ্টি এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার সর্বাঙ্গে, চুমু খাবে, সোহাগ করবে, ভরে দেবে তার রুক্ষতার প্রতি অণু-পরমাণু সহজ জলজ ভালোলাগায়, তার অপেক্ষায় দিন গোনে।

হঠাৎই আমার খুব হাসি পেল। চিতাটার ভয়ে আমি আজ দৌড়ে এলাম। অথচ আমার নিজের কারণে, নিজের জন্যে কখনও ভয় পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। তবে আজ পেলাম কেন? তিতলির জন্যে? যে-আসছে, তার জন্যে?

বোধহয় তাই। এ কথা বোধহয় সত্যি, খুবই সত্যি, যে একজন মানুষের জীবনের ভয় তার প্রাপ্তি ও সম্পত্তির সঙ্গে সমানুপাতে বাড়ে। যে কারণে, আমার চেয়ে রোশনলালবাবুর জীবনের ভয় অনেক বেশী। আমার চেয়ে গজেনবাবুর জীবনের ভয় কম। আগের আমির চেয়ে আজকের আমি অনেক বেশী ভীতু। এই কারণেই বোধহয় যাদের হারাবার কিছুমাত্র নেই সেই হ্যাভ্-নটস্‌রা জীবনের ভয় তুচ্ছ করে দেশে দেশে, যুগে যুগে বিপ্লব করতে পেরেছে। আর হ্যাভ্‌সরা তাদের স্বার্থপরতার ভয়েই কুঁকড়ে থেকেছে চিরদিন!

তিতলিকে আমি বোঝাব, আমার ছেলেকে আমি দেখাব, দেশটার নাম ভারতবর্ষ। এ-এক বিরাট স্ববিরাট দেশ। এটা আমেরিকাও নয়, রাশিয়াও নয়, এবং চীনও নয়। আমাদের সব সমস্যা আমাদেরই মোকাবিলা করতে হবে। অনেকগুলো বছর নষ্ট হয়েছে। মানুষকে মানুষের মতো বাঁচতে হবে, বাঁচবার সুযোগ দিতে হবে। তার সঙ্গে প্রকৃতির পশুপাখি, প্রাকৃতিক সম্পদকেও। ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ডের চেয়ারম্যান্ নেদারল্যাণ্ডের রাজকুমার কী করে জানবেন সেই সব মনুষ্যেতর মানুষদের কথা, যারা কান্দাগেঁঠি খুঁড়ে খায়, যারা ধরা-গলায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বনের মর্মরধ্বনির মতো গায়

"চড়্‌হলো আষাঢ় মাস বরষালে বনা, এ রাম
পহিলে মুঠ্ বুনলি গোঁন্দ্‌নি, হো এ রাম
চিনমিনা নিতনিদনা—
গোঁন্দ্‌নি আড়ুহাই দিনা, এ রাম
সাঁওয়া মাহিনা লাগু গেঁয়ো হো, এ রাম।"

কোন কথা থেকে কোন কথায় এসে গেলাম। ডাইরি লেখার অনেক রকম আছে। আমার এ ডাইরির সব অগোছালো, এলোমেলো। কখনও ফার্স্ট পার্সন্ সিংগুলার নাম্বারে কথা বলছি। কখনও বা থার্ড পার্সন্-এ। কোথাও ডাইরি লেখক উপস্থিত। কোথাও বা সে অনুপস্থিত থেকেও লিপিবদ্ধ করেছে সব কিছু। এই এলোমেলোমির সাফাই কী দেব জানি না। পাঠক-পাঠিকা এই অগোছালো, অনভিজ্ঞ, অলেখককে ক্ষমা করবেন।

একমনে একা বসে ভাবা ও পড়ার একটা মস্ত লাভ এই যে, নিজেকে একেবারে নিঃশেষে মুছে ফেলা যায় চেতনা থেকে। অন্য সবকিছুকে ম্যাগ্‌নিফাই করে।

কিন্তু হঠাৎ-ই বাদ সাধল পরেশনাথ। দৌড়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলল, বাবা জ্বরে অজ্ঞান হয়ে রয়েছে আর মাহাতো এসেছে বাড়িতে বাঁশবাবু। মা তোমাকে এক্ষুণি নিয়ে যেতে বলল ডেকে।

আবার মাহাতো? বলছে কি?'

চমকে উঠে বই ঘরে রেখে ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম আমি। লাঠিটাকে হাতে তুলে নিলাম। তিতলিকে চেঁচিয়ে বললাম, আসছি রে—। যাচ্ছ কোথায়? বলেই গর্ভিণীর ভাত-ঘুম ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়েই পরেশনাথকে দেখেই আন্দাজ করল ও। লাঠি-

হাতে বীরপুরুষকে দেখে বলল, সাবধানে যাও। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে। সত্যিকারের বীর হলে লাঠি লাগতো না। বীরত্ব অস্ত্রে থাকে না। থাকে বুকের মধ্যে। আমার নিজের মধ্যে যা নেই, তাই-ই লাঠি আমায় এনে দেবে, এমন মিথ্যে প্রত্যাশা করি।

পথে বেরিয়ে, পরেশনাথকে শুধোলাম, কী করছে রে মাহাতো?

ও সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, করবে আবার কি? কিছুই করছে না। দরজার সামনে উবু হয়ে বসে আছে। মার সঙ্গে কথা বলছে।

হুঃ? তুই দাঁড়া একটু। বলেই, আবার ফিরে কিছু ওষুধ নিলাম মানির জন্যে।

জ্বর কত?

জ্বর কবে থেকে এসেছে?

কে জানে?

জানিস না ত, করিস কী বাড়ি বসে? তোর বাপ ত বুড়ো হল, এতরকম ঝামেলা, বাপের খবরটা নিতে পারিস না একটু? মাই-ই বা কী করছিল তোর?

মা ছিল নাকি?

সেরকম নৈর্ব্যক্তিক গলাতেই পরেশনাথ বলল।

ছিল না? গেছিল কোথায়?

মাহাতোর ঘর।

মাহাতোর ঘর? কবে?

সেই হাটের দিনের পরের দিন।

আর আসেনি?

না।

কেন?

কে জানে? মাহাতো এসে মাকে কুয়োতলায় ডেকে নিয়ে হাত ধরে কী সব বলল। অনেক কাঁদল। মা চলে গেল ওর সঙ্গে।

বুলকি কোথায়!

ডেরাতে।

বুলকি সব জানে?

হ্যাঁ। জানবার কি আছে? মাহাতো বলেছে, মাকে বিয়ে করবে। মাও রাজী বাবাকে ফেলে চলে যাবো আমরা দুজনে। মা আর আমি। ভালো খাব। ভালো পরব অনেকদিন দুঃখ করেছি, কান্দা গেঁঠি খুঁড়ে, শুখামহুয়া খেয়ে থেকেছি। এবার মাহাতোর ব্যাটা সাজব বাঁশবাবু। মাহাতোর বউ মরেছে গত পূর্ণিমায়। মাকে মাহাতোর খুব পছন্দ।

ঠাস্‌স্‌ করে চড় লাগালুম একটা পরেশনাথের গালে।

পরেশনাথ চমকে উঠল।

অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। কিন্তু কাঁদল না। বলল, অনেকেই মেরেছে, তুমিও মারলে। মারলে, তো মারলে! মারলে আর লাগে না। মাহাতোর চেলারাই কী কম মেরেছে। মার খেয়ে ত আর পেট ভরে না বাঁশবাবু। যারা না খেয়ে থাকে, তারা জানে। তুমি কি বুঝবে? তোমার ঐ ইস্কুলেও আর আসব না। মাহাতো-বাবার গরু-বাছুর দেখাশোনা করব। মাহাতো-বাবা বলেছে। কত গরু আর মোষ আছে জানো? একটা মোষ আছে না, ইয়া বড়; নাম তার ভঁইষালোটন্।

এবার আমার অবাক হবার পালা।

টাঁড়টা যখন পেরুচ্ছি, তখন মনে হল যেন একটু একটু মেঘ করেছে আকাশে। তারপর বুঝলাম মনের ভুল। গরমের শেষে পালামৌতে মরুভূমির মতো অবস্থা হয় এত বন-জঙ্গল থাকা সত্ত্বেও। লু-এর বহরে ঘর ছেড়ে বেরোন যায় না। দিগন্তে মরীচিকার মতো বাষ্প, বৃষ্টির লোভ দেখায়, কিন্তু সে বাষ্প বাষ্প নয়, মনের ভুল। বৃষ্টি আসে না। বৃষ্টি লক্ষপতি বিড়িপাতা আর রোশনলালবাবুর মতো কোটিপতি ব্যবসায়ীর কথাই শোনে, ভালুমারের উপোসী মানুষগুলোর কথা সে কখনই শোনে না।

টাঁড় পেরিয়ে আবার জঙ্গলে ঢুকলাম। ন্যাড়া, বিবাগী ধূলিধূসরিত জঙ্গল। হুলুক্ পাহাড়ের দিকে হাওয়াটা হা-হা করে ছুটে যাচ্ছে। এখন আর শুকনো পাতাও ওড়ে না। তারা পাথরে পাথরে, পাথুরে-মাটিতে ধুলোর সঙ্গে গুঁড়িয়ে এক হয়ে আছে। পুটুসের ঝোপে এখনও পাতা থাকে। বড় শক্ত প্রাণ ওদের। মানির প্রাণের মতো। খাদ্য ও জল ছাড়া দিব্যি বেঁচে থাকে। তার ভিতরে তিতির বটের আর ছাতারে ছায়া খুঁজে বসে বসে গলা কাঁপিয়ে তৃষিত নিশ্বাস নেয়। তৃষ্ণায় ওদের উজ্জ্বল চোখগুলো উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। আমাদের পায়ের শব্দ শুনে নড়ে-চড়ে বসে ওরা। উষ্ণ ঠোঁটের দীর্ঘশ্বাসে বৃষ্টিকে অভিশাপ দেয়, দেরী করার জন্যে। বেলা পড়লে ওরা প্রথমেই জলে যাবে, যেখানেই জল পাবে, মুঞ্জরী যেমন গেছে নিরুপায়ে। জল খেয়ে তারপর অন্য কথা। জলই জীবন।

সামনে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের খোঁড়া সেই গাড্ডা। অনেকখানি গভীর। একটু হলেই পড়তাম ভিতরে। মানির মতই। মানির মতই আমিও চোখ এবং বোধহয় চোখের পাতাও খেয়ে বসে আছি। সময় মতো দেখেছিলাম ভাগ্যিস। দুপাশে ঢাল নামিয়েছে— একটি ঢালের পরই হঠাৎ প্রায় দশফিট মতো গভীর বর্ষার জল জমিয়ে নতুন প্ল্যানটেশনে জল দেবে শীতে, বন-বিভাগ।

চলতে চলতে রাগটা পড়ে এল। ভাবলাম আমার কি? যা খুশি করুক ওরা। এখন লাঠিটা হাতে করে আসায় লজ্জা লাগছিল। মুঞ্জরী যদি মাহাতোকে বিয়ে করাই মনস্থ করে, এত কাণ্ডর পর, এখন তার ঘরণীই হতে চায়, তাতে আমার কী বলার আছে? ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর তাই-ই যদি হবে, তাহলে আমাকেই বা ডাকলো কেন? আমি কি ওদের জমিদারির নোকর? যে, যখন ডেকে পাঠাবে তখনই যেতে হবে?

পরেশনাথ চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পরে জম্পেস্ করে একটা ঢেকুর তুলল। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, পরেশনাথকে এত বছর দেখছি, কখনো ঢেকুর তুলতে দেখি নি। আমি কখনো ওকে এমন খাওয়াই নি, আদর করে বসিয়ে, যাতে খেয়ে পরিতৃপ্তিতে ঢেকুর তোলে।

বলল, বড্ড বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। অভ্যেস তো নেই। মাহাতো-বাবা নিয়ে এসেছিল ঘিয়েভাজা, পুরি, আঃ! আলুর চোকা, মিষ্টি, ক্ষীর, বালুসাই, লাল কুমড়োর তরকারি, আমের সুখা-আচার। কতরকম মশলা দেওয়া তাতে। টক্‌টক্, মিষ্টি-মিষ্টি। দিদি খায় নি। বুধ্ধু।

আমি ওকে অগ্রাহ্য করে বললাম, মানিয়া কী বলেছে তাই বল্?

কী বলবে? বাবা কাঁদছে শুধু সেদিন থেকে। কাঁদা ছাড়া বাবা আর কি করবে? কাঁদে আর নেশা করে, এই-ই...

পরেশনাথের দিকে আবার তাকালাম আমি।

বিদ্যুতস্পৃষ্টের মতো বুঝতে পারলাম হঠাৎ, বড় বেদনার সঙ্গে যে, আমি, এমন

কি ওর জন্মদাতা যানিও ওর কেউ নয়। ওদের আমরা কেউই নই। যে ওদের দুবেলা পেট ভরে খেতে দেবে, সেইই ওদের সব। সে খাবার যত নোংরা হাত থেকেই আসুক না কেন? যত অসম্মানের সঙ্গেই তা দেওয়া হোক না কেন। পেটে এই গ্রীষ্ম শেষের দাবদাহের মতো খিদে থাকলে, বিদ্যা, শিক্ষা, বিবেক, ন্যায়-অন্যায়, এসবই বাহ্য, ফালতু, বইয়ে-পড়া রাজনীতির পুঁথিগত তত্ত্বে-ভরা ধূলির মতই ফাঁকা, ন্যাড়া, অন্তঃসারশূন্য। ওদের মুক্তি নেই। আমাদের মুক্তি নেই। কারণ আমাদের সঙ্গে ওদের ভাগ্য শিকল দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন বিধাতা কোন অদৃশ্য বন্ধনে, ওদের মুক্তি না ঘটিয়ে আমাদের কোনক্রমেই মুক্তি নেই। ওদের মরণে আমাদেরও মরণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। বড় অসহায়তার সঙ্গে আমি অন্তরের মর্মস্থলে অনুভব করলাম যে তিতলিকে বিয়ে করে ওদের সমাজেরই একজনকে আমি আমার স্বার্থপর সুখের ছোট মাপের চড়াই পাখির জীবনে সম্পৃক্ত করে পাতি-বুর্জোয়াদের বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করছি মাত্র। আমি ওদের কেউই হতে পারি নি। হয়তো অবচেতনে কখনো হতে চাইও নি। আমার মহত্ত্ব মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। আমার আমিত্ব মিথ্যা।

চলতে চলতে গরম জ্বালাধরা লু-এ চোখ জ্বলতে লাগলো। চোখ জ্বলতে, জ্বলতে, জ্বলতে কখন যেন চোখের কোণে বাষ্প জমে উঠল।

বাষ্পই কি? না, এও গ্রীষ্ম দিগন্তের তাপবাহী আর এক মরীচিকা?



একবার বাইরে বেরিয়ে বারান্দায় রাখা জলে হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকে পড়লাম। বড় অপমান লাগে। এমন ভয়ের মধ্যে জবুথবু অসম্মানের মধ্যে, বাঁচতে কারই বা ভালো লাগে? এই চিতাটা যেন রোশনলালবাবু, গোদা শেঠ এবং আমাদের বন-পাহাড়ের সমস্ত রকম ভয়েরই প্রতিভূ হয়ে উঠেছে।

ঘরে বসে রান্নাঘরে তিতলি এবং তার মায়ের হাতে-হাতে রুটি বানানোর চটাস্ ফটাস্ অওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। রুপোর মল বাজছে রিনরিনিয়ে। বাইরে ঝিঁঝির ডাক। হঠাৎ-ওঠা কোনো উদাসী হাওয়ার আঁচল উড়ছে জঙ্গলের ডালপালাতে। হুলুক্ পাহাড়ের নীচের পাহাড়তলি থেকে আবার হনুমানেরা হুপ্‌হাপ্ করে ডেকে উঠলো। অড়হড়ের ডালে এবার সম্‌বার দিল ঘি আর মসলা দিয়ে তিতলি। বাইরের রাতের প্রথম প্রহরের প্রকৃতির গন্ধর সঙ্গে ডাল সম্‌বারের গন্ধ মিশে গেল। তিতলি রান্না করছে বলেই বোধহয়, হঠাৎ আবার বাঁধুনি লালটু পাণ্ডের কথা মনে এল। কত শায়েরই না বানাতো লালটু! বেশির ভাগই ভুলে গেছি। তবু কিছু কিছু মনে পড়ে যায়, যেমন :

"রওশনী সুরজ সে হোতা হ্যায়
সিতারোসে নেহী
মুহব্বত্ এক সে হোতা হ্যায়
হাজারোসে নেহী।"

অথবা

"লিখ্‌তা হুঁ খাতে খুন্‌সে, সিয়াহী না সমঝ্‌না
মরতা হুঁ তেরী ইয়াদ্‌মে জিন্দা না সামঝ্‌না।"

অথবা

"ফুল হ্যায় গুলাব্ কা শুংকতে রহিয়েগা
পত্র হ্যায় গরীব্‌কা ভেজতো রহিয়েগা।"

সংসারের নিয়ম বোধহয় এই রকমই। যারা কিছুমাত্র বাকি না-রেখে অন্যকে নিজের সর্বস্ব দিয়ে বসে থাকে তারাই এমন করে ঠকে। যাদের বিবেক নেই, তারাই চিরদিন বিবেকবানদের ঠকিয়ে এসেছে, এসেছে সৃষ্টির আদি থেকে। এইটেই নিয়ম। অন্যরকম হলে হয়তো বলতে হত যে, নিয়মের ব্যতিক্রমই ঘটেছে।



বৃষ্টিটা এবারে আশ্চর্য করল। এরকম কোনো বছরই হয় না। প্রথম এসেই জাঁকিয়ে বসল, যেন ভরা শ্রাবণের বৃষ্টি।

ভালুমারের সকলেরই আনন্দের শেষ নেই। ক্ষেতে ক্ষেতে সাঁওয়া, গোন্দানি, বাজরা, কিতারি, গেঁহু, সরগুজা, অড়রড়, কুলথী, মটরছিম্মি এবং আরও নানা ফসল লাগাবার আগে মাটি যদি বর্ষণে নরম হয়ে যায় তবে ফসল ভাল যে হবে তাইই নয়, প্রত্যেকের মেহনতও কমে যাবে। আজও ভারতবর্ষের নব্বুই ভাগে বৃষ্টির ওপরই ফসল নির্ভর করে।

আবহাওয়াও যেন সব জায়গাতেই কেমন বদলে যাচ্ছে। গরমের সময় ন্যাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, শীতের সময় গরম, বর্ষার প্রথমে অতিবর্ষণ, এ সব ভালুমারে বরং কম, অন্যান্য জায়গায়, বিশেষ করে যেখানে বনজঙ্গল নেই সেখানে নাকি এই অনিয়মই প্রায় নিয়মে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলের মুখেই শুনি। আমাদের এখানে গাছপালা যথেষ্ট থাকাতে প্রকৃতির ভারসাম্য এখনও হয়তো তেমন নষ্ট হয় নি। সমস্ত পৃথিবীকেই একদিন মানুষের এই হঠকারিতা আর লোভের দাম দিতে যে হবেই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো।

পাহাড়ী নদীগুলিতে জলের ঢল নেমেছে। লাল ঘোলা জল, দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাঠ-কুটো, ঝরা পাতা ধুলো-বালি, ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে তাণ্ডব তোড়ে, কোয়েলের দিকে। কোয়েল ছাড়াও অনেক নামা ও অনামা নদী আছে ছোট ছোট, পাহাড় জঙ্গলের বুকের ভাঁজে ভাঁজে। তাদের দিকেও বয়ে চলেছে অসংখ্য ছোট ছোট গাড়হা আর নালা। মীরচা-বেটির রূপ খুলে গেছে এখন। শীতে যেখানে পিকনিক হয় আর গরমে কালো পাথররা যে অঞ্চল জুড়ে উষ্ণতা বিকীরণ করে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তাদের চ্যাটালো কঠিন নিকষ কালো বিস্তৃত বুক থেকে, সেই মীরচাইয়া প্রপাতের পুরো চেহারাই এক মাসেই একেবারে বদলে গেছে। প্রকৃতির মতো নিত্য নতুন রূপে সাজতে, ন্যূনতম প্রসাধনে এমন নতুন হতে, নতুন ভাবে ভাবুক হতে আর কোনো মেয়েই বোধহয় জানে না। নয়া-ভালাও-এর প্রায় আধখানি জঙ্গে ভরে গেছে ইতিমধ্যেই। ভরে গেছে খানা খন্দ, ঢাল, পাহাড়-তলির নীচু খাদ। অন্যান্য বছর শ্রাবণ মাসেও এমন হয় কি না সন্দেহ। প্রথম দিন কুড়ি ত একেবারে লাগাতার বৃষ্টি হল। সঙ্গে ঝড়। কত পাখি মরে গেল, ঠোঁট উঁচু করে ডানা দুমড়ে পা এলিয়ে, ঝরা পাতার ফ্যাকাসে গলিত স্তূপের মধ্যে রঙের চমক লাগিয়ে পড়ে রইল নিস্পন্দ হয়ে। বাড়ি থেকে বেরোনোই মুশকিল ছিল। এবেলা খিচুড়ি, ওবেলা খিচুড়ি। আর কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে বর্ষার রূপ দেখা। আমার মতো গ্রাম্য নিষ্কর্মাই জানে এই কর্মহীন নিশ্চিন্ত অবসরের সুখ। শহরের হায় টাকা হায় টাকা

ব্যস্ত মানুষদের জন্যে এইসব অতি সাধারণ অথচ অসাধারণ সুখ নয়। যে এর দাম দেবার জন্য প্রস্তুত, দাম দিতে জানে, সেইই শুধু এই গভীর আনন্দ পেতে পারে।

ঝড়বৃষ্টিতে প্রায় সকলেই গৃহবন্দী হয়েছিল। কিন্তু তবু অনেকেরই আবার বেরোতেও হয়েছিল, পেটের জ্বালায়। একে ত গ্রীষ্মশেষে এমনিতেই সকলের দুরবস্থার একশেষ, তারপর গ্রীষ্ম উধাও হতে না হতেই এহেন বর্ষা! চিতাটাও বোধহয় ভালুমারের মানুষদের দুরবস্থার কথা জেনে গেছিল। একদিন সকালে টিহুল-এর দ্বিতীয় বউ সহেলীর বড় ছেলেটি যখন ঐ দুর্যোগের মধ্যে মায়ের অনুরোধে কোথায় কোথায় জল ভাল জমছে তা দেখে আসতে এবং জল পেয়ে মোরব্বারা কোন টাঁড়ে কেমন বাড়ল তাও দেখে আসতে বেরিয়েছিল সকাল বেলায়, ঠিক তখনই, চিতাটা তাকে চুপিসারে এসে ধরেছিল। বড় রাস্তা ছেড়ে ছেলেটা বড় জোর হাত পনেরো ঢুকেছিল জঙ্গলের ভিতরে। একটি বড় পিপ্পল গাছের গোড়াতে তাকে ধরে, সেই গাছেরই আড়ালে বসে তাকে দিন-দুপুরে ঝড়ের সোঁ সোঁ আওয়াজ আর মেঘের গর্জনের মধ্যে নির্বিঘ্নে খেয়ে সাফ্ করে চলে গেল। সহেলী দুপুর অবধিও খোঁজ করে নি। দিন-দুপুরে চিতার কথাটা মনেও আসেনি ওর। টিহুল ফিরলে বস্তিতে এসে দুজনে মিলে এর বাড়ি তার বাড়ি খুঁজেও যখন ছেলেকে পেলো না তখনই সকলে মিলে খুঁজতে খুঁজতে শেষবিকেলে পড়ে-থাকা হাড় আর চুলশুদ্ধু অবিকৃত আতঙ্কিত চোখের শিশুমুখটিকে আবিষ্কার করেছিল ওরা। বিধাতার পরিহাস বোধহয় একেই বলে। যে টিহুল, তার স্ত্রীর গর্ভধারণের কারণে ডাক্তারবাবুদের ওপর রাগ করেছিল মাসখানেক আগে, সেই-ই এখন শোকগ্রস্ততার মধ্যেও আশ্বস্তও হল। দুখানা হাত ত কম পড়ল। পেটের জ্বালা যেমন জ্বালা, তেমনই ওদের টানাপোড়েনের সংসারে একজোড়া হাত হঠাৎ কমে যাওয়ার জ্বালাও বড় জ্বালা, হোক না সে ক্ষুদে হাত! পেটের রুটি, এখানে অনেক জোড়া হাতের সম্মিলিত মদতে বড়ই মেহনত করে জোগাড় করতে হয় যে!

বৃষ্টিতে বেরুবার জো নেই। তার ওপর সহেলীর ছেলেকে শোন্‌চিতোয়া দিন-দুপুরে নিয়ে যাওয়ার পর বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউই ঘর ছেড়ে বেরোতে চাইছে না। ভয়কে চিরদিনের মতো ভয় করার বিলাস এদের মানায় না।

এখানকার সকলেই এখন চিতাটার নামোল্লেখ পর্যন্ত করে না, বলে শয়তান। আরও বড় ভাবনার কথা যে, কেউ কেউ চিতাটার মধ্যে দৈবী ব্যাপারেও দেখতে শুরু করেছে। একে নিধন করা যখন কাড়ুয়া ও পুলিশের রাইফেলধারীদের পক্ষেও সম্ভব হয় নি তখন এ যেন বনদেওতার আশীর্বাদধন্য শোন্‌চিতোয়া এ বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ক্রমশই দৃঢ় হচ্ছে।

সকাল থেকে অঝোর ধারা ঝরে এখন থেমেছে বৃষ্টিটা। তবে, আকাশে মেঘ রয়েছে। এই অস্বাভাবিক বৃষ্টি কবে যে থামবে, কে জানে।

তিতলি একটু চিঁড়ে ভেজে দিল, সঙ্গে ডালমুট মিশিয়ে। বারান্দায় বসে চা আর চিঁড়েভাজা খাচ্ছি আর নোনা কথা ভাবছি। বিয়ের পর থেকে একটা অভাব বড়ই বোধ করছি। তিতলিকে যখন লেখাপড়া শেখানো সম্পূর্ণও হবে, তখনও ফাঁক থেকে যাবে অনেকই। আমার সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত পটভূমির সঙ্গে তিতলির পটভূমির মস্ত ব্যবধান চিরদিনই থেকে যাবে। এ ফাঁকটার কথা আগে কখনও ভাবি নি। বুঝতে পারি নি। ও নর্মসহচরী, বিনিপয়সার নোকরানি এবং আমার সন্তানের জননী হবে যদিও, তবু কখনই বোধহয় এ জীবনে আমার সখী হবে না। সখ্যতা শুধু

সমান রুচি, সমান শিক্ষা, সমান মানসিকতার দুজন মানুষের মধ্যেই বোধহয় সম্ভব। এ কথা দিনে দিনে বড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাই-ই বা হল। যারা বেড়া ভাঙতে চায়, তাদের ক্ষয়ক্ষতি লোকসান কিছু হয়ই। কিন্তু বেড়া ভাঙলে, তবেই না অনেকের পক্ষে এগিয়ে আসার পথ সুগম হবে।

কোন এক নাম-না-জানা পাখি ঠোঁটে করে কোন অচিন ফলের বীজ নিয়ে মন উদাস করা বিধুর স্বরে ডাকতে ডাকতে মেঘের মধ্যে সেই বীজ বপন করবে বলে উড়ে গেল। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ পাখিা উড়ান-পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। দিগন্ত আড়াল করে এক ঝাঁক বয়ের আর খয়ের গাছের ঝাঁকড়া ভীড়ের মধ্যে সে হারিয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে আবার পথে তাকালাম।

চারদিক থেকে গায়ের গন্ধ উঠেছে। বন-বর্ষার গায়ে যে আশ্চর্য মিষ্টি তিক্তগন্ধ তার সঙ্গে বন-শরতের গায়ের গন্ধের অমিল আছে। পাখিটাকে বয়ের আর খয়েরের আড়ালের ওপারে আর খোঁজা হলো না, দেখা হলো না আমার স্বপনে বীজ বপনের মতো কী করে সে মেঘের মধ্যে বীজ বপন করে? সত্যিই পারল কি? 'আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে, দিন শেষে দেখি ছাই হল সব হুতাশে হুতাশে।' বাঁশবাবুর নামী লেখক হওয়ার স্বপ্নর মতোই হয়তো পাখিরও কোনো স্বপ্ন সত্যি হলো না। কিন্তু পাখিটা, কি পাখি? আমি চিনি না এমন পাখি এদিককার জঙ্গলে বিশেষ দেখি নি। তবুও মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ অচেনা পাখি চোখেও পড়ে। ভাল করে তাদের দেখা হয় না, তাদের দেখতে দেয় না তারা। আর দেখার পরই যদি না সালিম আলী বা হুইসলার সাহেবের বইয়ের কোনো পাখির সঙ্গে তাকে মেলাতে পারি, তাহলেই সে হারিয়ে যায়। তখন ভাবি, নাইই বা চিনলাম সব পাখিকে। কিছু অচিন পাখি, অচিন সুখ অচিন মুখ না থাকলে জীবন বোধহয় বড়ই একঘেয়ে হয়ে যেত। সবই জানার মতো গভীর অজ্ঞানতা বোধহয় আর কিছুই হতে পারে না। জানার সীমা ত থাকেই; থাকে না অজানার সীমা।

গভীর রাতে, তিতলি যখন আমার পাশে পরম আশ্চিন্ত ও নির্লিপ্তিতে আশ্লেষে ঘুমোয়, বাইরে ঝিঁঝি ডাকে একটানা, ঝারিতালাও-এর দিকে থেকে ব্যাঙের একঘেয়ে ডাক এবং কখনও-সখনও সাপের ব্যাঙ ধরার আওয়াজ উঠোন থেকেও ভেসে আসে, তখন বিছানাতে উঠে বসে জানালা খুলে দিই। জানালা খোলাও বিপজ্জনক, শোনচিতোটার জন্যে। তবে, ভাগ্যক্রমে আজ অবধি কখনও কারো ঘরে ঢুকে রাতে বা দিনে চিতাটা মানুষ নেয় নি। সেই-ই ভরসা। হাতের কাছে টাঙ্গিটা অবশ্য থাকে, লম্বা টাঙ্গি।

ভালুমারের বর্ষারাতের আকাশে কোনোদিন চাঁদ থাকে, কোনোদিন থাকে না; আকাশ পরিষ্কার থাকলে বৃষ্টিভেজা বন-পাহাড়ে তারাদের আলো এক নরম সবুজাভ স্নিগ্ধতা মাখিয়ে দেয়। সেই সব মুহূর্তে আমার মনে হয়, আমার যেন অনেক বয়স। অনেক হাজার লক্ষ অযুত নিযুত কোটি বছর ধরে যেন এই পৃথিবীর জঙ্গলে জঙ্গলে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। কত স্মৃতি, কত সুখবহ ও ভয়াবহ অভিজ্ঞতায় আমার মস্তিষ্ক ভরে রয়েছে। নড়লেই চড়লেই মাথার মধ্যে ঝুমঝুমির মতো তারা নড়ে-চড়ে বেজে ওঠে। তখন মনে হয়, তিতলির সঙ্গে আমি এক গুহাতে বাস করেছিলাম একসময়। নগ্নাবস্থায়। তখনও মানুষ আগুন জ্বালাতে শেখে নি, ধাতুর ব্যবহার শেখে নি, চাষ বাস করতে শেখে নি কাড়ুয়ার মতো শুধুই শিকার করতে জানতাম তখন আমরা, পাথরের অস্ত্র দিয়ে। তখন ভাষা ছিল শুধু চোখের, আর শরীরের। তখন

মানুষের একটামাত্রই জাত ছিল, যে জাতের নাম মানুষ। সে মানুষের মধ্যে ভাষার ব্যবধান ছিলো না, কারণ ভাষাই ছিলো না। অস্ফুট, কচিৎ আওয়াজ করে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতাম তখন আমরা। বড়লোক গরীব ছিলো না, সাদা কালো ছিলো হয়তো, কিন্তু ঘৃণা ছিলো না, ব্রাহ্মণ চামারের মধ্যে ভাগাভাগি ছিলো না। অনেকদিন আগে হুলুক্ পাহাড়ে সেই গুহার মধ্যে পাথরের গায়ে শিকারিদের আঁকা ছবি দেখার পর রথীদার সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলাম গুহার বাইরে। কাড়ুয়া এখনও সেই অতীত যুগেই পড়ে আছে এ কথা বলেছিলেন রথীদা। আমি বলেছিলাম, আমরা ভুল করে ট্রেনে চড়ে আজ যে সভ্যতা নামক অসভ্যতায় আমাদের উপনীত করেছি তার চেয়ে কি কাড়ুয়ার মতো শিকারী হয়ে থাকাই ভালো ছিলো না?

কথাটা শুনে রথীদা বলেছিলেন, কথাটা ভেবে দেখার মতো! কত কথাই সেই সব সময়ে মনে আসে। আমার চারপাশে কতরকম শব্দ। কার পায়ের শব্দ? বনদেবীর? তার পায়ের শব্দ কেমন?

ঋগ্বেদে বনদেবীর দারুণ বর্ণনা আছে। অমন রাতে সে সব কথা মনে পড়ে গা ছমছম করে। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

"ও বনদেবী! ও বনদেবী! তুমি কখনও কোন গ্রামে আসো না? তুমিও কি পুরুষমানুষদের ভয় পাও? তুমি দূরের দিগন্তে কেবলই মিলিয়ে যাও কেন? দেবী, আমাকে একদিন দেখা দাও।

যখন ঘাসফড়িং, দূর জঙ্গলের ঘন বনে চরে বেড়ানো গরুর গভীর ডাকে সাড়া দেয়, তাদের শিং ঝাঁকানোতেই গলার ঘন্টা ডুং-ডুং করে বেজে ওঠে তখন মনে হয়, বনদেবী তুমি সেই গো-ঘন্টার ডুং ডুংগানি শুনতে বোধহয় খুব ভালোবাসো।

কখনও কখনও তোমাকে এক এক ঝলক মাত্র শুধু দেখা যায়, ঝাঁকি দর্শনে; এবং দূর থেকে তোমায় দেখে মনে হয় তুমি যেন দূরের টাঁড়ে ভাসমান মেঘের মতো ঘাস খুঁটে খাওয়া কোনো বনচারি গবাদি জীব। কখনও বা মনে হয় তুমি বুঝি দূর জঙ্গলের কোনো বন-চরিয়ালের অভিযানে ছেড়ে-যাও ঘর। রাতের বেলা তোমার গলার স্বর শুনে মনে হয় যেন বহুদূরের ধূলিধূসরিত বনপথ বেয়ে গরুর গাড়ি চলেছে ক্যাঁচোর কোঁচোর হৃদয়ভাঙ্গা শব্দ তুলে।

বনের মধ্যে তোমার গলার স্বর শুনে এক একবার মনে হয় গবাদি জীবের ডাক বুঝি। কখনও মনে হয়, জঙ্গলের গভীরে বুঝি কোনো নিষ্ঠুর কাঠুরের সদ্য কাটা মহীরুহ ভূতলশায়ী হল আর্তনাদে। যদি কেউ রাতে জঙ্গলে থাকে, তাহলে সুদূরে তোমার গলার স্বর শুনে তার মনে হতে পারে তা কোনো নারীর কান্না।

বনদেবী, তুমি কারোই কোনো ক্ষতি করো না। ক্ষতি করো না শত্রুরও, যদি সে তোমার খুব কাছাকাছি আসার চেষ্টা না করে। বনের মিষ্টি ফল খেয়ে তুমি থাকো এবং বনের মধ্যে তোমার যেখানে খুশী সেখানেই বিশ্রাম করো।

আমি বনদেবীর বর্ণনা করছি। তুমি সুস্নাতা, সুগন্ধি, সুবেশা। তুমি সব সময়ই সুতৃপ্তা। যদিও নিজে হাতে তুমি কখনও চাষ করো না। এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুরই তুমি মাতা।"

এইরকম রাতে একা থাকলেই মনে হয় কত যুগ-যুগান্তরের কত কালের কবিরা আমার চারপাশে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের সস্নেহে অদৃশ্য দৃষ্টি আমি যেন আমার দু' কাঁধের ওপর পড়েছে বলে অনুভব করি। বাইরে হাওয়া দেয়। জলভেজা

পাতায় পাতায় শিরশিরানি ওঠে। গোঁড় লেবুগাছের ফুল থেকে এরকম অসভ্য গন্ধ বেরোয়।

হঠাৎ তিতলি ঘুম ভেঙে বলে ওঠে, কী করছ তুমি? কি দেখছ?

কিছু না।

কিছু না কি আবার!

কিছুই না।

এই সময় আমাকে কেউ বিরক্ত করলে আমার ভীষণ রাগ হয়ে যায়। তিতলি হয়তো বোঝে না যে, আমার মতো এবং ওরও মতোই সমস্ত মানুষই একা। তার একক সত্তাটাই তার সবচেয়ে সত্য সত্তা। অথচ সেই একা মানুষ যতখানি বাঁচে তার সমস্ত সময়ই পরিবৃত্ত হয়ে, অন্যর ভাবনা, বুদ্ধি-দুর্বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। সে নিজেকে নিজের করে, পরম নিজস্বতায় একটুও পায় না।

তিতলির চোখে আজকাল প্রায়ই এক গভীর ভয়ও উঁকি মারতে দেখি। সেই ভয়ের স্বরূপ সে নিজেও জানে না, তার সমস্ত বুদ্ধি দু'হাতে জড়ো করেও যে-মানুষকে তার মতো করে সে এ জীবনে পেয়েছে, যার শরীরের শরিক সে হয়েছে, তার মনের নাগাল না পেয়ে ছটফট করে। হীনম্মন্যতায় ভোগে। এই ক্ষেত্রে আমার আর ওর জাত আলাদা।

আমি যা ভাবি, যা বলতে চাই, তা আমার এই ডাইরির অনেক পাঠিকা হয়তো নিশ্চয়ই বুঝবেন, কিন্তু মেয়ে হয়েও তিতলি কোনদিনও বুঝবে না, যদিও ও আমার স্ত্রী। একই মানুষের মনের মধ্যেই কত বিভিন্ন মানুষ বাস করে এবং বাস করে বলেই, মানুষের কোনো সম্পর্কেই পরম ও চূড়ান্ত সম্পর্ক নয়। সমস্ত সম্পর্কই অসম্পূর্ণ। শরীর অথবা মন কিছুমাত্র বাকি না রেখে অন্যকে দিতে চাইলেও অন্য মানুষকে কখনই চূড়ান্ত ভাবে পাওয়া হয়ে ওঠে না। ফাঁক থাকেই। বাকি থাকেই কিছু। এই মুহূর্তে পৃথিবীর কোণে কোণে কোটি কোটি নারী কোটি কোটি পুরুষ হয়তো তার জীবনসাথীকে পরিপূর্ণ করে চাইছে। মনে হয়, এই পরিপূর্ণ করে পাওয়ার কামনাটাই ভুল। কেউ অন্যকে পরিপূর্ণ করে পেতে পারে না। আমরা আমাদের এক সামান্য অংশকেই মাত্র অন্যকে দিতে পারি। সে বন্ধুই হোক, শত্রুই হোক, জীবনসাথীই হোক, কী প্রেমিকাই হোক। আমাদের একাকীত্ব সম্পূর্ণতা পায় শুধু প্রকৃতিতেই, ভগবৎ বোধে। "আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না ফুরাবে না, সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।"

একদিন উর্বশী পুরূরাকে বলেছিলেন তোমার সঙ্গে, কথা বলে কী লাভ আমার পুরূরবা? প্রথম ভোরের মতো আমি মিলিয়ে গেছি, তোমার ঘরে ফিরে যাও তুমি। আমি হাওয়ার মতো। আমাকে ধরা যায় না।'

পুরূরবার মতোই আমি যখন গভীর দুঃখের সঙ্গে বলব তিতলিকে : "আমি একা একা হারিয়ে যাচ্ছি, আমি চলে যাচ্ছি আমার চৈতন্যের দিগন্তরেখায়, নেকড়েরা সেখানে ছিঁড়ে খাবে আমাকে, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।" তখন হয়তো উর্বশী যেমন পুরবরবাকে বলেছিল তেমন করেই তিতলি চিরন্তন নারীর কথায় বলবে : "তুমি চলে যেও না, হারিয়ে যেও না, ভীষণ নেকড়েদের হাতে ছেড়ে দিও না নিজেকে। অমন নিবুদ্ধিতা আমাদের মতো সামান্য এক নারীর জন্যে। সখ্যতা বা বন্ধুত্ব কোনো নারীর মধ্যেই তুমি কখনও পাবে না। তা ভুল করে খুঁজতেও যেও না কখনও। কারণ, নারীদের হৃদয় আধাপোষমানা শেয়ালনীদের মতো। কোনো নারীই কোনো পুরুষের

পুরোপুরি বশে থাকে না, কখনও পোষ মানে না. এইই নারীর স্বভাবের গভীর বিস্ময়ময় বিপন্নতা। অথবা নিঃসংশয় নিরাপত্তা।"

এই গভীর সুষুপ্ত অরণ্যানীর মধ্যে আমি এমন একা-জাগার রাতে মৌন মহাকালের নীরব বার্তা শুনেতে পাই। সেই সব মুহূর্তে আমার জাগতিক, সমস্ত পারিপার্শ্বিক আমার দেশীয় বোধাবোধ, আমার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিক সমস্ত বিবেচনা এবং ভাবনাকে তুচ্ছ করে সবুজ অ্যালগী. লিভারওয়ার্ট, হর্সটেইলস্ ক্লাবব মসেস, জীমনো-স্পার্মস্ অ্যান্জিওস্পার্মস্ এবং গিংকোদের পূর্বসূরীদের বিরাটত্ব প্রচণ্ডভাবে ঘিরে রাখে। যে জঙ্গলে ডাইনোসররা ঘুরে বেড়াত একদিন, যে জঙ্গলে দু-ফিট বিস্তৃতির পাখার তেলাপোকারা আর ফড়িংরা উড়ে বেড়াত আর তাদের ধরে খেতো অতিকায় সব মাকড়সা আর বিছেরা, তাদের সকলকে মশ্নচক্ষে দেখতে পাই। আব ঠিক তখনই সেই মুহূর্তে, এই জীবন, এই কাল অনাদিকালের এক তুচ্ছতম ভগ্নাংশ হয়ে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়। সেই আমি, অনাদি আমি. আমার আমি, একা আমি, যে আমিই এক-মাত্র সত্য, যে-আমির সঙ্গেই যুগযুগান্ত ধরে তারা মিলন চলেছে। "দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া জনম জনম এই চলেছে তোমায় আমায়, মরণ কভু তারে থামায়?"

আমার ডেরার চারধারে, যতদূর মানুষের চোখ যায় আদিগন্ত শুধু ডোসডুয়াস্ বনের রাজ্য। যখন তাদের দিকে এমন নির্জন সম্পূর্ণ একা অবস্থায় তাকাই তখন আমার গা শিরশির করে উঠে। আমি তো সেদিনের! এই বনরাজিনীলার বয়স ছত্রিশ কোটি. বছর। বনরাজিনীলা তখন ছিলো না—তাদের পূর্বসূরীরা তখন সমুদ্রের মধ্যে থেকে প্রান্তিক এলাকা ছেড়ে ডাঙায় আসতে চেষ্টা করতে আরম্ভ করেছে শুধু মাত্র। তাবা প্রচণ্ড বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করে জয়ী হয়েছিল।

আনুমানিক বেয়াল্লিশ কোটি বছর আগে সমুদ্র ছেড়ে প্রস্তরাকীর্ণ নগ্ন ভূখণ্ডে প্রথম এই সবুজের নিশান ওড়ে। ভূখণ্ডের কঠিন প্রস্তরময় নগ্নতাকে নম্রসবুজ পরিধানে ঢেকে দিতে আরম্ভ করে তারা সেইই প্রথম। কোন গাছ বা লতা বা ঝোপ যে এই বিজয়াভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিল তার খবর এখনও মানুষের কালে অজানা।

কত কথাই মনে হয়। রাত বাড়ে। বৃষ্টি ঝরে। ক্বচিৎ জোনাকির দল রাতের বেলায় চোখে-আলো পড়া হরিণের দলের সবুজ চোখের মতো ঝিকমিক্ করে ওঠে জল-ভেজা অন্ধকারে। ঝিঁঝিরা একটানা এক পর্দায় ডেকে চলে। মাঝে মাঝে স্বরের আরোহণ অবরোহণও ঘটে। মনে হয়, আমি একা। এই পৃথিবীতে আমি যেন অনন্ত-কাল ধরে বৃষ্টি ভেজা সুগন্ধি হাওয়ার মধ্যে জানালা খুলে বসে আছি।

বসে বসে, কত কথাই মনে হয়। অনন্তকাল যেন স্তব্ধ হয়ে থাকে আমার খোলা জানালার সামনের নিবিড় অন্ধকার বনানীর মধ্যে।

তুষারযুগের আগে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার উদ্ভিদজগতে পরম সাদৃশ্য ছিল। একই রকম গাছগাছালি, লতাপাতা তখন জন্মাত। কিন্তু, আজ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার কোনো গাছগাছালি উদ্ভিদের মধ্যে আর মিল নেই। তুষারাচ্ছাদিত আদিগন্ত হিমবাহর চাপে যখন ইউরোপের অরণ্য দক্ষিণে নেমে আসছিল তখন পূর্ব-পশ্চিম জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা আল্পস্, পীরিনীজ, বালকানস্, ককেশাস্ ইত্যাদি পর্বতমালার পাদদেশে এসে তাবা ঠেকে যায়। এই সমস্ত পর্বতমালার সবগুলিই তখন সম্পূর্ণ তুষারাবৃত ছিল, কারণ পৃথিবী তখনও গরম হয়ে ওঠে নি। সেই তুষারাবৃত পর্বতমালাতে তুষার-বাহিত হয়ে এসে ঐ অরণ্যের বীজরা আর নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে পারল না। এই-ভাবে তুষার যুগের আগের যতরকম উদ্ভিদ এবং অরণ্য তখন গড়ে উঠেছিল তাদের প্রত্যেকের প্রজাতিই বিনষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু উত্তর আমেরিকাতে সমস্ত পর্বতমালা

উত্তর থেকে দক্ষিণে দাঁড়িয়ে ছিল বলে তুষার নিপীড়িত ও তাড়িত উদ্ভিদ ও অরণ্যানী সেখানে অমন ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি।

চারবার ঐ তুষারবাহরা এ গিয়ে এসে আবারও পোঁছিয়ে গেল। নিউ ইংল্যান্ড থেকে মাত্র দশহাজার বছর আগে তারা পোঁছিয়ে যায়। বরফ সরে গেল। পড়ে রইল জীবন-রহিত, ক্ষতবিক্ষত, বরফবাহিত স্তূপীকৃত ধ্বংসস্তূপ কঙ্কালের মতো। এই দাঁত বের করা কঙ্কালসার বরফাবৃত পৃথিবীর ওপরেই নতুন করে উদ্ভিদেরা আবার তাদের সংসার পেতেছিল। একথা অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে আজ আমরা তেমনই এক হিমবাহ অন্তবর্তী যুগে বাস করছি। আমার ভালুমার, চিপাদোহর, হুলুক্ গাড়ু, কোয়েল, ঔরঙ্গা, মীরুচাবেটী আমাদের সকলের সব সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-দীর্ঘশ্বাস এবং আনন্দসমেত, একদিন হয়তো আবারও বরফের তলায় চলে যাবে। শুধু ভালুমারই নয়, সমস্ত ভারতবর্ষ, সমস্ত পৃথিবীর ভূখণ্ডে।

যখনই তুমুল বৃষ্টি পড়ে, সারারাত ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়, বুকের মধ্যে কাঁপন তুলে বাজ পড়ে, আর নালা দিয়ে, গাড়ুহা দিয়ে, প্রতিটি আবৃত ও অনাবৃত খোয়াই দিয়ে তোড়ে কলরোল তুলে জল ছুটে চলে জানা থেকে অজানার দিকে, কামার্ত ও কামার্তা শেয়াল শেয়ালনীরা যখন পৈশাচিক ডাক ডাকে বৃষ্টিকে রমণ করতে করতে, হাওয়ার ধু-ধু পৃথিবী হয় মরুভূমি, নয় মৃত্যুর মতো শীতল রুক্ষ নগ্নতা অথবা অন্ধকারের রনবনানী ভয়ার্ত পাখিদের করুণ কাকলিতে যখন কাকলিমুখর হয়ে ওঠে, তখন আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাই যে নূহ আবারও নৌকো ভাসিয়েছেন। এক-এক জোড়া প্রাণী নিয়ে। এখন কলি। ঘোর কলি। এক-জোড়া নিষ্পাপ মানুষ কি আছে এই অভিশপ্ত পৃথিবীতে যারা দুজন নূহর নৌকোয় চড়বার যোগ্যতা রাখেন? বোধ হয় নেই। একবার ভয় হয়। কী হবে? তারপরই মনে হয়, যাক সব ভেসে যাক। ধ্বংস হয়ে যাক গর্বিত আত্মমগ্ন অন্ধ মানুষের নিজেরই কুৎসিত লালসার হাতে তার নিজের ইতিহাস, তার যা-কিছু ভাল, এবং তারই সঙ্গে শেষ হয়ে যাক সব ভণ্ডামি, ভেদাভেদ, অনাচার, আর অবিচার। আবার সেই হু হু হাওয়ার ধু-ধু পৃথিবীর ; হয় মরুভূমি, নয় মৃত্যুর মতো শীতল রুক্ষ নগ্নতা, অথবা নিষ্ঠুর হিমবাহর ধবল লীলা খেলা। আবার শুরু হোক উদ্ভিদ জগতের নতুন অভিযান। একটি একটি করে ফুল, ঘাস পাখি, ফল, প্রজাপতি, মানুষ, একটু একটু করে সততা, বিশ্বাস, আন্তরিকতা ; ভালোবাসা, সব ফিরে আসুক।

সময়?

যা লাগে লাগবে। যা লাগবে, তাইই নিরুপায়ে দিতে হবে। উপায় নেই, কোনো উপায় নেই।



আজ স্কুল থেকে যাবার সময় পরেশনাথ গলায় খুশির ঝলক তুলে বলল, আজ বাবা আসবে।

বাবা? অবাক হয়ে আমি শুধোলাম।

হ্যাঁ। মাহাতো বাবা। সুজির হালুয়া আর প্যাড়া নিয়ে আসবে আমাদের জন্যে।

বলেই, ছুট্ লাগালো ভেজা মাঠ পেরিয়ে।

কতকগুলো কেঁচো স্তূপীকৃত হয়ে ছিল নরম মাটির ওপরে। ব্যাঙাচি দৌড়ে গেল ছোট একটি গর্তের জমা জলে। কত পোকা-মাকড়, কত রঙ তাদের। রাতের বেলা ঘরের মধ্যে আলো জেবলে জানালা খুলে রাখা যায় না আজকাল। তীব্র গতিতে নানা আকৃতির নানারঙা বনজ পোকা-মাকড় আছড়ে এসে পড়ে লণ্ঠনের ওপর। সারাদিন ঝিঁঝি ডাকে ঝাঁ-ঝাঁ করে। মীর্‌চাইয়াতে এখন সফেন জলরাশি প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলেছে সহস্র ধারায়। গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ কালো চ্যাটালে পাথরগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে এখন। মাঝে মাঝে শুধু তাদের উঁচু কানাগুলো চোখে পড়ে, সেখানে জল ছাপিয়ে উঁচু হয়ে আছে ওরা। গ্রীষ্মের ধূসর ধূলিমলিন তাপক্লিষ্ট রুক্ষ বনের মধ্যে যে এত উচ্ছল প্রাণ লুকিয়ে ছিল নিঃশব্দে, তা কে বিশ্বাস করবে!

সব পোড়োরা চলে গেলে, তিত্‌লি চা নিয়ে এল। তিত্‌লিকে বলেছিলাম, ওকে ডালটনগঞ্জের হাসপাতালে সময় মতো ভর্তি করাব। ও ভীষণ আপত্তি করেছে। কোনো পুরুষ ডাক্তারের সামনে সে নগ্ন হতে পারবে না। তার নগ্নতার প্রথম ও শেষ সাক্ষী হবো আমিই। ওর জীবনের একমাত্র পুরুষ। আশ্চর্য ওর লজ্জাবোধ। মনের গভীরে প্রাচীন কোনো জটাজুট-সম্বলিত মেল শভিনিস্ট বাস করে বলেই হয়তো ওর এই সমর্পণী কথাতে মনের মধ্যে এক রকম মূর্খজনোচিত শ্লাঘা বোধ করি। বুঝতে পারি, আমি ভীষণ স্বার্থপর। নইলে জোর করতাম, করা উচিতও ছিল ওর নিরাপত্তার কারণেই। ও বলে, বিস্‌পাতিয়া আর শনিচারিয়াই যা করার তা করবে। যেমন করে তার ঠাকুমা এবং মা-এর প্রসব হয়েছে এই গ্রামেই, ওরও তেমন করেই হবে। অত খরচের ও কায়দার দরকার নেই। সে যেমন ছিল, তেমনিই থাকতে চায়। বড়লোক বাঁশবাবুকে বিয়ে করেছে বলেই সে বড়লোকি করতে রাজী নয়।

হাসি পায় আমার ওর কথা শুনে।

বড়লোকই বটে! বাঁশবাবুর মতো বড়লোক কে আর আছে? কি জানি? বড়লোকি বোধহয় টাকার অঙ্কের ওপর নির্ভরশীল নয়। তা থাকে কারো কারো মনে। তিতলির মতো এই রকম বোধসম্পন্ন মানুষরাই বোধহয় সত্যিকারের বড়লোক।

চা দিয়েই ফিরে না গিয়ে, আজ বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চলে যাওয়া পরেশনাথের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল তিতলি। কেমন উদাস হয়ে গেল ওর চোখের দৃষ্টি। আমি ভাবলাম, ওর যখন ছেলে হবে, সেও পরেশনাথের মতোই টালমাটাল পায়ে এই পর্বত প্রান্তরে কেমন করে ছুটে যাবে, তাইই ভাবছে বোধহয় ও।

কী ভাবছিস?

উঁ?

ভাবছিস কি তুই?

ও আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ভাবছি, ছেলেমেয়ের দরকার কী ছিল?

হঠাৎ এই কথা?

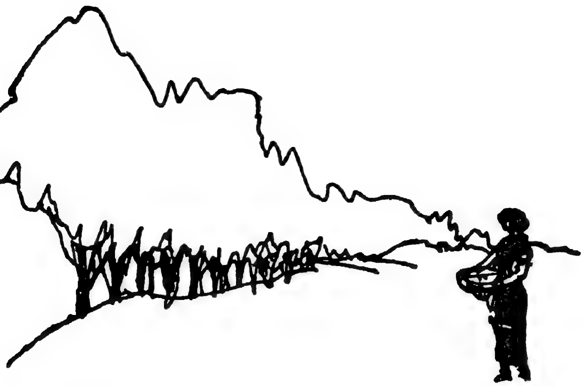
না, আমি ভাবছি ; মানি আর মুঞ্জরী চাচা-চাচীর কথা। কত কষ্ট করে পেটে ধরেছিল চাচী, পরেশনাথকে। কত কষ্ট করে নিজেদের সব আরামের থেকে বঞ্চিত করেই না, বড় করে তুলেছিল ওকে চাচা-চাচী! আজ সুজির হালুয়া আর প্যাঁড়ার লোভ পরেশনাথকে সবই ভুলিয়ে দিল! অজীব্ বাত! ওরা যদি এতই নিমক-হারাম হয়, তবে ছেলে-মেয়ে হওয়ার দরকার কি আদৌ?

পরেশনাথের কী দোষ? ও ত শিশু। মুঞ্জরীই যদি একটু ভাল খাওয়া, ভাল থাকা একটু সোহাগের জন্যে এতদিনের ঘর ভাঙতে পারে, তবে ছেলেমানুষ পরেশনাথের দোষ দিই কী করে? তুই যদি আজ দশ-পনেরো বছর পরে আমাকেও এমনি করে ছেড়ে চলে যাস, তোকে আমার চেয়ে যে অনেক বেশী ভালো করে রাখবে, আমার চেয়েও যে অনেক আরাম দিতে পারবে সব রকমের, এমন লোকের কাছে ; তখন তোর মা-ন্যাওটা ছেলেও তোর সঙ্গে গেলে তাকে আমি অন্তত দোষ দিতে পারব না।

তিতলি ভীষণ রেগে উঠল। নাকের পাটা ফুলে উঠল ওর। বলল, সব মেয়েই মুঞ্জরী-চাচী নয়। সব মেয়েই নিমকহারাম, নির্লজ্জ নয়। অমন কথা তুমি বোলো না। কখনও বলবে না।

বোকার মতো কথা বলছিস তুই। মানুষের একটাই জীবন। আমি যদি তোকে খেতে না দিতে পারি, তোর ছেলেমেয়েকে ভরণপোষণ না করতে পারি, অন্য লোকের হাতে রোজ রোজ অপমানিত হই কিন্তু তবুও রোজই মদ খাই, মাতাল হয়ে ফিরি হাট থেকে সেদিনকার তুই কী করবি না করবি তা আজ বলা সহজ নয়। আমাদের জীবন নদীরই মতো। তাতে কখন কোথায় চর পড়ে আর পাড় ভাঙে, কখন কোন দিকে ছুটে চলে জল তা কী আগে থাকতে বোঝা যায়? পাগলি! কারো ভবিষ্যৎই কেউ জানে না। ভগবান মানুষকে সবই জানতে দিয়েছেন, শুধু পরক্ষণে তার নিজের জীবনে কী ঘটবে তা জানতে দেন নি।

তিতলি আবারও রেগে বলল, ও সব কথা আমি জানি না। আমি, আমি। সবাই এক রকম নয়। চাচী কখনই ভালো কাজ করছে না। বনদেওতা তাকে কখনও ক্ষমা করবে না, তুমি দেখে নিও।



মানি গরু দুটোকে নিজের ঘরের সামনে ছেড়ে দিয়ে দু' হাঁটুর মধ্যে মুখ রেখে বসে ছিল। মুঞ্জরীর সঙ্গে অনেক বছরই তার কোনো শারীরিক সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক যা ছিল, তা শুধুমাত্র সংসার বিষয়ক। ছেলেমেয়ে সম্বন্ধেও কথা হত। গরু বাছুর সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফিরল কী ফিরল না। মাটিয়া তেল আছে কী নেই। ক্ষেতে গোবর সার দেওয়া হল, কী হল না। শীত বা গ্রীষ্ম বা বর্ষার প্রকোপ বা অভাব কতখানি এবং তাতে ক্ষেতের ফসলের ক্ষতি হবে না ভালো হবে, এই সব কথা। হাট থেকে ক' আনার নুন আর আনাজ আনবে, ওর ছেঁড়া ধুতিটাতে আরও ক'টা তালি সবশুদ্ধু মারা যাবে, আগামী বর্ষায় শতছিন্ন ছাতাটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা ছাতা কেনার সামর্থ্য হবে কি হবে না এই রকম সব কথা, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাবার্তাই হত ওদের মধ্যে। তার মধ্যে শারীরিক বা মানসিক ভালোবাসার মতো অপ্রয়োজনীয় কোনো কথার স্থান ছিল না। মুঞ্জরী, মাহাতোর বাড়ি রাত কাটিয়ে আসার পর থেকে সে সমস্ত প্রগাঢ় জাগতিক বিষয়ের কথাও বন্ধ হয়ে গেছে। হুলুক্ পাহাড়ের মতো মৌনী ধোঁয়া ধোয়া হয়ে গেছে মানিয়া। রোগাও হয়েছে ভীষণ। একেবারে কংকালসার। চেনা যায় না ওকে। আর রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা ; বুলকি। বুলকির এগারো বছর বয়স হল প্রায়। ও ঋতুমতী হয়েছে। তাইই সবসময়ে আতংকে থাকে মুঞ্জরী। গরীবের ঘরে নারীর যৌবন বড় আতঙ্কর। এখন বুলকি মানির সঙ্গে এখানেই থেকে যাবে বলে জেদ ধরায়, তার সব দায়ই এসে পড়েছে তার অপদার্থ বাবার ঘাড়ে। কী করবে যে, ভেবেই পায় না মানি। ভেবে ভেবে ওর ঘাড়ের কাছটাতে বড় ব্যথা করে। একবারে ভাবে, গোদাশেঠের দোকানে গিয়ে গেঁহুর জমির তীব্রগন্ধী সার কিনে অনেকখানি একসঙ্গে খেয়ে ফেলে নিজেকে একেবারেই শেষ করে দেয়। রোজ রোজ একটু একটু করে মরার চেয়ে একবারে মরা অনেক ভাল। তাইই দিত ও হয়ত এতদিনে, যদি না বুলকিটা তাকে এতখানি সম্মানিত না করত, এতখানি ভালো না বাসত তাকে। আসলে সার কেনার পয়সাও তার নেই। ও এমনই হতভাগ্য যে, বিষ কেনার সামর্থ্যও ভগবান দেন নি ওকে। হায় রাম!

পরেশনাথ দৌড়ে আসছিল। একবার মুখ তুলে তাকাল মানি—। দূর থেকে তার ছেলেকে দেখছিল সে। দেখতে দেখতে পরেশনাথ তার চোখের মণির মধ্যে বড় হতে লাগল, বড় হতে হতে প্রাপ্তবয়স্ক চওড়া কাঁধের যুবক—তার পর আরও বড়, দৈত্যের মতো বড় হয়ে গেল। মানির দু'চোখ, তার মস্তিষ্কের সমস্ত কোষে

পরেশনাথ ভরাট করে ভরে রইল স্বল্পক্ষণ। পরক্ষণেই সম্বিত ফিরে পেল মানি। তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন, তার জীবনবীমা, তার বার্ধক্যের শেষ অবলম্বন, তার একমাত্র ছেলে পরেশনাথ! মানি ভেবেছিল, আর কয়েকটা বছর পরেই সব কাজ ছেড়ে দিয়ে টিহুলের বৌ সহেলীর মতো শুধুই বাড়ি বসে দড়ি বানাবে আর শীতের দিনে রোদ পোয়াবে চাটাই পেতে বসে। তার শরীরের আনাচে-কানাচে তার বোঝা-বওয়া রুক্ষ. মলিন হাড়ে হাড়ে, গত পঞ্চাশ বছরে যত শীত, আর খিদে, অপমান আর অসম্মান জমে উঠেছে, সেই সব শীতের পাখিদের তাড়িয়ে দেবে সে ; রোদের তাপে শরীরের অণু-পরমাণু ভরে নিয়ে। ভেবেছিল। খ্যায়ের্ ' ক্যা হো গেল্ ! হো রাম!

পরেশনাথ একবার মানির দিকে তাকাল। কোনো কথা বলল না। মানির নাকে পরেশনাথের গায়ের গন্ধটা হঠাৎ ফিরে এল। শীতের রাতে, লেপ কম্বলের অভাব মেটাবার জন্যে গরীব বাপ যখন তার শিশুছেলেকে বুকের মধ্যে আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে একটু উষ্ণতা দেবার এবং পাবারও করুণ চেষ্টা করত সেই সময়কার ওম্-এর গন্ধের কথাও। যা কিছু জাগতিক, ও দিতে পারে নি তার আদরের ব্যাটা পরেশনাথকে ; লাল-জামা, ভালোমন্দ খাওয়া, জুতো, দশেরার মেলায় বুড়ির চুল কিনে খাওয়ার পয়সা অথবা নাগরদোলায় চড়ার,, তার সব কিছু অপূর্ণতাই ঘুমন্ত পরেশনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরে মানি পূরণ করতে চাইত। মানির অন্তরের এই বোধের স্বরূপ পরেশনাথের এখনও বোঝার সময় হয় নি. কিন্তু মুঞ্জরীর ত জানার কথা ' মাহাতোর ত জানার কথা! মাহাতো ত ভালুমার নামক পাহাড়া গ্রামের মাহাতোই মাত্র! রাজা মহারাজা হলেও কি তার বোধ মানির মতো বাপের বোধের থেকে তফাত হত? বাবা-মায়েদের তাদের সন্তানের প্রতি বোধ কি একই রকম নয়? কে জানে? বোধহয় নয়। নইলে, পারল কী করে মাহাতো আর মুঞ্জরী! কি করে পারল? মানি ভাবে, ও কতোটুকুই না দেখেছে দুনিয়ার? এই ভালুমারের টাঁড়ে টাঁড়ে আর হুলুক্ পাহাড়ের ছায়ায়, মীর্‌চাইয়ার ঝর্নার গানের মধ্যেই ত জীবন বীতিয়ে দিল—ওর জ্ঞানগম্যি আর কতটুকু?

পরেশনাথ বুলকির দিকে তাকাল। বুলকি বর্ষায় নেতিয়ে যাওয়া তেলচিটে কাঁথা-টাথা রোদে দিচ্ছিল, চাটাই বিছিয়ে মায়ের কথা মতো। মুঞ্জরী গাছতলার রোদে পিঠ দিয়ে বসে তার নিজের চুলে যত্ন করে তেল মাখছিল। এ ক'দিনেই মুঞ্জরীর বয়স অনেকই কমে গেছে। আসলে, কতই বা বয়স। দেখতে মনে হয় বুড়ি। এখনও যে মাটির তলার বীজের মধ্যের সুপ্ত প্রাণের মতো তার মধ্যেও এত প্রাণ ছিল, এত যৌবন ছিল, এত খুশি ছিল, চাওয়া ছিল, এমনকি কাউকে এমন করে এখনও দিয়ে ভরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও ছিল, এ কথা মাহাতোর আদর না খেলে, ও তাকে আদর না করলে মুঞ্জরী জানত না। মাহাতোকে অত্যাচারের প্রতীক, অসভ্যতা এবং দুর্বিনয়ের প্রতীক বলেই জেনে এসেছিল এত বছর মুঞ্জরী। ওকে দেখলে ওর আতঙ্ক হত। পুরুষ এক অদ্ভুত জাত! ভাবছিল, মুঞ্জরী। বড় মজারও জাত। মানির অকর্মন্যতায়, মদ্যপতায়, জীবনকে অসহায়ের মতো হাঁটু গেড়ে বসে মেরুদণ্ডহীনতার সঙ্গে মেনে নেওয়ার লজ্জাকর মানসিকতার কারণে কতবার ও মানিকে লাথি মেরে তার ভিতরের পৌরুষকে জাগাতে চেয়েছে. যে পুরুষকে সে শিশুকাল থেকে মনে মনে কল্পনা করে এসেছিল, বনদেওতার মূর্তির মাথায় জল ঢালতে ঢালতে, সারহুল উৎসবে গান গাইতে গাইতে. সেই পুরুষকে। কিন্তু পারে নি। অথচ মানি মানুষটা সৎ, অত্যন্ত ভালো, চাহিদাহীন এবং পুরোপুরি পরনির্ভর।

পরনির্ভরতাকে, ভালোবাসার এক বড় অঙ্গ বলেই জেনে এসেছিল মঞ্জরী। মানি যে তার ওপর নিঃশেষে নির্ভর করে এসেছে এত বছর, এ জানাটা চূড়ান্ত ভাবে জানত বলেই কখনও মানিকে ফেলতে পারে নি ও।,তাকে অপমান করেছে, মেরেছে, পদাঘাত করেছে তবু ত্যাগ করার কথা কখনও ভাবতে পারে নি। কিন্তু মাহাতো তার জীবনে পরনির্ভরতার অন্য এক রূপ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, পৌরুষের প্রতীকের মতো। এতদিন মানিকে, মঞ্জরী পরগাছার মতো বহন করেছে তার জীবনে।আজ নিজে পরগাছা হয়ে, সোনালী হলুদ উজ্জ্বল রঙের বাহারে নিজেকে সাজিয়ে সে নিঃশর্তে মাহাতোর ওপর নির্ভর করবে বলে ঠিক করেছে। মঞ্জরী তার জীবনের পথে অনেকখানি চলে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ বুঝতে পেরেছে যে, অন্যকে বইবার যেমন আনন্দ আছে, অন্যর দ্বারা বাহিত হওয়ারও তেমনই আনন্দ আছে। আনন্দর দরজা সকলের জন্যে খোলে না এ জীবনে। যারা সেই সুখ-কুঠুরির চাবির খোঁজ পেয়েছে, তারাই হয়ত জানে যে, বহন করে যতখানি সুখ, বাহিত হওয়ার সুখও তার চেয়ে কম ছাড়া বেশী নয়।

পরেশনাথ ডাকল, দিদি!

কি?

চোখ না তুলেই বুলকি বলল।—বুলকির গলার স্বরে চমকে উঠে মঞ্জরী একবার তাকাল মেয়ের দিকে। গত ক'দিনে মেয়েটার ব্যক্তিত্বই যেন বদলে গেছে। ওকে দেখলে আজকাল ভয় করে মঞ্জরীর। অথচ এগারো বছরের মেয়ে! বয়স বোধহয় বয়স হয় না, অভিজ্ঞতায় হয়। ব্যক্তিত্বে হয়। কাউকেই ভয় করে না আর মঞ্জরী। মানিকে না, পরেশনাথকে ত নয়ই, কিন্তু বুলকির নির্বাক চোখের চাউনি তাকে যেন জ্বলন্ত লোহার মতো ছ্যাঁকা দেয়। তার শরীরের কেন্দ্রবিন্দু লজ্জায় কেঁপে কেঁপে ওঠে। পরক্ষণেই ভাবে, লজ্জা কিসের? নিজেকে বোঝায়, আমার জীবন আমার। অনেক কষ্ট করেছি, আর নয়। এবার আমি বাঁচার মতো বাঁচব। এরা আমার কে? এদের জন্যে আমার জীবনের বাকি ক'টা দিন কেন এই অসামান্য সুযোগ থেকে, অনাস্বাদিত সব গা-শিউরানো সুখ থেকে বঞ্চিত হব!

পরেশনাথ আবারও ডাকল, মা।

কি বলছিস?

মঞ্জরী তেল মাখতে মাখতেই মুখ ফিরিয়ে তাকাল ছেলের দিকে।

মাহাতো-বাবা কখন আসবে?

মঞ্জরী একটু লজ্জা পেল। গলা নামিয়ে বলল, সময় হলেই আসবে। এত লাফাবার কী আছে?

চোখের কোণে চেয়ে দেখল মঞ্জরী, বুলকি সোজা নিষ্কম্প চোখে চেয়ে আছে তার বাবার দিকে। বুলকির চোখে এক আশ্চর্য জ্বালা আর দরদ যেন একই সঙ্গে মাখামাখি হয়ে রয়েছে। মেয়েটার চোখ দুটো বড় সুন্দর। সকলে বলে, মঞ্জরীর চোখ পেয়েছে ও।

পরেশনাথের মুখের 'মাহাতো-বাবা' কথাটা মানির কানেও গেছিল। এই কথাটা যখন শোনে, তখনই ওর মনে হয় যে, ওর বুকের মধ্যে পরেশনাথ, টাঙ্গির ফলাটাই আমূল বসিয়ে দিল। ছোটবেলার কথা সব মনে ভীড় করে আসে। কত লগন্সার দিন, তেওহারের দিন, মাদলের শব্দ-মেশা শালফুলের আর হাঁড়িয়ার আর শম্বরের মাংসের গন্ধের দিন। কিশোরী মঞ্জরীর শরীরের গভীর ঘ্রাণ, মানির দুই মুঠির মধ্যে মঞ্জরীর নরম স্তনকুঁড়িদের ধীরে ধীরে দৃঢ় যুগল ফুল হয়ে ফুটে ওঠার

অনুভূতির দিন। তার সফল না হওয়ার স্বপ্নগুলো সব সারি বেঁধে চোখের সামনে এসে হাত ধরাধরি করে ভীড় করে দাঁড়ায়। স্বপ্নগুলো যেন দল বেঁধে তাকে ঘিরে ঘিরে ভেজা নাচ নাচতে থাকে। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে মানির। পরেশনাথের গলার স্বরে ঘোর কাটে। পরেশনাথ দিদির কাছে এসে আবার ডাকে, দিদি।

বুলকি মুখ তুলে তাকায়। পরেশনাথের চোখে চোখ রাখে। কিন্তু কথা বলে না। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

পরেশনাথ বলে, দিদি! লগন বলছে, একদিন দুপুরে আসবে। মাছ ধরতে জলে ঝাঁপাঝাঁপি করতে নিয়ে যাবে আমাদের এক জায়গায়।

নিরুৎসাহ গলায় বুলকি বলে, কোথায়?

সে ঐ লগনই জানে। সেখানে অনেক রকম মাছ এসে জমায়েত হয়েছে। তুই যাবি ত?

বুলকি এক দৃষ্টে আরও অনেকক্ষণ পরেশনাথের চোখে চেয়ে রইল। কথা বলল না কোনো।

কি রে? যাবি না?

গেলেও হয়; না গেলেও হয়।

মুঞ্জরী বুলকির দিকে ফিরে বলল, তোর কথা শুনলে মনে হয় যেন, সাত বুড়ির এক বুড়ি! কত বয়স রে তোর বুলকি? শেষের দিকে মুখে হাসি ফোটাল মুঞ্জরী, পরিবেশ লঘু করার জন্যে, তার অবচেতনে যে এক স্বার্থপরতার লজ্জা আজ সকালবেলার পূবাকাশের পরত ঘন কালো মেঘের মতো জমে উঠেছে, সেই লজ্জাকে একটু দ্রবীভূত করতে চাইল ও।

কিন্তু বুলকি হাসল না। মেঘ ছেঁড়া রোদে কাঁথা উল্টে দিতে দিতে স্বগতোক্তির মতো বলল, বাচ্চাও বুড়ি হতে পারে, বুড়িও বাচ্চা; কখনও কখনও।

এমন সময় কার সাইকেলের ঘণ্টি শোনা গেল ঝোপের আড়ালে। বুলকি উৎকর্ণ হয়ে চেখ তুলল।

কে? নান্‌কু ভাইয়া?

চোখ তুলল মানি। ভয় পেল, ফরেস্ট গার্ডরা কি আবারও এল?

নাঃ। কেউই নয়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একজন ঠিকাদারের কর্মচারী, হলুদ আর সাদা খোপ খোপ শার্ট আর কালো প্যান্ট পরে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল। কোথায় গেল কে জানে? তিরিশে জুনের পর থেকে ত জঙ্গলে সব রকম কাজই বন্ধ থাকে।

নানকু সশরীরে না থেকেও এই ভালুমারের প্রত্যেকটি মানুষের বুকের মধ্যেই প্রচণ্ড জীবন্তভাবে বেঁচে আছে। হনুমান ঝাণ্ডা যেমন একটু হাওয়া লাগলেই পত্‌পতিয়ে উড়ে, মহাবীর যে আছেন, এ কথাই ওদের মনে করিয়ে দেয় অনুক্ষণ এত অন্যায়, অবিচার, অধর্মর মধ্যেও কোথাও যে ন্যায়, বিচার এবং ধর্ম সুপ্ত হয়ে থাকলেও আছেই, এ সত্য সম্বন্ধে ওদের সচেতন করে, তেমনই বনপথে শুকনো পাতা ওড়ার আওয়াজে, ভিজে হাওয়ায় লতাপাতার আকুলি-বিকুলি আর শন্‌শনানিতে ওরা চমকে ওঠে, ভাবে এই বুঝি নান্‌কু এল। নান্‌কুর সত্তা এখন আর কোনো একটি মানুষী ব্যক্তিত্বে সীমাবদ্ধ নেই, সে এখন আশার প্রতীক, ন্যায়ের, বিচারের, ধর্মর জ্বলন্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে এদেব সকলের কাছে। হঠাৎ ও উদয় হয়ে, ওরা যতখানি সাহসী নয়, যতখানি আশাবাদী নয়, যতখানি বিশ্বাসী নয়, অথবা যতখানি হতে পারার কল্পনাও ওরা কখনও করতে পারে নি, তার

চেয়েও অনেক বেশী সাহস, আশা ও বিশ্বাস ওদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে আবার শ্রাবণের বৃষ্টি-ঝরানো মেঘের মতো নিজেকে ভারমুক্ত করে বন পাহাড়ের দিগন্তে মিলিয়ে যায়। শুধু বুলকি বা মানিই নয়, নানকু কি বলতে চায়, কিসের বার্তা ও বয়ে আনে, কোন দিকে পথনির্দেশ করে তা এই ভালুমারের একজন মানুষও স্পষ্ট বোঝে না। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে এক নতুন প্রাণ সঞ্জীবিত হয়, বেঁচে থাকার এক নতুন মানে, জীবনের এক অনাস্বাদিত ভবিষ্যৎ-এর আভাস চমক তুলে ঝিলিক্ মেরে যায় প্রত্যেকেরই মনের মর্মস্থলে। ওরা ভাবে, একদিন হয়তো ওদের জীবনযাত্রা পাল্টাবে, জীবন শুধুই একঘেয়ে বারোমেসে ঘামগন্ধময় পরম ক্লান্তির পথ চলার রোজনামচা থেকে উত্তীর্ণ হবে এক নতুন দিগন্তের উজ্জ্বল উপত্যকায় — যে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা সুখের দেশ সম্বন্ধে ওদের কারোই কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই ; কিন্তু অস্পষ্ট কল্পনা আছে। তাই-ই, বনপথে যে কোনো শব্দ হলেই, ভালমারের প্রত্যেক মানুষ নানকুর আশায় মুখ তুলে চায়।

নানকুকে একদিন মুঞ্জরীও ভীষণ ভালবাসত। এমন কি, সেদিনও বাঁশবাবু আর নানকু যখন এসে মুঞ্জরীর ইজ্জৎ বাঁচালো হাটের মাঝে, সেদিনও নানকুর মতো ভালোবাসা, স্নেহ এমন কি শ্রদ্ধাও মুঞ্জরীর আর দ্বিতীয় কারো প্রতিই ছিল না। কিন্তু আজ ওর ছোট্ট পৃথিবীতে মুঞ্জরী, শয়তান শোন্‌চিতোয়াটার চেয়েও বেশী ভয় পায় নানকুকে। নানকু এসে মুঞ্জরীর সামনে দাঁড়ালে মুঞ্জরী কী করে মাথা তুলে কথা বলবে, জানে না মুঞ্জরী। আদৌ মাথা তুলতে পারবে কি ? নানকু কী বলবে ওকে? জবাবে ওই-ই বা কী বলবে নানকুকে? এ সব ভেবে মুঞ্জরী শুধুই আতংকিত বোধ করছে।

পুবের আকাশে খুব মেঘ করে এসেছে। দেখতে দেখতে বেলা বারোটার সময় একেবারে অন্ধকার করে এল। ঠিস ঠিস্ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল ঘন তৃণপল্লবাচ্ছাদিত মাটিতে আর বনে বনে। হুড়োহুড়ি করে কাঁথা-ত্যানা ঘরে তুলল বুলকি আর পরেশনাথ। মুঞ্জরী বৃষ্টির মধ্যেই হাসির মতো হেলেদুলে এগোল কুয়োতলার দিকে, গা ছেড়ে দিয়ে ভাল করে চান করবে বলে।

মানি যেমন দু হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে ছিল তেমনি করেই বসে রইল। বৃষ্টির তোড় বাড়ল মুহূর্তের মধ্যে। পরেশনাথ ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তার পুরনো বাবাকে বৃষ্টির সাদা ঝির্‌ঝিরে চাদরের এপারে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ওর মনে হল এ বাবাকে ও চেনে না। আবছা বাবা এ। অন্য বাবা। বুলকি জলের মধ্যে দৌড়ে গেল ওদিকে, ধাক্কা দিয়ে বলল, বাবা ! বাবা ! ভিজে গেলে যে বসে বসে।

মানি তবু জবাব দিল না। বুলকির মনে হল, মানি মরে গেছে। শক্ত, অনড় শরীরটা।

মানি তবু জবাব দিল না। বুলকির চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মরেই গেল নাকি লোকটা ! মরলে মরল। ওর কিছু কবার নেই। তবুও, এতদিনের কাছে থাকার, সুখ-দুঃখের ভাগীদার, সংস্কার, কু-অভ্যেস এই লোকটা। বুকটা হঠাৎ একবার ধ্বক্-ধ্বক্ করে উঠল মুঞ্জরীর। চেঁচিয়ে ধমকে উঠল বুলকিকে নাড়া দিয়ে দ্যাখনা, মরে গেল নাকি লোকটা ? কী আপদ !

বুলকি আবারও মানির কাঁধ ধরে নাড়া দিতেই মানি নড়ে উঠল। তারপর বুলকির হাত ধরে বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে চলল ঘরের দিকে। মুঞ্জরীর বুকের হঠাৎ-ধাক্কাটা থেমে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও।

ঠোঁট কামড়ে বলল, মরা এত সোজা' জন্মানো সোজা, মরা অত সোজা নয়!

কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়ে গেল। আজ শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন। আজকের দিনে তীর্থযাত্রীরা অমরনাথ দর্শন করেন। দর্শনের জন্যে নয়, পথের দৃশ্য দেখার জন্যে একবার যাবার বড় ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু যাওয়া কী হবে কখনও? কোথায়ই বা গেলাম আজ পর্যন্ত, যাওয়ার মতো জায়গায়? তিতলিকে বিয়ে করে, ভালুমারের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলে, বোধহয় বাকি জীবনের মতো এই জংলী গর্তের মধ্যেই সবুজ পোকার মতো বেঁচে থাকতে হবে।

আজ দুপুরেও এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। বৃষ্টির পর আকাশ একদম পরিষ্কার হয়ে গিয়ে চনচনে রোদ উঠল। আঃ' বন-পাহাড়, খোয়াই, লাল-মাটির পথ সব ঝক্‌মক্ করছে আজ। দারুণ গন্ধ উঠতে লাগল চারপাশের সোঁদা মাটি থেকে ওঠা বনজ বাষ্পের। ফড়িং উড়তে লাগল সমস্ত টাঁড়ের ওপরের আকাশ জুড়ে। দুরকমের ফ্লাইক্যাচার পাখি তাদের মধ্যে উড়ে উড়ে, ঘুরে ঘুরে কপাকপ্ করে ফড়িং গিলে খেতে লাগল। হুলুকে পাহাড়ের গায়ের কাছের ঘন জঙ্গলের ঢাল বেয়ে একদল নীলগাই হঠাৎ শোভাযাত্রা করে নেমে এল একেবারে টাঁড়ের মধ্যে। বোধহয়, পথ ভুলে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে তিতলিকে ডাকলাম। ও তখনও ঘরের মধ্যে শুয়ে ছিল। আমার দ্বিপ্রাহরিক আদর খাওয়ার পর। দৌড়ে এসে, বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়াল। অবাকও কম হলো না। নীলগাই-এর দলকে দেখে গ্রামের শেষপ্রান্ত থেকে দুটি কুকুর ভুকে উঠল। তখন নীলগাইয়েরা বুঝতে পারল যে, তারা পথ ভুল করেছে এবং বোঝা মাত্রই মুহূর্তের মধ্যে উল্টো দিকে আবার ক্লোরোফিল উজ্জ্বল জঙ্গলে ঢুকে গেল।

এদিকের জঙ্গলে নীলগাই খুব বেশি দেখি নি। নীলগাই উড়িষ্যার জঙ্গলে দেখেছি। যখন ছিলাম সেখানে। বিহারের কোডারমা ও হাজারীবাগের জঙ্গলেও অনেক দেখেছি। তিতলি এখানেই জন্মেছে। ও-ও বলল, ও মাত্র একবার দেখেছিল ছোট্টবেলায়। কে জানে, কোন জঙ্গল থেকে এরা এসে পোঁছল' জংলী কুকুর তাড়া করে নিয়ে এল কি? আমি আবার গিয়ে শুলাম। বাইরে সেই পাখিটা ক্রমান্বয়ে ডেকে চললো, ঘুমপাড়ানী ছড়ার মতো, টাকু, টাকু, টাকু, টাকু!

আজকে পাঠশালার পরে, লোহার চাচার সঙ্গে গাড়ুর দিকে একটা জমি দেখতে গেছিলাম। অনেকখানি জমি। ওটা পাকাপাকি হয়ে গেলে আমার কো-অপারেটিভ ফার্মিং শুরু করা যাবে। পাঁচ ভাই-এর জমি। তিনজন ডালটনগঞ্জে, একজন মুজাফ্ফরপুরে আর অন্যজন বিহার-শরিফে; অনেকের মালিকানার সম্পত্তি বলেই ব্যাপারটা আটকে আছে। তবু হয়ে যাবে। গাড়ুতে তাদের যে রিস্তেদার থাকে, শে ত তাই-ই বলছে। দলিল রেজিস্ট্রী হওয়ার আগেই ভাল করে দেখে-টেখে কোথায় ডীপ-টিউবওয়েল বসাবো, কোথায় ঘর বানাবো, কোথায় ভাণ্ডার, এ সবের নক্‌শা করে নিতে চাই। অনেকখানি পথ এই শ্রাবণের কাঁচপোকা-রঙা রোদে হেঁটে গিয়ে, হেঁটে ফিরে, খুবই ক্লান্তি লাগছিল। আর একটু ঘুমিয়ে উঠে, চা খাব। তিতলিকে বললাম। তিতলি বারান্দাতেই বসে রইল। বলল, সময় মতো চা করে, ডেকে দেবে আমাকে।

গভীর ঘুমের মধ্যে হঠাৎ, কে যেন আমাকে জোরে ধাক্কা দিল। কাঁচা ঘুম ভেঙে চম্‌কে উঠে দেখলাম তিতলি। ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

তিত্‌লি বলল, টিহ্‌ল।

টিহ্‌ল? কি হয়েছে? হঠাৎ! চোখ কচ্‌লে উঠে বসলাম।

তিত্‌লি আবার বলল, টিহ্‌ল দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকে ডাকছে। বলছে, খুব জরুরী দরকার। আমাকে কিছুতেই বলছে না।

কি ব্যাপার? বলতে বলতেই, আমি ঘরের বাইরে এলাম। টিহ্‌ল বলল, বাঁশবাবু! শিগগীর জামাটা গায়ে দিয়ে এসো। বেলা পড়ে আসছে। এক্ষুণি আমাদের এক জায়গায় যেতে হবে।

কোথায়? তিত্‌লি আতঙ্কিত গলায় শুধোল।

তিত্‌লির মা নেই ক'দিন হল, লাতেহারে তিত্‌লির এক চাচেরা ভাইয়ের অসুখ; তাই দেখতে গেছে। ও যে একা থাকবে!

থাকুক। আমরা একঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব। পারলে, আরও তাড়াতাড়ি।

কোথায় যাবে?

যেতে যেতে বলব।

তারপর তিত্‌লির দিকে ফিরে বলল, দেরি হলে আজ তোদের এখানেই থেকে যাব তিত্‌লি, রাতে। তাই-ই বলে এসেছি। আমরা আসছি। সাবধানে থাকিস।

পুরো ব্যাপারটাই রীতিমত রহস্যময়। কিন্তু টিহ্‌ল চুপচাপ। মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। তাড়াতাড়ি পা চালালো ও আগে আগে।

কয়েক মিনিট হেঁটে বলালাম, নান্‌কু খবর পাঠিয়েছে?

উত্তর না দিয়ে টিহ্‌ল বলল, সামনে গাড়হাটা আছে, দেখবে। ফরেস্ট ডিপার্ট শালারা কী ভেবেছে বলো ত? যেখানে-সেখানে গর্ত করে রাখবে?

নান্‌কু কি একা? কি রে টিহ্‌ল? মরে গেছে নাকি? বল্‌ না?

কয়েক মিনিট হেঁটে বললাম, নান্‌কু খবর পাঠিয়েছে?

নান্‌কু নয়। সংক্ষেপে বলল টিহ্‌ল।

তবে?

আমরা যাচ্ছি মানির বাড়িতে।

মানির বাড়িতে? কেন? মাহাতো কি আবার কোনো গোলমাল করেছে? নান্‌কু কি মাহাতোকে খুন করেছে? নাকি, মুঞ্জরীকে টাঙ্গি দিয়ে কেটে ফেলেছে মানিই?

না। না। সে সবও নয়। তাড়াতাড়ি চলতে চলতে টিহ্‌ল বলল।

তবে কি? কী ব্যাপার বলবি ত?

হঠাৎই পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে, টিহ্‌ল নিরুত্তাপ গলায় বলল, পরেশনাথ এবং বুলকি দুজনে একই সঙ্গে বৃষ্টির জল-ভরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেব খোঁড়া গাড়হাতে ডুবে মারা গেছে কিছুক্ষণ আগে। তিত্‌লি মা হবে শিগগিরি তাই ওকে সে খবরটা হঠাৎ দিতে চাইনি। পরে, ধীরে-সুস্থে সময় মতো দিও তুমি।

এমন সময় দেখা গেল, টুসিয়ার ভাই লগন দৌড়তে দৌড়তে এদিকেই আসছে। আমাদের দেখেই সে কেঁদে উঠল হাঁউ-মাঁউ করে।

বুঝলাম, ও খবর দিতে আসছিল আমাকেই।

কথা না বলে, চলতে লাগলাম। আমাদের সঙ্গে লগনও চলতে লাগল। দেখলাম, ওর ছেঁড়া প্যান্টটা আর গেঞ্জিটা জলে চুপচুপে ভিজে রয়েছে। জল-ভেজা চুল। একেবারে ঝোড়োকাক!

মুখ দিয়ে কথা সরছিল না আমার। কোনো রকমে বললাম, কী করে হল রে লগন?

লগনকে দেখে মনে হল, তখনও ধাক্কাটা পুরোপুরি সামলে উঠতে পারে নি। কাঁদতে কাঁদতে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি ত সাঁতার জানিই। ওরা পারে বসেছিল। আমি সাঁতার কাটছিলাম। বুল্‌কি মাছ ধরবে বলেছিল নালায়। আমার সাঁতার কাটা হয়ে গেল ওদের বললাম, নামিস না তোরা। ততক্ষণে পরেশনাথ নেমে পড়েছে হাঁটু জলে। বললাম, বহত্ পানি পরেশনাথ, জল্‌দি উপর চড়্ যা। পরেশনাথ হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে আমার মাথার ওপর দিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখছিল। হঠাৎই চিৎকার করে উঠল, সিসি! দিদি! ফিন্ আয়া' আ গ্যয়া।

বলতে বলতেই, সোজা হেঁটে আসতে লাগল আমারই দিকে। ভূতে পাওয়ার মতো আমি তখন গাড়্‌হাটার মধ্যিখানে।

আমি ডাকলাম, পরেশনাথ! পরেশনাথ!

পরেশনাথ যেন আমার ডাক শুনতেই পেল না। এগিয়ে আসতে লাগল জলের মধ্যে হেঁটে হেঁটে। দু-পা এসেই ও হঠাৎ তলিয়ে গেল। পরেশনাথকে তলিয়ে যেতে দেখেই বুল্‌কি চেঁচিয়ে উঠল, ভাইয়াঃ! ভাইয়াঃ বলে।

সঙ্গে সঙ্গে সেও পরেশনাথকে খোঁজবার জন্যে জলে ঝাঁপাল। ব্যস্!

তুই ওদের বাঁচাবার চেষ্টা করলি না কোনো?

না! পারলাম না। আমাকেও কে যেন জলের নীচে টেনে নিয়ে যেতে লাগল খুব জোড়ে।

কে? পরেশনাথ, না বুল্‌কি?

না না। ওরা কেউই নয়। ওরা আমার থেকে অনেকই দূরে ছিল। কোনো মানুষ নয়। জলের মধ্যে জলেরই দুটো হাতই যেন সাঁড়াশীর মতো আমাকে চেপে ধরতে লাগল। কোনোরকম ভাবে আমি সাঁতরে পারে উঠে, ওদের নাম ধরে খুব ডাকতে লাগলাম। ওরা কেউ উত্তর দিলো না। জলের ওপর বুড়িবুড়ি ভেসে উঠতে লাগল শুধু। আমি চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে লাগালাম। লীট্টিবাগে মগনলাল চাচা বয়েল নিয়ে মাটিতে চাষ দিচ্ছিল। তাকে বললাম। কিন্তু সেও সাঁতার জানে না। সে দৌড়ে ডেকে আনল জগদীশ চাচাকে ওর বাড়ি থেকে। জগদীশচাচাও নাকি সাঁতার জানে না। সাঁতার জানে শুধু বাবা। আমি বাড়ি অবধি দৌড়ে এসে, বাবাকে বললাম। বাবা আমার সঙ্গে গাড়্‌হার কাছে পেঁছিতে পেঁছিতে আধঘন্টা সময়েরও বেশী নষ্ট হয়ে গেল। বুড়ো হয়ে গেছে ত বাবা। বাবার সঙ্গে আমিও নামলাম।

বাবা বলল, সাবধান, সাবধান, লগন, টুসি গেছে। তুই ছাড়া কেউ নেই আমাদের; অনেক ডুব জল সেখানে আমার। আর আমি ত ডুব সাঁতার জানি না। তাই-ই আমি পারে উঠে এলাম।

বাবা এক একবার ডুব দেয়, ওদের খোঁজে, আবার ওপরে ভেসে উঠে দম নেয়। লালমাটি-ধোওয়া ভারী জলে বাবার চোখ নাক বুজে আসতে লাগল। তবু বাবা বার বার ডুবে, প্রথমে বুল্‌কিকে টেনে আনল চুল ধরে।

আমি, কত ডাকলাম বুল্‌কিকে। ওর গাল টিপে ডাকলাম ওর দুচোখের পাতা মেলে ধরলাম, বুল্‌কি তবু কথা বলল না। তারও অনেকক্ষণ পরে পরেশনাথকে নিয়ে বাবা উঠল। পরেশনাথ অনেকক্ষণ মরে গেছিল। মগনলাল, আর জগদীশ চাচা বাবার সঙ্গে ওদের হাত পা ভাঁজ করতে লাগল আর খুলতে লাগল। ওদের দুজনের নাক মুখ দিয়ে জল বেরোতে লাগল। নাক বোধহয় কাদাতে বন্ধ

হয়ে গেছিল। তারপর একসময় বাবা বলল, নাঃ। বেকার। সব বেকার। হায় রাম! বলে একবারও পিছনে না চেয়ে, বাড়ির দিকে চলে গেল। মগনলাল চাচা বুলকিকে আর জগদীশ চাচা পরেশনাথকে কাঁধে করে নিয়ে এল বুলকিদের বাড়িতে।

আমরা ততক্ষণে মানির বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছি।

দূর থেকেই শোনা যাচ্ছিল! মানি ডাক ছেড়ে কাঁদছিল। সে কান্না শুনে পাথরেরও বুক ফাটে! আর আমরা ত মানুষ! বর্ষণসিক্ত বন-পাহাড়, লাল-মাটির পথকেও সেই কান্না দ্রব করে তুলছিল।

মানি একবার পরেশনাথকে চুমু খাচ্ছে, আরেকবার বুলকির গালে হাত রাখছে আর কাটা-পাঁঠার মতো গড়াগড়ি যাচ্ছে মাটিতে। নিজের বুকে নিজে কিল মারছে. গাছের গুঁড়িতে মাথা খুঁড়ছে, নাক ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে মানিহার। আশ্চর্য! মুঞ্জরী একেবারেই চুপ। মাটিতে শুইয়ে রাখা ছেলেমেয়ের কাছেও যাচ্ছে না। পাথরের মতো স্থির হয়ে দূর থেকে তাদের দিকে চেয়ে আছে।

আমি প্রথমেই গিয়ে বুলকি আর পরেশনাথের নাড়ি দেখলাম।

মানি দৌড়ে এল। বলল, আছে নাকি? বেঁচে আছে? আমার পরেশনাথ? আমার বুলকি? একটু প্রাণও কি আছে? বাঁশবাবু?

বলেই, হঠাৎ মানি আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। গাছের গোড়ায় ফেলে রাখা টাঙিটা তুলে নিয়ে বলল, ভুলেই গেছিলাম। তোরই জন্যে আমার এমন সর্বনাশ হল। তোর কথায়ই আমি গুহমন সাপের চামড়া ছাড়ালেম, তোর জন্যেই আমার বংশনাশ হল। আজ তোরা খোপড়ি ফাড় দেবি, দো টুকরা কর্। আয়। আয়। এবার তোকে দেখি আমি! বেজাত, আমাদের মেয়েকে বিয়ে করে পাপ করলি শালা। বাবু হয়ে আমাদের সঙ্গে ভিড়ে গেলি। তুইই ত নষ্টের গোড়া! আয়! আয়, বিট্‌চোদোয়া! তোর আজ শেষ দিন!

বস্তির চারপাঁচজন লোক দৌড়ে গিয়ে মানির সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে ওকে মাটিতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে, ওর হাত থেকে টাঙিটা কেড়ে নিল। মানি শুয়ে শুয়েই বলতে লাগল, কোথায় যাবি তুই দেখব! কোথায় পালাবি তুই? তোর রক্তে আমি চান করব। না করলে, আমার পরেশনাথ, আমার বুলকি আমাকে ক্ষমা করবে না। বুলকিয়া-আ-আ-আ-আ-রেরে, এ এ-এ-এ। মেরী লাল, মেরী বেটা ; পরেশনাথ-আ-আথ-থ!

মানির মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না আমি। চোখ নামিয়ে, দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার হাঁটু দুটো থর্‌থর্ করে কাঁপছিল।

মুঞ্জরী, এত কাণ্ডতেও চোখের ভুরু পর্যন্ত তুলল না। একদৃষ্টে ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়েই রইল। মানির দিকেও তাকালো না একবারও। ও যেন অন্য কোনো দেশে চলে গেছে। এ পৃথিবীর সঙ্গে ওর যেন কোনো সম্পর্কই নেই আর।

একে একে বহু লোক আসতে লাগল। প্রত্যেকেই কাঁদতে লাগল। আর আমি খুনী আসামীর মতো এক কোণায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। গোদা শেঠও কাঁদছে দেখলাম। এমন সময় মাহাতো এল। আশ্চর্য! তার চোখেও জল। কিছুক্ষণ চুপ করে সব দেখেশুনে মুঞ্জরীর কাছে গিয়ে কী যেন বলতে গেল। মুঞ্জরী যে মাহাতোকে আদৌ চেনে, তা তার চোখ দেখে মনে হল না। তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মুঞ্জরী তার কাপুরুষ, মাতাল, জড়পদার্থ স্বামী, যাকে সে কতদিন চড়, কিল, ঘুষি মেরেছে, লাথি মেরেছে, সেই মানিরই একেবারে কাছে মানির দুপায়ের ওপর সাষ্টাঙ্গে

শুয়ে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। অপদার্থ, অযোগ্য মাতাল মানি উঠে বসে ওর স্ত্রীর মুখটা দুহাতে ধরল, কত যুগ পরে, বড় সোহাগে। মনে হল, যেন আদর করবে ও। তারপরই, এত লোকের সামনে তার বিবাহিতা স্ত্রীকে, তার সন্তানের জননীকে, চুমু খেল। মানি আর মুঞ্জরীর চোখের জল, দুজনের মুখে-নকে মাখামাখি হয়ে গেল।

এত কষ্ট, এত, এত কষ্ট। তবু এদেরই কোলের দুটি শিশুকে একই সঙ্গে এমন করে ছিনিয়ে নেবার দরকার কি ছিল? কে সেই যমদূত? যে এমন নিষ্ঠুর? কে সেই ভগবান, এই মানুষগুলোর ত বটেই, আমারও যার শুভবোধে একধরনের বিশ্বাস ছিল? কে এদের এমন নিঃশেষে সর্বস্বান্ত করতে পারে, এমনিতেই যারা এমন নিঃস্ব! বড় অন্যায় এ। বড় পাপ! বড় কাণ্ডজ্ঞানহীন হে, তুমি ভগবান!

সকলে তাড়াতাড়ি ঠিক করল, কাল খুব ভোরে বুলকি আর পরেশনাথকে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হবে নিদিয়া নদীর পারের শ্মশানে। এখন গেলে, শ্মশান থেকে ফিরতে রাত হয়ে যাবে অনেক। তাছাড়া শ্মশানের পথও গভীর নির্জন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। শ্মশানযাত্রীরা সকলে ফিরে নাও আসতে পারে শয়তানটার জন্য। এই ছোট্ট ভালুমারের মানুষরা শোন্‌চিতোয়ার অভিশাপে অল্প কিছু-দিনের মধ্যে অনেকই মৃত্যু দেখেছে। মৃত্যুতে তারা এখন অভ্যস্ত। কিন্তু একই সঙ্গে দুটি ভাই-বোনের মৃত্যু ভালুমারের আবালবৃদ্ধবনিতাকে স্তব্ধ, বোবা করে দিয়ে চলে গেল।

সকলে মিলে ধরাধরি করে, যারা এক ঘণ্টা আগেও উচ্ছল উদ্বেল ছিল; সেই বুলকি আর পরেশনাথের প্রাণহীন দেহ বয়ে, মানির ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। বলল, আমরা কাল সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আসব। বুলকিকে নতুন শাড়ি পরিয়ে দিও আর পরেশনাথকে নতুন জামা-প্যান্ট।

গোঁদা শেঠ বলল, রঘু শেঠের দোকান খুলিয়ে আমিই নিয়ে আসব। নিজেই নিয়ে আসব।

জগদীশ আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, গোদা শেঠের আট বছরের ছেলে মারা গেছিল সাপের কামড়ে অনেক দিন আগে।

সন্ধ্যে হয়ে এল প্রায়। মানি মুঞ্জরীর ঘরে গ্রামের অনেক পুরুষ ও নারী থাকতে চেয়েছিল ওদের সঙ্গ দেবার জন্যে আজ রাতে। কিন্তু মানি বলেছিল, কাল আমার মেয়ে চলে যাবে। নইহার ছুট্‌ যাওয়া নয়-এ। বরাবরের মতো ছুটি নিয়ে চলে যাবে বাবা-মাকে ছেড়ে। আর পরেশনাথ যাবে এমন এক দেশে, যেখানে কোনো দুঃখ নেই, যেখানে শুখা-মহুয়া চিবিয়ে খেয়ে আর কান্দা-গেঁঠি খুঁড়ে বাঁচতে হয় না শিশুদের। ওর বাবা-মাকে চিরদিনের মতো ছেড়ে যাবে ও। না। আজ ওরা আমাদের কাছে থাকবে। আমাদের পাশে শুয়ে থাকবে। অনেক কথা বাকি আছে ওদের সঙ্গে আমাদের। শ্বশুরবাড়িতে কেমন ব্যবহার করতে হয় তাও ত জানে না আমার মেয়ে। বড় ছোট যে এখনও ও! ছেলেও জানে না, নতুন দেশের ফসলের নাম।

না! তোমরা সকলে যাও। আমাদের বিরক্ত কোরো না আর। আয়রে পরেশনাথ। বুলকিয়ারে-এ-এ-এ-এ...

আস্তে আস্তে ভীড় পাতলা হয়ে এল। পশ্চিমে সূর্য ঢলছে। পূবে সারি-

বন্ধ ঘনসন্নিবিষ্ট গাছেদের ছায়া দ্রুত দীর্ঘতর হচ্ছে। সন্ধ্যে আসছে। আর আসছে সন্ধ্যের অন্ধকারে থাবা গেড়ে বসে শয়তান শোন্‌চিতোয়াটার ভয়।

মৃত্যুর মধ্যে মৃত্যু।

বড় বড় পা ফেলে একা একা বনপথ দিয়ে ফিরে আসছিলাম। চিতায় কাঠ পুড়লে যেমন ফুট্‌ফুট্‌ আওয়াজ হয়, তেমন ফুট্‌ফুট্‌ করে মানি-মুঞ্জরী নিজেদের ঘরের মধ্যে বসে কথা বলছিল। আমি ভাবছিলাম, মৃত্যুর মতো বড় সত্য আমাদের জীবনে বোধহয় আর নেই। মৃত্যুর এ রূপ দেখে বড় ভয় হল। এখনও আমি বাবা হই নি। হব। মানি-মুঞ্জরীকে চোখের সামনে দেখে বাবা হওয়ার ইচ্ছা আমার আর একটুও নেই। মানুষ নিজের কষ্ট সহ্য করতে পারে। সব কষ্ট। কিন্তু আত্মজ, আত্মজাকে, ফুলের মতো শিশুদের, এমন করে ভাসিয়ে দেওয়া?

যাবেই যদি? তবে এরা আসে কেন?

যারা এক অভাগা আর এক অভাগীকে সমবেদনা জানাতে গিয়েছিল আজ সন্ধ্যেতে তাদের মধ্যেও কাউকে যদি শোনচিতোয়াটা নেয় তাহলে বলতে হবে যে, চিতাটা ভগবানের সৃষ্ট জীব আদৌ নয়। সত্যিই কোনো শয়তানের বাহন সে। ভগবান, এমন করে তার অন্ধ বিশ্বাসে ভর করে যারা থাকে, যদি তাদের আঘাত দেন, তাহলে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সত্যিই সন্দেহ জাগে মনে।

আমার আওয়াজ পেয়েই তিত্‌লি দৌড়ে এল লণ্ঠন নিয়ে। ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করল। আমার দিকে চেয়ে বলল, কি হয়েছে? তোমার? চা আনি?

না।

আমার মুখ চোখ লক্ষ করে ও বলল, কি হয়েছে বল? বলেই, আমার পায়ের কাছে হাঁটুগেড়ে বসল।

সাপের চামড়া ছাড়ালে যে বংশনাশ হয় একথা জানলি কি করে?

কেন? বংশনাশ? কার বংশনাশ?

বুল্‌কি এবং পরেশনাথ। দুজনেই। দুজনেই একই সঙ্গে জলে ডুবে মারা গেছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের খোঁড়া গড়্‌হার জলে। মা-বাবা হওয়া যে এত কষ্টের তা আগে জানলে··

তিতলি একটা অতর্কিত আর্তনাদ করে আমার দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

এখন অনেক রাত। তিত্‌লি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। চা তো দূরের কথা কোনো কিছুই খাওয়ার মতো মানসিক অবস্থা আমাদের কারোই ছিল না। পরেশ-নাথটা, আজ সকালেই নাচতে নাচতে গেছিল। 'মাহাতো-বাবা আসবে' বলতে বলতে।

আমি তো লেখাপড়া শিখেছি! মানি মুঞ্জরী, জগদীশ, মগনলাল, টিহুল, এদের মতো অশিক্ষিত তো আমরা নই। শিক্ষিত মানুষরা আবেগের, শোকের বহিঃপ্রকাশকে হেয় করেন। কিন্তু শিক্ষিত হলেই তো মানুষ তার স্বাভাবিক ধর্মকে কবর দিতে পারে না। আবেগ যার নেই, সে কি মানুষ? যতই শিক্ষা তার থাক না কেন। আমি কেন চোখের জল সামলাতে পারি নি? কেন গোদা শেঠ বা মগনলালের চেয়ে বড় হয়ে উঠতে পারি নি এই শোকে? কি জানি? কিন্তু ভাগ্যিস পারি নি! যে শিক্ষা, মানুষকে ভগবান বা ভূতে পর্যবসিত করে, তেমন শিক্ষার প্রয়োজন অন্তত আমার নেই।

কে'দে কে'দে তিতলির মুখ-চোখ ফুলে গেছে। আমি ফুঁপিয়ে কাঁদি নি। কিন্তু সম্পূর্ণ অপারগতায় এখনও দুচোখ বয়ে জলের ধারা বইছে আমার। মানি-মুঞ্জরীর দুঃখে, ওদের চোখের জলে ওদেরই সমান হয়ে গেছি।

শোকের মতো, এত বড় সাম্যবাদ ; বোধহয় আর কিছুই নেই।

খুব জোর বৃষ্টি এল একপশলা। যেমন হঠাৎই এল তেমন হঠাৎই গেল। বাইরে এমন একটানা ব্যাঙ আর ঝিঁঝি ডাকছে। হাতিরা বোধহয় মীরচাইয়াতে জলকেলিতে নেমেছে। তাদের বৃংহনের শব্দে রাতের বৃষ্টি ভেজা বন-পাহাড় চমকে চমকে উঠছে বার বার! বৃষ্টি থামলে আকাশে একেবারে পরিষ্কার হয়ে গিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ বেরোল চরাচর উদ্ভাসিত করে। ঝকঝক করছে এখন চারদিক। কে বিশ্বাস করবে, এই সুন্দর পৃথিবীতে এত কষ্ট আছে? এই মুহূর্তে দুটি শিশুর শক্ত হয়ে যাওয়া ফুলে ওঠা মৃতদেহ বুকে করে মানি আর মুঞ্জরী শেষ রাতের মতো তাদের অনেক অনাদরের সন্তানদের আদর করছে, তাদের নিঃশব্দ, নিথর অভিমানী মুখ দুটির ওপর ঝুঁকে পড়ে। ওরা নিজেরাই শিশু হয়ে গিয়ে দেয়ালা করছে বিধাতার সঙ্গে এখন। বড় দুর্বোধ্য সে দেয়ালা! এই মুহূর্তেই, এই চন্দ্রালোকিত ভালুমারেই কোনো কোণে, অন্যায় আর অশুভর প্রতীকের মতো শয়তান শোন্‌চিতোয়াটা তার নখ-লুকোনো কালো থাবাব থাপ্পরে আলোকে গুঁড়িয়ে অন্ধকার করে দিচ্ছে। মৃত্যুই সব ভরন্ত জীবনের অমোঘ, রিক্ত পরিণতি, এই সত্য তার শরীরের কালো নিঃশব্দ ছায়ার চলমান বিজ্ঞাপনে দিকে দিকে বিজ্ঞাপিত করেছে। নিদিয়া নদীর পারের শ্মশানে এখন শকুনরা সভা বসিয়েছে!

আজকের রাতেই শ্রাবণী পূর্ণিমা। শ্রাবণ গিয়ে ভাদ্র আসবে। ভাদ্রর পরই আসবে আশ্বিন। দেখতে দেখতে আসবে কোজাগরী পূর্ণিমা। নান্‌কুর মায়েব মৃত্যুদিন। এই বিরাট দেশের আনাচে-কানাচে এবং এই দেশেরই এক ছোট্ট, অখ্যাত ঘুমন্ত পাহাড় বনের গ্রাম, এই ভালুমারের অণুপরমাণুতে অঝোর ধারে ঝরবে ভরা চাঁদের দুধ-ঝিনুকের নরম আলো।

যে ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে দু ভাই বোন পরেশনাথ আর বুলকি শর্টকাট করে আসতে-যেতে পায়েচলা পথের সৃষ্টি করেছিল, তা তখন সবুজ ঘাসে ঢেকে যাবে। আলো ঝরবে তার ওপরেও। পরের বছর শীতে আবারও সরগুজা বা অন্য ফসল লাগাবে সেখানে মানি ও মুঞ্জরী। সমস্ত ক্ষেতে ফসলে ভরে যাবে। সেই দিকে চেয়ে মুঞ্জরীর জরায়ু টনটন করে উঠবে। কিন্তু সেই ক্ষেতে আর পায়ের চিহ্ন পরবে না দুটি নিষ্পাপ শিশুর। ওদের বাবা-মাও ভুলে যাবে একদিন, অনেকই গালাগালি-খাওয়া সেই দুটি শিশুর পায়ের চিহ্ন বুকে করা সেই পথের কথা।

কোজাগরী রাতে কারো ঘরে নবজাত শিশু কাঁদবে কচি গলায়। গোবর আর গরুর গায়ের গন্ধ মিশে যাবে শরতের বনের গায়ের গন্ধর সঙ্গে। পেটে খিদে নিয়ে, অনেক মানুষ শব্দ করে পাশ ফিরবে ঘুমের মধ্যে। কোনো ঘরে, পুরুষ আদর করবে নারীকে, অস্থিসার বৃদ্ধ দীর্ঘ হাই তুলবে নিদ্রাহীন রাতে সারা জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে, মহুয়াতলীর লোম উঠে-যাওয়া চলচ্ছক্তিহীন অসহায় বৃদ্ধ শম্বরের মতো।

শোন্‌চিতোয়াটা হয়তো সেদিনও ঘুরবে, ছায়ায় ছায়ায়।

শুধু শয়তানেরই মৃত্যু নেই। মৃত্যু, শুধু বিবেক, শুভ বোধ নিরপরাধেরই

জন্যে। ততদিনে মাহাতো আর গোদা শেঠ আবারও তাদের স্বমূর্তি ধারণ করবে। তাদের স্বধর্ম দখল নেবে তাঁদের ওপর।

না মরলে ; মানুষের স্বভাব যে যায় না।

ভালুমারের সকলেই আবারও মাথানীচু করে তাদের সবাইকে মেনে নেবে।

মানুষ যদি নিজের মাথা নিজে না উঁচু করে, সম্মানিত না করে নিজেকে ; তবে অন্য কেউই তাকে উন্নতমস্তক, সম্মানিত করতে পারে না। যার যার মুক্তি তার তার বুকের মধ্যেই বয়ে বেড়ায় মানুষ। সেই প্রচণ্ড শক্তিকে সে নিজে যত দিন না মুক্ত করছে, ততদিন কারোই সাধ্য নেই তাকে মুক্ত করে।

সম্মানেরই মতো ; মুক্তিও ভিক্ষা পাওয়া যায় না।

বুলকি আর পরেশনাথের জন্যে এই ভালুমারের আমাদের সকলের চোখের জল, সব সমবেদনা, সমস্ত হঠাৎ-ঔদার্য যে চরম মিথ্যা তা প্রমাণ করে মানি ও মুঞ্জরী আবারও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে খিদেয় জ্বলতে জ্বলতে অশক্ত শরীরে নিজে-দের ধিক্কার দিতে দিতে, নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করতে করতে বুনো শুয়োর আর শজারুদের সঙ্গে লড়াই করে কান্দ-গেঁঠি খুঁড়ে খাবে। আবারও মাতাল হয়ে, অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে করতে মানি বাড়ি ফিরবে হাট থেকে ; যে বাড়িতে, বাবা বলে তাকে আর কেউ ডাকবে না কোনোদিন।

মানুষের জীবনে বোধ হয় অনেকই ধরে। অনেক আঁটে। আনন্দ, দুঃখ, উৎসব, শোক, মহত্ত্ব নীচতা সব, সব।

এই সমস্ত কিছু নিয়েই, ভরে তুলে ; আবারও ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে দিতেই তো আমাদের মতো নগণ্য সাধারণ সব মানুষদের বেঁচে থাকা! আমাদের কাছে, এর নাম জীবন। শুধুই প্রশ্বাস নেওয়া ; আর নিশ্বাস ফেলা। ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সুখ-দুঃখের ওপরে আমরা তো কোনোদিনও উঠতে পারি না! আর, পারি না বলেই হতাশ নিশ্চেষ্টতায় এই দুঃখময় রাতেও আমরা ঘুমোই, ঠাণ্ডা রক্তের সরীসৃপের মতো। পরম আশ্লেষে, কুণ্ডলী পাকিয়ে।

একটু পরে আমি নিজেও ঘুমোব, নিজের ছোট্ট সুখের ছোট্ট ঘরে, আমার যুবতী, গর্ভিণী স্ত্রীর মসৃণ শরীরে হাত রেখে।

জাগে না কেউই। এ দুঃখরাতে, এ দেশে ; এ যুগে।

না কি? কেউ জাগে?

কে জাগে?